মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র

মুনতাসীর মামুন

মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র ॥এক॥ ❑ মুনতাসীর মামুন

দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১১ । প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০ ।
প্রকাশক : আহমেদ মাহফুজুল হক
সুবর্ণ । বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (দোতলা) রুম নং ২৩৫
৩৮/৩ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ । ফোন : ৭১২২৪১৬
কম্পোজ : মঞ্জুরী কম্পিউটারস ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স ৩৬ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরীর ড্রইং অবলম্বনে : মোবারক হোসেন লিটন
স্বত্ব : লেখক

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

বিক্রয় কেন্দ্র : সুবর্ণ ❑ ইসলামী টাওয়ার, রুম নং ২ ❑ ১১ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

ISBN 984 70297 0028 0

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

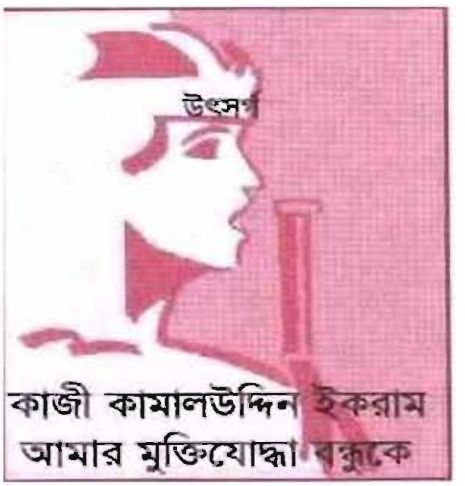

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি করছি প্রায় তিনদশকের মতো। পত্র-পত্রিকায় লেখা ছাড়াও, গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। প্রায় এক হাজার ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি প্রকল্পের কাজও শেষ করেছিলাম। শেষ হওয়ার পর বাকী গবেষক ও কেন্দ্র আমার নাম উল্লেখ না করে নিজেদের নামে চালিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে প্রতিপক্ষ, যেমন পাকিস্তানি বা রাজাকার যুদ্ধাপরাধীদের নিয়েও লিখেছি। এ লেখাগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, অগ্রন্থিতও আছে কিছু। ২০০৯ সালের বইমেলায় *অনন্যা* প্রকাশ করে *রাজাকার সমগ্র*।

আমার প্রথম যৌবনের বন্ধু/প্রকাশক আহমেদ মাহফুজুল হক সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি বের করবেন *মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র* কয়েক খণ্ডে। আমি আপত্তি জানাইনি, শুধু বলেছি সংকলন থেকে প্রুফ দেখা সব কাজ তাঁকেই করতে হবে। তিনি তা মেনেই বইমেলায় প্রকাশ করলেন *মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র/১*।

বর্তমান সংকলনে ১৫টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এগুলি নেয়া হয়েছে আমার প্রকাশিত বই—*ইয়াহিয়া খানের মুক্তিযুদ্ধ, যে সব হত্যার বিচার হয়নি, সেইসব দিন* এবং *ইতিহাস দখলের ইতিহাস* থেকে। উল্লেখ্য এইসব গ্রন্থের সংস্করণ নিঃশেষিত। এবং *সেইসব দিন* ছাড়া অন্য গ্রন্থগুলির পুনঃসংস্করণের সম্ভাবনা প্রায় নেই।

মুনতাসীর মামুন

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০১০

সূচিপত্র

মুক্তিযুদ্ধ ১১
যেসব হত্যার বিচার হয়নি ১৮
মার্কিন দলিলপত্রে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব মুহূর্ত ও মুক্তিযুদ্ধ ১১৯
ইয়াহিয়া খান ও মুক্তিযুদ্ধ ১৫৬
মুক্তিযুদ্ধের সামরিকায়ন ১৮০
আদালতেও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৬
পাঠ্যবই : ইতিহাস দখলের ইতিহাস ২০০
পাকিস্তানের দৃষ্টিতে পাকিস্তান ভাঙলো কেন? ২৫৩
বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া না চাওয়া ২৬২
পাকিস্তানের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে গণহত্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ২৬৯
মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি বনাম আপসের সংস্কৃতি ২৮২
ইতিহাসের আলোয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৮৬
৭ মার্চ কেন ৭ মার্চ ৩০৮
স্বাধীনতার আনন্দে ন'মাস ভেসে যায় ৩১৪
এ শতকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দিয়েছিল একমাত্র বাংলাদেশই ৩২০

আজ তিন দশক পরেও, কোনো-না-কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধ রয়ে গেছে বাংলাদেশের কেন্দ্রে। বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি—সবকিছুর পর্যালোচনা করতে গেলে কোনো-না-কোনো সময় নিরিখটা হয়ে দাঁড়ায় মুক্তিযুদ্ধ। তা হলে কি মুক্তিযুদ্ধে ছিল যে আশা তা এখনো অপূর্ণ, নয়তো ঘুরে-ফিরে কেন নিরিখটা দাঁড়াবে মুক্তিযুদ্ধ? সে-জন্যই শুরুতে বললাম—মুক্তিযুদ্ধ আছে এখনো বাংলাদেশের কেন্দ্রে।

মুক্তিযুদ্ধকে অনেকে বলেন স্বাধীনতাযুদ্ধও। আপাত-দৃষ্টিতে অনেকের কাছে শব্দ দুটি সমার্থক মনে হলেও তফাৎ আছে প্রত্যয় দুটিতে। তফাৎটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ-কারণে যে, শেষোক্ত শব্দটি সরকারিভাবে ব্যবহার করা শুরু হয় সামরিক শাসনামলে, গণপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনে নয়। সে-কারণে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটির দ্যোতনা প্রাক ১৯৭১ প্রজন্মের কাছে যতটা ব্যঞ্জনাময়, স্বাধীনতাযুদ্ধ ততটা নয়।

মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি ব্যাপক, অর্থও। অন্যদিকে স্বাধীনতার বিষয়টি সংকীর্ণ, অর্থও। মুক্তিযুদ্ধ বলতে বোঝায় (বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে) বাঙালির সার্বিক মুক্তি, সব অর্থে। এখানেই বিভক্ত হয়ে যায় জনপ্রতিনিধি আর সামরিক শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি। রাজনীতিবিদরা যেহেতু সাধারণ মানুষের মাঝ থেকে উঠে এসেছেন, ছিলেন তাদের প্রতিনিধি, তাই ১৯৭১ সালে তারা অনুধাবন করেছেন, মুক্তি কেন ছিল প্রধান প্রশ্ন। আর সামরিক সমাজের প্রতিনিধির কাছে আশু ছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ভৌগোলিক মুক্তি। এই যে বিভাজনের সৃষ্টি, তা অব্যাহত এখনো। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর সময়টুকুতেও দ্বন্দ্ব ছিল এ নিয়ে এবং এই যুদ্ধের নিরসন না-হওয়ায়, এ পার্থক্যই পরবর্তীকালে দ্বিখণ্ডিত করেছে সমাজ, রাজনীতি—সব।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষিত ও এলিট মহলে শব্দ দুটির দ্যোতনা দুরকম হতে পারে; কিন্তু একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে মুক্তি, স্বাধীনতা শব্দগুলোর পার্থক্য বিশেষ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে না। তাদের অনেকের কাছে ১৯৭১ সাল তো গণ্ডগোলের বছরও। তার অর্থ কি এই যে, সে মুক্তি বা স্বাধীনতা চায় নি? তা নয়। তার প্রকাশভঙ্গিই এরকম। তার কাছে ১৯৭১ এ-কারণে গণ্ডগোলের বছর যে, এর আগে সে অর্থাৎ বাঙালি এরকম সংঘাতের মুখোমুখি আর হয় নি। প্রকাশভঙ্গি যে-রকমই হোক, তাকে যদি শব্দ তিনটির মধ্যে কোনটি বেশি অর্থবহ চিহ্নিত করতে বলা হয়, তা হলে সে অবশ্যই ১৯৭১ সালকে চিহ্নিত করবে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে।

মুক্তি এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি যে হঠাৎ করে আমাদের শব্দাবলিতে চলে এসেছে তা নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধও হঠাৎ করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ শুরু হয় নি। বহুদিনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনা, নিপীড়ন থেকে মানুষ মুক্তি চেয়েছে সর্বতোভাবে—এই অনুভূতিই সৃষ্টি করেছে মুক্তিযুদ্ধ শব্দটির, একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং যে প্রত্যক্ষ

সমরে অংশগ্রহণ করেছে সে মুক্তিযোদ্ধা। সুতরাং এই শব্দটির (যা হয়ে ওঠে একটি প্রত্যয়) অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায় সর্বক্ষেত্রে মানুষের বা বাঙালির মুক্তি।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সবার জানা। সে-কারণে, নতুনভাবে তা বিবৃত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি এ প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেখাবার চেষ্টা করব কীভাবে আঞ্চলিকতা জাতীয়তাবাদে সংহত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রণোদনা যোগাল এবং বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে তা রূপ পেল।

বাংলাদেশ বাঙালির দেশ—এ মন্তব্য করলাম বটে কিন্তু এতে একটি সমস্যা থেকে যায়। বাঙালির আরেকটি বড় আবাসভূমি—পশ্চিমবঙ্গ। জাতিগতভাবে দু'ভূখণ্ডে একই জাতি, একই ভাষাভাষী মানুষের বাস, সংস্কৃতির উৎসও এক। সুতরাং বাঙালি জাতীয়তাবাদ কেন সংহত হলো বাংলাদেশে, অন্য অঞ্চলে নয়—সে প্রশ্ন জাগতে পারে। বা, কেন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হলো, পরিণত হলো বাঙালির আবাসভূমিতে? 'বাংলার ও বাঙালির ইতিহাসের সূত্রপাত' নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, 'বিচিত্র সংকরজন' নিয়ে।

অতি প্রাচীনকালে এসব নরগোষ্ঠী বাস করেছে কোমবদ্ধ হয়ে এবং একটি কোমের সঙ্গে অপরটির যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। সভ্যতার বিস্তৃতির ফলে, বিভিন্ন কোমের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল বৃহত্তর কোম, যেমন বঙ্গ, রাঢ়া, পুন্ড্রা প্রভৃতি। এই কৌমচেতনা প্রাচীন যুগে তো বটেই, মধ্যযুগেও ছিল এবং এখনো বহমান।

কৌমচেতনার সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়েছিল আঞ্চলিক স্মৃতি ও চেতনার। বঙ্গা, রাঢ়া, পুন্ড্রা প্রভৃতি কৌমগুলো গড়ে তুলেছিল আবার বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদসমূহ। পাল (আনুমানিক ৭৫০ থেকে ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দ) ও সেন রাজারা (আনুমানিক ১০৯৫-১২৪৫ খ্রিস্টাব্দ) বিভিন্ন জনপদগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আঞ্চলিক চেতনা লুপ্ত করা সম্ভব হয় নি। এবং নীহাররঞ্জন রায়ের মতে 'ভূমি নির্ভর কৃষি জীবনের কারণে' কাজ করেছিল কৌম ও আঞ্চলিক চেতনা। উনিশ শতকের শেষার্ধে আঞ্চলিক চেতনার মধ্যে ভূমি নির্ভরতার অনুপ্রবেশ ক্রিয়াশীল দেখতে পাই বিকাশমান মধ্য বা বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে। ঐ সময় জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল এবং এর দুটি ধারা ছিল বহমান। একটি সর্বভারতীয়, অপরটি আঞ্চলিক। প্রথমটির ভিত্তি ছিল সর্বভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য। দ্বিতীয়টির ভিত্তি ছিল স্ব স্ব অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং নিজ অঞ্চলের লোকসমষ্টির ঐ অঞ্চলের বাজার ও সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ। জাতীয় চেতনার মধ্যে আঞ্চলিক চেতনার এই অবস্থানের ভিত্তিতে আবার অনুপ্রবেশ করেছে প্রাচীন বাংলার অতীত ও ঐতিহ্য। উনিশ শতকের শেষার্ধে একই সঙ্গে সর্বভারতীয়, আঞ্চলিক (বাংলা) এবং উপ-আঞ্চলিক (পূর্ববঙ্গ)—এই চেতনাত্রয় কাজ করেছিল। বুর্জোয়া শ্রেণির জন্যে সর্বভারতীয় পরিসরে সুবিধা ছিল বেশি। সেজন্য সে চেয়েছিল সর্বভারতীয় চেতনার বিকাশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার আঞ্চলিক চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল সে, যেমন বঙ্গভঙ্গের সময়। কলকাতার বিরুদ্ধে আবার পূর্ববঙ্গের কাঠামোগতভাবে দুর্বল মধ্যশ্রেণির উপ-আঞ্চলিক চেতনা কাজ করেছিল। ঐ মধ্যশ্রেণির মতে, তাদের অঞ্চলের উৎপাদিত কাঁচামাল চলে যাচ্ছিল কলকাতায়, কিন্তু পাচ্ছিল না তারা ন্যায্যমূল্য। পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল

অবহেলিত। এসব কিছুর পরিচয় পাব আমরা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর বাহন, সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলোতে। এই চেতনায় সহায়তা করেছিল আবার ভূমিনির্ভর জীবন, শিল্পের অভাব। এই উপ-আঞ্চলিক চেতনা পূর্ববঙ্গবাসীর মন থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি কখনো। তবে সে-চেতনা আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে (১৯৭১) সহায়তা করেছিল। অবশ্য এই রূপান্তর আমার আলোচনার পরিসরের বাইরে।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন, একটি বিশেষ প্রাকৃতিক সীমার আবেষ্টনীর মধ্যেই জাতি ও ভাষার বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে এবং এই জন ও ভাষার একত্ব বৈশিষ্ট্য লইয়াই বর্তমান বাংলাদেশ এবং সেই দেশ চতুর্দিকে বিশিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা বেষ্টিত। বর্তমান রাষ্ট্রসীমা এই প্রাকৃতিক ইঙ্গিত অনুসরণ করে নাই সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিককে সেই ইঙ্গিতই মানিয়া চলিতে হয়, তাই ইতিহাসের নির্দেশ।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা এও লক্ষ করি, ভাষা ও জাতি হিসেবে বাঙালির 'একত্ব' গড়ে উঠলেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের এমন কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে যা দুটি অঞ্চলকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। প্রকৃতিগত দিক থেকেও পার্থক্য আছে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের। এ ছাড়া সংস্কৃতিগতভাবেও যে প্রাচীনকালে দুটি অঞ্চলের মধ্যে খুব মিল ছিল এমন কথা বলা যায় না। যেমন, রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ) এর ওপর প্রভাব পড়েছিল বেশি উত্তর ভারতীয় 'কালচারাল ইডিওমস'-এর। যার উদাহরণ ঐ অঞ্চলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। এ-পরিপ্রেক্ষিতে, অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন এ-বলে যে, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব রাঢ় অঞ্চল থেকে কিছু কম ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক প্রশ্নে প্রায় এক এবং রাঢ় ঐ প্রশ্নে স্বতন্ত্র। এর একটি কারণ বোধ হয় এই যে, পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের আগমন এবং তারপর তাদের সংগঠিত ধর্মজীবন ও কৃষি বাণিজ্যের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল উত্তরাঞ্চলে। এককথায়, মুসলমানদের আগমন, মসজিদ নির্মাণ ও তাকে ঘিরে পতিত জমি উদ্ধার ও সংগঠন, বিশেষ করে সুফীদের প্রভাব গ্রাস করেছিল উত্তরাঞ্চলকে। এখনো ঐ সব অঞ্চলে সুফীদের সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তী সেই স্মৃতিই বহন করে। এভাবে একসময়, উত্তরাঞ্চল রাঢ়ের সংলগ্ন ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে থাকা সত্ত্বেও কালক্রমে ঐ প্রশ্নে তা পূর্ববঙ্গে আঞ্চলিকতার বলয়ে লীন হয়ে গিয়েছিল।

অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, অভিন্ন বাংলার পরিপ্রেক্ষিতেও, ষষ্ঠ শতক থেকে সমতটকে কেন্দ্র করে একটি একক হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশের ভূ-ভাগে একটি স্বাতন্ত্র্য বোধের সৃষ্টি হয়েছিল যা ক্রমেই পুষ্ট হয়েছে।

দুই

উনিশ শতক পর্যন্ত, এই আঞ্চলিকতার বোধটি ক্রমেই জোরদার হয়ে ওঠে। 'বাঙাল' শব্দটির সৃষ্টিই তখন। পূর্ববঙ্গ পরিণত হয় 'বাঙাল'দের দেশে 'বাঙালি'র নয়। ঐ সময় পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ সাময়িকপত্র, আত্মজীবনীতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১৯৪৭-এর আগে এই আঞ্চলিকতা বোধ রূপান্তরিত হতে থাকে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদে। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বাঙালি হলেও আগে মুসলমান হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তান চেয়েছিল। গত শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি হয়েছিল। সম্প্রদায় হিসেবে সে ছিল অধস্তন। একজন বর্ণহিন্দু একজন শূদ্রের সঙ্গে যে ব্যবহার করে একজন মুসলমানের সঙ্গেও সে ব্যবহারের কোনো তারতম্য ছিল না।

১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে প্রথম দেখা গেল, এতদিন যা ভেবে আসা হয়েছিল উপাত্ত তা বলে না। অর্থাৎ ভেবে আসা হয়েছিল সংখ্যাগত দিক থেকেও হিন্দুদের সংখ্যা বেশি। এখন দেখা গেল, দুটি পৃথক অঞ্চলে দুটি পৃথক সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। আজকের বাংলাদেশের সীমানায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ যেখানে শ্রেণি ও সম্প্রদায় হিসেবে তারা আবার অধস্তন। আজকের মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, শ্রেণি ও সম্প্রদায় হিসেবেও তারা ঊর্ধ্বতন। কিন্তু সেখানে একেবারে ক্ষুদ্র হলেও একটি মুসলমান মধ্যবিত্ত ছিল যা অনুপস্থিত ছিল পূর্ববঙ্গে। মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধের কথা তারাই উচ্চারণ করছিলেন।

এর সঙ্গে আঞ্চলিকতার প্রশ্নটি ছিল সমান্তরালভাবে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ চেয়েছিল। মুসলমান কৃষক (ও ঊর্ধ্বতন শ্রেণি) এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ নমশূদ্র (হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে) ছিল বঙ্গভঙ্গের পক্ষে। এমনকি মধ্যবিত্ত ব্রাহ্ম গিরিশচন্দ্রও লিখেছিলেন, বঙ্গভঙ্গ হলে তিনি খুশি হবেন, কারণ, ঢাকা হবে এ অঞ্চলের রাজধানী এবং চট্টগ্রাম উন্নত হবে বন্দর হিসেবে। 'এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হইতে পারে।'

এ-শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল স্বাতন্ত্র্যবোধের। সম্প্রদায় হিসেবে নিজের অবস্থান সংহত করতে চাওয়াতেই ঊর্ধ্বতন হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বের শুরু। এবং এ কারণে দেখি ১৯২০ থেকে ১৯৪০-এর দশকে ক্রমেই বাঙালি আত্মপরিচয়ের চেয়ে মুসলমান পরিচয়ই প্রাধান্য পায়। আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন মল্লিক ও হোসেন : 'মুসলমানদের এই পৃথক পরিচয় দাবি বাহ্যত ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির বলে প্রতীয়মান হলেও মূলত তা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক সম্পদ-পরিবেশে একটি প্রান্তিকীকৃত (marginalised) অর্থাৎ ন্যায্য অধিকারবঞ্চিত সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। এর ফলে, উপমহাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জনসংখ্যার অবস্থানগত বাস্তবতা এখানকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, যেখানে হিন্দুরা ছিল প্রায় সকল সুযোগ-সুবিধার অধিকারী এবং মুসলমানরা ছিল ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।' [বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৯]

ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিচয়ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। জমিদার মহাজন, বড় চাকুরে সব হিন্দু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব কৃষক মুসলমান—এ রূপটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে বিশেষভাবে। আর্থ-সামাজিক নিপীড়নের মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে না-গেলে হয়ত এ-প্রশ্ন চাপা পড়ে যেত। 'এ কারণে', লিখেছেন মল্লিক ও হোসেন, '১৯৪৬-এ বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে একচেটিয়াভাবে ভোট দিয়েছিল ইসলামী রাষ্ট্র

হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে নয়, বরং, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, যা হিন্দু-শাসিত ভারতে অর্জন করা অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়েছিল।' [ঐ পৃ. ৫৪৫]
এভাবে আঞ্চলিকভাবে প্রশ্নটি চাপা পড়ে যায়, চাপা পড়ে যায় বাঙালি প্রশ্ন, বরং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্যান ইসলামিজম। পাকিস্তান শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকই নয়, উঠতি মধ্যবিত্তের কাছেও ছিল ভারতের বিকল্প যেখানে নিজের প্রসারণের সুযোগ তার থাকবে।

তিন

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান অর্জনের পর বাঙালির পূর্ব ধারণায় অভিঘাতের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের রাজনীতি সৃষ্টি করে দুটি ধারা। 'ক. ১৯৪৭-পূর্ব হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক রাজনীতি এবং সমান্তরালভাবে ১৯৪৭-উত্তর পাকিস্তানের পাকিস্তানি ও বাঙালিদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক রাজনীতি। খ. হিন্দু ও মুসলমান এবং পাকিস্তানি (বিশুদ্ধ মুসলমান) ও বাঙালিদের (অ-শুদ্ধ মুসলমান) মধ্যে ইতিহাসের এই বিভাজকের ভিত্তি বর্ণগত চিন্তা আচরণ বিধি ও সমাজকাঠামো।'
[বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সোনার বাংলা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সমাজ নিরীক্ষণ/৭০]
ভারত বিভাগের সময় পাকিস্তানের দুই অংশ যে অর্থনীতি পেয়েছিল তাতে 'তাদের বিকাশের স্তরে তাৎপর্যপূর্ণ বৈষম্য' ছিল না [বাংলাদেশের ইতিহাস ৩/পৃ. ৬১৭]। কিন্তু একদশকের মধ্যে দেখা গেল, দেখা দিয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ বৈষম্য। মধ্যবিত্তের প্রসারণের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে অবাঙালি আধিপত্যের কারণে। গণতন্ত্রের বদলে রাষ্ট্রে ক্ষমতা দখল করা হচ্ছে জবরদস্তি করে এবং কায়েম করা হয়েছে সামরিক আধিপত্য। সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে। ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নিপীড়ন চলছে যার বিরুদ্ধে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে।
পূর্ববঙ্গে শাসকদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ হলেই তা দেখা হত ইসলামদ্রোহী হিসেবে। সমীকরণটি ছিল এরকম—ইসলামের বিরোধিতা মানে ভারতকে সমর্থন। ইসলামের প্রতীক পাকিস্তান। হিন্দুত্বের প্রতীক ভারত। পাকিস্তানি শাসকদের বিরোধিতা করার অর্থ হচ্ছে হিন্দুত্ব সমর্থন। উল্লেখ্য, শাসকরা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। এক পাকিস্তানি জেনারেল লিখেছিলেন, বাঙালিরা দেখল তাদের প্রভুর বদল হয়েছে মাত্র এবং এ প্রভু পূর্বের প্রভুর থেকেও খারাপ। বাঙালি আবিষ্কার করে, যে-রাষ্ট্রের জন্য তারা সংগ্রাম করেছিল সে-রাষ্ট্রে তার অঞ্চল পরিণত হয়েছে কলোনিতে। বাঙালি আবিষ্কার করে, 'উপনিবেশিকতা যারা আরোপ করেছে সেই পাকিস্তানিরা বাঙালিদের রাজনৈতিক অর্থে স্থানচ্যুত করেছে, অর্থনৈতিক অর্থে সম্পদচ্যুত করেছে অধস্তন করে, এবং অধস্তন ব্যক্তিদের হত্যা করেছে মুক্তিযুদ্ধের সময় সশস্ত্রত মাধ্যমেও সন্ত্রাসের মাধ্যমে।' [জাহাঙ্গীর, ঐ]
এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের প্রতি মোহ বেশি ছিল বাঙালির, পাকিস্তানিদের নয়। ১৯৫৪ সালের দিকেই পাকিস্তানের শাসকরা অনুধাবন করেছিল অন্তিমে এই অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে। সুতরাং মধ্য-ষাটের দশকেই তারা

পূর্ববঙ্গকে পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭১ ছিল তাদের জন্য অজুহাত মাত্র। [পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার]।

এই সামগ্রিক বঞ্চনার আবেগ পাকিস্তানের পরিসরে সেই পুরোনো আঞ্চলিকতার রেশ ফিরিয়ে আনে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ একটি একক এবং বাংলাদেশ। শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা বা স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা তারই প্রতিফলন। ছয় দফা প্রত্যাখ্যাত হলে সৃষ্টি করা হয় 'সোনার বাংলা' মিথের। আঞ্চলিকতা বোধ উত্তরিত হয় জাতীয়তাবাদে। সোনার বাংলার ভিশন বাঙালি মেনে নিতে থাকে। প্রশ্ন ওঠে, সোনার বাংলা শ্মশান কেন? 'এভাবে পুনর্নির্মিত, পুনর্গঠিত হয়েছে ইতিহাসের দিক থেকে মৌল এবং স্থায়ী এক প্রতিরোধ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত পূর্বপাকিস্তানে, এবং উপনিবেশে রূপান্তরিত পূর্ববাংলা। পূর্বপাকিস্তান বাংলাদেশের মধ্যে। সোনার বাংলার এই নির্মাণের ফলে পাকিস্তানের কেবল কথা বলার অধিকার আছে এবং পূর্ববাংলা/পূর্বপাকিস্তান/বাংলাদেশ কেবল নীরব, স্তব্ধ, মৌন, এই ধারণা যায় বদলে। এটি বদলে দেয় পরিস্থিতি এবং সাবঅলটার্ন বাঙালিদের অভিজ্ঞতা ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করে দ্বৈরথের সম্মুখীন হয়ে, নিশ্চিতভাবেই জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-তত্ত্বের ভিত্তিতে।' [জাহাঙ্গীর, ঐ] বাঙালি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠে দ্বৈরথের জন্য। এখানে উল্লেখ্য, পাকিস্তান আন্দোলনে মেরুকরণে ভিত্তি ছিল ধর্ম, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ধর্মের গুরুত্ব গৌণ হয়ে গেল। যদিও দুটি আন্দোলনে অনুঘটক ছিল এলিট শ্রেণি। বাঙালি যেন অবশেষে নিশ্চিত হয় তার আবাসভূমি ও পরিচয় সম্পর্কে। ১৯৭০-৭১ সালে বাঙালির স্লোগান হয়ে ওঠে 'তোমার আমার ঠিকানা—পদ্মা, মেঘনা, যমুনা', 'তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ'; অন্তিমে—'জয় বাংলা'। যুদ্ধের সময় গীত গানগুলোতে দেখা যাবে আরব, ইরান, ইকবাল নয়, ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছেন—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ। রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে ওঠে জাতীয় সঙ্গীত আর নজরুলের গান রণ সঙ্গীত। ১৯৭১ সালের প্রবাসী সরকারের পোস্টারে লেখা হয়—'বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান—আমরা সবাই বাঙালি।'

চার

এভাবেই, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাঙালি তার শিকড় খুঁজে পেল বাংলাদেশে। দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সংগ্রামের ধারাবাহিকতা পরিণতি পেল। বাংলাদেশ আন্দোলনে এলিট শ্রেণি অনুঘটক হলেও নয়মাসের যুদ্ধ বাঙালি মানসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে যা প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে। এত দ্রুত আর কোনো দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র রচিত হয় নি। এর কারণ, মুক্তিযুদ্ধের অর্জন দ্রুত সংহত করতে চেয়েছিল সরকার। এখন মনে হয়, তারা কি ভাবছিলেন যে, এই অর্জন হুমকির সম্মুখীন? ১৯৭২ সালে শাসনতন্ত্র ছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিবাচক ফল যাকে বলা যেতে পারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপাদান। এর পটভূমি ছিল নয়মাসের যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ওই সময়টুকুতে শহর ও গ্রামের এলিট ও নিম্নস্বের ভেদাভেদ হ্রাস পেয়েছিল। কারণ, হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারে কোনো তারতম্য ছিল না। এ সময় দুই শ্রেণিই পরস্পরকে

সহায়তা করেছে, আশ্রয় দিয়েছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলের এলিটরা পালাবার সময় আশ্রয় ও খাদ্য পেয়েছে অধস্তন শ্রেণির কাছ থেকে যেটি তার মনোজগতে আঘাত হেনেছে। হাজার বছরে এই প্রথম তৃণমূল পর্যায়ে যুদ্ধ অভিঘাত হেনেছে এবং তা জাতীয়তাবাদী ধারণা তীব্র করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছে বাঙালি হিসেবে। এবং আবহমান বাংলার ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই যা মূর্ত হয়েছে 'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা'—এ ধরনের গান ও কবিতায়।

সে-জন্য নতুন স্বাধীন দেশের নতুন নাম হয়—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। শাসনতন্ত্রের মূল স্তম্ভ হয়—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। জাতীয়তা বাঙালি। বাঙালি জাতীয়তাবাদ চ্যালেঞ্জ করে পূর্বের পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ-সম্পর্কিত ধারণা। গণতন্ত্র ছিল সামরিক আধিপত্য ভেঙে সিভিল সমাজ গড়ার অঙ্গীকার। সমাজতন্ত্র ছিল নিঃস্বদের জন্য অর্থনৈতিক সাম্য। যুদ্ধে তাদের বিশেষ ভূমিকা এলিটদের বিরুদ্ধে এ অর্জনে সহায়তা করেছিল। এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল ইসলামকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে না-দেয়ার অঙ্গীকার।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সামরিকবাহিনীর ক্ষমতা দখলের পর এই ছকটি পুরো বদলে যায়। সামরিক শাসন আবার নাজেল হয়। বাংলাদেশে মিনি পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য সংশোধন করা হয় শাসনতন্ত্র। কারণ, এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক। বাঙালি জাতীয়তাবাদ হয়ে যায় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। বিলুপ্ত হয় সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। জেনারেল এরশাদ ইসলামকে ঘোষণা করেন রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে। যুদ্ধাপরাধীদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও প্রতীকসমূহ বিলুপ্তকরণে বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ১৯৯০ পর্যন্ত এই ধারা ছিল প্রবল। বর্তমানে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেও যে সে-ধারা পালটে দিতে পেরেছে তা নয়, তবে প্রচেষ্টা চলছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করি, তা হলে বলা সম্ভব নয় যে, মুক্তিযুদ্ধ সম্পন্ন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ দেশ দিয়েছে, আবহমান বাংলার ঐতিহ্যকে স্বীকার করেও বাংলাদেশ স্বতন্ত্রমণ্ডিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে কিন্তু সার্বিক অর্থে মুক্তি অর্জিত হয় নি। ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন হতে পারে সে-মুক্তি অর্জনে প্রধান পদক্ষেপ। যে-কারণে মুক্তিযুদ্ধ এখনো রয়ে গেছে সবকিছুর কেন্দ্রে। এবং সে-কারণেই সবকিছুর বিচারের নিরিখ এখনো মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৯৯

'আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা, মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে; হাত-পা বাঁধা। ...' 'আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। মুখ ও নাকের কোনো আকৃতি নেই। কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। স্তনের একটি অংশ কাটা। ... মেয়েটি সেলিনা পারভীন। শিলালিপির এডিটর। ...
'মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি ফলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যস্থ কঙ্কাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক-যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।'

ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমি দেখে এসে এই প্রতিবেদন লিখেছিলেন অধ্যাপিকা হামিদা রহমান। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী একবছর খবরের কাগজের পাতা ওল্টালে এ-ধরনের প্রচুর বধ্যভূমির খবর জানা যাবে। সংকলিত 'বধ্যভূমির অভিজ্ঞতা'—একটি উদাহরণ। এ উদাহরণটি অবশ্য অনন্য কারণ, বধ্যভূমি থেকে কেউ ফিরে আসে না, আসে নি। ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমি, যেখানে আমাদের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল তা বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক বধ্যভূমির প্রতীক। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল স্বাধীনতাবিরোধীরা যাদের প্রধান অংশ ছিল জামায়াতে ইসলামের কর্মীরা। এদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল রাজাকারবাহিনী, ডেথ-স্কোয়াড নামে খ্যাত আল-বদর ও আল শামস বাহিনী। এখনো ত্রিশ বছর পেরোয় নি ঐসব নৃশংস ঘটনার। কিন্তু, বাংলাদেশ যেন এসব মনে রাখে নি।

ভুলে যাওয়ার এক অসম্ভব ক্ষমতা আছে বাঙালির। অনেকে বলেন, বাঙালি ক্ষমাশীল। আমি মনে করি, না, তা সুবিধাবাদ, নিষ্ঠুরতা। আমার সামনে ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকার বিবর্ণ কিছু সংখ্যা। প্রতিটি পাতায় পাতায় হারিয়ে যাওয়া, খুন হওয়া মানুষের খবর, খুনিদের তালিকা, বিচারের দাবি আর সরকারি প্রতিশ্রুতি। তৃতীয় বছর থেকে এসব খবর কমতে থাকে এবং একসময় তা সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে ২৫ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায়। হয়ত, এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু, স্বাভাবিক নয়, খুনিদের বিচার না-হওয়া, সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা করা, তাদের মিত্র করা।

বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের ওপর নির্মিত ডেভিড বার্গম্যানের 'ডেসপ্যাচ' তথ্যচিত্রটির কথা হয়ত আপনাদের অনেকের মনে আছে। তথ্যচিত্রের প্রথমেই দেখা যায়, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে রায়ের বাজার বধ্যভূমির সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ সাংবাদিক এনায়েত উল্লাহ খান রায়ের বাজারের স্মৃতিচারণ করছেন। এর মাঝে ২৯টি বছর পার হয়ে গেছে। জে. জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সাল থেকে যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের নিয়ে সমন্বয়ের রাজনীতি শুরু করলেন। আরো অনেকের মতো ক্রুদ্ধ এনায়েতুল্লাহ খানও ক্রোধ ভুলে সমন্বয়ের রাজনীতিতে যোগ দিলেন। এভাবে পিঠে ছুরি মেরে অনেকে আমাদের ক্রোধ দমনে বাধ্য করেছিলেন। ক্রোধ দমন করা যায় কিন্তু বেদনা? অপমান? আসলে

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা কথা বলি, বলতে ভালোবাসি কিন্তু খুব কম সময়ই ব্যয় করি তাদের জন্য যারা আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।

১৪ ডিসেম্বর কেন আলাদাভাবে বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয় তা নিয়েও যে গোড়া থেকেই প্রশ্ন ওঠে নি তা নয়। উঠেছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগীরা যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে তারই একটি অংশ বুদ্ধিজীবী হত্যা। পার্থক্য শুধু একটি থাকতে পারে। তা হলো, সাধারণ মানুষদের যত্রতত্র বধ করা হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের খবর নিয়ে টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছে। দুটো প্রক্রিয়াই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। তবে ডিসেম্বরে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য আরো জোরদার ব্যবস্থা নেয়া হয়, পরিকল্পিত উপায়ে তাদের তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশকে বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর তাই বুদ্ধিজীবী হত্যাদিবস, গণহত্যাকে স্মরণ করেই।

বুদ্ধিজীবী কারা? বাংলা একাডেমী, 'শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, তাতে বুদ্ধিজীবীদের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। 'বুদ্ধিজীবী অর্থ লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলি, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী।'

পাকিস্তানিরা বুদ্ধিজীবীদের টার্গেট করেছিল কেন? এর একটি কারণ, পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ও প্রভাবকে মেনে নিতে পারে নি। তাদের ধারণা ছিল, এ শ্রেণির প্রেরণাদাতা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীরা। জেনারেল ফজল মুকিম খান ১৯৭৩ সালে লিখেছিলেন, বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ষাটের দশকে সারা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ে, মানুষকে প্রভাবিত করে তোলে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে। এ কথাগুলো সত্যি যে, ১৯৫২ থেকে ১৯৭১, এমনকি ১৯৭১ থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংস্কৃতিসেবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমাদের অনেকের চোখে তা এড়িয়ে গেছে। পাকিস্তানিরা তা ঠিকই পর্যবেক্ষণ করেছে। ফলে, একধরনের বিশেষ ক্রোধ ছিল বুদ্ধিজীবীদের ওপর।

অপর আরেকটি কারণ হল, যদি বাঙালিরা জিতেই যায় তারা যেন নেতৃত্বহীন থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'কোষগ্রন্থ'-এ যে যুক্তিটি দেয়া হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত—'এটা অবধারিত হয়, বুদ্ধিজীবীরাই জাগিয়ে রাখেন জাতির বিবেক, জাগিয়ে রাখেন তাদের রচনাবলির মাধ্যমে, সাংবাদিকদের কলমে, গানের সুরে, শিক্ষালয়গুলোতে পাঠদানে, চিকিৎসা, প্রকৌশল রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সান্নিধ্যে এসে। একটি জাতিকে নিবীর্য করে দেবার প্রথম উপায় বুদ্ধিজীবী শূন্য করে দেয়া। ২৫ মার্চ রাতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অতর্কিতে, তারপর ধীরে ধীরে, শেষে পরাজয় অনিবার্য জেনে ডিসেম্বর ১০ তারিখ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দ্রুতগতিতে।'

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আমাদের অনেকের ধারণা ডিসেম্বরেই বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যা করা হয়েছিল। আসলে তা নয়। ২৫ মার্চ থেকেই তা শুরু হয়েছিল। এর প্রমাণ, ২৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যা করা। সারা বছর

ধরেই এ অপহরণ ও হত্যা চলেছে। আল-বদর, আল-শামস গঠিত হবার পর এ হত্যাকাণ্ড জোরদার হয়ে ওঠে মাত্র। সংকলিত সংবাদে দেখা যাবে, অনেকে ডিসেম্বরের আগেই অপহৃত হয়েছেন কিন্তু তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগী আল-বদর ও আল-শামসরা কতজন বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছে? এর সঠিক হিসাব কিন্তু এখনো পাওয়া যায় নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়নে আমরা ব্যস্ত থেকেছি। কিন্তু কারা শহীদ হলেন, খুনি কারা তাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয় নি। এখনো সে চেষ্টা নেয়া হয় নি। এসব যখন মনে হয় তখন আমাদের পুরো শ্রেণিটির প্রতি ধিক্কার জানানো ছাড়া করার কিছুই থাকে না। একবার ভেবে দেখেছেন কি প্রত্যেক জাতির জাতীয় বীর থাকে, আমাদের নেই। থাকলেও স্বীকার করি না। আমরা স্বীকার করি তাদের যাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, এবং তারা বিজাতীয়। পৃথিবীর সব দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর প্রথম যে-কাজটি করা হয় তা হলো জাতীয় বীরদের প্রতি স্মৃতিতর্পণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ একমাত্র ব্যতিক্রম। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দৈনিক বাংলায় আবেগময়ী এক সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল—'পরাজয়ের প্রাক-মুহূর্তে বর্বর সামরিক জান্তার আল-বদর ঘাতকচক্র নারকীয় বীভৎসতার সে স্বাক্ষর রেখে গেছে, ফ্যাসিস্ট হিংস্রতার ইতিহাসেও তার কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। পঁচিশে মার্চের বিভীষিকাময় রাতে দেশের বুদ্ধিজীবীদের যে অবশিষ্ট অংশটি এদের নৃশংসতা থেকে কোনোমতে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তারাও এই হায়েনাদের মত্ততার নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হলেন। রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে জল্লাদদের বধ্যভূমিতে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গলিত বিকৃত শবগুলো মানবীয় বিবেককে প্রতিমুহূর্তে এক নিদারুণ যন্ত্রণায় রক্তাক্ত করেছে। সভ্যতার অনুশাসনে যারা বিশ্বাসী, বিশ্বাসী যারা নৈতিক মূল্যবোধে এই বর্বরতাকে কিছুতেই তারা ক্ষমা করতে পারবে না।' কিন্তু ক্ষমা করা হয়েছে। এখানে যুদ্ধাপরাধী, আল-বদরদের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, এমপি করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা-জাদুঘর হয় নি কিন্তু একদশক আগে সামরিক-জাদুঘর হয়েছে এবং বর্তমান সরকারের আমলে শহরের সবচেয়ে দামি এলাকায় তা স্থানান্তরিত হচ্ছে। এ জাতি এসবই মেনে নিয়েছে।

এ-সমস্ত কর্মকাণ্ড হয়েছে আমাদের একাংশের সহযোগিতার কারণে। এর ফলে দেশে দীর্ঘদিন কায়েম থেকেছে প্রগতিবিরোধী শাসন, থাবা বিস্তৃত হয়েছে মৌলবাদের। প্রায় সময় আমাদের নিশ্চুপ থাকার কারণ, আমাদের অনেকে এর বিনিময়ে ইউনিফর্মধারী ও ইউনিফর্মহীন বা ইউনিফর্ম-প্রভাবিত শাসকের কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছি। তবে একথা বলা ভুল হবে যে, নিরস্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ এতে অপমানিত বোধ করে নি। তাদের ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছিল জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে।

দুই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, হিটলার জার্মানিতে সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের নিধন করেছিলেন। এরপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশেই প্রথম বৃহৎ আকারে গণহত্যা ও সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। এই প্রজন্মের পরিকল্পক পাকিস্তানি

সামরিক জান্তা এবং প্রোগ্রাম কার্যকর করার দায়িত্বে ছিল স্থানীয় অবাঙালিরা যারা ছিল আল-বদর বা আল-শামসের সঙ্গে যুক্ত।

সামরিক জান্তার পক্ষে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক। এ অনুমান আমাদের তো বটেই, বাইরের অনেকেরও। রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সাক্ষাৎকারে আমি ফরমান আলীকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন তবে একপর্যায়ে স্বীকার করেন ৯ কি ১০ তারিখ তিনি পিলখানা গিয়েছিলেন, এবং সেখানে বেশ কিছু গাড়ি পার্কিং করা অবস্থায় দেখেছিলেন। তার একটি নোটে লেখা আছে— 'আল-বদরদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা'। তাতে মনে হয় ৯ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত আল-বদরদের বিভিন্ন গ্রুপকে গাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা তিনিই করেন এবং আল-বদররা এসব গাড়িতে করে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করেন। যাদের অপহরণ করা হয়েছিল তাদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, অপহরণ করার জন্য গাড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ সময় যানবাহনের অভাব ছিল। এসব গাড়ি না-পাওয়া গেলে হত্যা-পরিকল্পনা সম্পন্ন করা যেত না। আলতাফ গওহর ইসলামাবাদে এক সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন, কবি সানাউল হকের নাম ছিল তালিকায়। তার এক বন্ধুর মারফত রাও ফরমান আলীকে অনুরোধ করায়, তার ভাষায় 'ফরমান ড্রয়ার থেকে একটি তালিকা বের করে তার নামটি কেটে দেন।'

এ-বিষয়ে ১৯৭১ সালে গঠিত বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান খানিকটা আলোকপাত করেছিলেন। ভারতের সাপ্তাহিক 'নিউ এজ' পত্রিকায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে এক সাক্ষাৎকারে জানান—

"আল-বদরদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করতে যেয়ে আমরা একই সাথে অপরাধীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে যখন নিহত বাবা ও ভাইয়ের দেহের অবশেষ ঢাকার বধ্যভূমিতে খুঁজে ফিরছিলেন তখন আমাদের ধারণা ছিল যে, দখলদার পাকিস্তানি শাসকদের নিশ্চিত পরাজয় উপলব্ধি করে সমস্ত গোড়া ধর্মধ্বজী পশুরা ক্রোধান্ধ হয়ে কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি ঘটনা তা ছিল না। কেননা এই হতাকাণ্ডের শিকার যারা হয়েছেন তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

'আল-বদরবাহিনীর ধর্মান্ধ ও মূর্খ লোকদের কাছ থেকে সব লেখক ও অধ্যাপকই একরকম ছিলেন। জহির রায়হান বলেছিলেন এরা নির্ভুলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীদেরকে বাছাই করে আঘাত হেনেছে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় যে, আল-বদরের এই স্বেচ্ছাসেবকরা অপরের ইচ্ছা কার্যকরী করার বাহন ছিল মাত্র। কিন্তু কারা এই খুনিদের পেছনে ছিল?

'সংগৃহীত দলিল ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায়, শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানদের হত্যার কাজে নিয়োজিত অন্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত গুণ্ডাদেরকে আল-বদরবাহিনীতে যারা সংগঠিত করে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে জড়িত।

'পূর্বে উল্লেখিত পাকিস্তানি জেনারেলের (বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী) ডায়রিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, দুজন আমেরিকান নাগরিক ঢাকা সফর করে। এরা হল হেইট (Height) ও ডুসপিক (Dwespic)।

'এদের নামের পাশে ছোট ছোট অক্ষরে ইউ.এস.এ. (U.S.A.) ও ডি.জি.আই.এস. (D.G.I.S.) অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অব ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস লেখা ছিল। আর লেখা আছে—'রাজনৈতিক ৬০-৬২, ৭০। অপর এক জায়গায় লেখা আছে—এ দুজন আমেরিকান পি.আই.এ-র একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে।

'হেইট ও ডুসপিক কে? ঢাকার দৈনিক বাংলার রিপোর্টে দেখা যায়, হেইট ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করে। সে ১৯৪৬-৪৯ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে চাকরি করত। ১৯৫৩ সাল থেকে সে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাথে যুক্ত ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে সে আমেরিকান দূতাবাসের রাজনৈতিক কূটনীতিবিদ হিসেবে বহুদেশ ভ্রমণ করেছে। সে কলকাতা এবং কায়রোতেও ছিল। সি.আই.এ এজেন্ট ডুসপিকের সাথে গতবছর সে ঢাকায় ফিরে আসে এবং রাও ফরমান আলীর সাথে তিন হাজার বুদ্ধিজীবীর একটি তালিকা তৈরি করে। জেনারেলের শোবার ঘরে এই তালিকা পাওয়া গেছে।

'নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, আল-বদর বাহিনীর পরিকল্পিত হত্যার কাজে বিদেশী মুখোশ, ছদ্ম পোশাক ও ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে। গণহত্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

'স্বভাবতই পাকিস্তানি সেনাপতি ও সি.আই.এ-চরদের মধ্যেকার এই যোগাযোগ গোপন ব্যাপার ছিল। আল-বদর বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এ-সম্পর্কে কিছুই জানত না। আবার এই সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হোতারা এবং জামায়াতে ইসলামী দলের নেতারা অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর আশায় আমেরিকা ও পিকিং নেতাদের সাথে পাকিস্তানের সামরিক একনায়কের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রচার করত। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর সম্পাদক প্রকাশিত এক প্রচার পত্রের ভাষা হল : বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আছেন। চীন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থক বন্ধু-দেশ।"

['একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' থেকে উদ্ধৃত]

বুদ্ধিজীবী হত্যায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল আল-বদর বাহিনী। সারা পাকিস্তান আল-বদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। আল-বদর হাইকমান্ডের যারা এখন স্বচ্ছন্দে টাকা-পয়সা করে রাজনীতি করছে তাদের মধ্যে নিজামী ছাড়াও আছে জামায়াতের আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী, মোহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, আশরাফ হোসাইন, মোহাম্মদ শামসুল হক, আ শ ম রুহুল কুদ্দুস, সরদার আবদুস সালাম, আবদুল জাহের, মোহাম্মদ আবু নাসের প্রমুখ। জেনারেল জিয়া ওদের পুনর্বাসিত করেন।

এদের চেলাচামুণ্ডাদের মধ্যে ছিল খালেক মজুমদার, 'মওলানা' মান্নান, আবদুল আলীম, চৌধুরী মঈনুদ্দিন প্রমুখ। সারাদেশে, বিশেষ করে ঢাকায় এরকম অনেক ছোট আল-বদর ছিল [সংকলন দেখুন]। আল-বদরদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি। জানার বা তালিকা প্রণয়নের প্রচেষ্টাও করা হয় নি। ১৪.০৯.১৯৭১ তারিখে জামায়াতের মুখপত্র সংগ্রামে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যাতে লেখা ছিল—

"আল-বদর একটি নাম! একটি বিস্ময়! আল-বদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল-বদর সেখানেই। যেখানেই দুষ্কৃতকারী আল-বদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুষ্কৃতকারীদের কাছে আল-বদর সাক্ষাৎ আজরাইল।"

আল-বদর ও আল-শামস গঠিত হয়েছিল প্রধানত জামায়াতে ইসলাম ও ছাত্র শিবিরের কর্মী ও সমর্থকদের দ্বারা। সারাবছর ধরে তারা হত্যাকাণ্ড চালালেও, পরাজয় আসন্ন জেনে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তারা মরণ-কামড় দেয়। এ সম্পর্কে সে-সময়কার দৈনিক বাংলায় ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল একটি প্রতিবেদন—

"এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে গত সপ্তাহ ধরে জামায়াতে ইসলামীর আল-বদর।

'শহরের কয়েকশ' বুদ্ধিজীবী ও যুবককে এরা ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিকভাবে হত্যা করেছে।

'গতকাল রায়ের বাজার ও ধানমণ্ডি এলাকার বিভিন্ন গর্ত হতে বহুসংখ্যক লাশ উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের লাশও রয়েছে। এ-পর্যন্ত কতিপয় ব্যক্তির লাশ শনাক্ত করা গেছে। অনেক লাশই বিকৃত হয়ে গেছে, চেনার উপায় নেই। গত একসপ্তাহে যতজন নিখোঁজ হয়েছেন অনুমান করা হচ্ছে যে, এদের একজনকেও আল-বদর রেহাই দেয় নি।

"ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংস্থা ইসলামী ছাত্রসংঘের সশস্ত্র গ্রুপ আল-বদর এই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত একসপ্তাহে শহরের কয়েকশত বুদ্ধিজীবী ও যুবকদের ধরে নিয়ে যায়।"

সমন্বয়ের রাজনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের হয়ত এ বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য না-ও মনে হতে পারে। কারণ তা প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে একটি দৈনিকে। সে-জন্য তৎকালীন বিখ্যাত সাংবাদিক নিকোলাস টোমালিনের একটি বিবরণ (বঙ্গানুবাদ)—

'...বধ্যভূমিটি হচ্ছে ঢাকা শহরের মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা ধানমণ্ডির কাছে একটি ইটখোলা। এটি একটি অদ্ভুত নির্জন জায়গা : যদিও নীলচে-শাদা এঁদো জলাশয়গুলোতে কচুরিপানা ভেসে বেড়ায়।

'শত শত ঢাকাবাসী আজ এখানে এসেছিলেন। মৃতদেহগুলো দেখার জন্য কাদামাটির পাড় ধরে হাঁটতে থাকা লোকদের অনেকেই নিজেদের আত্মীয়স্বজনের লাশ খুঁজছিলেন।

'... এখানে এই বুদ্ধিজীবীরা এখনো শুয়ে আছেন : তাদের শরীরের উপর জমেছে ধুলো-কাদা, দেহগুলো গলতে শুরু করেছে। একটি বাঁধের উপর একটি কঙ্কাল পড়ে রয়েছে : ঢাকার কুকুরগুলো নাটকীয়ভাবে দেহটিকে মাংসমুক্ত করে ফেলেছে।

'বাঙালি জনতা এই ডোবাগুলোতে এক অদ্ভুত শান্ত ভঙ্গিমায় চলাচল করছে। এখানে তাদেরকে ক্রোধান্বিত মনে হয় না। অন্যত্র তারা ক্রোধোন্মত্ত। কিন্তু এখানে তারা হাঁটছে, মৃদু ফিসফিস করে কথা বলছে, তারা যেন গীর্জা পরিদর্শনরত পর্যটক।"

আল-বদর, আল-শামসদের ওপর বিস্তারিত লেখা হয় নি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়েও কোনো সরকার মাথা ঘামায় নি। তবে, আমাদের লজ্জা দিয়ে ব্রিটেনে নির্মিত হয়েছে একটি তথ্যচিত্র যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

তথ্যচিত্রটির মূল প্রতিপাদ্য ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যার সঙ্গে জড়িত তিন ব্যক্তি— চৌধুরী মঈনুদ্দিন, লুৎফর রহমান ও আবু সাঈদ এখন লন্ডন ও বার্মিংহামে বসবাস

করছে। ইংল্যান্ডের বাঙালি সমাজে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে মৌলবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে নানা উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। সুতরাং ১৯৫৭ সালের জেনেভা চুক্তি অনুসারে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ব্রিটেনে তাদের বিচার হওয়া উচিত।

'ডেসপ্যাচ' থেকে যে-বিষয়টি আমাদের এবং নির্মূল ও সমন্বয় কমিটির শিক্ষণীয় তা হল অভিযোগ উত্থাপনের পদ্ধতি। ডেভিড ব্রিটেনে বসবাসরত যে তিন জনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে শনাক্ত করেছেন তাদের মধ্যে একজন ছিল ঢাকায় আল-বদরের অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দিন। অপর দুজন সিলেটের লুৎফর রহমান ও আবু সাঈদ। তিনি এদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যোগাড় করে এমনভাবে মামলা দাঁড় করিয়েছেন যে, এদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বর্তমান যা অবস্থা তাতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না। কিন্তু শহীদ-পরিবাররা বিচার চায়। ব্রিটেনে যুদ্ধাপরাধীদের স্থান নেই। ঐ তিন জন যুদ্ধাপরাধী এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। মঈনুদ্দিন বলেছে, 'আমি কখনো আল-বদর ছিলাম না। গণহত্যার সঙ্গে জড়িত নই'। প্রশ্ন জাগে, যদি তা না-ই হয় তা হলে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের পর পর কেন দেশ ত্যাগ করেছিল? এবং ডেসপ্যাচ প্রদর্শিত হওয়ার পর কেনই-বা গা ঢাকা দিয়েছে?

বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে চিহ্নিত কেউ সাজা পায় নি। আগেই উল্লেখ করেছি বরং তাদের সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এরকম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আজকাল মাঝে মাঝে পত্রিকায় দেখা যায় ঐ তথ্যচিত্রে উল্লিখিত তিনজনকে বিচারের (একজন মারা গেছে) জন্য ঢাকা আনা হবে। এরা ছোট আল-বদর। কিন্তু ঢাকার বড় আল-বদররা এখনো পত্রিকা বের করে মুক্তিযুদ্ধকে গালাগাল দেয়, সংসদে বসে বিতর্কে অংশ নেয়, প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় কেন সরকার, রাজনৈতিক দল বা আমরা ঘটা করে প্রতি বছর ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করি? যারা দেশের জন্য প্রাণ দিলেন তাদের নিয়ে এ ইয়ার্কির মানে কী?

তিন

বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের বিচার কি দাবি করা হয় নি? ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকেই বিচার দাবি করা হয়েছে। নিবন্ধের শেষে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ সংক্রান্ত সংবাদাবলি সংকলন করা হয়েছে। এসব সংবাদ তুলে ধরে যুদ্ধাপরাধীদের কার্যাবলির বিবরণ যার অনেক কিছুই আমরা ভুলে গেছি। শুধু তাই নয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যে সব সময় দাবি করে আসা হচ্ছে সংকলিত সংবাদগুলোই তার প্রমাণ। শুধু তাই নয় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল 'চারুকলা ও সাহিত্য-সংক্রান্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন করা হবে।' তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, হত্যার বিচার হবে। বঙ্গবন্ধুও তো স্বপ্ন দেখেছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের। কিছুই হয় নি।

বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জোরালো হয়ে উঠলে ২৫ ডিসেম্বর (১৯৭১) দৈনিক বাংলা লিখেছিল—

"আল-বদরবাহিনীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটিকে সরকারের কাছে একসপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তাদের তদন্তের ভিত্তিতেই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পশুদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেনেভা কনভেনশনের অছিলায় যাতে তারা নিষ্কৃতি না পায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। **যদি** এসব দুর্বৃত্ত রেহাই পেয়ে যায়, তবে এদেশের নিহত নিরপরাধীদের আত্মা কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না।"

অবশেষে বুদ্ধিজীবীরা নিজেই তদন্ত কমিশন গঠন করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির আশ্বাসে কাজ শুরু করেন। কমিটির আহ্বায়ক জহির রায়হান নিজেই এরপর নিখোঁজ হয়ে যান। এর পরের ঘটনা উদ্ধৃত করছি। 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' থেকে—

"৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির উদ্যোগ থামিয়ে দেয়া হয়। কমিটি ইতোমধ্যে যে-সমস্ত তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার করেছিল কলকাতার একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক ভারতে নিয়ে চলে যান।

২১ ডিসেম্বর তারিখে আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিশিষ্ট সমর্থক ব্রিটেনের সাবেক মন্ত্রী জন স্টোনহাউজ বলেন যে, বাংলাদেশের শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার ব্যাপারে পাকবাহিনী যে জড়িত ছিল তার প্রমাণ তার কাছে রয়েছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন এই হত্যাকাণ্ড চলছিল তখন মি. স্টোনহাউজ ঢাকাতেই ছিলেন। সাক্ষাৎকারে মি. স্টোনহাউজ বলেন, বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল পদমর্যাদার দশ জন সামরিক অফিসারকে তিনি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই অফিসারদের নাম প্রকাশে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি এ-বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করার জোর দাবি জানান। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত মুখ্য দালালদের নামও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন বলে তিনি জানান।

এই দশ জন অফিসারের পরিচয় এবং বুদ্ধিজীবী হত্যা-সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র আর কখনই আমাদের হস্তগত হয় নি। এদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ সরাসরিভাবে পরিচালনাকারী দুই অফিসার জেনারেল নিয়াজী এবং জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ২০ ডিসেম্বর একটি বিশেষ বিমানে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পর কড়া সামরিক প্রহরায় কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত অন্যান্য অফিসারকেও অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়।

বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত দাবি করে **৭২** সালের ১৭ মার্চ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ শহীদমিনারে গণজমায়েত করেন। এরপর মিছিল করে বঙ্গভবনে যান। মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করেন। পরে মিছিলকারীরা বঙ্গভবনের ফটকে অবরোধ করে বসে পড়লে অনেকক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী এসে তাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিছিলকারীদের সঙ্গে তার উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে তিনি জানান যে, তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হবে। ইতোপূর্বে ৮ ফেব্রুয়ারি জহির রায়হানের পরিবারের সদস্যদেরও তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, জহির রায়হানের অন্তর্ধানসহ বুদ্ধিজীবী হত্যার

তদন্তের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিন সপ্তাহের ভেতর তাকে রিপোর্ট করা হবে। সেই তদন্তের ফলাফল দেশবাসী কখনো জানতে পারেন নি।

সংকলিত সংবাদ থেকে জানতে পারি ১৯৭২ সালে ড. আজাদকে হত্যার দায়ে দু'জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু, তারপর এ মামলার কী হল তা জানি না। ড. আলীম চৌধুরীর হত্যাকারী হিসেবে আল-বদর আবদুল মান্নানকে (বর্তমানে 'মওলানা' ও 'ইনকিলাবের' একজন মালিক) ধরা হয়েছিল। সেও ছাড়া পেয়ে যায়। শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত খালেক মজুমদারকে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ সাত বছরের কারাদণ্ড দেন। হাইকোর্ট সে রায় বাতিল করে। বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী ও সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী তাঁদের রায়ের উপসংহারে বলেন—"In the Circumstances, therefore, the opinion is that doubt has crept into the prosecution case and this doubt goes in favour of the accused and we accordingly give benefit of doubt..."

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর একটি আর্গুমেন্ট লক্ষ করুন—(F) "Circumstances showing that Abdul Khaleque was member of Jamat-e-Islami dominated the mind and Judgement of the prosecution witnesses because impression was created that Jamat-e-Islami was against the movement of the Liberation. Be that as it may, this impression was responsible for influencing the inductive reasonings of the witness."

মনে হয় বিচারকরা সব স্বর্গে ছিলেন। যেখানে জামায়াতে ইসলাম চোখের সামনে এত বড় হত্যাকাণ্ড ঘটালো সেখানে কি ইমপ্রেসন হবে আওয়ামী লীগ দায়ী ছিল। বিচারকরা অবসর নেয়ার পর আজকাল অনেক উপদেশ দেন। বদরুল হায়দারও দিয়েছেন। শুধু তাই নয় এই বিচারক প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের কাছে দোয়া মাগতে গিয়েছিলেন। একই ধরনের আর্গুমেন্টে গোলাম আজমকে নাগরিকত্বও দেয়া হয়েছে। এতে যে ন্যাচারাল জাস্টিস লংঘিত হয়েছে তা কারো মনে হয় নি। আমরা এগুলো মেনে নিয়েছি কারণ আমরা সেই আইনের ফ্রেমে বাস করি। কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় শুধু উল্লেখ করতে চাই—বাংলাদেশে যত বিতর্কমূলক নির্বাচন হয়েছে তার প্রত্যেকটির প্রধান (নির্বাচন কমিশন) ছিলেন একজন বিচারপতি। বাংলাদেশে যতগুলো অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রতিটির প্রধান ছিলেন একজন বিচারপতি। ১৯৭৮ সালে এক রায়ে বিচারপতিরা রায় দিয়েছিলেন সামরিক আইন সংবিধানের ওপর। অথচ, পৃথিবীতে সামরিক আইন জংলি আইন হিসেবে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সমস্ত কাজকর্ম ঐ ভাষায় সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া হয়। অধিকাংশ বিচারপতি সেই আইন না মেনে ইংরেজিতে রায় লিখেছেন।

১৯৭৫-এর পর থেকে বুদ্ধিজীবী হত্যা তথা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারটি ধামাচাপা পড়ে যায়। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটি তারপর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের

জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের দাবি তোলে এবং সে-দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। তখন শেখ হাসিনাও এ-দাবি সমর্থন করেন। সে-দাবি থেকে আমরা এখনো সরি নি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পর আবার এ দাবি জোরদার হয়ে উঠেছে। অনেকে, শহীদ পরিবারের সদস্যদের বলছেন, মামলা দায়ের করতে। আমরা এর বিরোধী। কারণ, বিষয় দুটি আলাদা।

বুদ্ধিজীবীদের যারা হত্যা করেছে তারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। বর্তমান বিশ্বে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কোনো দেশের মধ্যে সীমিত রাখা যাচ্ছে না। চিলির একনায়ক পিনোশের ঘটনা এর উদাহরণ। প্রচলিত আইনে এই বিচার সম্ভব নয়। কারণ, 'মওলানা' আবদুল মান্নান যদি বলেন, ডা. আবদুল আলীমকে তিনি হত্যা করেন নি তখন আজ এর প্রমাণ কী হবে? বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা প্রকাশ্যে হত্যার কথা স্বীকার করেছিল। মান্নানরা তো তা করে নি। বিচারক বলতে পারেন, সংগৃহীত প্রমাণ যথেষ্ট নয়। যদিও আমরা জানি, তৎকালীন কাগজপত্রে তা উল্লিখিত হয়েছে। এধরনের বিচারের জন্য সবসময় স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করা হয়। তাই সরকারকেও তাই করতে হবে এবং সরকারকে বাদি হতে হবে। শহীদ পরিবারগুলো আজ নিঃস্ব। জীবন ধারণই তাদের জন্য কষ্টকর। বছরের পর বছর তারা মামলা লড়বেন কিভাবে? সংবিধানে কিন্তু স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা আছে।

বিএনপি বলে, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের দল। এরশাদ বলেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধা। আওয়ামী লীগ বলে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল। সুতরাং, তিন পক্ষই তো সংসদে বিষয়টি তুলে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করলে তো এমনটিই হওয়া উচিত। আর খুনের মামলা বা খুনের বিষয় কখনো তামাদি হয় না। সব রাজনৈতিক খুনের বিচার সব দল দাবি করছে। বাংলাদেশের উজ্জ্বল সন্তানদের ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা কি রাজনৈতিক হত্যা নয়? আপনাদের বিবেক কী বলে?

অনেকে বলেন, এত বছর পর আজ এসব প্রশ্ন কেন? যারা এ কথা বলেন, ধরে নিতে হবে তারা স্বজনহারা হন নি। বাংলাদেশের অগণিত শহীদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ নেই এবং তারা পরোক্ষভাবে যুদ্ধাপরাধী ও বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে যে উগ্র মৌলবাদী আন্দোলন চলছে তার সমর্থক। যুদ্ধাপরাধী তো বটেই, এদের প্রতিরোধও বাঞ্ছনীয়। এক ব্রিটিশ মন্ত্রী বলেছেন, যে জাতি তার অতীত ভুলে যায় তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কারণ সে তার আত্মপরিচয় হারায়।

আমরা মনে করি বাংলাদেশে, সমাজে, শান্তি স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। শুধু তাই নয়, দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে হলে, মৌলবাদীদের অন্ধকার যুগ ফিরিয়ে আনার এ চেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে হলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। সময় এখনো ফুরিয়ে যায় নি। সারাবিশ্বে আবার মানবতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আহ্বান হবে, বাংলাদেশে বড় আল-বদরদের বিচারের দাবি তোলা। রাজনৈতিক দল যদি আমাদের সমর্থন না দেয়, নিরস্ত্র আমরা আর কিছু করতে না পারি, ঐসব অপরাধী ও তাদের সঙ্গে যারা রাজনীতি করছে বা সহায়তা করছে অন্তত তাদের পথে থুথু তো ফেলতে পারি।

সংকলন : বধ্যভূমির অভিজ্ঞতা
(স্টাফ রিপোর্টার)

রায়েরবাজার বিলের বধ্যভূমি থেকে তিনি অবিশ্বাস্য হলেও পালিয়ে এসেছেন। কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর জল্লাদদের হাত থেকে তিন বেঁচে গেছেন অলৌকিকভাবে। নাম মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। বয়স ২৫ বছর। ঢাকার গ্রীনল্যান্ড মার্কেন্টাইল কোম্পানি লিমিটেডের চিফ একাউন্ট্যান্ট। বদরবাহিনীর পশুরা আর সবারই মতো তাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল ঢাকার শান্তিবাগ এলাকা থেকে গত ১৪ ডিসেম্বর সকালবেলা। হাত ও চোখ বেঁধে আর সবার মতো তাকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বদর বাহিনীর এক ক্যাম্পে। সেখানে একই কক্ষে আর যারা বন্দী ছিলেন তার মধ্যে রয়েছে সাংবাদিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক এবং আরো অনেক পেশার লোক। হিংস্র শ্বাপদের নারকীয় উল্লাসে প্রমত্ত বদরবাহিনীর জল্লাদরা নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করেছে। দেলোয়ার হোসেন সেই নৃশংস তাণ্ডবলীলার মধ্য থেকে মৃত্যুকে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পেছনে রেখে পালিয়ে এসেছেন চৌদ্দই ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রায়েরবাজার বিলের বধ্যভূমি থেকে। মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সেই জল্লাদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার যে বিবরণ দিয়েছেন তা তারই জবানিতে নিচে দেয়া হলো :

'১৪ ডিসেম্বর সকাল নয়টা। শান্তিবাগে আমার বাসায় আমি শুয়েছিলাম। হঠাৎ বাইরে ভারি পায়ের শব্দ পেলাম। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন রাইফেলধারী লোক আসছে। রাস্তার দরজায় এসে তারা জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো। কর্কশ স্বরে তারা বলছিল ঘরে কে আছে? দরজা খোল।'

'তারপর নানা কথাবার্তার পর তারা আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। বাসার পাশের একটি মেসের একটি ছেলেকেও তারা ধরে নিয়ে এলো। আমাদের তারা নিয়ে মালিবাগের মোড়ে দাঁড় করিয়ে একটি বাসে নিয়ে তুললো। বাসে তুলেই তারা আমার গায়ের জামা খুলে ফেললো এবং একটি কাপড় দিয়ে খুব কষে চোখ দুটি বেঁধে ফেললো। এছাড়া হাত দুটোও পেছনের দিকে নিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। তারপর বাস ছেড়ে দিলো। পথে আরো কয়েক জায়গায়ও তারা বাসটি থামালো। মনে হলো আরো কিছু লোককে বাসের ভেতর ওঠানো হচ্ছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি। অনুমানে মনে হলো বাসটি মোহাম্মদপুর দ্বিতীয় রাজধানী বা ক্যান্টনমেন্ট্ এলাকার দিকে যাচ্ছে।

এমনিভাবে ঘন্টাখানেক চলার পর বাস এক জায়গায় এসে থামলো। তারপর আমাদেরকে হাত ধরে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ততক্ষণে কথাবার্তায় আমি টের পেয়েছি যে, আমি বদরবাহিনীর হাতে পড়েছি। আরেকজন সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে এলো উপর তলায়। দরজা খুলে একটি রুমের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মেঝের উপর। কিন্তু ঠিক পাকা মেঝের উপর নয়। গিয়ে পড়লাম কিছু লোকের উপর। অনেক কষ্টে সোজা হয়ে বসলাম। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কক্ষের আর-সব লোকেরও আমার মতো হাত ও চোখ বাঁধা কি না। শুধু বুঝতে পারলাম, ঘরে আমার মতো আরো বেশ কয়েকজন লোক রয়েছে। এদিকে কষে বাঁধার দরুন আমার চোখ ও কানে দারুণ যন্ত্রণা

হচ্ছে। আমি যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে কাঁদতে শুরু করছি। মাথায় তখন শুধু একটি চিন্তা—কী করে এই বর্বর পশুদের হাত থেকে আমি বাঁচতে পারি। আমি কি সত্যি বাঁচতে পারবো?

আঙুল কাটা : নখ উপড়ানো

আল্লাহ আল্লাহ বলে আমি উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলাম। ভাবছিলাম বদরবাহিনীর লোকরা তো শুনেছি মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা লাইনের ছেলে। আল্লাহর আহাজারিতে যদি বদর বাহিনীর লোকদের কিছু দয়া হয়। যদি দয়াপরবশ হয়ে চোখের ও হাতের বাঁধন খুলে দেয়, নিদেনপক্ষে একটু ঢিলে করে দেয়। অনেকক্ষণ কাঁদার পর কে যেন আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল। ফিসফিস করে সে বললো—সাবধান। হাত খোলা দেখলে কিন্তু আপনাকে পিটিয়েই মেরে ফেলবে। কচি কণ্ঠ। বুঝলাম অল্প বয়সী কোনো ছেলে এবং সে বদরবাহিনীর কেউ নয়। আমি তাড়াতাড়ি চোখের বাঁধন ঢিলে করে দিলাম। বাঁধন এমনিভাবে রাখলাম যাতে আবছা আবছা দেখা যায়। এর মধ্যেই দেখে নিয়েছি, যে আমার বাঁধন খুলে দিলো সে আট-নয় বছর বয়সী একটি ছেলে। তার দুহাতের চামড়া কাটা। হাত ফোলা। সারাকক্ষে শুধু রক্ত আর রক্ত। এখানে-সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে রক্তে রঞ্জিত জামা ও গেঞ্জি। আমার মতো প্রত্যেকের গায়েই গেঞ্জি। তাদের দেহের বিভিন্ন অংশে কাটাছেঁড়ার দাগ, হাতের বা পায়ের আঙুল কাটা, কারো দেহে দীর্ঘ ও গভীর ক্ষত, কারো হাত-পায়ের নখ উপড়ে ফেলা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদ

ছেলেটিই আমার হাতে আবার কাপড় জড়িয়ে বাঁধনের মতো করে দিল। আমি ভাবছিলাম আমি কী করে এই জল্লাদের হাত থেকে বাঁচব। কক্ষটিতে শুধু একটি কাচের জানালা; তবে মনে হলো বেশ মজবুত। এল টাইপের ত্রিতল অথবা চারতলা বাড়ি। বিরাট এলাকা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বাড়িটি সম্ভবত মোহাম্মদপুরের নিকটবর্তী এলাকার কোথাও হবে।
এমনিভাবে সারাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যার দিকে বদরবাহিনী বা রাজাকারের দলের লোকজন আরো কিছু লোককে ধরে নিয়ে এল। সন্ধ্যার পর তিন-চারজন লোক আমাদের কক্ষে এল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এক এক করে সবাইকে তারা জেরা করতে শুরু করল। শুনলাম, কেউ বলছে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কেউ বলল, আমি ডাক্তার, আমি সাংবাদিক, আমি চিফ একাউন্ট্যান্ট, আমি কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালের সার্জনের ছেলে। লোকগুলোর একজন বলে উঠল—শালারা সব ইন্ডিয়ান স্পাই এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পাই। একজন আবার বলল—শালা, তুমি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হয়ে এদ্দিন মন্ত্র পড়িয়েছ, আজ আমি তোমাকে পড়াব। তুমি তো গভর্নমেন্ট অফিসার, সরকারের টাকা খেয়েছ আর গাদ্দারী করেছ। এবার টের পাবে।

প্রহার আর প্রহার

জিজ্ঞাসাবাদের পর শুরু হলো প্রহার। এমনি ধুমাধুম মার দেয়া শুরু হলো যেন শ্বাস ফেলারও জো নেই। সবাই চিৎকার করে কাঁদছে। কেউ জোরে জোরে দোয়া-দরুদ

পড়ছে; আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে। কিন্তু পশুগুলোর সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। মারধর করে প্রায় আধঘণ্টা পর লোকগুলো চলে গেল। মার খেয়ে অনেকেই অচেতন হয়ে পড়েছে। রাত তখন অনুমান দশটা। অধ্যাপক সাহেব আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন—ভাই, আপনার হাত কি খোলা? আমার হাতের বাঁধনটা একটু ঢিলে করে দেন, লুঙ্গিটা হাঁটু থেকে নিচে নামিয়ে দেন। খানিক পর কোনোক্রমে তেমনি দেয়াল ঘেঁষে বসে তিনিই আচ্ছন্ন অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

মহিলার আর্তনাদ

রাত দশটা থেকে অনুমান একটা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার বদরবাহিনীর জল্লাদেরা এসে আমাদের খানিক পর পর দেখে গেল। রাত প্রায় সাড়ে ১২টায় আমাদের উপরতলা থেকে কয়েকজন মহিলার আর্তনাদ ভেসে এল। সেই আর্তনাদের বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। মারের চোটে প্রায় সবাই অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমি জ্ঞান হারাই নি। আমি আল্লাহকে ডেকে যাচ্ছি—শেষবারের মতো। আল্লাহর কাছে আমার যদি কোনো গুনাহ হয়ে থাকে তার জন্যে পানাহ চাইছি।

রাত প্রায় একটার সময় পাশের ঘরে রাইফেলে গুলি লোড করার শব্দ এবং লোকজনের ফিসফিস করে আলাপের শব্দ শুনতে পেলাম। সারা শরীরে আমার ভয়ের হিম স্রোত চকিতে ভরে উঠল। খানিক পর একটা লোক এসে আবার আমাদের দেখে গেল। তারও খানিক পর কয়েকজন লোক আমাদের ঘরে ঢুকল। তারাই আমাদেরকে ঘরের বাইরে নিয়ে এল।

এরপর বদরবাহিনীর একেকটি পশু আমাদের দুজন দুজন করে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে আনল। তিনটি বাসে তারা আমাদের সবাইকে নিয়ে তুলল। তাদের হাবভাব, ফিসফিস করে কথাবার্তা শুনে মনে হলো—আর রক্ষা নেই। বাস ছেড়ে দিল। বাসের সবকটি জানালা ওঠান। বুঝতে পারলাম, আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বাস এসে থামল কতগুলো ঘরের পাশে। ঘরের দরজা বেশ বড়, বড় এবং কোনাকুনি লাঠি দিয়ে আটকানো। কিন্তু তারা আমাদেরকে ঘরে না ঢুকিয়ে ধরে নিয়ে চলল। কৌশলে চোখের বাঁধন আলগা রাখার সুযোগ হলো বলে দেখতে পেলাম সামনে বিরাট এক বটগাছ, তার সম্মুখে একটা বিরাট বিল, মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও পুকুরের মতো রয়েছে। বটগাছের আরো কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, ১৩০ থেকে ১৪০ জন লোককে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে এক ফাঁকে সুযোগ বুঝে আমি আমার পরনের লুঙ্গি হাঁটুর উপরে উঠিয়ে রেখেছি। চোখ-বাঁধা অবস্থায়ও যে আমি দেখতে পাচ্ছি তা বদরবাহিনীর লোকেরা বুঝতে পারে নি। বদরবাহিনীর লোকজনের হাবভাবে স্থির নিশ্চিত হলাম, আমাদের হত্যা করার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি তখন আমার সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত করে ভাবছি কী করে বাঁচা যায়।

'আপনারা বাঙালি হয়েও আমাদের মারছেন'

দেখতে পেলাম বদরবাহিনীর পশুরা আমার সামনের লোকদের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধছে। আমাদের মতো বন্দী একজন চিৎকার করে বলে উঠলেন—আপনারা বাঙালি হয়ে

আমাদের মারছেন। কোনো পাঞ্জাবী যদি মারতো তাহলেও না হয় বুঝতাম। কেন আমাদের হত্যা করতে যাচ্ছেন? আমরা কী অন্যায় করেছি। ভদ্রলোকের গায়ে রাইফেলের ঘা দিয়ে বদরবাহিনীর এক জল্লাদ গর্জে উঠলো—চুপ কর শালা। কে যেন একজন বলে উঠলো—আমাকে ছেড়ে দিন; দশ হাজার টাকা দেবো। কোনো এক মহিলা চিৎকার করে বলে উঠলেন—আপনারা আমার বাপ, ভাই। আমাকে মারবেন না। চারদিকে মাতম, আহাজারি—তা বর্ণনার ভাষা আমার নেই। সামনের লোকদের দলে দলে ভাগ করে তারা সামনের ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়া শুরু করলো। আমার সারা শরীর যেন ভয়ে জমে যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে আমি বাঁচার আশায় পালাবার সম্ভাব্য সব উপায় ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। মনে হচ্ছে—কোনো উপায় আর নেই।

বাঁচার কি কোনো উপায় নেই ?

আবার মনে হচ্ছে বাঁচার কি কোনো উপায় নেই? জল্লাদের একজন আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমার পেছনের লোকের গেঞ্জির সাথে আমার গেঞ্জি সে ভালো করে বেঁধে দিল। হঠাৎ সে-সময় পেছনেরও লোকটি বলে উঠল—আজিজ ভাই, তুমি! তুমি আমাকে মারতে নিয়ে এসেছ। তুমি থাকতে আমাকে মেরে ফেলবে। আফসোস। রাইফেলধারী লোকটি কোনো কথা না বলে চলে গেল।

আলগা করা বাঁধন খুলে দৌড় দিলাম

বেয়নেট দিয়ে জল্লাদের দল তাদের হত্যালীলা শুরু করে দিয়েছে। ছুঁড়ছে গুলি। চারদিকে আর্তচিৎকার, মাঝে মাঝে জল্লাদের দলের কেউ-কেউ চিৎকার করে বলে উঠছে—শালাদের খতম করে ফেল। সব ব্যাটাদের খতম করে ফেলব। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে আর্তচিৎকারের সাথে সাথে পৈশাচিক হাসি। এমনি নারকীয় তাণ্ডবলীলার মধ্যে আমি জীবনপণ করে চট করে আমার হাতের বাঁধন খুলে ফেললাম। আমার সম্মুখের প্রায় ত্রিশজনকে ততক্ষণে সামনের ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিয়ে খতম করে ফেলেছে বদরবাহিনীর পশুরা। ত্রস্তহাতে আমি গেঞ্জির গিঁট খুলে ফেললাম। বাম হাতে দড়ির বাঁধন খুলে দড়িটা হাতের নিচে চাপা দিয়ে রাখলাম। হাত আবার পেছনে নিয়ে রাখলাম। বদরবাহিনীর এক দস্যু আমার সামনের কয়েকজন লোক নিয়ে তখন ব্যস্ত। কে যেন বলে উঠলেন—আল্লার কাছে তোরা দায়ী থাকবি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। মাগো...। আমি চোখের বাঁধনের কাপড়টি সরিয়ে ফেলে খুব জোরে দৌড় দিলাম। প্রায় হাত কুড়ি যাওয়ার পর এই এই বলে হাঁক-ডাক শুনতে পেলাম। আমার তখন কোনো দিকে খেয়াল নেই। শুনতে পেলাম গুড়ুম গুড়ুম করে দুটি আওয়াজ। অন্ধকারে প্রায় ৪০ গজ যাওয়ার পর সামনে পড়লো কাদা। কর্দমাক্ত জায়গাটি পার হওয়ার সময় আবার দুটি গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিন্তু অন্ধকারে তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আমি কাদার মধ্যে পড়ে গেলাম। আমার গায়ে গুলি লাগে নি। উঠে আবার দৌড়ানো শুরু করলাম। খানিকদূর যাওয়ার পর পানির মধ্যে পড়ে গেলাম। প্রায় ৩ ফুট গভীর পানি। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে আমি পানি ঠেলে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলাম। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর শুকনো

জায়গা পেলাম। উঠে আবার দৌড়ানো শুরু করলাম। দূর থেকে আমার দিকে টর্চের একঝলক আলো ভেসে আসলো। আবার দুটি গুলির শব্দ। সাথে সাথে আমি কাত হয়ে পড়ে গেলাম। গড়াতে গড়াতে পড়ে গেলাম পানির মধ্যে। প্রাণপণে সাঁতার কেটে এগিয়ে চল্লাম। এরপর শুকনো বিল আর নদী পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। গায়ে শক্তি নেই। কিন্তু আমি তখন দিকভ্রান্ত। নিরাপত্তার জন্য নদীর পাড়ে না উঠে উজানে এগিয়ে চললাম। রাতের তখন বেশি দেরি নেই। খানিক পর উঠে পড়লাম নদী থেকে বাকি রাত কাটিয়ে দিলাম নদীর তীরে এক ঝুপড়ির মধ্যে। সকালে রোদ ওঠার পর চারধারে তাকিয়ে দেখলাম। বুঝতে পারলাম না কোথায় এসেছি। গ্রামের আভাস যেদিকে পেলাম সেদিক পানে চললাম এগিয়ে। খানিক চলার পর শুনতে পেলাম কারা যেন আমায় ডাকছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলাম। পরে বুঝতে পারলাম—এরা গ্রামবাসী। তাদের কাছে সব কথা বললাম। বটগাছের বিবরণ দিতে তারা বললো—ওটা হলো রায়ের বাজারের ঘাটের বটগাছ। সেখান থেকে পরে আমি আটির বাজারে মুক্তিফৌজের কমান্ডারের সাথে দেখা করি। তিনি আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দুদিন পর ফিরে এলাম স্বাধীন বাংলার রাজধানীতে। আমি তখনো বুঝি নি এখনো বুঝতে কষ্ট হচ্ছে যে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে আমি কি বেঁচে গেছি। আল্লাহ শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়েছেন।

দৈনিক বাংলা, ২১.১২.১৯৭১

শহীদানের লাশ পূর্ণ মর্যাদায় দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

জামায়াতে ইসলামীর বর্বর বাহিনীর নিষ্ঠুরতম অভিযানে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের অসংখ্য লাশ এখনো সেইসব নারকীয় বধ্যভূমিতে শনাক্তবিহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তারা সবাই শহীদ—তারা সবাই অমর। অথচ এ-পর্যন্ত তাদের পূর্ণ মর্যাদায় দাফনের ব্যবস্থা করা যায় নি। বর্বরদের নৃশংস অভিযানে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের লাশ শনাক্তের অপেক্ষায় না রেখে অবিলম্বে দাফনের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এরা শনাক্তের অযোগ্য হলেও লাওয়ারিশ নন এবং লাওয়ারিশ লাশের জন্য যেমন ডোম বা আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম দিয়ে দাফনের দায়িত্ব সম্পন্ন করা হয় এদের জন্য তা বাঞ্ছনীয়ও নয়।
তা ছাড়া ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে হানাদারবাহিনী আত্মসমর্পণ করার প্রাক্কালে ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় কতিপয় ব্যক্তি নিহত হয়। তাঁদের লাশও এখন পর্যন্ত সেই অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং বিকৃত হতে হতে বীভৎস হয়ে উঠছে ও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাই তাদের দাফনের ব্যবস্থাও অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন।

যাদের সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি

পরাজয়ের প্রাক-মুহূর্তে বর্বর সামরিক জান্তার আল-বদর ঘাতকচক্র নারকীয় বীভৎসতার যে স্বাক্ষর রেখে গেছে, ফ্যাসিস্ট হিংস্রতার ইতিহাসেও তার কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। পঁচিশে মার্চের বিভীষিকাময় রাতে দেশের বুদ্ধিজীবীদের যে অবশিষ্ট অংশটি এদের নৃশংসতা থেকে কোনোমতে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তারাও এই

হায়েনাদের মত্ততার নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হলেন। রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে জল্লাদদের বধ্যভূমিতে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গলিত-বিকৃত শবগুলো মানবীয় বিবেককে প্রতি মুহূর্তে এক নিদারুণ যন্ত্রণায় রক্তাক্ত করছে। সভ্যতার অনুশাসনে যারা বিশ্বাসী, বিশ্বাসী যারা নৈতিক মূল্যবোধে এই বর্বরতাকে কিছুতেই তারা ক্ষমা করতে পারবেন না। এই জল্লাদদের অনেকে আত্মগোপন করেছে, অনেকে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকার বিবর থেকে অনতিবিলম্বে এদের বের করে এনে প্রকাশ্য আদালতে উপযুক্ত দণ্ডের বিধান করা হবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি।

এ-প্রসঙ্গে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জল্লাদরা যেসব প্রখ্যাত মনীষী, সাংবাদিক এবং চিকিৎসাবিদকে ধরে নিয়ে গেছে তাদের অনেকের এখনো কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। ঘাতকচক্রের দুর্গগুলোর আশপাশে কোথাও এদের আটক করে রাখা হয়েছে কি না ব্যাপক তল্লাশির মাধ্যমে সেটা উদঘাটন করা বোধ হয় অসম্ভব হবে না। এই হতভাগ্য ব্যক্তিবর্গের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং স্বজনগণ কী দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন, আমরা সবাই তা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। আশা করি কর্তৃপক্ষ দ্রুত এই প্রার্থিত তদন্তের ব্যবস্থা করে আমাদের সবাইকে আশ্বস্ত করবেন।

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বাংলা সমিতির শোকসভা

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় কলাভবনে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলা সমিতি

সকাল দশটায় বটতলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সমিতির উদ্যোগে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে।

এখনও ড. আমিনউদ্দিনের কোনো খবর পাওয়া যায় নি

পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগারের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ড. আমিনউদ্দিনকে বিগত ১৪ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টায় তার বাসভবন ১৯/বি, সায়েন্স ল্যাবরেটরি হতে আল-বদররা ধরে নিয়ে গেছে। অদ্যাবধি তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ তার খোঁজ পেলে পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণাগারের ডিরেক্টরের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

শাহরিয়ারের খোঁজ নেই

গত ১৩ই ডিসেম্বর বেলা ১টায় কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর একটি সশস্ত্র দল মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের পুত্র মোস্তফা কামাল শাহরিয়ার (মিন্টু)-কে ৯ নং কে এম দাস লেন, ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এ পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।

মোস্তফা কামাল শাহরিয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ছাত্র।

দৈনিক বাংলা, ২১.১২.১৯৭১

খুনী পাকবাহিনী ও তার চরয়া এদের হত্যা করেছে
(স্টাফ রিপোর্টার)

হানাদার পাকিস্তানি দস্যু বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন সর্বজনমান্য কৃতী অধ্যাপককে হত্যা করেছে। গত ২৫শে মার্চের রাতে এই হত্যালীলা শুরু হয় এবং প্রথম দিকে ১০ জন সেরা অধ্যাপক প্রাণ হারান। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রাক্কালে ১৪ই ডিসেম্বর অপর দশজন প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রথম দিকের দশজন হচ্ছেন : ১. ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব (দর্শন) ২. অধ্যাপক এ এন এম মনিরুজ্জামান (সংখ্যাতত্ত্ব), ৩. ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (ইংরেজি), ৪. ডঃ ফজলুর রহমান খান (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), ৫. জনাব এ মুকতাদির (ভূ-বিদ্যা), ৬. জনাব শরাফত আলী (অংক), ৭. জনাব এ আর কে খাদেম (পদার্থবিদ্যা), ৮. শ্রী অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য (ফলিত পদার্থবিদ্যা), ৯. জনাব এম সাদেক (শিক্ষা) ও ১০. ড. এম সাদত আলী (শিক্ষা)।

গত ১৪ই ডিসেম্বর থেকে হারিয়ে যাওয়া প্রিয় অধ্যাপকগণ হচ্ছেন : ১. অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (বাংলা), ২. জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা), ৩. জনাব আনোয়ার পাশা (বাংলা), ৪. ড. আবুল খায়ের (ইতিহাস), ৫. মিঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য (ইতিহাস), ৬. জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদ (ইতিহাস), ৭. জনাব রাশীদুল হাসান (ইংরেজি), ৮. ডঃ সিরাজুল হক খান (শিক্ষা), ৯. ডঃ ফজলুল মহী (শিক্ষা) ও ১০. এম মর্তুজা (চিকিৎসক)।

আমাদের মেডিক্যাল রিপোর্টার জানাচ্ছেন যে, বিগত নয় মাসে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের তাঁবেদার আল-বদর ও রাজাকারদের হাতে বিভিন্ন সময় নিহত বহু চিকিৎসক আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। স্বাধীনতার স্বাদ তারা শেষ মুহূর্তের জন্যও গ্রহণ করতে পারেন নি। বহু চিকিৎসকের মৃত্যু সংবাদ আজও রাজধানীর মানুষের কাছে এসে পৌঁছে নি। এ পর্যন্ত ২৬ জনের নাম বাংলাদেশ মেডিক্যাল সমিতির দফতরে এসে পৌঁছেছে। তারা হলেন :

১. অধ্যাপক ডাঃ এম এফ রাব্বী, ২. অধ্যাপক ডাঃ আলীম চৌধুরী, ৩. অধ্যাপক ডাঃ শামসুদ্দীন আহমেদ, ৪. অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল জিয়াউর রহমান, ৫. ডাঃ হুমায়ুন কবীর, ৬. ডাঃ আজহারুল হক, ৭. ডাঃ সোলায়মান খান, ৮. ডাঃ মিসেস আয়েশা বেদোরা চৌধুরী, ৯. ডাঃ কসির উদ্দীন তালুকদার, ১০. ডাঃ মনসুর আলী, ১১. ডাঃ গোলাম মোর্তজা, ১২. ডাঃ মফিজউদ্দীন খান, ১৩. ডাঃ জাহাঙ্গীর, ১৪. ডাঃ আলহাজ মফিজউদ্দীন, ১৫. ডাঃ নুরুল ইমাম, ১৬. ডাঃ এস কে লালা, ১৭. ডাঃ হেমচন্দ্র বসাক, ১৮. ডাঃ ওবায়দুল হক, ১৯. লেঃ কর্নেল তাহের এএমসি, ২০. লেঃ কর্নেল হাই এএমসি, ২১. লেঃ কর্নেল বদিউর চৌধুরী এএমসি, ২২. মেজর রিজাউর রহমান, ২৩. মেজর ওয়াসিমুল ইসলাম, ২৪. ডাঃ আসাদুল হক, ২৫. ডাঃ মোসাব্বের আহমেদ, ২৬. ডাক্তার জব্বার।

দৈনিক বাংলা, ২২.১২.১৯৭১

হত্যার চেষ্টা অব্যাহত
অল্পের জন্য দুই শতাধিক চিকিৎসকের প্রাণরক্ষা
(মেডিক্যাল রিপোর্টার)

গত সোমবার ঢাকা শহরের চিকিৎসকরা কুখ্যাত আল-বদরদের আর একটি হত্যা ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আকস্মিকভাবে রক্ষা পেয়েছেন। এই কুখ্যাত দস্যুদের হাতে নিহত

চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে আহুত এক শোকসভায় যখন ঢাকা শহরের দুই শতাধিক চিকিৎসক সমবেত হয়েছিলেন তখনই এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। জেলখানা রোডস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল সমিতির চত্বরে গত সোমবার সকাল এগারোটার সময় এই সভা শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চত্বরের পূর্ব-উত্তর কোণে একটি ম্যানহোলের ঢাকনির পাশে সুদৃশ্য একটি সোনিও ট্রানজিস্টার দেখা যায়। আকস্মিকভাবে একটি দামি ট্রানজিস্টারটিকে পড়ে থাকতে দেখে সভায় আগত কয়েকজন মুক্তিবাহিনীর লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তারা উপস্থিত সবাইকে সরে যেতে বলেন ও মিত্রবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার দলকে খবর দেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিত্রবাহিনীর একটি দল উপস্থিত হন এবং প্রাথমিক পরীক্ষার পর উপস্থিত চিকিৎসকদের দূরে সরে গিয়ে সত্বর সভা শেষ করার অনুরোধ জানান। এরপর বিকেলের দিকে মিত্রবাহিনীর দ্বিতীয় দল ইঞ্জিনিয়ারসহ আসেন এবং সন্ধ্যা ৬টার দিকে ট্রানজিস্টারের মধ্যে রক্ষিত মাইনটির নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ ঘটান। মাইনটি নিয়ন্ত্রিতভাবে বিস্ফোরণ ঘটালেও এর প্রচণ্ড শব্দে আশপাশের বিল্ডিংয়ের কাচের শার্সিগুলো ভেঙে যায়। তবে অন্য কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। সম্ভবত এই শক্তিশালী বিস্ফোরকটির দ্বারা হানাদার বাহিনীর তাঁবেদাররা সভায় আগত সমস্ত চিকিৎসককে হত্যা করতে চেয়েছিল। উক্ত স্থানে এই শোকসভার কথা পূর্বাহ্নেই সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল।

ঘোষণা

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, পিএইচডি (ম্যানচেস্টার), এমএসসি (মান), এমএসসি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট গোল্ড মেডালিস্ট (ঢাকা), ডিপ্লোমা ইন ফ্লুইড মেকানিক্স (ইংল্যান্ড), ফেলো অফ দি রয়াল মেট সোসাইটি, লন্ডন, ফেলো অফ দি সোসাইটি অফ এপ্লাইড মাথামেটিক্স এবং ফেলো অফ দি মেট সোসাইটি অফ বোস্টন গত ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে আল-বদর কর্তৃক নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। ডাঃ আজাদ এবং অন্যান্য শহীদের বিদেহী আত্মার সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ শহরের একমাত্র সান্ধ্য পত্রিকা ইভনিং পোস্টের প্রকাশনা বন্ধ রাখা হয়েছে। উহার প্রকাশনা শিগগিরই পুনরায় শুরু করা হবে।

হাবিবুল বাশার
সম্পাদক, ইভনিং পোস্ট
দৈনিক বাংলা, ২২.১২.১৯৭১

ডা. আয়েশা চৌধুরীর কুলখানি অনুষ্ঠিত

ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর গুলিতে গত ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় নিহত পরলোকগত ডাক্তার আয়েশা বেদোরা চৌধুরীর (আইসিআই-এর ম্যানেজার ডাক্তার এম এ বাশারের পত্নী) কুলখানি গত সোমবার ধানমন্ডি ৩২নং রোডে জনাব হাতেম আলী খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ডাক্তার আয়েশা অবিভক্ত বাংলার সাবেক মন্ত্রী, সাবেক স্পিকার এবং ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য নওশের আলীর বড় নাতনি ছিলেন।

ভাইয়ের সন্ধানে সৈয়দ আমজাদুল হক

সৈয়দ আমজাদুল হক গত সোমবার সারাদিন ধরে উন্মাদের মতো তার ভাই সৈয়দ নজমুল হকের সন্ধান করেন। সৈয়দ নজমুল হক ফ্যাসিবাদী আল-বদর রাজাকারগণ কর্তৃক অপহৃত ও নিহত হয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার গঠিত হবার কয়েকদিন পর অর্থাৎ এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তানি দূতাবাসের যে দু'জন কূটনীতিক পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষাবলম্বন করেন, সৈয়দ আমজাদুল হক তার অন্যতম। তিনি নয়াদিল্লিস্থ সাবেক পাকিস্তানি দূতাবাসের প্রেস এটাচি ছিলেন। পাকবাহিনী বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণকে হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। অপর একজন কূটনীতিক হচ্ছেন জনাব এস কে শাহাবুদ্দিন। তিনি নয়াদিল্লিস্থ সাবেক পাকিস্তানি হাইকমিশনের প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন।
বিপিআই-এর খবরে বলা হয়, সৈয়দ আমজাদুল হক তার ভাই সৈয়দ নজমুল হকের অপহরণের খবর পেয়ে ঢাকা এসেছেন। সৈয়দ নজমুল হক সাবেক পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (পিপিআই)-এর চিফ রিপোর্টার ছিলেন।
ভাইকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় পাওয়ার জন্য তিনি রায়ের বাজার এলাকার বধ্যভূমি পরিদর্শন করেন। সেখানে আল-বদর রাজাকাররা পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সহায়তায় বহু বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, লেখক ও বিজ্ঞানীদের হত্যা করেছে। এই বধ্যভূমিতে কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে আটক করে রাখার খবরে এখনো অনেকে আশায় ভর করে দিন কাটাচ্ছে। সৈয়দ আমজাদুল হক তার ভাইকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার আশা করছেন।

ডাঃ মোমতাজ হোসেন চৌধুরীর হোন্ডা

গত ৮ই ডিসেম্বর কুখ্যাত বদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত ঢাকার কমলাপুরের সৈয়দ ফার্মেসির ডাক্তার সৈয়দ মোমতাজ হোসেনের পরিবারবর্গ (সৈয়দ সালমা পারভীন ও সৈয়দ মুনীর হোসেন) যেখানেই থাকুন না কেন তাদের শাহ আলম চৌধুরী, কেয়ার অব ২৭৩৪, আউটার সার্কুলার রোড (দরগাহ রোড জংশন) ঢাকা-১৪ ঠিকানা থেকে একটি হোন্ডা নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

দৈনিক বাংলা ২২.১২.১৯৭১

এদের সন্ধান চাই

আওয়ামী লীগের সহযোগী আওয়ামী উলেমা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব সভাপতি মওলানা অলিউর রহমানকে গত ১১ ডিসেম্বর কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর একদল সশস্ত্র লোক পুরাতন ঢাকা এলাকা থেকে ধরে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। তারপর থেকে আজ অবধি তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। তার সম্পর্কে কেউ কিছু জানলে তা তার ছোট ভাই নিপার ইনস্ট্রাক্টর জনাব শফিউর রহমান ২৫৫০৬১/৫ অথবা জনাব সাদেককে ২৫৪৫৪২ নম্বর টেলিফোনে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

দুই

রেজাউল করিম (বাবলু)। বয়স ২৫ বছর। উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। গায়ের রঙ ফর্সা, স্বাস্থ্যবান। ঢাকাস্থ সরকারি জেলা কলেজের ১ম বর্ষ বিকম-এর ছাত্র। গত ২৩শে নভেম্বর, ১৯৭১ অপরাহ্নে ১৫নং শেখ সাহেব বাজারস্থ বাড়ি থেকে সশস্ত্র সাদা পোশাক পরিহিত কতিপয় উর্দুভাষী ব্যক্তি তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং অতঃপর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। তার কোনো খোঁজ পেলে বেগম বদরুদ্দিন আহমদ, ১৫নং শেখ সাহেব বাজার ফোন : ২৫০৭১৮ ও ২৮১০১৫-তে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

তিন

টিএন্ডটি কলেজের বিএ ক্লাসের ছাত্র এবং ছাত্রলীগের সাহিত্য সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নুরুল আফসারকে গত ৩০ মে মতিঝিল গভর্নমেন্ট কলোনি থেকে রাত দেড়টায় হানাদার পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। তারপর থেকে বহু চেষ্টা করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। মোহাম্মদ নুরুল আফসার সম্পর্কে কোনো সন্ধান পেলে তা তার বাবা জনাব মোহাম্মদ জহুরুল হককে ৬নং পুরানা পল্টন ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

দৈনিক বাংলা, ২২.১২.১৯৭১

কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর আরো দুজন শিকার

কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর আরো দুজন শিকারের কথা জানা গেছে। এরা হলেন জনাব এম খুরশেদ আলম ও তার দ্বিতীয় পুত্র এ কে এম মাহবুবুল আলম।

জনাব খুরশেদ আলম টিএন্ডটি বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (ট্রাক অভ্যন্তরীণ-১) ও তার ছেলে মাহবুবুল আলম ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর বিকেল সোয়া ৫টায় আল-বদর বাহিনীর প্রায় ১৫ জন সশস্ত্র দস্যু ৬/৩/১, টিএন্ডটি কলোনি থেকে তাদের ধরে নিয়ে যায়। দস্যুরা ধরে নেয়ার সময় পিতা-পুত্রের চোখ বেঁধে দিয়েছিল।

১৩ ডিসেম্বরের পর থেকে এ পর্যন্ত এই দুজনের আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি।

২৬.১২.৭১, *দৈনিক বাংলা*

Kidnapped

Mr. Badaruddin Ahmad aged about 40. President of an area unit of Dhaka City Awami League, is one of those people who were kidnapped by the Al-Badar goondas.

Mr. Badaruddin Ahmad was kindapped by Al-Badar people on December 12 from Hajee Rashid Lane, Bangshal. His Family has been trying to locate him but all their attempts have proved fruitless.

Mr. Ahmad's brother Prof. Muhammad Husain has requested anybody having information of the where abouts of Mr. Badaruddin Ahmad to contact him (Mr. Muhammad Husain). He said that anybody giving information about Mr. Badaruddin Ahmad will be rewarded. Prof. Muhammad Husain address in-87. Hajee Abdullah Sarker Lane, Bangshal, Dhaka, Phone : 252680 or 254729.

Bangladesh Observer, 28.12.1971

Body of Salina Parveen found By a staff correspondent.

The body of Mrs. Salina Parveen editor shilalipe was found in the kiln at the Rayer Bazar on Friday. Her body was partly mutilated and she was in a completely blind folded state.

According to her brother, who was staying with her in her Siddeshwary residence, she was taken from her house by armed men at about 2 p.m. on December 14, while the city was under curfew impossed by the occupation forces. The armed gang came in an EPRTC coach. Four of the nearly 15 members of the armed gangsters entered her house and told her at bayonet point to accompany them. While her brother asked them about the purpose of her accompanying them they told him that he should not ask anything about that. They also threatened him that the consequences would also be too bad for him if he asks anything more.

It is believed that she was also the victim of the carnage of the Al-Badar, the armed gang of the ultra rightists Jamaat-e-Islami who brutally killed the topmost intellectuals of Bangladesh during the last few days of the Pakistan occupation forces in Dhaka.

Bangladesh Observer, 29.12.1971

3 more victims of Al-Badar carnage

Dr. Siddique Ahmed, Dr. Aminuddin both senior research officers and Mr. Shamsul Alam Laboratory Technician of the Eastern Regional Laboratory Dhaka were lifted from their quarters at noon on December 14 by Pakistani army and men of Al-badar they are believed to have been brutally killed like hundred of other intellectual of this city.

Bangladesh Observer, 24.12.1971

Absconding Al-badar gangster By A Staff Correspondent

Chowdhury Mainuddin a member of the banned, fanatic Jamaat Islam Party, has been described as the 'Operation-in-Charge' of the killing of intellectuals in Dhaka by Abdul Khaleque, a captured ring leader of the Al-badar and office-bearer of the Jamaat-e-Islam. The Fascist Al-Badar forces are responsible for the killing of the intellectuals backed by the Pakistan army before their humiliating surrender.

Chowdhury Mainuddin has been absconding presumably since December 16.

Bangladesh Observer, 29.12.1971

Al-Badar leader held By A Staff Correspondent

Abdul Khaleque a collaborator of the notorious fascist Al-Badar Bahini was caught on Wednesday in Rampura. He disclosed the names of nine Al-Badar members who conducted the cold blooded murders of the intellectuals in the city prior to the shameful surrender of the occupation army.

Mr. Khaleque office secretary of the City Jamaat a bootlicking organisation of the occupation army, said that the members whom he named could give the details of the murderers and plans. He denied his association with the killings, but he admitted that he was asked by the Al-badar bahini to locate the house of Shahidullah Kaiser, President of the then East Pakistan Union of Journalist. Khaleque said that he was full timer of the fascist organisation Jamaat Islam was drawing a salary of taka 325 per month.

Latest Victim of Al-Badar

Syed Najmul Huq, a renowned journalist and the Chief Reporter of the former PPI and correspondent of the Columbia Bangladesh Service was picked up by a group of the Fascist and fanatically religious Al-Badar Bahini—a millitant organisation of the Jammat-e-Islami on December 10 at 4 a.m. from his residence at 90 Purana Paltan line Dhaka. It is to be recalled that these miscreants who were working under the direct supervision and set planning of

Pakistan Army under the leadership of Major General Rao Farman Ali were wearing uniforms and masks and carrying stenguns and rifles and fired two shots to create terror in Mr. Najmul's House. Afterwards they grabbed him by his neck in his bed room and ordered him hands up. Then they took him to the open yard of his house and ordered him to sitdown. Immediately afterwards at 4-15 a.m. he was forcibly taken by them to a jeep which was escorted by another military jeep. The jeep whisked away in the wild darkness carrying Syed Najmul Huq grabbed by four members of Al-Badar bahini one of them reported to be a Bangali.

He presumed to have been taken to the Physical Training Institute at Mohammadpur blindfolded and hands tied behind along with other intellectuals of the city before they brutally murdered him in cold blood at Rayerbazar marshy area after inhuman torture. Mr. Najmul's dead body could not be traced as yet, as is the story of many other intellecuals of the city. Other dead bodies bore the mark of Gestapo type of torture, some body's fingers were cut, some body's chest bore bayonet wounds, some body's face was disfigured with acid.

More than a hundred foreign journalist who have so far visited dead bodies lying at slaughter land at Rayerbazar and other places, have admitted that the barbarous and inhuman torture meted out to the intellectuals, have surpassed any type of cruel torture ever heard of in history. One foreign journalist even commented "its not only utterly shocking but we are ashamed that we belong to the human race which is capable of doing this."

Syed Najmul Huq, aged 30 was born in Paigramkashba in the district of Khulna. He is the fourth son of the reputed educationist Mr. Emadul Huq and younger brother of Mr. Amjadul Huq, who went first to switch over allegience to Bangladesh Government on April 6 in New Delhi. He joined PPI in 1964 and since then he was working in the same News Agency for the last seven years. He also accompanied Sk. Mujibur Rahman to London and Europe when he later went on a tour after his release from the so-called 'Agartala Conspiracy Case.'

Bangladesh Observer, 23.12.1971

Killing of intellectuals condemned By a Staff Correspondent

Different educational institutions employees unions of autonomous and commercial offices and socio-cultural organisations in separate meetings held on Wednesday and Thursday in Dhaka condemned the brutal killing of intellectuals by the Fascist Al-Badar forces in collaboration with the Pakistan Army. In All the meetings heartfelt sympathies were expressed with the members of the bereaved families and demanded punishment of the culprits.

The Dacca University Bangla Samity in its meeting demanded severe punishment for the persons who are responsible for the murders of teachers, doctors, scientists, journalists and other social workers.

Presided over by Dr. Neelima Ibrahim the meeting was addressed by Professor Rafiqul Islam, Professor Maniruzzaman, Professor Humayun Azad, Mr. Kabir Chowdhury. Mr. Shaukat Anwar, Mr. Al Mansur and Miss Baby Maudood.

In a resolution the meeting demanded that the culprits should not be released under the umbrella of Geneva convention and they should be duly punished after their trial in special tribunals.

The teachers of the Central Law College in a meeting held on Thursday expressed its deep sense of distress at the acts of ghostly murder and atrocities on the eminent teachers and intelligentsia of Bangladesh and called upon the Government to punish the criminals without mercy and without regard to their being prisoners of war.

Bangladesh Samabaya Union in a meeting held at Samabaya Sadan at Motijheel Commercial Area paid homage to the memory of the martyrs to the liberation movement and expressed sympathy to the members of the bereaved families.

The teachers and employees of Engineering University met under the presidentship of Dr. M.A. Naser, Vice-Chancellor of the University. The meeting demanded punishment to the criminals responsible for killing of intellectuals. The meeting also demanded immediate release of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and necessary steps for his return to Bangladesh.

The teacher and staff of Dacca College in a meeting strongly condemned the brutal killing of intellectuals by Al Badar Bahini and their collaborators and demanded open trial of the murderers.

Bangladesh Observer, 24.12.1971

Varsity teachers demand punishment of murderers By a Staff Correspondent

A general meeting of Dacca University teachers on Tuesday condoled the death of teachers and people from various other professions who fell victim to the planned massacare carried out in Bangladesh since March 25 until the surrender of the Pakistan Army. The meeting also demanded investigation of the activities of Pak-military and para-military forces and their collaborators responsible for one of the worst massacres in the history of mankind. The meeting pressed for their trial and severest punishment.

Held at the University Arts building the meeting prayed for eternal peace of the departed souls and sympathised with the bereaved families. The meeting held under the auspices of Dacca University Teachers Assosiation was presided over by Dr. M.A. Latif.

The meeting called for steps to ensure that defence personnel connected with the massacre were not given the Pakistan status of prisoners of war. The meeting demanded that they be treated as war criminals.

The meeting also appealed to the United Nations to take punitive action against the Government of Pakistan for the planned genocide.

Another resolution of the meeting hailed the dawn of independence and acknowledged with respect the unprecedented sacrifice of the brave warriors of the Mukti bahini and crores of struggling people of Bangladesh. Gratitude was also expressed to the friendly. countries for their role in the struggle of the people of Bangladesh. The meeting also acknowledged with gratitude of world opinion and the role of newsman of various countries. The Dacca University teachers meeting in a separate resolution demanded the immediate release of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. An other

resolution appealed to all to safeguard the dignity of independence achieved after so much sacrifice of blood and also urged all people, whatever their party affiliation or opinion to engage in the task of constructing a happy prosperous and socialistic Bangladesh.

24.12.1971

Teachers killed

The following is a list of Dhaka University teachers killed in army action in March, as mentioned in a Press release at Dacca University.

Dr. G.C. Dev, Head of the Department of Philosophy; Dr. A.N.M. Maniruzzaman, Head of the Department of Statistics; Jyotirmay Guha Thakurata of English Department; Dr. Fazlur Rahman Khan of Soil Science; Mr. A. Muktadir of Geology Department; Mr. Sharafat Ali of Mathematics Department; Mr. A.R. Khadem of Physics Department; Mr. A. Bhattacharjee of applied Physics; Mr. Mohammad Sadeq and Mr. Mohammad Sadat Ali (both of Research and Education).

Names of Dacca University teachers picked up by army collaborators a few days before the surrender by the Pakistan Army are :

Prof. Munier Chowdhury, Head of the Department of Bengali; Mr. Mufazzal Haider Chowdhury of Bengali Department; Mr. Anwar Pasha of Bengali Department; Dr. Abul Khair of Histroy Department; Mr. Santosh Bhattacharjee of History Department; Mr. Giasuddin Ahmed of Histroy Department; Mr. Rashidul Hassan of English Department; Dr. Serajul Huq Khan of Research and Education and Dr. Faizul Mahi of Research and Education.

Medical officer of Dhaka University Dr. Mohammad Murtaza was also lifted away by Al-Badar. Search for them is continuing but they are believed to have been killed.

Bangladesh Observer, 24.12.1971

Killing of intellectuals condemned PUNISH CULPRITS

By A staff Correspondent

Different organisations and homage to the departed souls of journalists, professors and doctors who were killed by the armed

wing of the extreme rightist Jammat-e-Islami, Al-Badar,. Just on the eve of the liberation of Dacca by the Allied Forces and the Mukti Bahini. These organisations urged upon the Government of Bangladesh to find out the criminals and punish them.

The doctors of the Dacca Medical College in a meeting at the auditorium of Dacca Medical College at 11 a.m. on Sunday expressed their heart-felt condolence at the inhuman killing of Professor Dr. Fazle Rabbe, Dr. Alim Chowdhury by the Fascist Al-Badar. The meeting presided by the Principal of Dhaka Medical College was addressed, among others, by Prof. Dr. Mominul Haq, Prof. Ali Ashraf, Dr. Salauddin and Prof. Akram Hossain, Dr. Sarwar Ali Khan, Mr. Rafiqul Hasan and Mr. Abul Kasem addressed the gathering on behalf of the Mukti Bahini. All the speakers while addressing was found sobbing. The speakers made a strong vow that for the consolidation of our independence and as a mark of respect to the departed souls, who throughout their life envisaged a exploitation free society, we must make our Health Services people oriented. The meeting proposed to name two of the existing halls of Dacca Medical College after Dr. Fazle Rabbe and Dr. Alim Chowdhury.

The doctors, nurses and other employees of the Post-Graduate Medical Institute in a meeting expressed their deep condolences at the gruesome murder of Dr. Mohammad Fazle Rabbe. Dr. Abdul Alim Chowdhury and Dr. Mohammad Murtaza. The meeting decided to install memorial plaque for the departed doctors in the Post-Graduate Medical Institute.

The Student and the staff of the Salimullah Medical College in a meeting expressed heart-felt grief and anguish at the brutal killing of Prof. Abdul Alim Chowdhury and Dr. Fazle Rabbe and offered their sincere condolences to the bereaved families. The meeting urged upon the doctors and professional colleagues to take effective measures to keep the memory of these martyrs alive.

The scientists and employees of the Atomic Energy Centre, Dhaka as well as the engineers and staff of the Directorate of Works and Services in a meeting at the auditorium of the Atomic Energy Centre, Dacca also offered their heart-felt sympathy to the

members of the bereaved families who lost their dear ones in the hands of the Fascist Al-Badar. The meeting in another resolution congratulated the heroic Mukti bahini and the Allied Forces in liberating the soil from the Fascist occupation forces.
The Bangladesh Journalists Union has condemned the Fascist Forces who so brutally killed the numerous intellectuals of Bangladesh. The Union in a Press release also stated that the gaibi janaza and a condolence meeting for the departed souls will be held at the Press Club today Monday at 11 a.m.

Bangladesh Observer, 29.12.1971

Murder of Intellectuals

...Including those who were killed on the 25th March. They urged upon the government to provide all facilities including free education-to the members of the bereaved families.
The signatories to the statement were Poet Shamsur Rahman, Mr. Abdul Aziz, Senior advocate, Supreme Court, Mustafa Kamal, Barrister, Hasan Hafizur Rahman, Ahmed Rafique Editor Nagarik, Begum Ferdousi Rahman, Sardar Jainuddin, Mr. Ahmed Humayun, Neamul Bashir, Fazal Shahabuddin, Aminul Islam Bedu, Mr. Anwar Husain Khan and Mr. Mustafa Jaman Abbasi.

Bangladesh Observer, 28.12.1971

হত্যাকারী কারা?
৩৯ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি
খুনীদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গণ্য করতে হবে

গতকাল সোমবার মুজিবনগরে ৩৯ জন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীদের দানবীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কোনোরূপেই ক্ষমা করা যায় না।
বিবৃতিতে তারা বলেন, উক্ত ব্যক্তিদের যুদ্ধবন্দি নয়, বরং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী অন্যদের মধ্যে রয়েছেন, সিকান্দার আবু জাফর, জনাব শওকত ওসমান, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ এ আর মল্লিক, জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী, ডঃ সরওয়ার মুর্শেদ, মিসেস সনজিদা খাতুন, রণেশ দাশগুপ্ত ও জনাব কামরুল হাসান।
বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্র থেকে উপরোক্ত বিষয় প্রচার করা হয়।

রাও ফরমান আলীই দায়ী

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ বেতার ও ভারতীয় বেতারের এক খবরে বলা হয় যে, বাংলাদেশে সম্প্রতি ৩৪০ জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যার পেছনে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত গভর্নর ডঃ মালেকের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীসহ অন্যান্য সামরিক অফিসারের হাত রয়েছে। এতে বলা হয় যে, এই ঘৃণ্য নারকীয় হত্যালীলার জন্য দায়ী অন্যান্য সামরিক অফিসারদের নামও শিগগিরই প্রকাশ করা হবে। গতকাল সোমবার ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারের একজন বিভাগীয় সেক্রেটারি উপরোক্ত বিষয় জানান বলে বেতারে উল্লেখ করা হয়।

দৈনিক বাংলা, ২১.১২.১৯৭১

এরাই হলো নরপিশাচ আল-বদর

(স্টাফ রিপোর্টার)

ফ্যাসিস্ট পাকিস্তানী বাহিনী স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের নির্বিচার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য যে খুনীবাহিনী গড়ে তুলেছিল, যারা তাদের পাকিস্তানী প্রভুদের রক্তলোলুপতা ও জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার পৈশাচিক উল্লাসে অসংখ্য নিরীহ বাঙালির রক্তে হোলি খেলেছে, নিষ্ঠুর নির্যাতন করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে, ঘর-বাড়িতে আগুন দিয়েছে, নারী নির্যাতন করেছে, দুধের শিশুকে বেয়নেটের খোঁচায় আর বুটের তলায় পিষে মেরেছে সম্প্রতি সেই আল-বদর পশুবাহিনীর একটি দলের নেতা ও তাদের রক্তপিপাসু সহচরদের নাম জানা গেছে।

গতকাল মঙ্গলবার রমনা থানায় এহেন একটি দল সম্পর্কে এজাহার দেয়া হয়েছে। আলোচ্য দলটির সদস্যরা সকলেই ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার বিশেষ একটি দলের সদস্য। এদের নেতা হচ্ছে আলিয়া মাদ্রাসা ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নূরুল হক।

এই দলটিতে মোট কতজন সদস্য আছে তা জানা যায় নি, তবে বকসিবাজার অঞ্চলের জনসাধারণ অনেকেই তাদের নৃশংস কার্যক্রম সচক্ষে দেখেছেন। বস্তুতপক্ষে আল-বদর বাহিনীর ঐ দলটি উক্ত অঞ্চলে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল।

উপরের ছবিতে এই খুনিদের নেতাকে দেখা যাচ্ছে। এদের একটি গ্রুপফটোও আমাদের হস্তগত হয়েছে। রমনা থানায় এ সম্পর্কীয় জিডি নম্বর হচ্ছে ১৪৮২।

আলিয়া মাদ্রাসা বদর বাহিনী ইউনিটের অন্যান্য সদস্য হচ্ছে সাঈদ আহমদ, সাব্বির আহমদ, হেলাল উদ্দীন, আলতাফুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, জোবায়ের, শফিকুল্লাহ খান, হাবিবুর রহমান ও আবদুল্লাহ।

দৈনিক বাংলা, ২২.১২.১৯৭১

বুদ্ধিজীবীদের হত্যার চক্রান্তের আরো দলিল

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকার গভর্নমেন্ট হাউসে বসে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বুদ্ধিজীবীদের হত্যালীলা চালাবার নাটগুরু যে ছিলেন তার আরো প্রমাণ ক্রমশ পাওয়া যাচ্ছে। গভর্নমেন্ট

হাউসে তার নির্দিষ্ট কক্ষের টেবিলে ফাইল চাপা যেসব নোটিশ ইতস্তত রয়েছে তার একটিতে বিবিসির ও এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার সংবাদদাতা জনাব নিজামউদ্দিন আহমদকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার সংকেত রয়েছে। জনাব নিজামউদ্দিন পিপিআই'র ব্যুরো চিফ ছিলেন।
নোটিশটিতে জনাব নিজামউদ্দিন প্রেরিত সংবাদ সম্পর্কে নাখোশ হওয়ার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। নোটিশটিতে অন্যান্য ৩টি বিষয় সম্পর্কেও জরুরি সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত রয়েছে। আমরা নোটিশটির পূর্ণ পৃষ্ঠাই ছেপে দিলাম।

কুখ্যাত আল-বদর পান্ডা গ্রেফতার
(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকায় গেরিলা বাহিনী গতকাল বুধবার ঢাকা শহর জামাতে ইসলামের দফতর সম্পাদক ও কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর অন্যতম নেতা আবদুল খালেককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।
কুমিল্লা জেলার হাজিগঞ্জ থানার বাড্ডা গ্রামের জনাব আবদুল মজিদের পুত্র আবদুল খালেককে রামপুরার একটি গোপন আস্তানা থেকে উদ্ধার করা হয়।
গেরিলা বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদের ফলে সে স্বীকার করে যে, সে প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক জনাব শহীদুল্লাহ কায়সারের বাসা বদরবাহিনীর ঘাতকদের দেখিয়ে দেয় তবে, তাকে কোথায় হত্যা করা হয়েছে, সে কথা সে জানে না বলে জানায়।
সে মোট ৯ জন আল-বদর বাহিনীর নেতার নাম প্রকাশ করেছে।
আবদুল খালেকের বাসা তল্লাশি করে অনেকগুলো ছবি পাওয়া যায়। যাদের ছবি রয়েছে তারাও আল-বদরের লক্ষ্য ছিল কিনা জিজ্ঞেস করা হলে সে অস্বীকার করে। বলে যে এগুলো তার বন্ধুবান্ধবদের ছবি।
সে আরো জানায় যে, মোহাম্মদপুরে অবস্থিত ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে আল-বদর বাহিনীর লোকদের ট্রেনিং দেওয়া হতো।
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার আলবদর বাহিনীর শিকারে পরিণত হওয়ার সংবাদ জানার পর কায়েতটুলি মসজিদের ইমাম কায়সার সাহেবের বাসায় গিয়ে জানায় যে জামাতে ইসলামের উপরোক্ত আবদুল খালেক কয়েকদিন আগে জনাব কায়সারের ঠিকানা তার কাছে জানতে চায়। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে গেরিলা বাহিনীর সদস্যগণ দ্রুত সন্ধান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন।
কুখ্যাত জামাতে ইসলামীর আবদুল খালেক আল-বদর বাহিনীর যে ৯ জনের নামোল্লেখ করেছে তার অপারেশনাল ইনচার্জ ছিল দৈনিক পূর্বদেশ-এর স্টাফ রিপোর্টার চৌধুরী মঈনুদ্দীন। সে প্রকাশ্যভাবেই জামাতে ইসলামীর সদস্য ছিল। প্রকাশ, সাংবাদিকদের বাসস্থানের ঠিকানাও সেই যোগাড় করত।

দৈনিক বাংলা, ২৩.১২.১৯৭১

এদের ধরিয়ে দিন

জল্লাদ বদর বাহিনীর সদস্যদের আরো কয়েকটি নাম

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মূল করার জন্য বাংলার জঘন্যতম শত্রু ফ্যাসিস্ট জামাতে ইসলামী যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এবং যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আল-বদর নামে জল্লাদ বাহিনী গঠন করেছিল—তাদের সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। এই জল্লাদদের ট্রেনিং কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত লালমাটিয়ার শরীরচর্চা কেন্দ্র থেকে উদ্ধার করা এইসব তথ্যে বদর জল্লাদদের আরো কয়েকজনের নাম পরিচয় ঠিকানা পাওয়া গেছে। নিচে এই নাম ঠিকানা প্রকাশ করা হলো। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য বলে উল্লেখিতদের সবারই স্থানীয় ঠিকানা দেয়া হয়েছে ১৫ পুরানা পল্টন। এটি ছিল ইসলামী ছাত্র সংঘের কার্যালয়।

প্রথম চৌদ্দজনের নাম ঠিকানা ও বিবরণ সাইক্লোস্টাইল করা ফরমে পাওয়া গেছে। এদের ধরে থানা বা মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছে দেবেন। কেউ নিজের হাতে এদের শাস্তি দেবেন না। কারণ এদের কাছে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।

১. মোঃ শাহজাহান ভূইয়া, দ্বিতীয় বর্ষ, বিএ অনার্স, ২৬০ মহসীন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঠোঁটে বসন্তের দাগ আছে। পিতা মৃত হাজী মোঃ আফসারউদ্দিন ভূইয়া, গ্রাম : খলাপাড়া, পোস্ট : বাজার হাসনাবাদ, থানা : রায়পুর, টঙ্গী, ঢাকা।

২. মোঃ আক্তারুজ্জামান, পিতা মুন্সী এ আলী, দশম শ্রেণীর ছাত্র। ডান হাতে একটি কালো দাগ আছে। পোস্ট ও গ্রাম : তারাগাঁও, থানা : কাপাসিয়া, ঢাকা। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য।

৩. ওসিউদ্দিন আহমেদ, পিতা মোঃ সামসুল হক, শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি, বাম হাতের কনুইয়ের বিপরীত দিকে একটি কাটা দাগ আছে। গ্রাম : ভাওয়ার ভিটি, পোস্ট : বাঘৈর, থানা : কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য।

৪. মোঃ মোমদেদুজ্জামান, পিতা সাজেদুল মোনায়েম, এসএসসি পরীক্ষার্থী, গ্রাম : উজুলী, পোস্ট : টুকনয়ন বাজার, থানা : কাপাসিয়া, ঢাকা। বাঁ হাতে একট কাটা দাগ। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য।

৫. ফিরোজ মাহবুব কামাল, পিতা মোঃ শাহাবুদ্দীন, দ্বিতীয় বর্ষ এমবিবিএস পরীক্ষার্থী, চোখের দুই ভুরুর মাঝখানে একটি কালো চিহ্ন। গ্রাম : কাদিরপুর, পোস্ট : খোকসা, জেলা : কুষ্টিয়া। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য।

৬. এস এম জহুরুল ইসলাম, পিতা কফিলুদ্দীন, এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : বেলদি, পোস্ট : পুতিনা, স্থানীয় ঠিকানা—গ্রাম, পোস্ট ও থানা : জয়দেবপুর, ঢাকা।

৭. মোঃ আবুল হোসেন, বয়স ১২ বছর, পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। পিতা মোঃ আবদুল হামিদ হাওলাদার, স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ঘাটাশিয়া, পোস্ট : গাবুয়া, থানা : মির্জাগঞ্জ, জেলা : পটুয়াখালী। স্থানীয় ঠিকানা : ৪/২৫ ডিআইটি ভবন, নারায়ণগঞ্জ। বাঁ হাতের অনামিকায় একটি কাটা দাগ।

৮. মোঃ কবিরুদ্দীন, পিতা মোঃ আবুল হাশেম, পোস্ট ও গ্রাম : সারিফল, থানা গৌরনদী, জেলা : বরিশাল, ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য, বাঁ হাতের আঙ্গুলে একটি তিল।

৯. মোঃ শামসুল ইসলাম খান, পিতা মোঃ সোবেদার আলী খান, আইএ পরীক্ষা দিয়েছে। মুখে স্মল পক্সের দাগ ও ডান হাতের তিন আঙ্গুলে পোড়া দাগ। স্থানীয় ঠিকানা : ১০৯, হাজী ওসমান গনি রোড, ঢাকা-১। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : সোনাতলা, পোস্ট : শিকারীপাড়া, থানা : নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা।

১০. মোঃ আবদুল মতিন, পিতা নূর মোহাম্মদ, চতুর্থ বর্ষ এমবিবিএস ছাত্র, ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য, ডান চোখের ভুরুতে একটি কাটা দাগ। গ্রাম : তুলাছরা, পোস্ট : গোপালপুর, জেলা : নোয়াখালী।

১১. মোঃ নসরত-এ খুদা, পিতা : ডাঃ নওশের আলী, ২য় বর্ষ এমবিবিএস, ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য, বাঁ পায়ে একটি কাটা দাগ। গ্রাম : নাসিমপুর, পোস্ট : সিরাজগঞ্জ বাজার, পাবনা।

১২. এম এম আবদুল হাই, পিতা এফ এম আনোয়ারুল্লাহ, ঢাকা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এমএম। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : মহম্মদপুর, পোস্ট : থানারহাট, জেলা : নোয়াখালী। স্থানীয় ঠিকানা : আলিয়া মাদ্রাসা হোস্টেল, বক্সীবাজার, ঢাকা।

১৩. মোঃ মাজেদ আলী (বিবাহিত), পিতা মোঃ ওয়েজউদ্দীন হাওলাদার, বিকম প্রথম বর্ষ। গ্রাম ও পোস্ট : এনায়েতনগর, থানা : কালকিনি, জেলা : ফরিদপুর। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য। উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, পাতলা গড়ন।

১৪. খোন্দকার নজমুল হুদা, পিতা খোন্দকার আবদুল মান্নান, ১ম বর্ষ এমবিবিএস, বাঁ হাতের অনামিকায় পাতার দিকে একটি দাগ আছে। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য। গ্রাম : শোসালিয়া, পোঃ সাহাপুর, জেলা : নোয়াখালী।

নারায়ণগঞ্জের আল-বদরের তালিকা

১৫. মোঃ মুইনুদ্দীন, পিতা আবদুল হাকিম, ৪/২৫ ডিআইটি ভবন, নারায়ণগঞ্জ। স্থায়ী ঠিকানা : পোস্ট ও গ্রাম : কুকুটিয়া, থানা : শ্রীনগর, ঢাকা।

১৬. মোঃ নাসিরুদ্দিন, পিতা মোঃ বসিরুদ্দীন, ৪/২৫ ডিআইটি ভবন, নারায়ণগঞ্জ। পোস্ট ও গ্রাম : গোয়ালমারি, থানা : দাউদকান্দি, জেলা : কুমিল্লা।

১৭. মোঃ জামালউদ্দীন, পিতা আবদুল গনি সিকদার, ৪/২৫ ডিআইটি ভবন, নারায়ণগঞ্জ। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ঈশ্বরকাটি, পোস্ট ও থানা : নরিয়া, ঢাকা।

১৮. জালালউদ্দীন মোঃ মনসুর আলম, পিতা মৃত এম এ সালাম, ৭৪ উত্তর চাষাড়া, পোস্ট : নারায়ণগঞ্জ, থানা : ফতুল্লা।

১৯. মোঃ সোলায়মান, পিতা মোঃ আজিজউল্লাহ, বর্তমান ঠিকানা : পোস্ট ও গ্রাম : নবিগঞ্জ, থানা : নারায়ণগঞ্জ।

২০. মোঃ বোরহানউদ্দীন, পিতা আবদুল বারিক মিয়া, গ্রাম : সিঙ্গাপাড়া, পোস্ট : কোলা, থানা : শ্রীনগর, জেলা : ঢাকা।
২১. মোঃ রিজওয়ান আলী, পিতা মোঃ মনসুর হিলাল, গ্রাম ও পোস্ট : নবিনগর, থানা : নারায়ণগঞ্জ, জেলা : ঢাকা।

দৈনিক বাংলা, ২৯.১২.১৯৭১

এ লোকটিকে এখনো ধরা যায় নি
(পূর্বদেশ রিপোর্ট)

বধ্যভূমি শিয়ালবাড়ির জল্লাদদের একজন এই এস, খান। তার আসল নাম এখনো জানা যায় নি। তবে এ কথা সত্যি যে, শিয়ালবাড়ির বধ্যভূমিতে বাঙালিদের নিধন করার জন্য হানাদার বাহিনী যে ক'জন জল্লাদকে নিযুক্ত করেছিল তার অন্যতম প্রধান ছিল এই এস, খান।
বড়ই দুর্ভাগ্য, এই নরঘাতক পশু এখনো ধরা পড়ে নি। অথচ এস, খানের অত্যাচার অনুচারের কথা জানে না এমন লোক মিরপুর এলাকায় নেই।
এস, খান জীবিত আছে এবং নিরাপদে মিরপুরের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ কথা শুনে শিয়ালবাড়ির লোকজন আতঙ্কিত সন্ত্রস্ত। এই খুনীকে কয়েকদিন আগে ১২ নম্বর সেকশনে দেখা গিয়েছে।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'পূর্বদেশে'ই প্রথম মিরপুরের খুনীদের আড্ডাখানার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ বাহিনী খুনীদের বিভিন্ন আড্ডাখানায় তল্লাশি চালিয়ে বহু অস্ত্রসহ তাদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন।
কিন্তু এই নরঘাতক পশুটি ধরা পড়ে নি।

পূর্বদেশ, ১.৩.১৯৭২

হোসেনের হত্যাকারী কি এ লোকটি?
॥ সালেহউদ্দিন প্রদত্ত ॥

নাম তার মোহাম্মদ ইসরাইল খান। পেশায় রেলগাড়ির চালক। বাসা ছিল শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনি। হয়ত বছরখানেক আগেও সে ছিল আর দশজন শ্রমজীবী মানুষেরই একজন। কিন্তু আজ তার পরিচয় ভিন্ন। আজ সে বিগত ন মাস ব্যাপী ত্রাসেরই প্রতিচ্ছবি।
ইসরাইলের পালকপুত্র এবং তার কুকীর্তির অন্যতম সহযোগী খলিল জানিয়েছে, পিতার অনুচরদের কাছে সে শুনেছে, তারাই ইত্তেফাক পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন হোসেনকে হত্যা করেছে। এ কাজে প্রধান উদ্যোক্তা নাকি ছিল ইত্তেফাকের এককালীন দারোয়ান এবং ইসরাইলের ভায়রা ভাই সানাউল্লাহ। জনাব হোসেনকে নাকি নটরডেম কলেজের কাছে হত্যা করা হয়।
মার্চ মাসে পাক বাহিনী বাংলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর ইসরাইল তাদের সাথে ভিড়ে যায়। পরে রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে শাহজাহানপুর এলাকায় অসংখ্য হত্যা,

লুণ্ঠন আর নারী নির্যাতনের নায়কে পরিণত হয়। এককালের শ্রমজীবী ইসরাইল হয়ে ওঠে মূর্তিমান ত্রাস।

গত সোমবার ইসরাইল ফকিরাপুলে রক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। শাহজাহানপুর এলাকার দায়িত্ব নাকি ছিল হানাদার বাহিনীর কাপ্তান আবদুল কাইয়ুমের হাতে। রাজাকার নেতা ইসরাইল ছিল সেই নারীলোলুপ নরপশুর দক্ষিণ হস্তবিশেষ। সে পাশের বস্তি এলাকা থেকে মেয়েদের জোর করে কলোনিতে আটকে রাখতো তার পাকিস্তানী প্রভুদের ভোগের জন্য। এ কাজে ইসরাইলের বাঙালি পত্নীও নাকি ছিল সহযোগী—সে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রলোভনে কলোনিতে টেনে এনে অসংখ্য মেয়ের সর্বনাশ করেছে।

ইসরাইলের পালকপুত্র মোহাম্মদ খলিল পিতা-মাতার এসব কীর্তির সাক্ষ্য দেয়।

ইসরাইল ও তার সঙ্গীরা বহু লোককেই হত্যা করেছে। তার মাঝে রেলওয়ে স্কুলের শিক্ষক মীর মোশাররফ হোসেন, রেলওয়ের ইলেকট্রিক্যাল চার্জম্যান আনওয়ার হোসেন ও বেবি ট্যাক্সি চালক আবদুস সোবহানের নাম জানা গেছে।

গত ৬ই ডিসেম্বর বিকেলেও ইসরাইল কলোনি এলাকায় ব্যাডমিন্টন খেলারত কয়েকজন তরুণ এবং উপস্থিত দর্শকদের গুলি করে হত্যা করে। .

ইসরাইল ও তার সঙ্গীরা হত্যা আর নারী নির্যাতন ছাড়াও লুণ্ঠনের এবং ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়ের অপরাধে অপরাধী।

ওরা মীর মোশারফ হোসেনকে হত্যার দুদিন আগে তার অফিসে গিয়ে তাকে জানায়, "আপকা দিন খতম হো রাহা হ্যায়।"

বদর বাহিনীর কমান্ডার

ঢাকায় বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞের অন্যতম নেতা শওকত ইমরান গত ১৬ই ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ রয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাকে খুঁজছেন। সে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বর্ষের ছাত্র।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, কুখ্যাত জামাতে ইসলামীর ঢাকা শহর অফিস সেক্রেটারি আবদুল খালেক পুলিশের কাছে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যে বিবরণ দেয়, তাতে শওকত ইমরানের নামও রয়েছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী এই নরপশু ধানমন্ডিস্থ সিটি নার্সিং হোমে অবস্থিত তৎকালীন আল-বদরের ক্যাম্প কমান্ডার ছিল।

তার বাড়ি ফেনী শহরে। পিতার নাম ডাঃ বশীর। সে ছাত্রজীবনের শুরু থেকে ইসলামী ছাত্র সংঘের একজন সক্রিয় কর্মী এবং পরে নরঘাতকদল আল-বদরের সদস্য। শওকত ইমরান বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রধান হোতা ও অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দিনের প্রধান সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। এই খুনী জল্লাদ এখনো ফেরার এবং একে ধরা গেলে তার কাছ থেকে আরো তথ্য জানা যাবে।

আবু হানিফা আফ্রাদ

আবু হানিফা আফ্রাদ নামক রাজাকার বাহিনীর এই সদস্যটিও ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। এই খুনীও বর্তমানে ফেরার।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে—কিন্তু অনেক মুখই হারিয়ে গেছে

(প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

গতকাল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘণ্টা বেজেছে। দীর্ঘদিন পর স্বাধীন দেশের মুক্তাঙ্গনে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে যাবার ডাক দিয়ে গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি সবার বুকের মধ্যে সাড়া তোলে। একসাথে মিলিত হবার সুখ। কেমন আছো? কেমন আছো তোমরা সব?

হঠাৎ বুকটা ব্যথা করে। মুফতি ক্লাসে আসে নি। আসাদুল্লাহ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সবার পেছনে পড়ে। সেইসব বন্ধুদের মুখগুলো কোথায়? বুলবুল, বদিউলই বা কোথায়? ওরা কেউ আর ফিরবে না। কোনদিন না।

তবু ঘণ্টা বাজলো। নতুন দিনের নতুন আশায় কাঁপতে কাঁপতে ঘণ্টাধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

শ্রেণিকক্ষগুলোয় ছড়ানো ছিটানো দুই একটা ছাত্র। খুব বেশি ছেলে এখনো এসে পৌছায় নি। শতকরা মাত্র ৩২ জন ছাত্র ছাত্রাবাসগুলোয় উপস্থিত। ছাত্রাবাসগুলো আজ থেকে মেস চালু করবে।

দৈনিক বাংলা, ৯.২.১৯৭২

বুদ্ধিজীবী সকল মহল থেকে হত্যার বিচার দাবি
নিহত বুদ্ধিজীবীদের মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলে শোকসভা

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার প্রতিবাদ এবং তাদের রুহের মাগফেরাতের জন্য গতকাল সোমবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের পক্ষ থেকে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়। সভায় কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল সমিতি

মেডিক্যাল রিপোর্টার কর্তৃক প্রদত্ত খবরে বলা হয় যে, গতকাল সোমবার তোপখানা রোডস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সমিতির পরলোকগত চিকিৎসক সদস্যদের মৃত্যুতে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওষুধ শিল্প সমিতি

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি সংগঠন কমিটির এক সভায় পাকিস্তান সামরিক চক্রের এজেন্টদের দ্বারা বাংলাদেশের চিকিৎসক, অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

দৈনিক বাংলা, ২১.১২.১৯৭১

ঢাকা প্রেসক্লাবে শোকসভা
দখলদার বাহিনীর গণহত্যার সব তথ্য উদ্ধারের আহ্বান

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাবেক পিএফইউজের সভাপতি জনাব কে জি মুস্তাফা গতকাল সোমবার মিত্রবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল জে এস অরোরাকে দখলদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার সমস্ত তথ্য উদ্ধারের জন্য আহ্বান জানান।

বিপিআই পরিবেশিত এই সংবাদে বলা হয় যে, এই সমস্ত গণহত্যার তথ্য যদি হত্যাকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা না হয়, তবে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গতকাল সোমবার ঢাকা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক শোকসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ৩৫ লাখেরও বেশি নির্দোষ মানুষকে হত্যা করেছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চরম ও লজ্জাকর পরাজয়ের প্রাক্কালে তাদের সমস্ত অপকর্মের সঙ্গী ফ্যাসিবাদী জামাতে ইসলামীর অঙ্গদল আল-বদর বাহিনীর বর্বরোচিত হামলায় যেসব সাংবাদিক শহীদ হয়েছেন, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনার জন্য বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে এই শোকসভার আয়োজন করা হয়। জনাব কে জি মুস্তাফা এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আলী আশরাফ ও জনাব আবদুর রহিম আজাদও এই সভায় বক্তৃতা করেন।

শোকসভার আগে সাংবাদিক ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা প্রেসক্লাবে আয়োজিত গায়েবানা জানাজায় অংশগ্রহণ করেন।

বিপিআই পরিবেশিত রিপোর্টে আরো বলা হয় : জনাব কে জি মুস্তাফা তার বক্তৃতায় বলেন, বাংলাদেশে নিহতদের যে সংখ্যা দেয়া হয়েছে, প্রকৃত নিহতের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। তিনি বলেন যে, পল্লী এলাকায় কোনো গ্রাম বা শহরাঞ্চলে কোনো শহর এই বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তান সেনাদের হত্যাযজ্ঞ থেকে বাদ পড়ে নি।

পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশে যেসব লোক সাংবাদিক, চিকিৎসক, লেখক, শিক্ষক প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়ার জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানান।

দৈনিক বাংলা, ২১.১২.১৯৭১

শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত : নূর খান

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার মার্শাল নূর খান বলেছেন, এতদিন পূর্ব পাকিস্তান নামে যে এলাকা পরিচিত ছিল গত কয়েক মাসে সেখানে কী ঘটেছে তার একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত।

বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের মর্যাদাহানি করার জন্য যেসব ব্যক্তি দায়ী তাদের বিচারের তিনি দাবি জানান বলে আকাশবাণীর এক খবরে প্রকাশ।

বাংলা একাডেমীতে শোকসভা
স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগণিত বীর শহীদদের স্মরণে গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর শোকসভায় অবিলম্বে শহীদ স্মৃতিসৌধ পুনর্নির্মাণের দাবি জানানো হয়।

বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেও সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বেগম সুফিয়া কামালের সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই শোকসভায় বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব কবীর চৌধুরী শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং একাডেমির সংস্কৃতি অধ্যক্ষ সদ্য কারামুক্ত সরদার ফজলুল করিম ও জনাব বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে যেসব সরকারি কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী ও অন্যরা বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন বা বিরোধীদের সহযোগিতা করেছেন তাদের বিচার ও অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী দণ্ড দান, বাংলাদেশের জনসাধারণকে হত্যার পরিকল্পনার পেছনে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার যেসব জেনারেল ও তাদের অনুচররা রয়েছে তাদেরকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারের জন্য জাতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি জানানো হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করার প্রয়াস চালাবার জন্য জাতিসংঘ, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও ভারতের বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের জন্য ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড ও ব্রিটেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

শোক প্রস্তাব পেশকালে জনাব কবীর চৌধুরী স্বাধীনতা যুদ্ধের চরম বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিভিন্ন বৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিভাবান মনীষা বুদ্ধিজীবী ও কর্মীদের যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তার কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলা সংস্কৃতির সাথে যা কিছুরই সম্পর্ক রয়েছে তাই তাদের আক্রোশের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। সেই জন্য তারা বাংলা একাডেমী ভবনের ওপরও কামানের গোলাবর্ষণ করে এই ভবনের সংস্কৃতি বিভাগ, গ্রন্থাগার ও পরিচালকের কার্যালয় কক্ষের বিরাট ক্ষতিসাধন করেছিল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসকার্যের নমুনা হিসেবে তিনি কামানের গোলার একটি অংশ ও বিনষ্ট বইপত্র দর্শকদের দেখান। তিনি বলেন, কিন্তু তবু আমরা জানতাম বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের এই সংস্কৃতিকে কখনও ধ্বংস করা যাবে না। আমাদের সেই ধারণা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, লজ্জা ও কলংকের কথা যে, এদের মধ্যে আমাদের দেশের লোকও রয়েছে এবং এদের অনেকেই আবার মুখোশ পরে ভোল পাল্টাবার চেষ্টা করছে।

জনাব বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন, দালাল ও বিশ্বাসঘাতকরা এখনও আছে এবং ভোল পাল্টাবার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, দালাল ও অপরাধীদের তালিকা আমরা টাঙিয়ে দেব। সরকার যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে আমরা নিজেরাই তাদের টুটি টিপে ধরব। জনাব জাহাঙ্গীর অপরাধীদের কিছু নাম সভায় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ছাত্র, শিক্ষক ও মহিলাদেরও অনেকে দালালদের সাহায্য করেছে।

সভানেত্রীর ভাষণে বেগম সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বাংলার মর্যাদা রক্ষার আহ্বান জানান।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

এছাড়াও গতকাল বুধবার বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, সমাজ কল্যাণ কলেজ ও সেন্ট্রাল ল কলেজেও শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথ কলেজ শিক্ষক পরিষদ ও পূর্ত বিভাগীয় ইলেকট্রিক্যাল কর্মচারী সমিতিও শোকসভার আয়োজন করে।

দৈনিক বাংলা, ২৩.১২.১৯৭১

মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আজো বাস্তবায়িত হয় নি

ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে জনমতের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। মন্ত্রিসভা স্থির করেছেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারি ও রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা, মুক্তিসংগ্রামে শহীদদের স্মরণে ঢাকা নগরীতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হবে এবং তাদের পরিবারবর্গের কল্যাণে ওয়ার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হবে। মন্ত্রিসভা বিএনআর, পাকিস্তান কাউন্সিল ও প্রেস ট্রাস্ট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারের আরো সিদ্ধান্ত, চারুকলা ও সাহিত্য সংক্রান্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠন করা হবে।

দৈনিক বাংলা, ২৫.১২.১৯৭১

'৭১ সালের দাবি তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে

ফ্যাসিস্ট জামাতে ইসলামীর বিশেষ শাখা কুখ্যাত আল-বদর বাহিনীর নরপিশাচেরা ঢাকা শহরে যে ভয়াবহ হত্যালীলা চালিয়েছে তা সবাই জানেন। শুধু রাজধানী ঢাকা শহরেই নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মনুষ্য নামধারী এসব হিংস্র পশুরা চরম নৃশংসভাবে সাংবাদিক, চিকিৎসক, সাহিত্যিক ও অধ্যাপকদের হত্যা করেছে। ধর্মের নামে যে অধর্মের পরিচয় তারা দিয়েছে তার কোনো নজির নেই। যেসব বুদ্ধিজীবীদের আল-বদরের ঘৃণ্য জল্লাদেরা হত্যা করেছে তাদের একমাত্র অপরাধ যে, তারা ছিলেন মুক্তবুদ্ধির অধিকারী, মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল। যে সমাজে মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ঘটে, যে সমাজে প্রগতিশীল ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে যায় সে সমাজে তথাকথিত ধর্মব্যবসায়ীদের ব্যবসা ফাঁদা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এসব ধর্মান্ধ খুনিদের শিকারে পরিণত হয়েছেন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। হানাদার শত্রুরা এদেশে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য এখানকার প্রগতিশীল, মেধাবী ব্যক্তিদের নিশ্চিহ্ন করার এক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল, এ তথ্য সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। এবং এই কালা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে হানাদার শত্রুরা সাঙাত হিসেবে খুঁজে নিয়েছিল আল-বদরের দানবদের।

নিহত বুদ্ধিজীবীদের অনেকের লাশ এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি, এখনো বহু লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। বস্তুত, আল-বদরের নরঘাতকেরা বাংলাদেশের মোট ক'জন বুদ্ধিজীবীকে খুন করেছে তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নি এখনো। এ সম্পর্কে অবিলম্বে তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত জরুরি। এই সঙ্গে আল-বদরের নরপিশাচদের গ্রেফতার করার সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আল-বদরের কোনো কোনো চাঁই অবশ্য ইতোমধ্যে ধরা পড়েছে, তাদের কাছ থেকে বহু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। আল-বদরের নরঘাতকেরা এখন জনতার মধ্যে মিশে রয়েছে। তাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এখনো শেষ হয় নি। তাদের সবাইকে খুঁজে বের করতে না পারলে জনসাধারণের মধ্যে পুরোপুরি নিরাপত্তাবোধ ফিরে আসবে না। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা আতংকমুক্ত হতে পারবেন না। আল-বদর বাহিনীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটিকে সরকারের কাছে এক

সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তাদের তদন্তের ভিত্তিতেই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পশুদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেনেভা কনভেনশনের অছিলায় যাতে তারা নিষ্কৃতি না পায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যদি এসব দুর্বৃত্ত রেহাই পেয়ে যায়, তবে এদেশের নিহত নিরপরাধদের আত্মা কখনো আমাদের ক্ষমা করবে না।

দৈনিক বাংলা, ২৫.১২.১৯৭১

৫২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি
বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য দায়ীদের প্রকাশ্য বিচার দাবি
(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল শুক্রবার ঢাকার ৫২ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক ও শিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে সম্প্রতি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত বুদ্ধিজীবীদের জঘন্যভাবে হত্যা করার পূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বেগম সুফিয়া কামাল ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনসহ মোট ৫২ জন স্বাক্ষর করেছেন।

তারা আরো বলেন যে, যারা এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে তাদের জেনেভা কনভেনশনের আওতার মধ্যে না ধরে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাক্ষরকারীগণ ভিয়েতনামের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য পরলোকগত লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেল, জা পল সাঁত্রে ও আঁদ্রে মালরোর নেতৃত্বে যেমন আন্তর্জাতিক বিচারকদের সমন্বয়ে কমিশন গঠন করা হয়েছিল, বাংলাদেশে সংঘটিত বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তেমনি কমিশন গঠন করার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

দৈনিক বাংলা, ২৫.১২.১৯৭১

১৩ জন লেখক শিল্পী ও আইনজীবীর যুক্ত বিবৃতি
যোগসাজশকারীদের খুঁজে বের করুন

আত্মসমর্পণের ঠিক প্রাক্কালে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে তৎকালীন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সাথে যারা পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে যোগসাজশ করেছে সেই অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য একটি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে একদল লেখক, আইনজীবী ও শিল্পী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, তারা এক যুক্ত বিবৃতিতে এদেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও চিকিৎসকদের নির্মমভাবে হত্যার ব্যাপারে জামাতের আল-বদর বাহিনীকে সাহায্যদানকারী অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য একটি তথ্য অনুসন্ধান কমিটি গঠনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের সাথে

জড়িত সকল অপরাধী ও সামরিক অফিসারসহ যোগসাজশকারীদের খুঁজে বের করার জন্য লেখক ও শিল্পীরা সরকারকে তার সমস্ত রকমের প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের আহ্বান জানান। অপরাধীদের বিচারের জন্য তারা একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনেরও দাবি জানান। বিবৃতিতে তারা বলেন, কোনো জঘন্য অপরাধী সামরিক অফিসারই জেনেভা সম্মেলনের আওতায় পড়ে না।

তারা বলেন, দখলদার বাহিনী ও যোগসাজশকারীদের এই নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের নজির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা বলেন, বাংলাদেশের দখলদার বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের সাথে নাজিদের বর্বরতারই তুলনা করা চলে। বিবৃতিতে এসব বুদ্ধিজীবী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও তাদের এজেন্টদের আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে যারা স্বাক্ষর করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন : কবি শামসুর রাহমান, জনাব আবদুল আজিজ, ব্যারিস্টার মুস্তাফা কামাল, হাসান হাফিজুর রহমান, আহমদ রফিক, বেগম ফেরদৌসী রহমান, সরদার জয়েনউদ্দিন, আহমদ হুমায়ুন, নেয়ামুল বশীর, ফজল শাহাবউদ্দিন, আমিনুল ইসলাম বেদু, আনোয়ার হোসেন খান ও মুস্তাফা জামান আব্বাসী।

দৈনিক বাংলা, ২৮.১২.১৯৭১

বুদ্ধিজীবী নিধন মামলা

ডঃ আজাদকে হত্যার দায়ে দুজনের বিরুদ্ধে চার্জশীট

(স্টাফ রিপোর্টার)

আল বদর বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলায় ঢাকার উচ্চতর বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডঃ এম, এ, কে আজাদ পিএইচডি হত্যা মামলায় গোয়েন্দা বিভাগ দুইজনের বিরুদ্ধে অপহরণ, হত্যা ও দালাল আদেশের কতিপয় ধারা মোতাবেক চার্জশীট দাখিল করেছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ঢাকার ইভনিং পোস্ট পত্রিকার সম্পাদক হাবিবুল বাশার গত ২৪শে জানুয়ারি লালবাগ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, ১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৮টার সময় আল-বদর বাহিনীর ৫ জন লোক শাহ শাহেব বাড়ির শাহ ওয়ালিউল্লাহ-এর পুত্র জুবায়েরের সাথে ডঃ আজাদের আজিমপুরের দায়রা শরীফস্থিত বাড়িতে হানা দেয় এবং ডঃ আজাদকে অপহরণ করে।

বাদি তার অভিযোগে আরো বলেন যে, তিনি আজাদের বড় ভাই এবং অপহরণের খবর পেয়ে বাড়ি ছুটে আসেন। ঘটনার সময় সেই বাড়িতে তাদের ভাই আবুল খায়ের, জাকির হোসেন ও বোন সালমা ও সেলিনা উপস্থিত ছিল এবং তাদের মাও ছিলেন। সেলিনা বাদিকে বলেন যে, একজন বদর বাহিনীর লোককে তিনি চিনতে পেরেছেন এবং দেখলে শনাক্ত করতে পারবেন। বদর বাহিনীর লোকরা মুখোশ পরে এসেছিল। জুবায়ের বাদিকে জানায় যে, ডঃ আজাদকে আজিমপুরের রাজাকার ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান হাজী কাশেমের বাড়িতে খোঁজ করে ডঃ আজাদকে না

পাওয়ার পর লালবাগ থানায় যোগাযোগ করলেও ওসি সাহেব বলেন যে, ডঃ আজাদকে বদর বাহিনীর লোক ধরে নিয়ে গেছে, তাকে উদ্ধার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বাদি এজাহারে বলেন যে ১৭ই ডিসেম্বর রায়েরবাজার ডোবা থেকে মিত্র বাহিনীর সৈনিকদের সহায়তায় ডঃ আজাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তার শরীরে এবং বুকে, মাথায় গুলির দাগ এবং বেয়নেটের খোঁচা ছিল।

হাবিবুল বাশারের এজাহার দাখিলের পর লালবাগ থানায় মামলা রুজু হয়।

ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ মামলাটি তদন্ত করে আসামি মকবুল হোসেন ও আয়ুব আলীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে উল্লেখ করেন যে, ডঃ আজাদকে অপহরণ করার পর দুষ্কৃতকারীরা আজিমপুর মহল্লার কাজী মন্টু, কাজী মতিউর রহমান এবং ভুলু ওরফে বদরউদ্দীনকে অপহরণ করে এবং যে মাইক্রোবাসে ডঃ আজাদকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই একই বাসে সবাইকে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ের জানুয়ারি মাসের দুই তারিখে আসামি মকুবল ও আয়ুব আলী যখন একটি লঞ্চে মুন্সিগঞ্জে যাচ্ছিল তখন অপহৃত মতির ভাই মুস্তাফিজুর রহমান তাদের চিনে ফেলে এবং লঞ্চের যাত্রীদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করে। মুক্তিবাহিনীর কাছে লঞ্চের যাত্রীরা আসামিদ্বয়কে সোপর্দ করার পর তারা আসামিদের লালবাগ থানায় নিয়ে আসে। আসামি মকবুল হোসেন ১৫ই ডিসেম্বর অপরাধ সংঘটনের সময় যে কালো চশমা পরেছিল তাকে আটক করার সময়ও তার চোখে সেই চশমা লাগানো ছিল। পুলিশ চশমাটি আটক করে। তদন্তকালীন আসামিদের শনাক্তকরণ প্যারেডে হাজির করা হলে সাক্ষীরা তাদের শনাক্ত করেন।

গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর তার দায়েরকৃত চার্জশীটে উল্লেখ করেন যে, অপরাধ সংঘটিত হয় দেশের মুক্তির পূর্বের দিন। এটা স্থির যে, আসামিদের সেসময় খুবই শক্তি বা ক্ষমতা ছিল এবং তারা কার্যকরভাবে দখলদার পাকবাহিনীর সহায়তা করেছে এবং বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যা করেছে। ডঃ আজাদকে অপহরণ ও হত্যা তারাই করেছে এবং এভাবে দখলদার বাহিনীর অবৈধ দখল কায়েম রাখতে সাহায্য করেছে।

ঢাকার এক নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল এ মামলাটি বিচারের জন্য প্রেরিত হওয়ার পর স্পেশাল জজ সৈয়দ সিরাজউদ্দীন আহমদ আগামী ১৯ জুন আসামিদের বিচারের দিন ধার্য করেছেন।

দৈনিক বাংলা, ১৩.৬.১৯৭২

নবরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিনেই ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করেছে কয়েকটি বর্ণাঢ্য ফেস্টুন ও প্রতীক মূর্তি।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ এই ফেস্টুনগুলো বিশ্ববিদ্যালয় গাত্রে লাগান।

কলাভবনের ফটক দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়লো লম্বা এক কালো কাপড়ে লেখা শহীদ অধ্যাপকসহ কয়েকজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাম। তালিকার পাদদেশে একটি ফুলের স্তবক অর্পিত হয়েছে, অসীম শ্রদ্ধায় তার পাশেই একটি কালো কাগজের উপর লেখা—লাখো

শহীদের আত্মত্যাগের ঐতিহ্য ও তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের শপথ নিয়ে মুক্ত স্বদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ সূচনা হোক। এই আশা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের দেয়ালে দেয়ালে এমনি ফেস্টুন আর পোস্টার। কলা ভবনের প্রাঙ্গণে লনের উপর কয়েকটি বিশেষ বক্তব্যের প্রতীক সংবলিত প্রতিমূর্তি রাখা হয়েছে স্থাপত্যের মতো। এ রকম স্থাপত্য আর কখনো দেখা যায় নি ভার্সিটি অঙ্গনে। শিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়া পেয়ে এসব প্রতিকৃতিতে ফুটে উঠেছে তীব্র ক্ষোভ, কখনো প্রবল ঘৃণা আবার কোথাও নতুন জীবনের অঙ্গীকার।

এমনি কয়েকটি পোস্টারের ভাষা—১. লাখো শহীদের হারানোর বেদনায় আমাদের হৃদয় মথিত। ২. মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনলো যারা—তাদের সালাম। ৩. আর নয় ধ্বংস—মৃত্যু আর নয়। ৪. শহীদের ঐতিহ্য নিয়েই আমাদের যাত্রা। ৫. এসো বিধ্বস্ত সোনার বাংলা নবচেতনায় গড়ে তুলি। ৬. ধ্বংস আর মৃত্যুর মাঝে ধ্বনিত হোক জীবনের জয়গান। ৭. নবযুগ ঐ এলো ঐ রক্ত যুগান্তর।

চিত্রফলকের ভাষা : ১. প্রতিক্রিয়ার মৃত্যু। ২. উদ্ধত সঙ্গীনের দিন হোক অবসান। ৩. মুক্তিযোদ্ধা জানাই তোমাদের সালাম। ৪. পীড়ন আর আর্তনাদের প্রতিধ্বনি আর নয়। ৫. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়। ৬. ফুল ফুটুক, ফুল ফুটুক, শোকাহত হৃদয়ে ফুল ফুটুক। ৭. কোটি মানুষের শবের আলপনায় প্রাণের প্রবাহ জাগাও।

ডাকসুর পোস্টার : ১. মধুদা তোমাকে ভুলব না কোনোদিন। ২. ডঃ জেসি দেব গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশই হবে তোমার স্মৃতিমন্দির।

বিধ্বস্ত মধুর ক্যান্টিনের প্রবেশপথেই ছাত্র ইউনিয়নের একটা ব্যানার। 'মধুদা তোমাকে কোনোদিন ভুলবো না।' ভেতরে দু-তিনটে মরচেপড়া টেবিল সাজানো রয়েছে। এখনো মধুর ক্যান্টিন শুরু হয় নি। যেখানে মধু দা বসতেন সেখানে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের একটা পোস্টার। লেখা রয়েছে : যে বর্বর দানবশক্তি আঘাত হেনেছে আমাদের প্রিয় মধুদার উপর, তাদের ক্ষমা করি নি, ক্ষমা করবো না।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রীকে লাল ও কালো ব্যাজ পরিধান করতে দেখা গেছে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গান বাজানো হয়। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি একেবারে অল্প ছিল না। তবে যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধা এখনো কাটিয়ে না উঠাতে দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখনো এসে পৌঁছেনি। শিগগিরই আবাসিক হলগুলোসহ বিশ্ববিদ্যালয় আবার প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দৈনিক বাংলা, ৯.২.১৯৭২

অবিলম্বে তদন্ত কমিশন গঠন করুন : জহির রায়হান
(স্টাফ রিপোর্টার)

দৈনিক সংবাদ-এর যুগ্ম সম্পাদক জনাব শহীদুল্লাহ কায়সারের অনুজ বিশিষ্ট লেখক ও চিত্রপরিচালক জনাব জহির রায়হান কুখ্যাত আল-বদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত ব্যক্তিদের অনুসন্ধানের জন্য আর কালবিলম্ব না করে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের জোর দাবি

জানিয়েছেন। তিনি আল-বদর এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আল-বদর ছাড়াও তাদের সহযোগীদের তালিকা পাওয়া গেছে। সুসংগঠিত সরকারি উদ্যোগে এদের গ্রেফতার করা আশু কর্তব্য। এছাড়া এই বিরাট ষড়যন্ত্রের নায়ক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এ সম্পর্কিত পূর্ণ তথ্য সরকারের জানা দরকার।

তিনি নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্যে সরকারের মুক্তিবাহিনীর ও গেরিলাসহ সকল স্তরের জনসাধারণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানান। প্রতি মহল্লা, পাড়া, গ্রাম, গঞ্জে জনগণের ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় সশস্ত্র পলাতক অপরাধীদের খুঁজে বের করা অসম্ভব নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, যেসব দলিলপত্র পাওয়া গেছে তাতে এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত সরকারি কর্মচারীদেরও নাম পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে অনেকে ভোল পাল্টে আবার সাধারণের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এদেরও গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত।

তিনি মনে করেন যে, ব্যাপক তল্লাশি চালালে নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ব্যক্তির সন্ধান হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

এছাড়া শনাক্ত করা যায় নি এরূপ ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহগুলোকে মর্যাদার সাথে সমাহিত করাও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

মরহুম অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর ভাই জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক বাজেয়াপ্ত সাপ্তাহিক হলিডের কার্যনির্বাহী সম্পাদক জনাব এনায়েতুল্লাহ খান ও বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের জনাব গিয়াস কামালও এ আলোচনায় অংশ নেন।

এ সম্পর্কে আশু কর্মসূচি গ্রহণ ও সরকারের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের জন্য আজ বুধবার সকাল ১১টায় প্রেসক্লাবে একটি বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে।

দৈনিক বাংলা, ২৯.১২.১৯৭১

বুদ্ধিজীবী হত্যা ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদদের হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আটক এবং তাদের গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য একটি সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার ঢাকা প্রেসক্লাবে ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী।

গঠিত কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জনাব জহির রায়হান, জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এমএনএ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, জনাব এনায়েত উল্লাহ খান, জনাব হাসান ইমাম ও ডঃ সিরাজুল ইসলাম।

জনাব জহির রায়হান কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

সভায় বক্তৃতা করেন, জনাব জহির রায়হান, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ডঃ সিরাজুল ইসলাম, জনাব এনায়েত উল্লাহ খান, জনাব আলী আশরাফ, হাসান ইমাম, সরদার জয়েনুদ্দিন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব আতাউস সামাদ ও জনাব খোন্দকার আবদুল কাদের।

সভায় আলোচ্য কমিটিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিকেলে প্রেসক্লাবে কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এক সভায় কমিটির নাম 'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই কমিটি হত্যাযজ্ঞের সথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধার ত্বরান্বিত করার তাগিদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং দায়িত্বে মুক্তিবাহিনী, মিত্র বাহিনী এবং সরকারি ও বেসরকারি সদস্য সমবায়ে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সার্বক্ষণিক সংগঠন অনতিবিলম্বে চালু করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যে সমস্ত মৃতদেহ এখনও রায়েরবাজারের বধ্যভূমি ও অন্যান্য স্থানে পড়ে রয়েছে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে দাফন করার জন্য কমিটি আবেদন জানিয়েছে।

এছাড়া যে সমস্ত মৃতদেহ এলোপাতাড়িভাবে মাটিচাপা পড়ে আছে সেগুলোকে উপযুক্ত স্থানে দাফনের ব্যবস্থা করার জন্যে এবং প্রয়োজন বোধে এলাকাকে গোরস্তানে পরিণত করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে।

কমিটি জানিয়েছেন যে, প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রেসক্লাবে এই হত্যাকাণ্ডের খবরাখবর কমিটিকে দেয়ার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

এছাড়া নিখোঁজ ব্যক্তি ও নির্যাতন সম্পর্কে কমিটিকে তথ্য জানানোর জন্যে 'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি' প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, ঢাকা-২, এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে কমিটির কাছে বক্তব্য পেশ করতে চান তাহলে উপরোল্লিখিত সময়ের মধ্যে কমিটির সাথে দেখা করতে পারবেন।

পূর্বদেশ, ৩০.১২.১৯৭১

বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রতি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হত্যাকাণ্ড তদন্তের আশ্বাস

ঢাকা ৩০শে ডিসেম্বর (এপিবি)। 'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি'র একটি প্রতিনিধিদল আজ বিকেলে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করেছেন। প্রতিনিধিদলটি পাকবাহিনী এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদী আল-বদর কর্তৃক সংঘটিত বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপারে তদন্ত চালানোর জন্যে মুক্তিবাহিনী, মিত্রবাহিনী, সরকারি এবং বেসরকারি সদস্য নিয়ে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের জন্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন।

ফ্যাসিবাদী নরঘাতকদের দালাল এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটক এবং জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে অবিলম্বে এই কমিটির কাজ শুরু করার জন্যে এই প্রতিনিধিদলটি জোর দাবি জানান।

প্রতিনিধি দলটি প্রেসিডেন্টের কাছে এখনও রায়েরবাজার এবং অন্যান্য এলাকায় পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর সৎকারের ব্যবস্থা করার জন্যেও দাবি জানান।

তথ্যানুসন্ধান কমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট প্রতিনিধিদলটির দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে অবিলম্বে 'কার্যকরী ব্যবস্থা' গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করেন।

এখনও যেসব কুখ্যাত ব্যক্তি জনগণের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেজন্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট তার উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন এবং জাতির এই শত্রুদের নির্মূল করার জন্যে কমিটি যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে সেজন্যে তিনি তাদেরকে অভিনন্দন জানান।

যারা এই কুখ্যাত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন তাদের প্রতিও তিনি গভীর সমবেদনা জানান।

পূর্বদেশ, ৩১.১২.১৯৭১

বুদ্ধিজীবী নিধন সম্পর্কে তথ্যাদি পেশ করুন

ফ্যাসিস্ট আল-বদর ও অনুরূপ অন্যান্য বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের হত্যা সম্পর্কিত কোনো তথ্য, কাগজপত্র, দলিলপত্র ও এতদসংক্রান্ত খবরাখবর 'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি'র কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে।

এপিবি'র খবরে প্রকাশ, বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার করা যেতে পারে এমন কোন সূত্র কারো জানা থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে তা উক্ত কমিটিকে জানাতে বলা হয়েছে।

প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ১টা পর্যন্ত ঢাকা প্রেসক্লাবে উক্ত কমিটির কাছে এসব তথ্যাদি পেশ করা যাবে।

দৈনিক বাংলা, ৩১.১২.১৯৭১

সৈয়দ নজরুল সকাশে তথ্যানুসন্ধান কমিটি
বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠনের সুপারিশ

বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির এক প্রতিনিধিদল গতকাল বৃহস্পতিবার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করেন। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা বাংলাদেশে যে পাইকারি গণহত্যা সম্পন্ন করেছে, সে সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য তারা একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। ধর্মান্ধ ফ্যাসিস্ট আল-বদর বাহিনী এবং কোনো কোনো বিদেশী সংস্থা ও পাকিস্তানি বাহিনীস্থ আল-বদরের উপদেষ্টারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ চালিয়েছে, সে সম্পর্কেও উক্ত কমিটি তথ্যানুসন্ধান করবে।

মুক্তিবাহিনী, মিত্র বাহিনী, সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি নাগরিকদের নিয়ে উক্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের জন্যেও তারা সুপারিশ করেন। কুখ্যাত হত্যাকারীদের সাথে

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবিলম্বে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার এবং রায়ের বাজার ও অন্যান্য স্থানে এখনো যেসব লাশ পড়ে রয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে সেগুলোকে সমাহিত করার ব্যবস্থা করার জন্যেও তারা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানান।

তথ্যানুসন্ধান কমিটির এক বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এপিবি জানান যে, তাদের এসব দাবি সম্পর্কে অবিলম্বে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কমিটিকে আশ্বাস দেন। পূর্ববর্তী খবরে প্রকাশ, গত বুধবার ঢাকা প্রেসক্লাবে বুদ্ধিজীবীদের এক বৈঠকে বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদদের সংঘবদ্ধ হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের আটক ও এর পশ্চাতে যে গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে তা উদ্‌ঘাটন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় কমিটিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের অনুরোধ করা হয়। এই কমিটির নাম দেওয়া হয়েছে বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি।

এই কমিটি বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধার ত্বরান্বিত করার তাগিদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং দায়িত্বে মুক্তিবাহিনী এবং সরকারি ও বেসরকারি সদস্য সমবায়ে গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি সার্বক্ষণিক সংগঠন অনতিবিলম্বে চালু করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটি আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যে সমস্ত মৃতদেহ এখনো রায়ের বাজারের বধ্যভূমি ও অন্যান্য স্থানে পড়ে রয়েছে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে দাফন করার জন্য কমিটি আবেদন জানিয়েছে।

এছাড়া যে সমস্ত মৃতদেহ এলোপাতাড়িভাবে চাপা পড়ে আছে সেগুলোকে উপযুক্ত দাফনের ব্যবস্থা করার জন্য এবং প্রয়োজনবোধে এলাকাটিকে গোরস্তানে পরিণত করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছেন।

কমিটি প্রতিদিন সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত প্রেসক্লাবে এই হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছে দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। নিখোঁজ নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্যও কমিটিকে জানাবার অনুরোধ করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবেও কমিটির কাছে উপরোক্ত সময়ে বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে।

দৈনিক বাংলা, ৩১.১২.১৯৭১

বুদ্ধিজীবীদের হত্যা তদন্তের ব্যাপারে গঠনমূলক কাজ হয়নি : নাফিসা কবীর

স্টাফ রিপোর্টার

বেগম নাফিসা কবীর সরাসরি অভিযোগ করেছেন, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার তদন্তের ব্যাপারে কোনো গঠনমূলক কাজ করা হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, অব্যাহত এই বুদ্ধিজীবী অপহরণে শুধু দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীই নয়, বিদেশী শক্তিরও হাত রয়েছে।

তিনি বলেন, জহির রায়হান এমন সব তথ্য উদ্ধার করেছিলেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বেগম নাফিসা কবীর গতকাল বিকেলে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে একাডেমীর স্মরণ সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, দু'মাস পেরুতে চলেছে, এখনো এই হত্যারহস্যের কিনারা হলো না। বেগম কবীর বলেন, আল-বদর, আল-শামস জাতীয় বাহিনীতে শুধু অবাঙালি ছিল না, বাঙালিও ছিল। যারা এখনো বহাল তবিয়তে আছে।

বেগম নাফিসা কবীর দাবি করেন, সরকারের এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া উচিত যাতে জনগণ নিঃশঙ্ক হতে পারেন এবং বাকি বুদ্ধিজীবীরাও নিরাপদ বোধ করতে পারেন। তিনি গভীর অনুতাপের সাথে বলেন, যদি তা না হয় তাহলে আমরা নিজেরাই আমাদের ধ্বংসের কারণ হবো।

উল্লেখযোগ্য যে, বেগম নাফিসা কবীর শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সারও এখনো রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ জহির রায়হানের বোন। তিনি সপ্তাহখানেক আগে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরেছেন।

বাংলা একাডেমী আয়োজিত এই আলোচনা সভায় ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম সভানেতৃত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে শহীদ অধ্যাপক ও অন্যদের সম্পর্কে ভাষণদানকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, অধ্যাপকদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছেন তারা শুধু শিক্ষক হিসেবে কৃতী ছিলেন না, ছাত্রজীবনেও তারা ছিলেন উজ্জ্বল। তিনি বলেন, তারা সবাই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট ছিলেন।

শহীদ সাংবাদিকদের কীর্তি নিয়ে আলোচনাকালে বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব কে জি মুস্তফা বলেন, শহীদ সাংবাদিকদের শূন্য স্থান পূরণ করা কষ্টকর হবে। জনাব মুস্তফা শহীদ সাংবাদিকদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

সভায় ডাঃ এম এ কাদরী ও অধ্যাপক আবদুল হালিমও বক্তৃতা দেন।

দৈনিক বাংলা, ১৮.০২.১৯৭২

বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার চাই
শহরে বিক্ষোভ সভা ও মিছিল
স্টাফ রিপোর্টার

বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব কবীর চৌধুরী গতকাল রোববার বলেন যে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যার জন্যে দায়ী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিচার করা না হলে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের বিচারের দাবিতে গতকাল বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত বিরাট বিক্ষোভ সভায় জনাব কবীর চৌধুরী একথা বলেন। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষুব্ধ পরিবারবর্গের উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে।

এর আগে বিক্ষুব্ধ পরিবারবর্গের সদস্য-সদস্যাগণ রাজপথে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।

অশ্রুসজল ও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বাংলাদেশের মানস সম্পদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যার আশু বিচার ও হত্যাকারীদের শাস্তিদানের দাবি জানিয়ে বক্তৃতা দেন বেগম লিলি চৌধুরী, বেগম শহীদুল্লাহ্ কায়সার, বেগম সুচন্দা রায়হান, বেগম আলতাফ মাহমুদ, বেগম সাইদুল হাসান, বেগম আলীম চৌধুরী, চিত্রনায়িকা কবিতা, বেগম শামসুদ্দিন প্রমুখ এবং নিহত বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষুব্ধ পত্নী ও প্রিয়জন।

তাদের এ দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তৃতা দেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল, কবি জসীমউদ্‌দীন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কমরেড অনিল মুখোপাধ্যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জনাব আসম আবদুর রব, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব হায়দার আনোয়ার খান জুনো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহসানুল হক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির পক্ষে ডক্টর আলী হায়দার, বাংলাদেশ স্থপতি সমিতির জনাব মাজহারুল ইসলাম, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসান ইমাম, বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতির সভাপতি ডাঃ আবদুল মান্নান, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষে কাজী মমতা হেনা, 'পূর্বদেশ' সম্পাদক জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, প্রাক্তন ছাত্রনেতা জনাব রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আকসাদ, ছায়ানটের অধ্যাপিকা সনজীদা খাতুন, সাহিত্যিক জনাব বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সাংবাদিক জনাব শওকত আনোয়ার, সাংস্কৃতিক মুক্তি শিবিরের পক্ষে জনাব আলী নকী ও এ সভার আহ্বায়িকা শহীদ শহীদুল্লাহ্ কায়সার-জহির রায়হানের বোন বেগম নাফিসা কবীর।

সভাপতির ভাষণে জনাব কবীর চৌধুরী বলেছেন যে, স্বাধীনতা-উত্তর তিন মাস পরেও নিহত বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্যগণ কেন আজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন, বাংলাদেশের সরকারকে অবশ্যই তার কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও দেশের বাইরে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে। কমরেড অনিল মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য দায়ী জামাতে ইসলামীর কুখ্যাত আল-বদর বাহিনী মূলত এখানে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের স্বার্থেই কাজ করেছে। সংগ্রামী ছাত্রনেতা জনাব আসম আবদুর রব বলেন যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার চাইতে আজ সরকারের কাছে দাবি জানাতে হবে কেন? বাংলাদেশ সরকার জনগণেরই সরকার। এটা সরকারেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি বলেন, নিহত বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। তাই তাদের পরিবারবর্গের পাশে আমরাও রয়েছি।

ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম বলেন যে, বুদ্ধিজীবী ও গণহত্যার জন্যে দায়ী বদর বাহিনীর লোকেরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে আত্মগোপন করে রয়েছে। এদের খুঁজে বের করে বিচার করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে অনেক আগেই আরো সক্রিয় হয়ে উঠা উচিত ছিল।

সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন যে, বুদ্ধিজীবী হত্যার পেছনে দখলদার পাক বাহিনী ও কুখ্যাত বদর বাহিনী ছাড়াও অনেকে জড়িত রয়েছে বলে তথ্যাদি পাওয়া গেছে।

দৈনিক বাংলা, ২৮.২.১৯৭২

শিগগিরই প্রকাশ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

কুয়ালালামপুর, ৬ই জুন (পিটিআই) : 'মানবতা বিরোধী অপরাধের' দায়ে অভিযুক্ত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিচার আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ও প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজ একথা বলেন।

চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরশেষে জনাব সামাদ আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, যুদ্ধবন্দিদের বিচার শিগগিরই শুরু হবে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দাঁড় করানো হচ্ছে। রয়টার জানিয়েছে, পরে কুয়ালালামপুর থেকে সিঙ্গাপুরে পৌঁছে জনাব সামাদ সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের লুকোবার কিছুই নেই। যাদেরকে বিচার করার জন্য আনা হবে তাদের ছাড়া অন্য কাউকেই আমরা জড়িত করব না।

যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে এমন সব যুদ্ধাপরাধী রয়েছে যাদের অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, এসব যুদ্ধবন্দিকে মুক্তি দেয়ার জন্য জনাব ভুট্টোর ভারতের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আমরা এসব যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দিতে রাজি হব না।

দৈনিক বাংলা, ৭.৬.১৯৭২

বাংলাদেশে দখলদার বর্বর পাক বাহিনীর সাথে যোগসাজশের জন্য আরও অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিম্নে তাদের কয়েকজনের নাম দেয়া হলো :

১. অধ্যাপক আবদুল সাত্তার, নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাতে ইসলামী, শেরপুর, ময়মনসিংহ।
২. মাওলানা রুহুল আমীন আতিকী, বেআইনী ঘোষিত নেজামে ইসলাম ও খলিফারহাট, নোয়াখালী থেকে নির্বাচনে পরাজিত এম এন এ।
৩. তসলিম উদ্দিন আহমদ, সাবেক এসডিও, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।
৪. আবদুল ওহাব, উকিল, বেআইনী ঘোষিত নোয়াখালী জেলা পিডিপির সেক্রেটারী।
৫. মাসুদ মুক্তার, ভাইস প্রেসিডেন্ট, নোয়াখালী জেলা সিএমএল (নিষিদ্ধ ঘোষিত)
৬. খুরশেদ আলম তালুকদার, বেআইনী ঘোষিত পিএমএল, বগুড়া।
৭. আবদুল মজিদ এডভোকেট, বাকেরগঞ্জ।
৮. জামাল আহমদ, এনএসএফ, নোয়াখালী।
৯. মাসুদুল হক, নিষিদ্ধ ঘোষিত পিএমএল, নোয়াখালী।
১০. আবদুস সালাম (রাজাকার কমান্ডার), বাবুগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ।
১১. আবদুল কবীর (রাজাকার), বরগুনা, পটুয়াখালী।
১২. মোঃ মেহের আলী মোড়ল (রাজাকার), মনিরামপুর, যশোর।
১৩. সোমর আলী সরদার (রাজাকার), সাতক্ষীরা, খুলনা।
১৪. আবদুর রাজ্জাক (রাজাকার), চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া।
১৫. আতিক (রাজাকার), মীরপুর, ঢাকা।
১৬. মোঃ লিয়াকত আলী (রাজাকার), নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী।
১৭. খুরশেদ আলী (রাজাকার), নওয়াবগঞ্জ, রাজশাহী।

১৮. আবদুল লতিফ (রাজাকার), মোহনগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
১৯. নাজমুল হক (আল-বদর), নকলা, ময়মনসিংহ।
২০. খলিলুল্লাহ (আল-বদর), নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা।
২১. সিপাই আবদুল হামিদ গাজী, মনিরামপুর, যশোর।
২২. পুলিশ কনস্টেবল আশরাফ হোসেন, ঢাকা।
২৩. আবুল কালাম আজাদ, নগরকান্দা, ফরিদপুর।
২৪. কমরউদ্দিন, সুত্রাপুর, ঢাকা।
২৫. মনির আহমদ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম।
২৬. কাজী গোলাম সরোয়ার, তেজগাঁও, ঢাকা।
২৭. আবদুল খালেক, বাঞ্ছারামপুর, কুমিল্লা।

দৈনিক বাংলা, ৭.১.১৯৭২

আরও ১২৮ জন দালাল গ্রেফতার

ইয়াহিয়ার জল্লাদ চক্রের আরো বহু দালালদের গ্রেফতার করা হয়েছে। নিচে কয়েকজনের নাম দেয়া হলো :

অধ্যাপক সিদ্দিক আহমদ, নড়াইল কলেজ যশোর; চট্টগ্রাম রেলওয়ের সাবেক সিনিয়র পারসোনাল অফিসার, এসএম সোলায়মান, বগুড়ার খোরশেদ আলম তালুকদার (নিষিদ্ধ পাকিস্তান মুসলীম লীগ), বগুড়া শহরের মোহাম্মদ এজাহারুল হক (নিষিদ্ধ জামাতে ইসলামী), সাতকানিয়ার ফারুক আহমদ চৌধুরী (নিষিদ্ধ মুসলীম লীগ), বগুড়ার তবিবুর রহমান, চট্টগ্রাম ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান নাজির আহমদ (নিষিদ্ধ পাকিস্তান মুসলীম লীগ), চট্টগ্রামের সুরু মিয়া (নিষিদ্ধ পাকিস্তান মুসলীম লীগ), বগুড়ার হাবিবুর রহমান (নিষিদ্ধ জামাতে ইসলামী), চট্টগ্রামের আবদুল জলিল চৌধুরী (নিষিদ্ধ পাকিস্তান মুসলীম লীগ), চট্টগ্রামের আখতার আহমদ (নিষিদ্ধ পাকিস্তান মুসলীম লীগ), চট্টগ্রামের মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক (মুজাহিদ), চট্টগ্রামের হাটহাজারীর মোহাম্মদ মিয়া (রাজাকার), চট্টগ্রামের মোহাম্মদ নূরুল মোস্তফা (মুজাহিদ) চট্টগ্রামের নাজির হোসেন (রাজাকার), চট্টগ্রামের মহেশখালীর নুরুল হক (রাজাকার), চট্টগ্রামের চকোরিয়ার শামসুল হুদা (রাজাকার), চট্টগ্রামের টেকনাফের বাচা মিয়া, চট্টগ্রামের সাব্বির আহমদ (নিষিদ্ধ পাকিস্তান মুসলীম লীগ), কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, কুষ্টিয়ার দর্শনার আবদুল সাত্তার, কুষ্টিয়ার দামুরহুদার ওসমান আলী, কুষ্টিয়ার দামুরহুদার শাহ আলম, বগুড়ার পাঁচবিবির জয়দার আলী মণ্ডল, কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গার মোহাম্মদ হানিফ, কুষ্টিয়ার কুমারখালীর আয়াজউদ্দিন, কুষ্টিয়া শহরের মোহাম্মদ ইসমাইল, বগুড়ার আব্বাস আলী মণ্ডল, (রাজাকার), বগুড়ার সিদ্দিক তালুকদার (রাজাকার) বগুড়ার বুদ্ধা শেখ, চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর আবদুল জলিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনার মোহাম্মদ শফি, চট্টগ্রামের ডবল মুরিংয়ের এসএম মহিবুল হক, চট্টগ্রামের রেলওয়ে কলোনীর মোহাম্মদ জাকারিয়া, চট্টগ্রামের পাঁচলাইশের সাজিদুল হক, পটুয়াখালীর আবদুল কাদির, চট্টগ্রামের পটিয়ার আবদুস সাত্তার, চট্টগ্রামের ইমাম হোসেন, চট্টগ্রামের আনোয়ারার আহমদ সফা, চট্টগ্রামের

ডবলমুরিংয়ের মোহাম্মদ রমজান, ঢাকার আবুল বাসার খান, ঢাকার তেজগাঁর জাহাঙ্গীর কবীর, ঢাকার কমলাপুরের শেখ শামসুদ্দিন, ফরিদপুরের মোকসেদপুরের মিয়া আবদুল সালাম, বাখরগঞ্জের রফিকউদ্দিন তালুকদার (নিষিদ্ধ জামাতে ইসলামী), ঢাকার মিরপুরের মমতাজ আলী (আল-বদর), ঢাকার সুত্রাপুরের চুন্নু মিয়া (রাজাকার), ডা: আবদুল রহমান ফরিদপুরের রাজাবাড়ীতে (নিষিদ্ধ জামাতে ইসলামীর সভাপতি), মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান ওরফে কাঞ্চন মিয়া (নিষিদ্ধ মুসলীম লীগ), এম সৈয়দ আবদুল মজিদ সাবেক জেলা কৃষি অফিসার পটুয়াখালী, রাজবাড়ীর ওবায়দুল্লা মজুমদার (নিষিদ্ধ মুসলীম লীগ), ফরিদপুরের কোতোয়ালী থানা শান্তি কমিটির সাবেক চেয়ারমান খোন্দকার নূরুল হোসেন, পটুয়াখালীর গলাচিপার রাজাকার কমান্ডার মোহাম্মদ শাহজাদা, বাখরগঞ্জের আবদুল খালেক মুক্তার, ফরিদপুর শহরের গোলাম গফুর, মোক্তার, পটুয়াখালীর বেতাগীর শান্তি কমিটির সেক্রেটারী আবদুল আজিজ হাওলাদার, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের মোহাম্মদ আলী, ঢাকার সাভারের ফুলচাঁদ। নোয়াখালীর সেনবাগের আবদুল করিম, ঢাকার সুত্রাপুরের আবদুল রশিদ, ঢাকার সাভারের ইসমাইল হোসেন, কুমিল্লার কচুয়ার আবদুল মজিদ, ফরিদপুরের চাঁদমিয়া, কুমিল্লার জামাল আহমদ, ঢাকার তেজগাঁওর তমিজউদ্দিন, ঢাকার মানিকগঞ্জের কায়েদ আলী, ঢাকার মীরপুরের শরীফ হোসেন, ফরিদপুরের জান হাবিব, ফরিদপুরের মানিকদার হান্নান চৌধুরী, ফরিদপুরের সাইফুল্লাহ মিয়া, ফরিদপুরের আবুল খায়ের, ফরিদপুরের ইউসুফ আলী বেপারী, ফরিদপুরের রাজবাড়ীর নাশিম আহমদ, ঢাকা শহরের আলী আহমদ, ঢাকার লালবাগের আবদুল মালেক, ঢাকার সুত্রাপুরের নবাব মিয়া, পটুয়াখালীর মোসলেম শিকদার, বাখরগঞ্জের কাঠালিয়ার আবদুল কাদের মীর।

অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী রাজেন্দ্র কলেজ ফরিদপুর, মুজিবুর রহমান মোল্লা, সাবেক এমপিএ, শান্তি কমিটির সদস্য, বাকেরগঞ্জ, আবদুল জলিল খান, সাবেক এমপিএ, মুলাদী, বাকেরগঞ্জ, মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ, পিরোজপুর সরকারী বিদ্যালয়ের সাবেক হেডমাস্টার, বাকেরগঞ্জ, ডা: সায়েদ আলী, এমবিবিএস, ফরিদপুর; শাহ আলম চৌধুরী, (বেআইনী ঘোষিত সিএমএল) ভোলা; আবদুল মজিদ মুন্সী, এডভোকেট, নলছিটি, বাকেরগঞ্জ, হাসমত আলী খান, মুক্তার (বেআইনী ঘোষিত পিএমএল) মাদারীপুর, ফরিদপুর; আবদুল করিম মোল্লা, (বেআইনী ঘোষিত সিএমএল), ফরিদপুর; খোন্দকার আবদুল হামিদ (বেআইনী ঘোষিত পিডিপি), ফরিদপুর শহর; খন্দকার মহিউদ্দিন, এডভোকেট (বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলামী), ফরিদপুর; মওলানা আবদুস সাত্তার (বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলামী), মাদারীপুর, ফরিদপুর; মিনহাজউদ্দিন আহমদ খান, এডভোকেট, কোতওয়ালী, বাকেরগঞ্জ; আবদুর রাজ্জাক, হাবিব ব্যাংক, ফরিদপুর; আবদুল জব্বার হাওলাদার (বেআইনী ঘোষিত পিএমএল) মাদারীপুর, ফরিদপুর; মোহাম্মদ হায়দর হোসেন, ক্লার্ক, এসডিও অফিস, মাদারীপুর; মোহাম্মদ ওয়ারেস মাস্টার (বেআইনী ঘোষিত সিএমএল), ভোলা; জিএ তরিকুল আলম, ভোলা, আবদুল্লাহ (বেআইনী ঘোষিত সিএমএল), ভোলা; মোস্তফা আবু ইসহাক, এডিবি, পিরোজপুর, বাকেরগঞ্জ; মওলানা মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, তজমুদ্দিন, ভোলা; আবদুল বারী খান, নাজিরপুর শান্তি কমিটির সদস্য, বাকেরগঞ্জ, খন্দকার আবদুল বারী; পুলিশের এসআই, বাকেরগঞ্জ জেলা। আবদুল

জলিল, পুলিশের এএসআই বাকেরগঞ্জ; হেড কন্সটেবল সোহরাব হোসেন, বাকেরগঞ্জ; মোহাম্মদ ইসমাইল (আল-মুজাহিদ), পটুয়াখালী; মোহাম্মদ মহিউদ্দিন (আল-শামস), গলাচিপা, পটুয়াখালী। আজিজুর রহমান, কোতওয়ালী, বাকেরগঞ্জ; বসিরউল্লাহ (আল-শামস), লালমোহন, বাকেরগঞ্জ; মোহাম্মদ জালালউদ্দিন (আল-বদর), পটুয়াখালী, ওবায়দুর রহমান (আল-বদর), লালমোহন, বাকেরগঞ্জ; আবদুল জলিল সিকদার, (আল-বদর), পিরোজপুর, বাকেরগঞ্জ; হাবিবুর রহমান (আল-বদর), মুলাদী, বাকেরগঞ্জ; এ.কে. এম. আবদুল্লাহ (রাজাকার), ভোলা শহর; আবদুল বারেক (রাজাকার), ভোলা শহর; মোহসিন বিল্লা, দৌলতপুর, বাকেরগঞ্জ; হারুনুর রশীদ (রাজাকার), পিরোজপুর, বাকেরগঞ্জ; জাবেদ আলী বেপারী (রাজাকার), মেহেন্দীগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ; জামিল আহমদ (রাজাকার), বাকেরগঞ্জ; আবদুল মালেক (রাজাকার), ঝালকাঠি; রুস্তম আলী গাজী (রাজাকার), বাকেরগঞ্জ; আবদুল রশীদ জমাদার (রাজাকার কমান্ডার), মাদারীপুর, ফরিদপুর টাউন, এস আই অব পুলিশ, এমএ মুহিত চৌধুরী, ফরিদপুর; লুৎফর রহমান খান, এস আই অব পুলিশ, ফরিদপুর; ফজলুল হক হাওলাদার (বেআইনী ঘোষিত পিডিপি), মাদারীপুর, ফরিদপুর; এসআই অব পুলিশ ফজলুল হক, বাকেরগঞ্জ।

দৈনিক বাংলা, ১৩.১.১৯৭২

আরও ৩৭ জন দালাল গ্রেফতার

বাংলাদেশের বর্বর পাক দখলদার বাহিনীর সাথে যোগসাজশের জন্য আরও বহুসংখ্যক লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিচে তাদের নাম দেওয়া হলো :

সৈয়দ ইকবাল আহমদ, ঢাকা রেডিওর সাবেক সহকারী আঞ্চলিক ডিরেক্টর; এ আর এম ফজলুর রহমান, বড় মগবাজার, ঢাকা, সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারী, সিভিল এফেয়ার্স; আবদুর রাজ্জাক (বেআইনী ঘোষিত সিএমএল), কুমিল্লার মতলব থেকে তথাকথিত উপনির্বাচনে নির্বাচিত এমপিএ; সোলেমান (সাবেক এমপিএ), ভেদরগঞ্জ, ফরিদপুর; গোলাম রব্বানী খান, রাজশাহী বেতারের সাবেক সহকারী আঞ্চলিক ডিরেক্টর; আবু শাহাদত, ঢাকা বেতারের সাবেক সহকারী আঞ্চলিক ডিরেক্টর; ফজল করিম, ভাইস চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম পৌরসভা; মওলানা হাবিবুর রহমান (বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলামী), চেয়ারম্যান, শান্তি কমিটি, জীবননগর, কুষ্টিয়া; ডা: কাজী শামসুজ্জোহা, কুষ্টিয়া; এম আর সারোয়ার, সাবেক মেজর, পাক-সেনাবাহিনী, চট্টগ্রাম; সৈয়দ মনজুরুল আহসান, নাজিমউদ্দিন রোড, ঢাকা; তোফাজ্জল হোসেন, চেয়ারম্যান, টাউন কমিটি, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম; সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (রাজাকার), কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ; আজিজুর রহমান, এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, পাক কেপি ওয়ার্কস লিমিটেড, চট্টগ্রাম; পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর, মুজাফফর ইসলাম, সাবেক ওসি, জয়দেবপুর, ঢাকা; শরাফত আলী (বেআইনী ঘোষিত পিএমএল), চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন কাউন্সিল শ্রীপুর, ঢাকা; মসিউল আজম (বেআইনী ঘোষিত পিএমএল, চট্টগ্রাম; মাহবুব আশরাফ, সেকেন্ড অফিসার, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, চট্টগ্রাম; আবদুল হাকিম (রাজাকার), কোতওয়ালী, ঢাকা; আবুল খায়ের (আল-বদর), হাজিগঞ্জ, কুমিল্লা; শেখ মুসলিম আহমদ, এএসআই পুলিশ, খুলনা;

এ. কে. এম জাহাঙ্গীর (বেআইনী ঘোষিত পিএমএল), এডভোকেট হাফিজ মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ, বুরহানউদ্দিন, বাকেরগঞ্জ; মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, সরিষাবাড়ী, ময়মনসিংহ; মোহাম্মদ শাহজাহান, মনোহরদী, ঢাকা; তোফায়েল আহমদ, রায়পুরা, ঢাকা; এসএম রিজভী, সাবেক ওসি, কোতওয়ালী, ময়মনসিংহ; নওয়াব আলী, জয়দেবপুর, ঢাকা; মফিজউদ্দিন, জয়দেবপুর, ঢাকা; আবদুল হাকিম (রাজাকার), মোহাম্মদপুর, ঢাকা; সিরাজুল ইসলাম (আল-বদর), মনোহরদী, ঢাকা; শেখ জাফর ফারুক, জেটি সুপারভাইজার, চট্টগ্রাম; শামসুল হক, যশোর শান্তি কমিটির সদস্য; সদরউদ্দিন মোল্লা, যশোর শান্তি কমিটির সেক্রেটারী; আবদুল জলিল, যশোর শান্তি কমিটির সদস্য; বিল্লাল বিশ্বাস (রাজাকার কমান্ডার), যশোর; ও আজমল হোসেন, তেজগাঁও, ঢাকা।

দৈনিক বাংলা, ১৪.১.১৯৭২

আরও ৩৮ জন দালাল গ্রেফতার—বাংলাদেশে দখলদার বর্বর পাকবাহিনীর সাথে যোগসাজশের জন্য আরও বহুসংখ্যক দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিচে তাদের নাম দেওয়া হলো :

হাফিজুল ইসলাম, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক, ঢাকা; মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পাবনা থেকে বেআইনী ঘোষিত পিডিএম'র টিকেটে তথাকথিত উপনির্বাচনে নির্বাচিত এমপিএ; নূর হোসেন, অবসর প্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর, ময়মনসিংহ শান্তি কমিটির সদস্য; আলী হায়দর মোল্লা, পুলিশ ইন্সপেক্টর, বিশেষ ব্রাঞ্চ; আবদুল হাই (রাজাকার কমান্ডার), গফরগাঁও, ময়মনসিংহ; আবদুল হাকিম, হালুয়াঘাট শান্তি কমিটির সদস্য, ময়মনসিংহ; মোহাম্মদ মুসা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম; মোহাম্মদ হোসেন, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম; আজিজুদ্দিন আহমদ, একাউন্ট্যান্ট, ফিশারী বিভাগ, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম; আবদুল হাকিম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম; জাহাঙ্গীর আলম, কোতওয়ালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম; আবেদ আলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান, কুমিল্লা; আবদুল করিম, সুত্রাপুর, ঢাকা; সায়েদ আলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; পাকোন মিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা; সাইদুর রহমান, নবীনগর, কুমিল্লা; কালাচাঁদ (রাজাকার), ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা; নাসিরুদ্দিন আহমদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা; আবুল হোসেন, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী; চানমিয়া (রাজাকার), মুরাদনগর, কুমিল্লা; সরাফুল আলী চৌকিদার, ছাগলনাইয়া, নোয়াখালী; জয়নাল আবেদীন, আজমিরীগঞ্জ, সিলেট; আবদুল ওয়াদুদ, লাকসাম, কুমিল্লা; মোহাম্মদ হানিফ খান, টঙ্গিবাড়ী, ঢাকা; মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সুত্রাপুর, ঢাকা; জহুরুল হক, রায়পুরা, নোয়াখালী; আবুল মনসুর আহমদ, কাপাসিয়া, ঢাকা; আবদুস সোবহান, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা; আবদুল (রাজাকার), রায়পুরা, নোয়াখালী; এ এ তারেক, (আল-বদর কমান্ডার), মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ফয়জুল্লা খান, রেলওয়ে কলোনী, ঢাকা; আমীর হোসেন (রাজাকার), পটুয়াখালী; নাজিম আহমদ (রাজাকার), হাজারীবাগ, ঢাকা; মোহাম্মদ সেলিম (রাজাকার), হাজারীবাগ, ঢাকা; রমিজউদ্দিন (রাজাকার), দোহার, ঢাকা; আবু মুরিদ চৌধুরী (রাজাকার), ঢাকা ও মোহাম্মদ সাঈদ হোসেন, কুষ্টিয়া।

দৈনিক বাংলা, ১৫.১.১৯৭২

৫৩ জন তমঘাপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী অপসারিত

বাংলাদেশ সরকার ৫৩ জন সরকারি কর্মচারীকে চাকরি থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধান্তটি অবিলম্বে কার্যকরী হচ্ছে।

এই চাকুরেরা নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সাথে সামরিক সরকারের খেদমত করেছিলেন। আর এর বিনিময়ে পাকিস্তানী সামরিক সরকার এদের দিয়েছিলেন বেসামরিক খেতাব। গত ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের দখলী সময়ে সামরিক সরকারের খেদমত করে খেতাব নেওয়াতেই এদের চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার প্রদত্ত এক সরকারি প্রেসনোটের উদ্ধৃতি দিয়ে বাসস জানায়, ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি চাকুরেরা অবশ্য তাদের নিজ নিজ বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করতে পারবেন।

যেসব অফিসারকে অপসারিত করা হচ্ছে, তাঁরা হলেন :

১. জনাব এম ওয়াজিদ আলী খান টিপিকে, চেয়ারম্যান, রেলওয়ে বোর্ড।
২. জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, টিপিকে, চেয়ারম্যান, জুট বোর্ড।
৩. জনাব শামসুদ্দীন আহমদ, কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ।
৪. জনাব এম জি দাস্তগীর, ডেপুটি গভর্নর, সাবেক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান।
৫. জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান টিপিকে, প্রাদেশিক নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৬. ডঃ কামালুদ্দীন আহমদ, টিকিউএ, অধ্যক্ষ, জৈব-রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. ডাঃ আবদুল বাসেত, টিকিউএ অধ্যাপক, চর্মরোগ বিভাগ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ২০ ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা।
৮. জনাব এ. এফ. এম আবদুল হক, আরবি, পার্সী ও উর্দুর অনারারী বিশেষজ্ঞ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৯. জনাব মোখলেসুর রহমান তালুকদার, কৃষি ডাইরেক্টর (এক্সটেনশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট), বাংলাদেশ, ঢাকা।
১০. জনাব এ. কে. এম. ওয়ালিউল ইসলাম, কাস্টমস কালেক্টর, কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
১১. জনাব বাহাউদ্দিন আহমদ, ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল, এক্সপোর্ট প্রোমোশন ব্যুরো, আঞ্চলিক অফিস, ঢাকা।
১২. ডঃ আবদুল হক, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
১৩. জনাব এনাম আহমদ চৌধুরী, জয়েন্ট সেক্রেটারী, শিল্প ও বাণিজ্য, বাংলাদেশ, ঢাকা।
১৪. জনাব এ. এফ. এম. নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারি, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ১১১, গ্রীন রোড, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৫. জনাব একরামুল আমীন, জেনারেল ম্যানেজার, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিমিটেড, খুলনা।

১৬. ডঃ মোহাম্মদ মোহতাজুদ্দীন মিয়া, প্রিন্সিপ্যাল সায়েন্টিফিক অফিসার, আনবিক শক্তি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা।
১৭. ডাঃ এম শামসুল হক, আনবিক শক্তি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা।
১৮. জনাব আলী আহমদ, সহকারী উন্নয়ন অফিসার, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১০, গ্রীন রোড, ঢাকা।
১৯. জনাব এম শরাফতউল্লাহ, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
২০. জনাব আশরাফুজ্জামান খান, ডাইরেক্টর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
২১. ডঃ হাফেজ আহমদ, অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
২২. ডঃ মুন্সী সিদ্দিক আহমদ, ইকনোমিক বোটানিস্ট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, ঢাকা।
২৩. ডাঃ মুজিবুর রহমান, ব্লাড ট্রান্সফিউশন অফিসার, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
২৪. জনাব মোঃ আবু হেনা, প্রধান হাইড্রোগ্রাফার, আই ডব্লিউ টিএ, ডিআইটি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
২৫. ডঃ মোখলেসুর রহমান, অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, একাউন্টস বিল্ডিং বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
২৬. ডঃ মোঃ এরফান আলী, প্রজেক্ট অফিসার, পিএসসিআই অব ল্যাবরেটরীজ, চট্টগ্রাম।
২৭. জনাব এসএএম আজফর, সহকারী একাউন্টস অফিসার, একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিস, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২৮. জনাব ইউনুস মোল্লা, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, পুলিশ ডাইরেক্টরেট, ১৪০, আর কে মিশন রোড, ঢাকা।
২৯. জনাব মোঃ কেরামত আলী তালুকদার, সহকারী ডাইরেক্টর, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।
৩০. জনাব সৈয়দ আফজাল ইমাম, সহকারী ডাইরেক্টর, পোস্টাল জীবন বীমা, ঢাকা।
৩১. মিস রাহেলা খাতুন, প্রধান শিক্ষত্রিয়ী, সেন্ট্রাল গবর্ণমেন্ট গার্লস হাইস্কুল (বাংলা মাধ্যম), ঢাকা।
৩২. জনাব মোখলেশউদ্দীন আহমদ, পিপিএম, ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩৩. জনাব এস মাহমুদুল হক, সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট, ট্যাকেরহাট লাইমস্টোন অ্যান্ড মাইনিং প্রজেক্ট, সুনামগঞ্জ, সিলেট।
৩৪. মিসেস খন্দকার হোসেন আরা বেগম, মেট্রন, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
৩৫. জনাব মোঃ ইউনুস হোসেন, সুপারিনটেন্ডেন্ট, প্রাদেশিক নির্বাচন কমিশনারের অফিস, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩৬. জনাব মকসুদুর রহমান, সুপারিনটেন্ডেন্ট, মার্কেনটাইল মেরিন বিভাগ, জিজিও ভবন, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

৩৭. জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্বাস্থ্য বিভাগ, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩৮. জনাব খন্দকার মোঃ জাকের হোসেন, হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট, কালেক্টরেট, রংপুর।
৩৯. জনাব মোঃ ওয়াজিদ আলী, সেকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, বোর্ড অব রেভিনিউ, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪০. জনাব আবদুল লতিফ খান, ইউনিয়ন এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট কে/অব কৃষি বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
৪১. জনাব সেরাজুদ্দীন আহমদ, ইউনিয়ন অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্বাস্থ্য বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
৪২. জনাব আবদুল খালেক, সেকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা।
৪৩. জনাব আবদুল কুদ্দুস, গেস্টেনার অপারেটর, কে/অব প্রাদেশিক নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪৪. কাজী সাদিমান, দফতরী, বোর্ড অব রেভিনিউ, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪৫. শেখ মনসুর আলী জমাদ্দার, বোর্ড অব রেভিনিউ, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪৬. শেখ মারুফুল হক, নং ০৪৯০, পুলিশ ইনস্পেক্টর, সাদেরা সার্কেল, রংপুর।
৪৭. সাব-ইনস্পেক্টর আহমদ আলী খান, পাকিস্তান স্পেশাল পুলিশ এস্ট্যাবলিশমেন্ট, ঢাকা।
৪৮. জনাব ওয়ালিউর রহমান গাজী, পিপিএম, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, সাবেক গভর্নরের ইনস্পেক্টর টীম, ঢাকা।
৪৯. জনাব মোঃ তৌহিদ আলম, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা।
৫০. জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা।
৫১. জনাব আফসারউদ্দীন আহমদ, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, দুর্নীতি দমন অফিস, রংপুর।
৫২. জনাব মোঃ আবু ইউসুফ খান, পুলিশ ইনস্পেক্টর, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, ঢাকা।
৫৩. জনাব মেসের উদ্দীন আহমদ প্রসিকিউটিং ডিএসপি, স্টেট ব্যাংক ব্রাঞ্চ, স্পেশাল পুলিশ এস্ট্যাবলিশমেন্ট, ঢাকা।

দৈনিক বাংলা, ২.২.১৯৭২

দালালীর অভিযোগে গ্রেফতার

অধিকৃত আমলে টেলিভিশন সার্ভিসের ঢাকা কেন্দ্রের গায়ক ও অভিনেতা জনাব নজমুল হুদাকে দালালীর অভিযোগে গতকাল বৃহস্পতিবার রমনা পুলিশ গ্রেফতার করেছেন। তাকে পরীবাগ থেকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া শাহজাহানপুর থেকে আনোয়ার হোসেন চৌধুরী নামে এক ব্যক্তিকে দালালীর দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এসআই সানাউল্লাহ ভূঁইয়া এদের গ্রেফতার করেন।
নূরুল আমীন, হামিদুল হক সবুর গং
ফেরার ঘোষিত : বিষয় সম্পত্তি ক্রোক—
অধুনালুপ্ত কতিপয় রাজনৈতিক দলের ১৫ জন নেতাকে গতকাল বুধবার বাংলাদেশ সরকার ফেরার ঘোষণা করে তাদেরকে ২২শে ফেব্রুয়ারি বিকেল তিনটায় অথবা তার পূর্বে তাদের স্ব স্ব এলাকার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অধুনালুপ্ত পিডিপি, জামাতে ইসলামী, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও কাইয়ুম মুসলিম লীগের এসব ব্যক্তিদের এবং সাবেক গভর্নর ডাঃ মালিকের মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্যের নামে যেসব স্থাবর বিষয় সম্পত্তি আছে তা এবং তাদের বেনামী বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করে নেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার এক সরকারি ঘোষণায় এ কথা বলা হয়।
অধুনালুপ্ত কাতিপয় রাজনৈতিক দলের ফেরার ঘোষিত নেতাদের নামের তালিকা :

১. নূরুল আমীন, পিতা মরহুম জহিরুদ্দিন, সাকিন, আকুয়া মাদ্রাসা কোয়ার্টারস, ময়মনসিংহ শহর, গ্রাম : বাহাদুরপুর, থানা : নান্দাইল, ময়মনসিংহ। ২০ নং ইস্কাটন রোড, রমনা থানা, জেলা : ঢাকা।
২. হামিদুল হক চৌধুরী, পিতা : আক্কাস আলী চৌধুরী, গ্রাম : রামনগর, থানা : ফেনী, জেলা : নোয়াখালী। নিরালা গার্ডেন, গ্রীন রোড, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. খান এ সবুর, পিতা : মরহুম নজমুল খান, সৈয়দ মহল্লা, থানা : ফকিরহাট, জেলা : খুলনা, যশোর রোড, থানা : কোতয়ালী, জেলা : খুলনা। ঢাকার ঠিকানা : রোড নং ২৫, প্লট নং ২৮-১, ধানমন্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা।
৪. মাহমুদ আলী, পিতা : মরহুম মুজাহেদ আলী : সুনামগঞ্জ শহর, থানা : সুনামগঞ্জ, সিলেট। ১৮০ ধানমন্ডী আবাসিক এলাকা, রোড নং-১৯, থানা : লালবাগ।
৫. ওয়াহিদুজ্জমান ওরফে ঠাণ্ডা মিয়া, পিতা : মরহুম আবুল কাদের, গোপালগঞ্জ শহর, থানা : গোপালগঞ্জ, জেলা : ফরিদপুর, ১০/১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, থানা : রমনা, জেলা : ঢাকা।
৬. খাজা খয়েরুদ্দিন, পিতা : খাজা আলাউদ্দিন, ১৫, আহসান মঞ্জিল, থানা : কোতোয়ালী, জেলা : ঢাকা।
৭. কাজী আবদুল কাদের, পিতা : কাজী এল আবেদউদ্দিন আহমদ, গ্রাম : সোয়ালমনী, থানা : জলঢাকা, জেলা : রংপুর, ৮ নং গুলশান, তেজগাঁও, জেলা : ঢাকা। ১১ নং হাটখোলা, সুত্রাপুর, ঢাকা।
৮. রাজা ত্রিদিব রায়, পিতা : মৃত মীনাক্ষ রায়, রাজবাড়ী রাঙ্গামাটি শহর, থানা : কোতোয়ালী, জেলা : পার্বত্য চট্টগ্রাম।
৯. অধ্যাপক এ কে এম শামসুল হক, পিতা : ওয়ালী আহমদ, গ্রাম : পশ্চিম সৈয়দপুর, থানা : সীতাকুণ্ড, জেলা : চট্টগ্রাম।
১০. মোঃ ওবায়দুল্লাহ্ মজুমদার, পিতা : মরহুম আলী আজম মজুমদার, গ্রাম : দক্ষিণ সাতারা, থানা : ছাগলনাইয়া, ফেনী, জেলা : নোয়াখালী।

১১. আউং শুপ্রু, পিতা : আউং প্রু, গ্রাম : বান্দরবন, থানা : বান্দরবন, জেলা : পার্বত্য চট্টগ্রাম।
১২. অধ্যাপক গোলাম আজম, পিতা : মওলানা গোলাম কিবরিয়া, গ্রাম : বীরনগর, থানা : নবীনগর, জেলা : কুমিল্লা। ৩৮ নং এলিফ্যান্ট রোড, রমনা, ঢাকা।
১৩. শাহ্ আজিজুর রহমান, পিতা : শাহ্ মোহাম্মদ সিদ্দিক, গ্রাম : থানাপাড়া, থানা : কোতওয়ালী, জেলা : কুষ্টিয়া। ২২ ইস্কাটন রোড, রমনা, ঢাকা।
১৪. এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, পিতা : মরহুম আবদুস সোবহান, গ্রাম : বীরগাঁও, থানা : নবীনগর, জেলা : কুমিল্লা।
১৫. এ জব্বার খদ্দর, পিতা : আবদুল হামিদ চৌকিদার, গ্রাম : গনক, থানা : সোনাগাজী, ফেনী, জেলা : নোয়াখালী।

দৈনিক বাংলা, ১০.২.১৯৭২

পাক বাহিনীর সহযোগী গ্রেফতার

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের সাবেক সহকারী নেতা শাহ্ আজিজুর রহমানকে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সর্বশেষ অধিবেশনে ইয়াহিয়া সরকারের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। বাসস এই খবর দিয়েছে।

দৈনিক বাংলা, ১৬.২.১৯৭২

মওলানা রহিম, সামসুল হুদা, মতিন, জুলমত আলী প্রমুখ ফেরারদের প্রতি হাজিরের নির্দেশ ৫৪ জন দালালের সম্পত্তি ক্রোক

বাংলাদেশ সরকার বে-আইনী ঘোষিত জামাতে ইসলামীর এককালীন আমীর মওলানা আবদুর রহিম, কনভেনশন লীগের সভাপতি শামসুল হুদা, আইয়ুবী আমলের জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পীকার কনভেনশন লীগের এটি এম এ মতিন, পিডিপির এডভোকেট জুলমত আলী, নারায়ণগঞ্জের মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, খানসেনাদের দখলদারীর সময়ে প্রহসন উপনির্বাচনে নির্বাচিত জামাতে ইসলামীর এমএলএ জনাবউদ্দিন, কাইয়ুম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট গাইবান্ধার সাইদুর রহমান, পাবনার আসগর হোসেন জ্যাইডী, কাউন্সিল লীগের আবদুস সাত্তার খান চৌধুরীসহ ৫৪ ব্যক্তির নামে বা বেনামিতে রাখা স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করেছেন। সরকার এদের সবাইকে ২৯শে ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টার মধ্যে নিজ নিজ এলাকার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আনীত অভিযোগের তদন্ত এড়ানোর উদ্দেশ্যে এরা এখন সবাই পলাতক।

বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের ১৭ (১) ধারা বলে এই নির্দেশ জারি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরা নির্ধারিত সময়ে হাজির হলে সরকার ক্রোক রদের নির্দেশ দিতে পারেন।

আদালতে হাজির হওয়ার তালিকায় অন্যান্য লোকেরা হলেন : এ. কে. এস. মোশাররফ হোসেন, এ. এন. এম ইউসুফ, সৈয়দ কামাল হোসেন রিজভী, রইসুদ্দীন আহমদ,

মওলানা তমিজুদ্দীন, আবদুল্লা আল কাজী, নসীহুল আজম, এমএ মতিন, মওলানা এ সোবহান। জসিমুদ্দীন আহমদ, মোমতাজ উদ্দীন আহমদ, আফাজ উদ্দীন, আফিলুদীন, আজমত আলী, এম এ রশিদ। সিলেটের ফজলুল হক, দলীলুর রহমান, আবদুল হক, সাইদুল হক, মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ, আবু সুফিয়ান, মোহাম্মদ নুরুল্লাহ, খুররমজা মুরাদ, অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার, মওলানা নুরুল ইসলাম, মওলানা আশরাফ আলী, রংপুরের শাহ মোহাম্মদ রুহুল ইসলাম, রংপুরের নাগেশ্বরীর শামসুল হক খোন্দকার, ভুরুঙ্গামারীর আহমদ আলী সরদার, উলীপুরের আবুল বাসার, দিনাজপুরের নতুন বস্তির ইসমাইল হক, ঠাকুরগাঁর ডাক্তার শফিকুর রহমান ওরফে শফিউর রহমান, বিরল থানার মাহবুবুল আলম, কোতওয়ালীর ইসহাক আলী খান, পার্বতিপুর শহরের আবদুল ওয়াদুর ও নুরুল হুদা চৌধুরী। বগুড়া জেলার জয়পুরহাটের আবদুল হালিম। জলেশ্বরীতলার আবদুল গণি, রাজশাহীর শিবগঞ্জের ডাক্তার ইরতিজা আলম, নাচোল থানার মীর ওবায়দুল্লাহ, নবাবগঞ্জের তাইব আলী, নওগাঁর ফারাজ উদ্দীন মোল্লা, বোয়ালিয়া থানার জিয়াউল আলম, মোঃ ইউসুফ খান ওরফে খাজা, কোতওয়ালীর দুর্গাপাড়ার আবদুস সোবহান এবং পবা থানার শ্যামপুরের মোঃ আইলদ্দিন ওরফে আইনুল।

দৈনিক বাংলা, ১৮.২.১৯৭২

সবুর খানের গ্রেফতার

দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্যতম বড় দালাল খান এ সবুর খানকে পুলিশ গত মঙ্গলবার (২২ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় গ্রেফতার করে। খান এ সবুর তার প্রভুদের নির্দেশে খুলনাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যা করার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে পরিকল্পনা করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে।

খান এ. সবুর ছিল কুখ্যাত কাইয়ুম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল। এ ছাড়াও ছিল পাকিস্তানী শাসকদের খুবই পেয়ারের লোক। তাই সরকারের বড় বড় পদেও আসীন থাকতো। ঘৃণিত আইয়ুব খানের আমলে খান এ সবুর ছিল তথাকথিত জাতীয় দলের নেতা ও মন্ত্রী পরিষদের প্রবীণতম সদস্য। পাক সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী থাকাকালে তার বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ পাওয়া যায়। তার প্রভুগোষ্ঠী পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা মিত্রবাহিনীর হাতে ১৬ই ডিসেম্বর চরম পরাজয় বরণ করলে আজীবন বিশ্বাসঘাতক খান এ সবুর আত্মগোপন করে।

গতকাল বুধবার বাসস এ খবর জানায়।

দৈনিক বাংলা, ২৪.২.১৯৭২

স্পীকার আসগর হোসেন গ্রেফতার

দেখা যায় এদিন আইয়ুব আমলের এমপিএ ও তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পীকার পাক হানাদারদের সহযোগী আসগর হোসেন ঢাকায় ধরা পড়েন।

দৈনিক বাংলা, ২৯.২.১৯৭২

স্পীকার আসগর হোসেনের বিচার

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদের ডেপুটি স্পীকার আসগর হোসেনসহ জনাব ওবায়দুল কবীর, হাজী মোহাম্মদ আকিল, এ. বি. এম আহমদ আলী মন্ডল, ইউসুফ আলী ও আকরাম খানকে ১৯৭২ সালের দালাল আদেশ মোতাবেক বিচারের জন্যে গত ১৯ এপ্রিল ঢাকার প্রথম বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক আব্দুল হান্নান চৌধুরীর এজলাসে হাজির করা হয়।

সরকারের পক্ষ থেকে একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার এদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, গত ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের আগে পাক বাহিনী বর্বর পশুশক্তিবলে দেশকে পদানত রাখতে চেষ্টা করে এবং হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণ ইত্যাদি জঘন্যতম অপরাধ সংগঠন করে। এই পশুশক্তির পক্ষে কিছু লোক ব্যক্তিগত বা কোনো দলের সদস্য হয়ে দালালী করে। উপরোক্ত ব্যক্তি দখলদার বাহিনীর দালাল হিসেবে তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। অন্যতম আসামী আকরাম হোসেন খান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারকের নিকট অভিযুক্ত জনাব আসগর হোসেন বলেন যে, তাঁর পক্ষে উকিল নিয়োগের জন্য সময় দরকার এবং তিনি শুনানী মুলতবী রাখার প্রার্থনা করেন। বিচারক ১৯শে মে পর্যন্ত শুনানী মুলতবী রেখে ঐ তারিখে বাদী ও বিবাদী পক্ষের সাক্ষীকে হাজির থাকার নির্দেশ দেন।

দৈনিক বাংলা, ২৪.৪.১৯৭২

আহমদ আলী মন্ডলের আত্মসমর্পণ

গতকাল (২৯ এপ্রিল) ঢাকার স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল প্রথম কোর্ট স্পেশাল জজ জনাব আব্দুল হান্নান চৌধুরীর এজলাসে দালাল আদেশে অভিযুক্ত এ. বি. এম আহমদ আলী মন্ডল আত্মসমর্পণ করে জামিনের জন্যে প্রার্থনা করলে বিজ্ঞ স্পেশাল জজ জামিন না মঞ্জুর করে হাজতে থাকার নির্দেশ দেন।

মামলায় অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ঢাকার গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর জনাব রফিকুল্লাহ্ আতিয়র রহমান লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বলেন যে, গত ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও হানাদার পাক বাহিনী বর্বর পশুশক্তির দ্বারা দেশকে দখলে রাখতে চেষ্টা করে, এবং কিছুলোক ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো দলের সদস্য হিসেবে দখলদার পাক বাহিনীর দালালী করে। অভিযুক্ত আহমদ আলী মন্ডল পাক বাহিনীর দালাল হিসেবে তথাকথিত উপনির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ প্রেসিডেন্টের দালাল আদেশের কতিপয় ধারা অনুযায়ী সে অপরাধী।

অভিযুক্ত আহমদ আলী মন্ডল মাননীয় জজের নিকট একটি লিখিত দরখাস্ত দাখিল করে বলে যে, সে জানতে পেরেছে তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা

জারী হয়েছে। সুতরাং সে আত্মসমর্পণ করেছে। অভিযুক্ত তার দরখাস্তে আরও উল্লেখ করে যে, সে বাংলাদেশের নাগরিক এবং জামিন পেলে ফেরার হবার আশংকা নেই। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন স্পেশাল পিপি এ বি এম রফিকুল্লাহ ও আসামী পক্ষে কয়েকজন এডভোকেট।

দৈনিক বাংলা, ৩০.৪.১৯৭২

মোনেম খানের ভাগ্নে গ্রেফতার

আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গত বুধবার পাক হানাদারদের দালাল মনসুর রহমান তালুকদারকে গ্রেফতার করে রমনা থানায় সোপর্দ করেছে। মনসুর রহমান প্রাক্তন গভর্নর মোনেম খাঁর ভাগনে বলে পরিচিত। উক্ত মনসুরের সহায়তায় পাক বাহিনী ময়মনসিংহের বহু গ্রাম ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগে প্রকাশ।

দৈনিক বাংলা, ১৪.৫.১৯৭২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন দালাল শিক্ষক গ্রেফতার

হানাদার পাক বাহিনীর দালালী করার অভিযোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন শিক্ষককে সম্প্রতি গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত শিক্ষকরা হচ্ছেন : বাণিজ্য বিভাগের প্রধান জনাব মকবুল আহমদ, ভূগোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আহমদ মোহাম্মদ প্যাটল, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সোলায়মান মন্ডল। মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ওয়াসিম বারী বাঘী, আইন বিভাগের রীডার ডঃ জিল্লুর রহমান ও ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক কলিম এ সাসারামী। একই অপরাধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আবদুল বারী, বাংলা বিভাগের রীডার ডঃ গোলাম সাকলায়েন, একই বিভাগের অধ্যাপক আজিজুল হক ও শেখ আতাউর রহমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছে। ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক আহমেদউল্লাহ খান ও অন্যতম ডেপুটি রেজিস্ট্রার ইবনে আহমদ এখন পলাতক রয়েছেন বলে জানা গেছে।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে দখলদার আমলে ডঃ আবদুল বারীকে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছিল। একই সময়ে ডঃ গোলাম সাকলায়েনকে বাংলা বিভাগের প্রধান করা হয়। তবে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, ইবনে আহমদ এখন পূর্ণ বেতনে ছুটিতে আছেন ও অধ্যাপক আহমেদ উল্লাহ খান বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের সাহায্যে নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন।

দৈনিক বাংলা, ১৭.৫.১৯৭২

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলা : জামাত নেতা খালেকের বিরুদ্ধে চার্জশীট

গতকাল ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালত শহীদুল্লাহ কায়সার অপহরণ ও হত্যা মামলার শুনানী আগামী ১৯শে জুন পর্যন্ত মুলতবী রাখেন। এ মামলায় বর্তমানে বিলুপ্ত

জামাতে ইসলামীর ঢাকা শহর শাখা সেক্রেটারী আবদুল খালেকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ড বিধির ৩৬৪ ধারা মোতাবেক চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলার মধ্যে জনাব শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণ ও হত্যা মামলার শুনানী সর্বপ্রথম দায়রা আদালতে শুরু হয়েছে। জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন এবং তিনি বর্তমানে নিখোঁজ জনাব জহির রায়হানের জ্যেষ্ঠ সহোদর। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বক্ষণে পাক-বাহিনীর দোসর আল-বদর দুষ্কৃতিকারীরা তাকে অপহরণ করে। সরকার পক্ষে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলার তদন্ত চালাচ্ছে এবং এই মামলায় প্রথম চার্জশীট দাখিল করেছে।

দৈনিক বাংলা, ২০.৫.১৯৭২

হাজী মোহাম্মদ আকিলের মামলা

গতকাল ৮ই জুন ঢাকার সাত নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জনাব এম মাহমুদের এজলাসে দালালী মামলায় পিতার পক্ষে পুত্র সাফাই সাক্ষ্য প্রদান করেন। এই মামলায় সরকার পক্ষ থেকে হাজী মোহাম্মদ আকিলের বিরুদ্ধে দখলদার পাক বাহিনীর দালালীর অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলার অভিযোগের বিবরণে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দখলদার পাক বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের দ্বারা বাংলাদেশ দখলের চেষ্টা করে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৯৭১ সালের তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে দখলদার বাহিনীর দালালী করে।

মামলায় সরকার পক্ষে মোট সাত জন সাক্ষ্য প্রদান করেন ও আসামী পক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুত্র মোহাম্মদ খলিল সাফাই সাক্ষ্য প্রদান করে বলে যে, সে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি এবং তার বাবা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির কোষাধ্যক্ষ ছিল। তার বাবা ১৯৭১ সালের এপ্রিলে পদত্যাগপত্র দাখিল করে এবং নেজামে ইসলাম পার্টির সেক্রেটারী মৌলানা আশ্রাফ তার বাবাকে চিঠি দিয়ে ইলেকশনে দাঁড়াতে বলে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের মৌলানা ইহতেশামুল হক থানভিও তার বাবাকে ইলেকশনে দাঁড়াতে বলে। সাফাই সাক্ষী মোহাম্মদ খলিল আদালতে মৌলানা আশ্রাফের চিঠিটি প্রদান করে বলে যে, সে বর্তমানে হোসেন সোহরাওয়ার্দী কলেজের বি, কম ক্লাসের ছাত্র।

আশ্রাফ আলী নির্বাচনে দাঁড়াতে বলেছিলেন—সরকারের পক্ষে কৌসুলীর জেরার জবাবে মোহাম্মদ খলিল উল্লেখ করে যে, ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে এদেশ স্বাধীন হয়েছে সে তা জানে না। ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন হয়েছে তাই সে জানে। অপর একটি প্রশ্নে সে স্বীকার করে যে, সে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতো।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন জনাব সোবহান ও আসামী পক্ষে এডভোকেট আতাউর রহমান খান ও ইকবাল আনসারী খান। ঢাকার আট নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জনাব আজিজুর রহমান মিয়ার এজলাসে অপর একটি দালালীর মামলায় গতকাল সর্বমোট আট জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়। এই মামলায় বাদী পক্ষ থেকে ওবায়দুল কবিরের বিরুদ্ধে পাক দখলদার বাহিনীর পক্ষে দালালীর অভিযোগ আনা হয়েছে। সরকার

পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করছেন জনাব আবদুর রাজ্জাক খান ও আসামী পক্ষে জনাব আতাউর রহমান খান ও অন্যান্য।

দৈনিক বাংলা, ৯.৬.১৯৭২

রাজাকার চিকন আলীর মৃত্যুদণ্ড

কুষ্টিয়ার দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সদস্য শ্রী আর কে বিশ্বাস গত বৃহস্পতিবার রাজাকার চিকন আলীকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশে দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের ১১ (ক) ধারা বলে চিকন আলীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। দালাল আদেশের অধীনে এই প্রথম একজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হলো।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, বাংলাদেশে দখলদার বাহিনীর শাসনামলে মীরপুর গ্রামের চিকন আলী রাজাকার তালিকাভুক্ত হয়। সে হত্যা, লুটতরাজ, ঘর জ্বালানী এবং মেয়েদের মর্যাদা হানির কাজে অংশগ্রহণ করে। গণহত্যা ও অন্যান্য অপরাধ সংগঠনে সে সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানী সেনাদের সাথে সহযোগিতা করে।

১৯৭১ সালের ১৯শে অক্টোবর চিকন আলী তার গ্রামের বাড়ীতে কামালউদ্দিন মণ্ডল নামক এক ব্যক্তিকে বলে যে, সে জনৈক ইয়াজউদ্দিনের বাড়ি থেকে দুলালী বেগমকে বের করে আনতে ইচ্ছুক। পাকিস্তানী সৈন্য রাজাকারদের হামলা থেকে রক্ষার জন্য আব্দুল গফুরের মেয়ে দুলালী বেগমকে ইয়াজউদ্দিনের কাছে রাখা হয়। এরপরই চিকন আলী ইয়াজউদ্দিনের বাড়ীতে যায়। মেয়েটি তখন তার বাড়ীতেই ছিল। ইয়াজউদ্দিন দুলালী বেগমকে দিতে অস্বীকার করায় চিকন আলী রাইফেলের সাহায্যে গুলী করে ইয়াজউদ্দিনকে হত্যা করে।

কুষ্টিয়ায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রায় : দালালির দায়ে মৃত্যুদণ্ড—আদালতে বিবাদী চিকন আলীর উকিল বলেন চিকন আলী কখনোই রাজাকার ছিল না। সে মুক্তিবাহিনীর সদস্য ছিল। কিন্তু বিচারক বিবাদীর কৌসুলীর বক্তব্য গ্রহণ করেননি। এবং অভিযুক্ত চিকন আলীকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে ফাঁসির হুকুম প্রদান করেন।

একই বিচারক বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১২১ ধারা এবং দালাল আদেশের ১১ (ক) ধারায় আরো কতগুলোর অভিযোগের ভিত্তিতে চিকন আলীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোনো দণ্ড প্রদান করেননি। কারণ আগের অভিযোগেই তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে তাকে আপীল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব আমজাদ হোসেন সরকার পক্ষে এবং মীর আতিউর রহমান এ্যাডভোকেট বিবাদী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

দৈনিক বাংলা, ১১.৬.১৯৭২

বুদ্ধিজীবী নিধন মামলা

ডঃ আজাদকে হত্যার দায়ে দু'জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট

আল-বদর বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলায় ঢাকার উচ্চতর বিজ্ঞান ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডঃ এম এ কে আজাদ পিএইচডি হত্যা মামলায় গোয়েন্দা বিভাগ

দুইজনের বিরুদ্ধে অপহরণ, হত্যা ও দালাল আদেশের কতিপয় ধারা মোতাবেক চার্জশীট দাখিল করেছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ ঢাকার ইভনিং পোষ্ট পত্রিকার সম্পাদক জনাব হাবিবুল বাশার গত ২৪শে জানুয়ারী লালবাগ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে ১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে আটটার সময় আল-বদর বাহিনীর পাঁচজন লোক শাহ সাহেব বাড়ীর জনৈক শাহ ওয়ালিউল্লাহ-এর পুত্র জুবায়ের-এর সাথে ডঃ আজাদের আজিমপুরের দায়রা শরীফস্থ বাড়ীতে হানা দেয় এবং ডঃ আজাদকে অপহরণ করে।

বাদী তার অভিযোগে আরও বলেন যে, তিনি আজাদের বড় ভাই এবং অপহরণের খবর পেয়ে বাড়ী ছুটে আসেন। ঘটনার সময় সেই বাড়ীতে তাদের ভাই আবুল খায়ের, জাকির হোসেন ও বোন সালমা ও সেলিনা উপস্থিত ছিল এবং তাদের মাও ছিলেন। সেলিনা বাদীকে বলেন যে, একজন বদর বাহিনীর লোককে তিনি চিনতে পেরেছেন এবং দেখলে সনাক্ত করতে পারবেন। বদর বাহিনীর লোকেরা মুখোশ পরে এসেছিল। জুবায়ের বাদীকে জানায় যে, ডঃ আজাদকে আজিমপুরের রাজাকার ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান হাজী কাশেমের বাড়ীতে খোঁজ করে ডঃ আজাদকে না পাওয়ার পর লালবাগ থানায় যোগাযোগ করলে ও, সি সাহেব বলেন যে, ডঃ আজাদকে বদর বাহিনীর লোক নিয়ে গেছে এবং তাকে উদ্ধার করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বাদী এজাহারে বলেন যে, ১৭ই ডিসেম্বর রায়ের বাজার ডোবা থেকে মিত্র বাহিনীর সৈনিকদের সহায়তায় ডঃ আজাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তার শরীরে এবং বুকে, মাথায় গুলীর দাগ এবং বেয়নেটের খোঁচা ছিল। জনাব হাবিবুল বাশারের এজাহার দাখিলের পর লালবাগ থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়।

ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ মামলাটি তদন্ত করে আসামী মকবুল হোসেন ও আয়ুব আলীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে উল্লেখ করেন যে, ডঃ আজাদকে অপহরণ করার পর দুষ্কৃতকারীরা আজিমপুর মহল্লার কাজী মন্টু, কাজী মতিউর রহমান এবং ভুলু ওরফে বদরউদ্দিনকে অপহরণ করে এবং যে মাইক্রোবাসে ডঃ আজাদকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই একই বাসে সবাইকে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে জানুয়ারী মাসের দুই তারিখে আসামী মকবুল ও আয়ুব আলী যখন একটি লঞ্চে মুন্সীগঞ্জ যাচ্ছিলো তখন অপহৃত মতির ভাই মুস্তাফিজুর রহমান তাদের চিনে ফেলে এবং লঞ্চের যাত্রীদের ঘটনা বর্ণনা করে। মুক্তিবাহিনীর কাছে লঞ্চের যাত্রীরা আসামীদ্বয়কে লালবাগ থানায় নিয়ে আসে। আসামী মকবুল হোসেন ১৫ই ডিসেম্বর অপরাধ সংগঠনের সময় যে কালো চশমা পরেছিল তাকে আটক করার সময়ও তার চোখে সেই চশমা লাগানো ছিল। পুলিশ চশমাটি আটক করে। তদন্তকালীন আসামীদের সনাক্তকরণ প্যারেডে হাজির করা হলে সাক্ষীরা তাদের সনাক্ত করেন।

গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর তার দায়েরকৃত চার্জশীটে উল্লেখ করেন যে, অপরাধ সংগঠিত হয় দেশের মুক্তির পূর্ব দিন। এটা স্থির যে, আসামীদের সে সময় খুবই শক্তি বা ক্ষমতা ছিল এবং তারা কার্যকরীভাবে দখলদার পাক বাহিনীর সহায়তা করেছে এবং বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যা করেছে। ডঃ আজাদকে অপহরণ ও হত্যা তারাই করেছে

এবং বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যা তারাই করেছে এবং এভাবে দখলদার বাহিনীর অবৈধ দখল কায়েম রাখতে সাহায্য করেছে।

ঢাকার এক নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-এ মামলাটি বিচারের জন্য প্রেরিত হওয়ার পর স্পেশাল জজ সৈয়দ সিরাজুদ্দিন আহমদ আগামী ১৯শে জুন আসামীদের বিচারের দিন ধার্য করেছেন।

দৈনিক বাংলা, ১৩.৬.১৯৭২

ওবায়দুল কবীরের মামলা ও সশ্রম কারাদণ্ড

গতকাল ১২ই জুন ঢাকার সাত নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-এ জনাব আজিজুর রহমানের এজলাসে দালালি মামলায় অভিযুক্ত ওবায়দুল কবীরের মামলার শুনানী সমাপ্ত হয় এবং স্পেশাল জজ আগামী ১৭ই জুন মামলার রায়ের দিন ধার্য করেন।

মামলায় আসামী পক্ষে তিনজন সাফাই সাক্ষী ও সরকার পক্ষে আটজন সাক্ষ্য প্রদান করে। আসামীর কৌসুলী জনাব মোহাম্মদ আজম আসামীর নির্দোষিতার সপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করে বলেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে আসামী উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। মিলিটারী কর্তৃপক্ষ তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। কারণ সে সময় সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করা কারও সাধ্য ছিল না।

আসামী পক্ষের কৌসুলী আরও বলেন যে, ওবায়দুল কবীরের বাড়ী পাকবাহিনী আক্রমণ করে এবং তার পুত্র রানা কবীরকে খুঁজতে থাকে। তার বাড়ী তছনছ করে দেয়া হয় এবং তাকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাছাড়া পূর্বে সংঘটিত কোনো অপরাধ পরবর্তীকালে পাস করা কোনো আইন দ্বারা বিচার চলে না এবং উপনির্বাচন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের এলএফও নির্দেশ মোতাবেক অনুষ্ঠিত হয়, যে নির্দেশ মোতাবেক ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।

সরকার পক্ষের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার জনাব আবদুল রেজ্জাক খান বলেন যে, আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ আদালতে করা চলে না এবং পরবর্তীকালে জারীকৃত আইন দ্বারা পূর্ববর্তী সময়ে সংঘটিত অপরাধের বিচার করা চলে এ সম্পর্কে দেশী ও বিদেশী অনেক বিধান ও নজির আদালতে পেশ করেন। আসামী স্ব-ইচ্ছায়, দেশে যখন নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, লুট, অগ্নিসংযোগ চলছিল সে সময় পাক বাহিনীর সাথে করমর্দন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে দাবী করে জনাব আবদুল রেজ্জাক খান বলেন যে, আসামী পক্ষের সাফাই সাক্ষীরা আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে। কারণ সাফাই সাক্ষী ফজলুল করিম নিজেকে একজন সাংবাদিক দাবী করে বলেছে যে, সে বাংলাদেশ প্রেস ইন্টারন্যাশনালের সাব-এডিটার অথচ জেরায় সে বলেছে যে, দেশ স্বাধীন হবার পরই সে আল-বদর, আল-শামস ও রাজাকারদের নাম প্রথম শুনতে পেয়েছে। সে কখনও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনেনি এবং পিডিপি নামক রাজনৈতিক দলের নামও শোনেনি। এ ধরনের কথা সাংবাদিক বলে নিজেকে দাবী করে তার বলা আদালতে মিথ্যা ভাষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তৎকালীন দেশের সামগ্রিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আসামী কর্তৃক গুরুতর ও হীন দালালির অপরাধের জন্য আইনে শুধু মাত্র দুই বছরের জেল এর বিধান রয়েছে। এ

জন্য দুঃখ প্রকাশ করে মাননীয় কৌসুলী বলেন যে, আসামীর চরম দণ্ডের বিধান থাকলেই আইনের ন্যায় উদ্দেশ্য সার্থক হতো।

দৈনিক বাংলা, ১৪.৬.১৯৭২

সশ্রম কারাদণ্ড

১৭ই জুন ঢাকার আট নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্পেশাল জজ জনাব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান দখলদার পাক বাহিনীর দালালির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ঢাকার ঘোড়াশাল নিবাসী মরহুম আবদুল কবিরের পুত্র ওবায়দুল কবিরকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন।

মাননীয় স্পেশাল জজ বাদী ও বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তি বিশ্লেষণ করে আসামীকে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে তার রায়ে উল্লেখ করেন আসামী উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দখলদার পাক বাহিনীর দালাল হিসেবে কাজ করেছে এবং তাদের অবৈধ দখল কায়েম রাখতে সাহায্য করেছে।

দৈনিক বাংলা, ১৮.৬.১৯৭২

স্পীকার আসগর হোসেনের সশ্রম কারাদণ্ড

গতকাল সোমবার দালালী মামলায় অভিযুক্ত সাবেক পূর্বপাকিস্তান পরিষদের ডেপুটি স্পীকার আসগর হোসেনের বিচার ঢাকার ৯ নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে জনাব এম খোরশেদ আলীর এজলাসে শুরু হয়। অভিযুক্ত আসগর হোসেনের বিরুদ্ধে দালাল আদেশের কতিপয় ধারা মোতাবেক অভিযোগ এনে বাদীপক্ষের তরফ থেকে বলা হয় যে, প্রথমতঃ আসামী দখলদার পাকবাহিনী কর্তৃক অনুষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত ১৯৭১ সালের উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দখলদার বাহিনীর অবৈধ দখল কায়েম রাখতে সাহায্য করেছে। দ্বিতীয়তঃ আসামী গত ১৯৭১ সালের ১৯শে এপ্রিল খবরের কাগজে একটি বিবৃতি দিয়ে বলে যে পাক সেনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করতে হবে এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার জন্য শেষ রক্তবিন্দু দান করতে হবে। এই বিবৃতিটি সাবেক এপিপি'র মাধ্যমে দৈনিক মর্নিং নিউজে প্রকাশিত হয় এবং এই বিবৃতিতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারিফ করা হয়।

স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে শোনানোর পর আসামী শুনানী মুলতবী রাখার জন্য প্রার্থনা করে এবং মহামান্য জজ আসামী পক্ষে মামলা পরিচালনার সুবিধার্থে আসামীর কৌসুলীর প্রার্থনা শোনার পর আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময় মামলার শুনানী শুরু করার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য যে, আসামী আসগর হোসেন জেল হাজত থেকে না এসে শুনানী মুলতবীর জন্য প্রার্থনা করলে স্পেশাল জজ হাজত কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে আসামীকে এজলাসে হাজির করার নির্দেশ দিলে আসামীকে আদালতে হাজির করা হয়।

দৈনিক বাংলা, ২০.৬.১৯৭২

হাজী আকিলের আপীল

ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব কামালুদ্দিন হোসেন সমবায়ে গঠিত বেঞ্চে গতকাল মঙ্গলবার পাক বাহিনীর সঙ্গে দালালির অভিযোগে ঢাকার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অভিযুক্ত হানাদার বাহিনীর আমলে উপনির্বাচনে অংশগ্রহণকারী হাজী মোঃ আকিলের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আনীত আপিলটি প্রাথমিক শুনানীর জন্য উত্থাপিত হয়। প্রাথমিক শুনানীর পর বিচারপতি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য হাজী আকিলের আপীলটি মঞ্জুর করেন এবং সম্ভব হলে ছ' সপ্তাহের মধ্যে আপীলের নথিপত্র প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দেন।

দৈনিক বাংলা, ২১.৬.১৯৭২

আসগর হোসেনের সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা : মতিনের জামিন না মঞ্জুর

বৃহস্পতিবার ঢাকার নবম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের পরিপূর্ণ এজলাসে স্পেশাল জজ জনাব এস খোরশেদ আলী দালালি মামলায় সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ডেপুটি স্পীকার জনাব আসগর হোসেনকে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর দালাল হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড দান করেন। বিচারক তার রায়ে বলেন যে, আসামী একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করেই শুধু দখলদার বাহিনীর দালালি করেননি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে ইয়াহিয়া খানের সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে মোবারকবাদও জানিয়েছেন। এই সময়োচিত ব্যবস্থা আর কিছুই নয় নির্মম গণহত্যা ও অমানুষিক অত্যাচার, ইতিহাসে যার কোনো তুলনা নেই।

বাদী পক্ষে আসামী জনাব আসগর হোসেনের বিরুদ্ধে পাক হানাদারদের পক্ষে দালালির দায়ে দালাল আদেশের চতুর্থ অনুচ্ছেদের 'ঘ' ধারা মোতাবেক অভিযোগ আনা হয়। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে আসামী নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করেন। মাননীয় স্পেশাল জজ এ সম্পর্কে তার রায়ে উল্লেখ করেন যে আসামীর সাফাই অত্যন্ত অস্পষ্ট ও তাতে গোঁজামিল রয়েছে।

মামলায় সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে মাননীয় জজ আসামীকে দণ্ডাদেশ প্রদান করে বলেন যে, আসামী যে অপরাধ করেছে তার জন্য আইন মোতাবেক সর্বোচ্চ সাজাই তার প্রাপ্য। বাদী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন স্পেশাল পিপি জনাব আশরাফউদ্দিন আহমদ ও আসামী পক্ষে এডভোকেট জনাব ফজলুল রহমান খান ও আসামী স্বয়ং।

এটিএম মতিন

গত ২৮শে জুন ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আইয়ুব আমলের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পীকার এটিএম মতিনের জামিন না মঞ্জুর করেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি অভিযুক্ত মতিন ও অন্যান্য ৫৩ জনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র মারফত হুলিয়া জারী করে সরকার পক্ষ তাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। গত ২৯শে ফেব্রুয়ারি অভিযুক্ত জনাব মতিন আত্মসমর্পণ করেন।

গত ৯ই জুন অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে দায়রা জজ আদালত জামিনের প্রার্থনা করেন। মাননীয় জজ কারাবিভাগের সহ-অধ্যক্ষ ও রমনা থানার ওসির নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তির তদন্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। রমনা থানার সাব-ইন্সপেক্টর আসামীর অভিযোগ তদন্ত করে উল্লেখ করেন যে আসামী মুসলীম লীগের প্রার্থী হিসেবে স্বাধীনতা পূর্বকালে জাতীয় পরিষদ সদস্য ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

দৈনিক বাংলা, ৩০.৬.১৯৭২

বিচারপতি নূরুল ইসলামের জামিন না'মঞ্জুর

গত ২৭শে জুন ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী দালাল আদেশে ধৃত বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলামের জামিন না'মঞ্জুর করেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ, অভিযুক্ত বিচারপতির পক্ষে দায়রা জজ আদালতে জামিনের জন্য প্রার্থনা করে উল্লেখ করা হয় যে, গত বছর ২৬শে ডিসেম্বর কয়েকজন পুলিশ অফিসার তাঁর বাসভবনে গিয়ে তার নিরাপত্তার জন্যে তাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যান। তখন থেকে তিনি আটক আছেন। অভিযুক্ত বিচারপতির জামিনের বিরোধিতা করে সরকার পক্ষে বলা হয় যে ৯ই জুন থানায় সুনির্দিষ্ট কতিপয় অভিযোগ মোতাবেক তাঁর বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়েছে এবং সেসব অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত চলছে। মাননীয় জজ বাদী ও বিবাদী পক্ষের বক্তব্য শোনার পর অভিযুক্ত বিচারপতির জামিন না'মঞ্জুর করে বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দালাল আদেশের চতুর্থ অনুচ্ছেদের 'খ' ধারা মোতাবেক অভিযোগ রয়েছে এবং এ ধরনের অপরাধের জন্য জামিন দেবার বিধান নেই।

বেতারের আঞ্চলিক ডাইরেক্টর জিল্লুর রহমানের জামিন না'মঞ্জুর

সম্প্রতি ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ জনাব আব্দুল হান্নান চৌধুরী আদেশে ধৃত ও আটককৃত সাবেক রেডিও পাকিস্তানের রিজিওনাল ডাইরেক্টর সৈয়দ জিল্লুর রহমানের জামিনের প্রার্থনা নাকচ করে দেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ, জামিনের জন্য প্রার্থনা করার পর মাননীয় জজ রমনা থানার ওসিকে ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট পাঠাতে নির্দেশ দেন। থানা থেকে রিপোর্ট প্রদান করে বলা হয় যে, স্বাধীনতার পর ঢাকার ডেপুটি পুলিশ সুপার পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর দালালির অভিযোগে জনাব জিল্লুর রহমানকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান।

দৈনিক বাংলা, ৪.৭.১৯৭২

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলা
নাসির আহমেদের সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত

গতকাল ৩রা জুলাই ঢাকার পঞ্চম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্পেশাল জজ জনাব এফ, রহমানের এজলাসে শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার শুনানীর প্রথম দিনে বাদী পক্ষের একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়।

নিহত শহীদুল্লাহ কায়সারের ভগ্নিপতি এবং এই মামলার অভিযোগ প্রদানকারী জনাব নাসির আহমদ তার সাক্ষ্য প্রদানকালে উল্লেখ করেন যে জনাব শহীদুল্লাহ কায়সার মুক্তিসংগ্রামের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ও কর্মী ছিলেন। গত সালের ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর সাত-আটজন লোক তাদের কায়েতটুলির বাস ভবনের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। তাদের কাছে ষ্টেনগান, রাইফেল ও রিভলবার ছিল। তাদের পরনে ছাই রংয়ের পোশাক ছিল। আমি তাদের আল-বদর বাহিনীর লোক বলে বুঝতে পারি। তারা শহীদুল্লাহ কায়সারকে ধরে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী-পুত্র পথ রোধ করে দাঁড়ালে তাদের ষ্টেনের বাট দিয়ে ধাক্কা দেয়া হয়। তারপর জনাব কায়সারকে খোঁজা শুরু হয়। দেশ মুক্ত হবার পর রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে বহু বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায়। কিন্তু তার লাশ পাওয়া যায়নি। পাড়ার মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন যে, আসামী খালেক ঘটনার দিন শহীদুল্লাহ কায়সারের খোঁজ করছিলো এবং আসামী একজন জামাত কর্মী ও বদর বাহিনীর লোক।

বাদী আসামীকে কাঠগড়ায় সনাক্ত করে বলেন যে, তিনি ও মামলার অপর সাক্ষী জাকারিয়া হাবিব আসামীর বাড়ী যান। তার বাড়ী তল্লাশী করা হয় এবং মিলিটারীর সাথে যোগাযোগ সম্বলিত কিছু কাগজপত্র ও কয়েকটি ফটো উদ্ধার করেন। আসামীকে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা গ্রেফতার করে। সাক্ষী তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে শহীদুল্লাহ কায়সারের সহোদর জহির রায়হানের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি এবং সে সমস্ত কাগজপত্রও এখন পাওয়া যাচ্ছে না। জবানবন্দি শেষ হবার পর আসামীর কৌসুলীর জেরার জবাবে নাসির আহমেদ বলেন যে, ঘটনার দিনে টেলিফোন করে থানায় শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণের কথা বলা হয়। সে সময় বস্তুতপক্ষে থানায় কোনো কাজ হতো না। আর একটি প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী বলেন যে, মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার মেজর হায়দারের নির্দেশে আসামীর বাড়ী তল্লাশী ও আসামীকে পরবর্তী সময়ে মুক্তিবাহিনী গ্রেফতার করে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে গোয়েন্দা পুলিশ ঢাকা শহর জামাতে ইসলামীর আব্দুল খালেক মজুমদারের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারা ও দালাল আদেশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের 'খ' ধারা মোতাবেক চার্জশীট দাখিল করেছে। আগামীকাল পুনরায় মামলার শুনানী শুরু হবে।

সরকার পক্ষে সিনিয়র স্পেশাল পিপি খন্দকার মাহবুব হোসেন ও আসামী পক্ষে জনাব সাফকাত হোসেন মামলা পরিচালনা করছেন।

দৈনিক বাংলা, ৪.৭.১৯৭২

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলা : দ্বিতীয় দিনে আটজনের সাক্ষ্য গ্রহণ

গতকাল মঙ্গলবার (৪ জুলাই) ঢাকার পঞ্চম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্পেশাল জজ জনাব এফ রহমানের এজলাসে বদর বাহিনী কর্তৃক শহীদুল্লাহ কায়সার অপহরণ ও হত্যা মামলার শুনানীর দ্বিতীয় দিনে সরকার পক্ষের মোট আটজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়। এইদিনে সাক্ষ্য প্রদান করেন মরহুম শহীদুল্লাহ কায়সারের কনিষ্ঠ সহোদর জাকারিয়া হাবিব, তার স্ত্রী নীলা জাকারিয়া। মরহুমের স্ত্রী সাইফুন নাহার, স্থানীয় মসজিদের ইমাম হাফিজ মোঃ আশরাফউদ্দিন ও আরও তিন ব্যক্তি।

মামলায় সাক্ষ্য প্রদান করে মরহুম শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী সাইফুন নাহার বলেন যে, গত সালের ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর কয়েকজন বদর বাহিনীর লোক তাদের দরজা ভেঙ্গে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। তাদের পরনে ছাই রংয়ের পোশাক ও হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। শহর নিষ্প্রদীপ থাকা সত্ত্বেও তিনি ঘরের আলো জ্বেলে দেন এবং এই ভেবে আতংকিত হয়ে পড়েন যে আল-বদর ও রাজাকাররা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করছে এবং তার স্বামী একজন বুদ্ধিজীবী ও দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে জড়িত। মিসেস সাইফুন নাহার তার সাক্ষ্যে আরও বলেন যে, বদর বাহিনীর তিনজন লোক দোতলা থেকে তার স্বামী ও দেবরকে টেনে নিয়ে যায় এবং তিনি ও অন্যান্যরা চিৎকার করে তাদের ছেড়ে দিতে বলেন। জাকারিয়াকে ছেড়ে দিয়ে বদর বাহিনীর লোক তার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায় এবং আজ পর্যন্ত তাকে পাওয়া যায়নি।

মিসেস সাইফুন নাহার আদালত কক্ষে আসামীকে সনাক্ত করে বলেন যে, সনাক্তকরণ প্যারেড অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে আসামীকে তিনি কখনও দেখেননি এবং খবরের কাগজে তার ছবি বেরিয়েছিল কি না জানেন না।

বাদীপক্ষের ছয় নম্বর সাক্ষী ঢাকা জেলা প্রশাসক অফিসের একজন কর্মচারী আদালতে আসামীর রিভলবারের দরখাস্ত ও লাইসেন্সের ক্রমিক নাম্বার ইত্যাদি পেশ করে বলেন যে, আসামী ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে রিভলবারের লাইসেন্স গ্রহণ করে। তার দরখাস্তটি ঢাকার তদানীন্তন মার্শাল ল সাব সেক্টর অফিসের মেজরকে দিয়ে সুপারিশ করান হয়। রিভলবার কেনার কারণ হিসেবে আসামী তার দরখাস্তে উল্লেখ করে যে, সে জামাত-ই-ইসলামী অফিসের দপ্তর সম্পাদক ও একজন পাকিস্তানপন্থী। দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে নিরাপত্তার জন্যই তার রিভলবার দরকার বলে সে আবেদনে জানায়।

মামলার শুনানীর এক পর্যায়ে আসামী খালেক মজুমদার মিসেস সাইফুন নাহারকে মাননীয় স্পেশাল জজের অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন করেন—ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে আমাকে গ্রেফতার করে আপনাদের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয় এবং আপনি আমাকে ধরে বার বার প্রশ্ন করেন, বল আমার স্বামী কোথায়?

—বলুন এটা সত্য কি না?

সাইফুন নাহার বলেন, না আমি আপনাকে দেখিনি।

মামলার শুনানীর দ্বিতীয় দিনে মাননীয় জজ সাহেবের এজলাসে বিপুল দর্শকের সমাগম ঘটে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ ও হত্যা করার দায়ে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ও দালাল আদেশের কতিপয় ধারা মোতাবেক আবদুল খালেক মজুমদারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আগামীকাল মামলার পুনরায় শুনানী শুরু হবে। এই চাঞ্চল্যকর মামলাটি বাদীপক্ষে স্পেশাল পিপি খন্দকার মাহবুব হোসেন ও আসামী পক্ষে এস এ সাফকাত হোসেন পরিচালনা করেন।

দৈনিক বাংলা, ৫.৭.১৯৭২

দালাল মামলায় পিডিপি নেতা নূরুল ইসলাম চৌধুরী দণ্ডিত

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার দশম স্পেশাল জজ জনাব মাহমুদুল্লা একটি দালালী মামলার রায় প্রদান করেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের পিডিপি দলের সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম

চৌধুরীকে দালাল আদেশের চতুর্থ অনুচ্ছেদের 'খ' ধারা মোতাবেক ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ মাস কারাদণ্ড দান করেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী নূরুল ইসলাম চৌধুরী পাক দখলদার আমলে উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপিএ নির্বাচিত হন। বাদীপক্ষ এ সম্পর্কে তার বিরুদ্ধে দালাল আদেশ মোতাবেক অভিযোগ আনে। মামলায় বাদীপক্ষে আটজন সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন যে, তিনি দালালি করেননি। সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুর নির্যাতন করছিল এবং উপনির্বাচনের পর তারা ব্যারাকে ফিরে যাবে এই ধারণায় তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় স্পেশাল জজ বাদী ও আসামী পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে আসামীকে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে তার রায়ে উল্লেখ করেন যে, আসামী দীর্ঘ ৪৫ বছর রাজনীতি করছে। তার বয়স ও অতীত রাজনৈতিক কর্মধারা বিচার করে তাকে লঘু দণ্ড দিলে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

দৈনিক বাংলা, ৫.৭.১৯৭২

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলা : তৃতীয় দিনে ১২ জনের সাক্ষ্য

গতকাল ৫ই জুলাই ঢাকার পঞ্চম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্পেশাল জজ জনাব এফ, রহমানের এজলাসে আল-বদর বাহিনী কর্তৃক শহীদুল্লাহ কায়সার অপহরণ ও হত্যা মামলার শুনানীর তৃতীয় দিনে বাদীপক্ষের মোট বারোজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা সমাপ্ত হয়। এইদিনে সাক্ষ্য প্রদান করেন মরহুম শহীদুল্লাহর কনিষ্ঠা ভগ্নি সাহানা বেগম, ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সলিমুল্লা, একজন পুলিশ কর্মচারী ও মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জনাব এ, কে, এম শামসুদ্দীন।

মরহুমের ভগ্নি সাহানা বেগম তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, বদর বাহিনীর লোক তাদের বাড়ীর দরোজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে এবং তাঁর বড়দা শহীদুল্লাহ কায়সারকে ধরে নিয়ে যায়। সাহানা বেগম এজলাসে আসামীকে সনাক্ত করেন।

আসামী পক্ষের কৌসুলীর প্রশ্নের জবাবে সাহানা বেগম বলেন যে তিনি টিআই প্যারেডের পূর্বে আসামীকে কখনও দেখেননি। আসামীর কৌসুলী এ সময় আদালতে গত সালের ২৪শে ডিসেম্বরের দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক পূর্বদেশ আদালতে পেশ করেন। উক্ত দুটি কাগজে আসামী আবদুল খালেক মজুমদারের ছবি সমেত মুক্তিবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার খবর ছাপা হয়েছিল।

আগামীকাল মামলার শুনানী পুনরায় শুরু হবে। মামলাটি সরকার পক্ষ সিনিয়র স্পেশাল পিপি খন্দকার মাহবুব হোসেন ও আসামী পক্ষে এস, এম, সাফকাত হোসেন ও চৌধুরী তাহের আহমদ পরিচালনা করেছে।

দৈনিক বাংলা, ৬.৭.১৯৭২

ফজলুল কাদের চৌধুরীর বিরুদ্ধে চার্জশীট

চট্টগ্রাম, ৬ জুলাই (বাসস), পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর সাথে হত্যাযজ্ঞ, বিনাদোষে আটক প্রভৃতি কাজে সহযোগিতা করার দায়ে কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি

ফজলুল কাদের চৌধুরীর বিরুদ্ধে দালাল আদেশ বলে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ওয়াকিবহাল মহল সূত্রে জানা গেছে যে, জনাব চৌধুরীর ২১ জন সহকর্মী এখনো আত্মগোপন করে রয়েছেন। তাদের শীঘ্রই পলাতক বলে ঘোষণা করা হবে।

দালাল আদেশ বলে
ফকা চৌধুরীর বিরুদ্ধে চার্জশীট

গত বছর ১৬ই ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ১১০০ মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার মধ্যে দালাল আদেশ অনুসারে এ পর্যন্ত দেড়শ মামলায় চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানান হয়েছে।

দৈনিক বাংলা ৭.৭.১৯৭২

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার শেষ শুনানী

গতকাল শুক্রবার ঢাকার পঞ্চম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল জজ জনাব এফ রহমানের এজলাশে শহীদুল্লাহ কায়সার অপহরণ ও হত্যা মামলার শুনানী শেষ হয়। মাননীয় স্পেশাল জজ এই চাঞ্চল্যকর বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলাটির আগামী ১৭ই জুলাই রায় দানের দিন ধার্য করেন।

সরকার পক্ষের সাক্ষ্য প্রদান শেষ হবার পর ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেক আসামীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পড়ে শোনানোর পর পাঞ্জাবী, পায়জামা ও টুপি পরিহিত আসামী আবদুল খালেক মজুমদার জজ সাহেবের প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, সে নির্দোষ এবং তাকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে।

বাদীপক্ষের সিনিয়র স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার খন্দকার মাহবুব হোসেন যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করে বলেন যে আসামীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণে তার অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী বেগম শহীদুল্লাহ কায়সার এবং মরহুমের ভগ্নি ও ভ্রাতৃবধূ আসামীকে সনাক্ত করেন। আসামী পক্ষের কৌসুলী জনাব সাফকাত হোসেন বলেন যে অভিযুক্ত আবদুল খালেক মজুমদার জামাতে ইসলামীর দফতর সম্পাদক ও বেতনভুক্ত কর্মচারী কিন্তু জামাতের কর্মী হলেই সে দালাল আদেশে সাজা পাবে এর কোন কারণ নেই। সাক্ষীরা সবাই একত্রে মনে হয় কিছু চেপে গেছেন এবং তাদের বক্তব্যের মধ্যে গরমিল আছে।

আসামী পক্ষের কৌসুলী আরও বলেন যে, পাক সামরিক চক্র সে সময় দেশে অমানুষিক নির্যাতন করেছে এবং আল-বদর ও রাজাকাররা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। জামাতে ইসলামী দলের প্রতি একটা প্রচণ্ড ঘৃণা ও প্রিয়জনকে হারানোর নিমিত্ত সাক্ষীদের মনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে সেই ঘৃণা ও বেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশ হয়েছে আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানে।

দৈনিক বাংলা, ৮.৭.১৯৭২

আহমদ আলী মণ্ডল ও মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানী

গতকাল শুক্রবার ঢাকার অষ্টম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে জনাব মোঃ আজিজুর রহমানের এজলাশে কাউন্সিল মুসলিম লীগের মোঃ সিরাজুদ্দিন ও দশম স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে জনাব মোহামুদুল্লার এজলাশে পিডিপি নেতা আহমদ আলী মণ্ডলের বিরুদ্ধে দালালি মামলাদ্বয়ের শুনানী হয়।

মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ও আহমদ আলী মণ্ডলের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক মামলায় গোয়েন্দা পুলিশ একই ধরনের দালালি করার অভিযোগে চার্জশীট দাখিল করেছে। এরা উভয়েই দখলদার আমলে উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য মনোনয়ন করে। মোঃ সিরাজ উদ্দিন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয় কিন্তু আহমদ আলী মণ্ডলের আসনে অপর একজন পিডিপি প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়।

উপরোক্ত দুটি মামলায় সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন যথাক্রমে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার জনাব এ, কে, এম খলিলুর রহমান ও এ, বি, এম রফিকুল্লাহ এবং আসামীর পক্ষে জনাব মোহাম্মদ আজম ও জনাব মহিউদ্দিন আহমদ।

দৈনিক বাংলা, ৮.৭.১৯৭২

ঢাকা শহর কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ ফয়েজ বখসের বিচার

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার নবম স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল স্পেশাল জজ জনাব শেখ খোরশেদ আলীর এজলাসে একটি দালালি মামলার রায়ে সাবেক ঢাকা শহর কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ ফয়েজ বখসকে দখলদার পাক বাহিনীর দালাল হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও আট হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

মামলার বাদীপক্ষে আসামী ফয়েজ বখসের বিরুদ্ধে তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ ও দালালির জন্য অভিযোগ আনা হয়। আসামী নিজের দোষ অস্বীকার করে বলে যে তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী খাজা খয়ের উদ্দিন ও মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন এরা জোর পূর্বক সাদা কাগজে তার দস্তখত নেয় এবং সেই জালিয়াতি কাগজ দাখিল করে নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার দেখায়।

মামলায় বাদী ও বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে মাননীয় জজ আসামীকে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে উল্লেখ করেন যে যখন সমস্ত জনসাধারণ স্বাধীনতার পক্ষে তখন আসামীর উপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা পাক দখলদার বাহিনীর অবৈধ দখল কায়েম রাখার জন্য ভুয়া গণপ্রতিনিধির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয়।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন স্পেশাল পিপি রিয়াজউদ্দিন আহমদ ও আসামী পক্ষে এডভোকেট শাহজাহান খান।

দৈনিক বাংলা, ১২.৭.১৯৭২

খুলনায় দালালি মামলায় ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

খুলনা, ১৪ই জুলাই (বাসস), হত্যা ও পাক বাহিনীর ঘৃণ্য দালালির অপরাধে খুলনায় এক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল পাঁচ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত এই পাঁচজন অপরাধীর নাম যথাক্রমে আবদুর রশীদ মোল্লা, আবদুল হামিদ শেখ, কেরামুদ্দীন সর্দার, রিয়াজুল শেখ ও ইঞ্জিল শেখ।
জনাব কে, এফ আকবরের নেতৃত্বে গঠিত এই বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারে উক্ত আসামীদের বাংলাদেশ ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০৪ এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের ১৯৭২ সালের ৮ নং অর্ডারের ১১ ক ধারা অনুযায়ী অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়।
সাজাপ্রাপ্ত সকলেই রাজাকার ছিল। এদের মধ্যে আবদুর রশীদ মোল্লা ছিল পতেঙ্গা হাই স্কুলে অবস্থিত রাজাকার ক্যাম্পের কমান্ডার। সরফরাজ নামক একজন মুক্তিযোদ্ধা ও তেরখাদা কলেজের একজন বি, এ ক্লাশের ছাত্র হত্যার অপরাধে এরা অপরাধী প্রমাণিত হয়।

দৈনিক বাংলা, ১৫.৭.১৯৭২

রাজাকার কমান্ডার ফিরোজের আত্মসমর্পণ

গতকাল শনিবার ঢাকায় জেলা ও দায়রা জজ জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরীর এজলাসে রাজাকার কমান্ডার হিসেবে পাক দখলদার বাহিনীর দালালি করার অভিযোগে অভিযুক্ত ফিরোজ আহমদ আত্মসমর্পণ করলে মাননীয় জজ ফিরোজ আহমদের জামিন বাতিল করে তাকে জেল হাজতে থাকার নির্দেশ দিয়ে আগামী ২২শে জুলাই মামলাটির শুনানীর দিন ধার্য করেন।
মামলার বিবরণে প্রকাশ, ফিরোজ আহমদ গত ২৪শে জুন দায়রা আদালতে জামিনের জন্য প্রার্থনা করলে বিজ্ঞ জজ রমনা ওসির নিকট তদন্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর গত ৬ই জুলাই বিজ্ঞ জজ আসামীকে তিন হাজার টাকা জামিন মঞ্জুর করে তার নির্দেশে উল্লেখ করেন, তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের রিপোর্টে প্রতিভাত হয়েছে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দালালির কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নাই।
গত ১৩ই জুলাই ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল পি, পি খন্দকার মাহবুব হোসেন সরকার পক্ষে আসামীর শুনানী নাকচ করার জন্য প্রার্থনা করলে বিজ্ঞ জজ আসামী ফিরোজকে গতকাল আদালতে হাজির করার জন্য পুলিশ ও ফিরোজের জামিনদারকে নির্দেশ দেন। আসামী স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে।

দৈনিক বাংলা, ১৬.৭.১৯৭২

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলা : জামাত নেতা খালেকের ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা

গতকাল ১৭ই জুলাই ঢাকার পঞ্চম স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল পাক হানাদার বাহিনীর দোসর আল-বদর বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবী নিধন মামলায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার রায় প্রদান করে বেআইনী জামাতে ইসলামীর বেতনভুক্ত দফতর সম্পাদক এ, বি, এম আবদুল খালেককে দোষী সাব্যস্ত করে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দান করেন।

মাননীয় স্পেশাল জজ জনাব এফ, রহমান আসামীকে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৬ নং ধারা ও দালাল আদেশের দ্বিতীয় তফসিলের কতিপয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড প্রদান করে বলেন যে, আসামী হত্যা করার জন্য পাক বাহিনীর দালাল হিসেবে শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করেছে। এই চাঞ্চল্যকর অপহরণ ও হত্যা মামলায় অভিযোগ আনা হয় যে, আল-বদর বাহিনীর সদস্য ও জামাতে ইসলামীর দফতর সম্পাদক হিসেবে আসামী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দখলদার পাক বাহিনীর অবৈধ দখল কায়েম রাখার জন্য তাদের সমর্থন ও সাহায্য করে। তার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগে বলা হয় যে, গত ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর আসামী চার/পাঁচজন আল-বদর সদস্য সাথে করে নিহত শহীদুল্লাহ কায়সারের বাড়ির দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে দোতলার একটি ঘর থেকে মরহুমকে ধরে নিয়ে যায় হত্যা করার উদ্দেশ্যে। আসামীদের হাতে স্টেনগান, রিভলবার ইত্যাদি অস্ত্র ছিল এবং বাড়ির মহিলারা চিৎকার করে বাধা দিলে তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। তখন কারফিউ বলবৎ ছিল। দেশ শত্রুমুক্ত হবার পর বহু তল্লাশী করার পর মরহুমের লাশ পাওয়া যায়নি। ২০শে ডিসেম্বর থানায় এজাহার দায়ের করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে গোয়েন্দা পুলিশ আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে।

মামলায় সরকার পক্ষে তেরোজন সাক্ষ্য প্রদান করেন। তন্মধ্যে মরহুমের স্ত্রী, বোন, ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী এরা আসামীকে সনাক্ত করে বলেন যে, অপহরণকারী আল-বদর বাহিনীর মধ্যে আসামীও ছিল। আসামী ছোট কাটারা মুক্তিবাহিনী কর্তৃক ধৃত হবার পর তার ছবি কাগজে ছাপা হয়েছিল এ জন্য সাক্ষীরা আসামীর ছবি দেখে সনাক্ত করেছে। আসামী পক্ষের কৌসুলীর এই যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে বিজ্ঞ জজ বলেন যে, সাক্ষীরা শিক্ষিত এবং তাদের অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

জজ সহেব রায়ে আরও উল্লেখ করেন যে, দখলদার আমলে আসামী রিভলবারের লাইসেন্সের জন্য যে দরখাস্ত করেছে তাতে সে নিজেই নিজেকে পাকিস্তানবাদী বলে উল্লেখ করেছে, তাছাড়া সরকার পক্ষের একজন বিশ্বাসী সাক্ষী বলেছেন যে, আসামী কারফিউ-এর সময় রাতে এমনকি পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের পূর্বের রাতেও ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু জজ সাহেব প্রশ্ন রাখেন পাক বাহিনীর দালাল ছাড়া সে সময় অমনভাবে ঘোরা সম্ভব ছিল কি?

সংবাদ পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ও অন্যতম সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার রায় শোনার জন্য বিপুল দর্শকের আগমন হয়।

মামলাটি সরকার পক্ষে সিনিয়র স্পেশাল পিপি খন্দকার মাহবুব হোসেন ও আসামী পক্ষে এডভোকেট এম. এম সাফকাত হোসেন পরিচালনা করেন।

দৈনিক বাংলা, ১৮.৭.১৯৭২

৩ জন দালাল মন্ত্রীর বিরুদ্ধে পুলিশের তদন্ত

গত বছর বাংলাদেশ সামরিক অভিযান চলাকালে সামরিক জান্তার দালাল ডাঃ মালেকের সাক্ষী গোপাল মন্ত্রীসভার তিনজন মন্ত্রী সর্বজনাব মুজিবুর রহমান, নওয়াজিস খান ও জসিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে পুলিশের তদন্ত সমাপ্ত হয়েছে। ডাঃ মালেকসহ এসব দালাল মন্ত্রীরা বর্তমানে আটক রয়েছে।

ব্যাপক তদন্তের পর এদের সকলের বিরুদ্ধেই বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১২১ ধারা মতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার ও দেশদ্রোহের অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে। সপ্তাহকালের মধ্যে পুলিশ এদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করবে বলে প্রকাশ।

দৈনিক বাংলা, ২৬.৮.১৯৭২

কালিগঞ্জ থানার তৎকালীন ওসি ও শান্তি কমিটি কর্মকর্তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে একটি চাঞ্চল্যকর দালালি মামলার রায়ে স্পেশাল জজ জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী হানাদার পাক বাহিনীর দালাল হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে ঢাকার কালিগঞ্জ থানার ওসি ইউসুফ আলী চৌধুরী ও থানা শান্তি কমিটির সেক্রেটারী শামসুর রহমান মোল্লা ওরফে শাহাজাহানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন। মামলায় বাদী পক্ষের অভিযোগে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনী অমানুষিক পশুশক্তির দ্বারা এদেশকে দখলে রাখে। বিদেশ হানাদারমুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত দখলদার বাহিনীর সাথে কিছু লোক সহায়তা করে এবং মুক্তিসংগ্রামে সমস্ত দেশবাসী যখন লিপ্ত তখন সংগ্রামের প্রতি অন্ধ থেকে এরা দখলদারদের অবৈধ দখল কায়েম রাখার জন্য পাক বাহিনীর দালালী করে। আসামীদের বিরুদ্ধে দালাল আদেশের কতিপয় ধারা অনুযায়ী অভিযোগ ছাড়াও বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারা মোতাবেক অভিযোগ এনে বলা হয় যে, ১৯৭১ সালের ১৭ই জুন আসামীরা দখলদার পাক বাহিনী কর্তৃক কালিগঞ্জ থানার নগর নরসিংহ গ্রামের ষোলটি ঘর পুড়িয়ে দিতে সাহায্য করে যা দ্বারা তিনলক্ষ টাকার ক্ষতি হয়।

এই দালালি মামলায় সরকার পক্ষে মোট দশজন সাক্ষ্য প্রদান করেন। আসামীরা নিজেদের দোষ অস্বীকার করে নির্দোষ বলে দাবী করে।

মামলার বাদী ইমদাদ আলী মোল্লা তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি একজন আওয়ামী লীগার ও ২৫শে মার্চের পর তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং স্থানীয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলেন। আসামীরা সেই সময় কালিগঞ্জ থানার ওসি ও শান্তি কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করত। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আসামী দারোগা তাকে থানায় ডেকে মিলিটারীর সাথে সহায়তা করার জন্য ভীতি প্রদর্শন করে এবং ঢাকার গুলিস্তান রেস্তোরাঁর সামনে দেখা করতে বলে। এখানে দারোগার সাথে দেখা করার পর দারোগা তার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবী করে এবং ৮ জন যুবতী মেয়ে সংগ্রহ করে দিতে বলে। অসম্মতি প্রকাশ করায় আসামীরা গ্রামে মিলিটারী নিয়ে যেয়ে বাদীর ঘরবাড়ী সমেত ১৬টি বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। বাদী ভারতে পালিয়ে যায় ও দেশ মুক্ত হবার পর ফিরে এসে এজাহার দাখিল করে।

মামলায় সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে মাননীয় জজসাহেব তাঁর রায়ে উল্লেখ করেন যে আসামী শামসুর রহমান দখলদার আমলে পিস্তলের লাইসেন্স নেয়। বাঙালিদের নিকট থেকে যখন আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেয়া হচ্ছিল তখন তাকে পিস্তলের লাইসেন্স দালাল হিসেবেই প্রদান করা হয়েছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। আসামী ইউসুফ আলী চৌধুরী

শুধু টাকা নয় হানাদার বাহিনীর জন্য মেয়ে সংগ্রহ করতেও চেষ্টা চালায় তাদের সুনজরে থাকার জন্য। তাছাড়া দখলদার বাহিনী বিদেশী। আসামীরা তাদের চিনিয়ে না দিলে মুক্তিকামীদের এতগুলো বাড়ী পোড়ানো হানাদার বাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সিনিয়র স্পেশাল পিপি খন্দকার মাহবুব হোসেন ও আসামী পক্ষে এডভোকেট আবদুল গনি সরকার।

দৈনিক বাংলা, ৮.৯.১৯৭২

বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলা

ডঃ আজাদের ভ্রাতার সাক্ষ্য গৃহীত—গতকাল সোমবার ঢাকার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্পেশাল জজ জনাব এসএম সিরাজুদ্দিনের এজলাসে আল-বদর কর্তৃক বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলায় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডাঃ এম. এ. কে. আজাদ হত্যা মামলার শুনানী শুরু হয়। মামলায় শুনানীর প্রথম দিনে মরহুম আজাদের কনিষ্ঠ সহোদর ঢাকার ইভনিং পোস্টের সম্পাদক জনাব হাবিবুল বাশার তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তাঁর ভাই উচ্চতর কারিগরি ও বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে একজন গবেষক-শিক্ষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর তাঁর ভাই ডঃ আজাদ, মা ও অন্যান্য ভাইবোন সমেত আজিমপুরের দায়রা শরিফের একটি বাড়িতে বাস করছিলেন। তিনি সস্ত্রীক ঐ বাড়ীরই নিকটস্থ অন্য একটি বাড়িতে থাকতেন। ভাই-এর অপহরণের খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি ছুটে আসেন এবং আসামী জুবায়েরকে দেখতে পেয়ে তাকে ভাইয়ের খবর জিজ্ঞাসা করায় সে জানায় যে ডঃ আজাদকে আজিমপুরস্থ শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হাজী কাসেমের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাজী কাসেমের বাড়ী যাওয়ার পর ডাঃ আজাদের কোনো খবর না পাওয়ায় তিনি থানায় টেলিফোন করেন। তারপর বাড়ী আসার পর তাঁর মা ও অন্যান্য ভাইবোন যারা ডঃ আজাদকে অপহরণ করার সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা জানান যে চার-পাঁচ জন অস্ত্রধারী আল-বদরকে আসামী জুবায়ের তাদের বাড়ি দেখিয়ে দেয়, আল-বদররা বাড়ী ঢুকে সমস্ত ঘর তল্লাশী করার পর ডঃ আজাদকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতিকারীরা তাঁর মা ও বোনদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

বাদী তার সাক্ষ্যে আরও উল্লেখ করেন যে, আল-বদর বাহিনী ঐ একই সময়ে তাঁদের বাড়ীর সম্মুখস্থ অপর একটি বাড়ী থেকে জনাব মুস্তাফিজুর রহমানের দুই ভাই মতি ও মন্টুকে ধরে নিয়ে যায়। মন্টু নিহত হয় এবং মতি জীবন্ত ফিরে আসে। এর কাছ থেকে খবর জানার পর রায়েরবাজার বধ্যভূমি থেকে ডঃ আজাদের মৃতদেহ আনা হয়। মৃতদেহের গায়ে বুলেট ও বেয়নেটের মারাত্মক জখম চিহ্ন ছিল। তাঁকে উপুড় করা হয় এবং দুটি হাত বেঁধে রাখা হয়।

আসামী পক্ষের একজন কৌশুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী হাবিবুল বাশার বলেন যে মুসলিম লীগার ওয়াহিদুজ্জামানের এক পুত্র তার পত্রিকার সাথে প্রায় মাস খানেকের জন্য যুক্ত ছিল। ২৫শে মার্চের পর তিনি পত্রিকা বন্ধ করে দেন কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার পর পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশ করা শুরু করেন। কৌশুলীর অপর একটি প্রশ্নের

জবাবে তিনি বলেন যে তাঁর স্ত্রী বার্মিজ বংশোদ্ভুত এবং তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ীরা করাচীতে বাস করছেন একথা সত্য নয়। আর একটি প্রশ্নের জবাবে বাদী বলেন যে ১৯৭১ সালের মে মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য দশজন পত্রিকা সম্পাদকের সাথে তিনিও সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে করাচীতে একটি কনফারেন্সে যোগদান করেছিলেন।
ডঃ আজাদ হত্যা মামলায় গোয়েন্দা পুলিশ মকবুল হোসেন, আয়ুব আলী ও জুবায়েরের বিরুদ্ধে নরহত্যা, অপহরণ ও দালালির জন্য চার্জশীট দায়ের করেছে।
বাদীর জেরা সমাপ্ত হবার পূর্বেই পরবর্তী দিনের জন্য মামলার শুনানী মুলতবী রাখা হয়।
বাদীর পক্ষের স্পেশাল পিপি আবদুর রাজ্জাক খান ও আসামী জুবায়ের, মকবুল হোসেন ও আয়ুব আলীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন যথাক্রমে মোঃ আজম, জোয়ারদার ও ফয়জুদ্দীন।

দৈনিক বাংলা, ১২.৯.১৯৭২

শুনানীর ২য় দিনে তিনজনের সাক্ষ্য ও জেরা

গতকাল ঢাকার স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে স্পেশাল জজ জনাব এস. এম সিরাজুদ্দিনের এজলাসে আল-বদর কর্তৃক বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলার দ্বিতীয় দিনে বাদী পক্ষে মোট তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়। এইদিন বাদীর জেরা শেষ হবার পর মরহুম ডঃ আজাদের ভগ্নিপতি জনাব সিরাজুল হক ও সহোদর জাকির হোসেনের সাক্ষ্য প্রদান করার পর কৌশুলী পক্ষকে জেরা করা হয়। সরকার পক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী জনাব সিরাজুল হক বলেন যে, দেশ শত্রুমুক্ত হবার পূর্বের দিন অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর ডঃ আজাদের অপহরণের খবর পাবার পর তিনি শ্বশুরবাড়ীতে ছুটে আসেন এবং শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়ের কাছে জানতে পারেন যে, কয়েকজন খাকি পোশাকধারী আল-বদরের লোক ডঃ আজাদকে ধরে নিয়ে গেছে।
গতকালের উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী জাকির হোসেন বলেন যে, ঘটনার দিন সকালে তিনি বাথরুম থেকে বেরোনর পর ফিসফাঁস শব্দে জানালা খুলে দেখতে পান পাঁচজন খাকি পোশাকধারী লোক অস্ত্রশস্ত্র সমেত জোবায়ের-এর সাথে কথা বলছে। তারপর খাকি পোশাক পরা লোকগুলো দরজা ধাক্কা দেয় এবং ডঃ আজাদ দরজা খুলে দেবার পর তারা প্রবেশ করে বলে যে, আপনি ডঃ আজাদ? মরহুম হ্যাঁ সূচক জবাব দেবার পর তারা সমস্ত বাড়ী তল্লাশী করে এবং ডঃ আজাদকে নিয়ে যাবার সময় মরহুমের মা কোহিনূর বেগম ও অন্যরা বাধা দিলে তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হয়। তারপর সাক্ষী ভাই হাবিবুল বাশারের বাড়ী ছুটে যেয়ে তাকে খবর দেয়।
সাক্ষী জাকির হোসেন বলেন যে, আসামীদের মুখে রুমাল ও মাফলার জড়ানো ছিল। তবে কথা বলার সময় তাদের মুখ দেখা গেছে। একজন আসামীর চোখে একটি কালো গগলাস ছিল। জাকির হোসেন আদালত কক্ষে আসামীদের সনাক্ত করেন। এ সময় আসামী পক্ষের একজন কৌশুলী আপত্তি দাখিল করেন।
আসামী জুবায়ের-এর কৌশুলী মোহাম্মদ আজমের একটি জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, তিনি মিথ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন না এবং ঘটনার সময় তিনি নিদ্রিত ছিলেন না।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন স্পেশাল পিপি আবদুর রাজ্জাক খান, আসামী মকবুল হোসেনের পক্ষে এ এম জোয়াদার, আয়ুব আলীর পক্ষে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এডভোকেট ফয়জুদ্দীন ভুইয়া।

দৈনিক বাংলা, ১৩.৯.১৯৭২

দালালির দায়ে শিক্ষক গ্রেফতার

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ডঃ সৈয়দ শফিউদ্দিন সাবেরকে পুলিশ গতকাল দালালির দায়ে গ্রেফতার করে।

দৈনিক বাংলা, ১৬.৯.১৯৭২

বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলা : ডঃ আজাদের মা ও বোনের সাক্ষ্য

গত বৃহস্পতিবার ঢাকা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে জনাব এস, এম সিরাজুদ্দিনের এজলাসের ডঃ আজাদ হত্যা মামলার শুনানীর চতুর্থ দিনে মরহুম ডঃ আজাদের মাতা মিসেস কোহিনূর বেগম, কনিষ্ঠা ভগ্নী সেলিনা ও সালমা সমেত মোট দশজনের সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হয়। এই মামলার অন্যতম আসামী আইয়ুব আলীর বাসস্থানের স্থানীয় ফুলপুর থানার কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রামবাসী স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন যে, আইয়ুব আলী দখলদার আমলে উক্ত এলাকার একজন রাজাকার ছিল। সে দখলদার বাহিনীর নির্দেশে সেতু পাহারা দিত এবং জনসাধারণের পকেট তল্লাশী করত। ময়মনসিংহের ফুলপুর থানার তৎকালীন ওসি সাক্ষ্য প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, তিনি আসামী আইয়ুব আলীর চরিত্র ও পূর্বাপর কার্যকলাপ তদন্ত করে বুঝতে পারেন যে, সে একজন রাজাকার।

মরহুম আজাদের মা সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন যে, ঘটনার দিন তার পুত্রের অপহরণ সম্পূর্ণভাবে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। আজাদকে যখন নিয়ে যায় তখন অপহরণকারী একজনকে জড়িয়ে ধরে বলেন, বাবা তোমরা সবাইতো বাঙালি, বল আমার ছেলেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? কিন্তু তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়।

বাদী পক্ষের দশম সাক্ষী মিস সালমা সোবহানের সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হবার পর আদালতের অধিবেশন গতকালের মতো শেষ হয়।

বাদী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন স্পেশাল পি.পি. আব্দুর রাজ্জাক খান ও আসামী জুবায়েরের পক্ষে এডভোকেট মোহাম্মদ আজম, আসামী আইয়ুব আলীর পক্ষে সরকার নিযুক্ত উকিল ফয়জুদ্দিন ভুঁইয়া ও আসামী মকবুল হোসেনের পক্ষে এডভোকেট এ. এম. জোয়ারদার।

দৈনিক বাংলা, ১৬.৯.১৯৭২

মহাখালীর কুখ্যাত আল-বদর কমান্ডার সৈয়দ মোহাম্মদ রিজভী গ্রেফতার

মহাখালীর কুখ্যাত আল-বদর কমান্ডার সৈয়দ মোহাম্মদ রিজভী (৪৫) গতকাল মঙ্গলবার ধরা পড়েছে।

তেজগাঁ থানার সাব-ইন্সপেক্টর জনাব মোহাম্মদ আলী ও সাব-ইন্সপেক্টর খন্দকার সাইফুল হুদা এই কুখ্যাত দালালটিকে মৌলভীবাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করেন। রিজভীকে ২৯নং আবুল খায়ের রোড থেকে ধরা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে এই কুখ্যাত অবাঙালি দালালটি ছিল আল-বদর কমান্ডার ও মহাখালী শান্তি কমিটির সদস্য। এই আল-বদর পশুটি মহাখালী এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে। পাক বাহিনীর অফিসারদের নারী নির্যাতনের সহযোগী ছাড়াও হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের কয়েকটি মামলা রয়েছে এর বিরুদ্ধে।

আল-বদর রিজভীকে গ্রেফতার করার পর তেজগাঁ থানায় বহুলোকের ভিড় হয়ে যায় এবং থানায় বিশেষ পুলিশ প্রহরা মোতায়েন করতে হয়।

এই কুখ্যাত নরপশুর গুলিতে পঙ্গু বেশ কয়েকজন তরুণ ও মাঝারি বয়সের লোক থানায় আসেন। রিজভী নিজের হাতে তাদেরকে গুলি করেছিলো। এদের একজনের তলপেটে এখনো গুলি রয়েছে। অন্যজনের পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এছাড়া বহু মুক্তিযোদ্ধাকে সে গুলি করে মেরেছে বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

দৈনিক বাংলা, ২০.৯.১৯৭২

খুলনার কেয়ামতুল্লা ফারাজীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

খুলনা, ২১শে সেপ্টেম্বর। গতকাল এখানে দু'নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারে হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিপন্থী ভূমিকা গ্রহণের অভিযোগে কেয়ামতুল্লা ফারাজী নামক এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। হানাদার পাক বাহিনীর এই দালালদের বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগের আর একটি পৃথক অভিযোগে তাকে আরও পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, দখলদার বাহিনীর আমলে এই পাক দালাল কেয়ামতুল্লা ফারাজী দু'ট্রাক বোঝাই পাক সৈন্য নিয়ে গত ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে একদিন গিলজঙ্গা গ্রামে যায়। আসামী কেয়ামতুল্লা ফারাজীর সহযোগিতায় হানাদার সৈন্যরা ঐ গ্রামের ছ'ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং একই বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে।

দৈনিক বাংলা, ২২.৯.১৯৭২

দালাল গভর্নর মালেক ও তার মন্ত্রীদের বিচারের সূচনা

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ এ, এম, মালেকের বিচার শুরু হচ্ছে। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এই দেশদ্রোহীর বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশীট তৈরী করেছে। দখলদার পাক বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বাংলাদেশ দালাল আদেশ অনুযায়ী পুলিশ তার বিরুদ্ধে চার্জশীট তৈরী করে। এই একই অভিযোগে ডাঃ মালেকের তথাকথিত মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধেও চার্জশীট তৈরী হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সরকারী সূত্রে একথা জানা গেছে বলে বাসস পরিবেশিত এ খবরে উল্লেখ করা হয়। এক বিশেষ সিনিয়র ট্রাইব্যুনালে খুব শিগগিরই ডাঃ মালেক ও তার

অন্যান্য সহযোগিদের বিচার শুরু হবে। জনাব আব্দুল হান্নান চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এদের বিচার হবে। বাংলাদেশ ও মিত্রবাহিনীর যৌথ বিমান আক্রমণের সময় গত ১৩ই ডিসেম্বর আসামী ডাঃ এ, এম মালেক ও তার তথাকথিত মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য ঐ সময় নিরপেক্ষ এলাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দখলদার পাকিস্তানী বাহিনী যুক্ত কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণের পর ডাঃ মালেক ও তার সহযোগিদের জেল হাজতে পাঠানো হয়।

দৈনিক বাংলা, ২৭.৯.১৯৭২

নিজামুদ্দীন রাজাকারের কারাদণ্ড

গতকাল ২৬শে সেপ্টেম্বর ঢাকার তৃতীয় স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের জজ বাবু এস বি বড়ুয়া ঢাকার কালিয়াকৈর থানার কাঁচারস গ্রামের মোহাম্মদ নিজামুদ্দীনকে রাজাকার হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে প্রেসিডেন্টের দালাল আদেশ অনুযায়ী ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দান করেন।

এই মামলার বাদী আবুল বাশার আসামীর বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দায়ের করেন। তিনি তার অভিযোগে বলেন যে, তিনি কালিয়াকৈর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আসামীকে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাইফেলসহ রাজাকারের পোশাকে সেতু পাহারা দিতে দেখেন। বিগত যুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণের সময় সে রাইফেল ও কিছু অস্ত্র সমেত তার গ্রামের বাড়ী যায় এবং তাকে ধরা হয়।

স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে আসামী পক্ষে বলা হয় সে মুক্তিবাহিনীর ইঙ্গিতে রাজাকার হিসেবে যোগদান করে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে।

মাননীয় স্পেশাল জজ আসামীকে রাজাকার হিসেবে দোষী করে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে উল্লেখ করেন যে, আসামী কর্তৃক মুক্তিবাহিনীর ব্যাটেলিয়ান কমান্ডিং অফিসার মিঃ আফসারউদ্দিন আহমদ দায়েরকৃত সার্টিফিকেটে প্রকৃত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ইত্যাদি ঘষে উঠানো হয়েছে এবং স্পষ্টত আসামীর নাম ধাম জালিয়াতী করে লেখা হয়েছে।

সরকার পক্ষে স্পেশাল পিপি জনাব এম এ সোবহান ও আসামী পক্ষে জনাব আবদুল মোমেন মামলা পরিচালনা করেন।

দৈনিক বাংলা, ২৭.৯.১৯৭২

ডঃ আজাদ হত্যা মামলার শেষ সওয়াল-জবাব

গত মঙ্গলবার ঢাকায় দুই নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের জজ সৈয়দ সিরাজউদ্দিন আহমেদের কোর্টে আল-বদর কর্তৃক বুদ্ধিজীবী হত্যা মামলায় বাংলার কৃতী সন্তান অঙ্কশাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ এম এ কে আজাদ হত্যা মামলার সওয়াল-জবাব শেষ হয়। ট্রাইব্যুনাল আজ (বৃহস্পতিবার) এই মামলার রায় প্রদান করিবেন।

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর চার-পাঁচজন অস্ত্রধারী আল-বদরকে আসামী জুবায়ের ডঃ আজাদের বাসা দেখাইয়া দেয়। তখন আল-বদররা ডঃ আজাদের ৪৪ নং আজিমপুরের বাসায় প্রবেশ করিয়া ডঃ আজাদকে তাঁহার মা, ভাই বোনদের সম্মুখ হইতে জোরপূর্বক ধরিয়া লইয়া যায়। বাধা দিতে গেলে দুষ্কৃতিকারীরা তাহার মা ও বোনদের ধাক্কা দিয়ে ফেলিয়া দেয়। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার দুইদিন পর তাহারা রায়ের বাজারের একটি গর্ত হইতে ডঃ আজাদের মৃতদেহ উদ্ধার করেন। দেহে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের অনেক আঘাত ছিল।

আসামী মকবুলের উকিল জনাব জোয়ারদার ট্রাইব্যুনালের যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া বলেন, ডঃ আজাদের বাসার লোকজন ঠিকমতো তাহার আসামীকে সনাক্ত করিতে পারেন নাই এবং সরকার পক্ষ কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষী কোর্টে আনয়ন করেন নাই। আসামী আইয়ুব আলীর পক্ষে সরকারী উকিল জনাব ফয়েজউদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, সাক্ষী আবুল হোসেন ব্যতীত অন্য কোনো সাক্ষী তাহার আসামীকে সনাক্ত করেন নাই। সরকার পক্ষ তাহার আসামীর বিরুদ্ধে মামলা ঠিকমতো প্রমাণ করতে পারেন নাই।

আসামী জুবায়েরের উকিল জনাব মোঃ আযম যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন : আল-বদরের লোক জোর করিয়া জুবায়েরকে ডঃ আজাদের বাসা দেখাইয়া দিতে বলিয়াছে। এই মামলায় সরকার পক্ষে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার জনাব আবদুর রাজ্জাক খান যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, ২৬ জন সাক্ষী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন এই আসামী ডঃ আজাদকে অপহরণ করিয়া হত্যা করিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৫.১০.১৯৭২

জামায়েত ইসলামীর নেতা ও একাত্তরের মালেক মন্ত্রিসভার সদস্য মওলানা এ কে এম ইউসুফের বিচার

গত মঙ্গলবার (৩ অক্টোবর '৭২) সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব মন্ত্রী জনাব মওলানা এ কে এম ইউসুফের এক নম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের জজ জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরীর কোর্টে হাজির করা হয়।

আসামী মওলানা ইউসুফ ১৯৭১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ মালেক মন্ত্রিপরিষদে রাজস্ব মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন। তাহার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হইয়াছে।

প্রকাশ, আসামী ১৯৭১ সালের তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া দখলদার বাহিনীর দালালি করেন। ইয়াহিয়ার পুতুল সরকারকে বাংলাদেশে টিকাইয়া রাখিবার জন্য তিনি নানাস্থানে সভা করিয়া মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের খতম করিয়া পাক বাহিনী, রাজাকার ও বদর বাহিনীকে সহযোগিতা করার আবেদন জানান।

অভিযুক্ত আসামী ইউসুফের আবেদনক্রমে গতকাল মামলার শুনানী স্থগিত রাখা হয় এবং আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর মামলার শুনানীর দিন ধার্য করা হয়।

সরকার পক্ষে সিনিয়র স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার খন্দকার মাহবুব হোসেন ও ঢাকা জেলা পাবলিক প্রসিকিউটার জনাব রমজান আলী খান মামলা পরিচালনা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৫.১০.১৯৭২

বুদ্ধিজীবী ডঃ আজাদকে হত্যার দায়ে ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সদস্য সৈয়দ সিরাজুদ্দীন আহমদ অঙ্কশাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ আজাদকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত মকবুল, আয়ুব আলী ও জুবায়েরকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়াছেন।

এই তিনজন যুবককে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের ২ (খ) অনুচ্ছেদ বলে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

আসামী জুবায়ের ওরফে আহমদ উল্লাহ আজিমপুর শাহ সাহেব বাড়ীর ছেলে ও ডঃ আজাদের ভাড়াটে বাড়ীর অন্যতম মালিক। অপর দুইজন আসামী ময়মনসিংহের লোক। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে আল-বদরের পাণ্ডারা দখলদার বাহিনীর দালাল সাজিয়া দেশে যে বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ চালাইয়াছিল, সে সম্পর্কে ইহা ২য় মামলা। বুদ্ধিজীবী অপহরণ ও হত্যার প্রথম মামলায় আসামী জামাতের আবদুল খালেককে ঢাকায় এক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ ও হত্যার দায়ে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

প্রকাশ, দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর সকাল ৮টার সময় খাকী পোশাক পরিহিত ৫ জন আল-বদরের লোক ডঃ আজাদকে তাহার ৪৪ নং আজিমপুর বাসা হইতে বলপূর্বক অপহরণ করে। ডঃ আজাদের মা, ভাই-বোন ও অন্যান্য লোক ডঃ আজাদকে অপহরণ করার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং আসামী জুবায়ের আল-বদর সদস্যদিগকে ডঃ আজাদের বাসা দেখাইয়া দিয়াছিল। ডঃ আজাদকে বলপূর্বক নেওয়ার সময় তাহার মা ও বোন বাধা দিতে গেলে তাহাদেরকে দুষ্কৃতিকারীরা ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেয়।

আল-বদর বাহিনী ঐ একই সময়ে ডঃ আজাদের বাড়ীর নিকট বাড়ী হইতে জনাব মুস্তাফিজুর রহমানের দুই ভাই মতি ও মন্টুকে ধরিয়া নিয়া যায়।

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার দুইদিন পর রায়ের বাজারের গর্ত হইতে ডঃ আজাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তাহার দেহে অনেকগুলি আঘাতের চিহ্ন ছিল। একই গর্তে আরও কয়েকজনের লাশও পাওয়া যায়।

সরকার পক্ষে স্পেশাল পি, পি আবদুর রাজ্জাক খান ও আসামী জুবায়ের, মকবুল ও আয়ুব আলীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন যথাক্রমে মেসার্স মোঃ আজম, জোয়ারদার ও ফয়জুদ্দিন ভূঁইয়া।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬.১০.১৯৭২

যশোরের মেছের আলী খানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

যশোর হইতে আমাদের সংবাদদাতা এক তারবার্তায় জানাইয়াছেন যে, জেলা ও সেশন জজ এবং ১নং বিশেষ আদালতের বিচারক শ্রী ডি, এন চৌধুরী জনৈক মেছের আলী খানকে বি, পি, সি ৩৭৬ এবং ১৯৭২ সালের দালাল আইনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ বাদী আবদুস শুকুর ১৯৭১ সালের মার্চের শেষে পাক বাহিনীর হামলার সময় ঝিকরগাছা থানার অন্তর্গত কীর্তিপুর গ্রামের বাড়ীঘর তাঁহার বাড়ির ঝি উজ্জালা বিবির তদারকীতে রাখিয়া ভারতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। আসামী কীর্তিপুরেরই অধিবাসী। পদচ্যুত পুলিশ কনষ্টেবল মেছের আলীর সঙ্গে দখলদার পাক বাহিনীর দহরম-মহরম ছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে মেছের আলী উক্ত উজ্জালা বিবিকে জোরপূর্বক আবদুস শুকুরের বাড়ীর একটি কোঠায় আটক রাখিয়া তাহার উপর বলাৎকার করে। উজ্জালা বিবিকে ধরিয়া নেওয়ার সময় জনৈকা বৃদ্ধা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। বাদী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন বিশেষ পি, পি এডভোকেট আবদুল মালেক (দ্বিতীয়) এবং আসামী পক্ষে ছিলেন এডভোকেট সাইদুজ্জামান।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬.১০.১৯৭২

কড়া পুলিশ প্রহরাধীনে ডাঃ মালেককে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে হাজির

বাংলাদেশে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় ইয়াহিয়া টিক্কা নিয়াজীর তদানীন্তন গভর্নর দালাল আইনে আটক ডাঃ আবদুল মোতালেব মালেককে বিচারের জন্য গতকাল (শনিবার) সকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে হাজির করা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁহার হাজিরার পর আসামীর আবেদনক্রমে মামলার শুনানী মুলতবী করা হয় এবং আগামী ১৩ই নভেম্বর মামলার শুনানীর তারিখ ধার্য করা হয়। ঢাকার দায়রা জজের আদালতে অনুষ্ঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের এই অধিবেশনে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জনাব এ, এইচ, চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সিনিয়র পাবলিক প্রসিকিউটর খোন্দকার মাহবুব হোসেন। ইহা ছাড়া এডভোকেট মেসার্স এমএ সোবহান, রমজান আলী খান তাঁহাকে সাহায্য করেন।

আসামী পক্ষে ছিলেন আইন ব্যবসায়ে সুদীর্ঘ ৪২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের প্রবীণতম আইনজীবী খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন আহমদ। ডাঃ এএম মালেক নিজেই দেশের এই প্রবীণতম আইনজীবীকে নিয়োগ করেন বলিয়া জানা যায়। ডাঃ মালেকের মামলা মুলতবী ঘোষণার পর একই ট্রাইব্যুনালে ডাঃ মালেক মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য সাবেক তথ্য ও বেতার মন্ত্রী কুমিল্লার জনাব মুজিবর রহমানকেও হাজির করা হয়। আসামীর আবেদনক্রমে গতকাল মামলার শুনানী স্থগিত রাখা হয় এবং আগামী ২০শে ডিসেম্বর মামলার শুনানীর দিন ধার্য করা হয়।

অভিযুক্ত জনাব মুজিবর রহমান কুমিল্লা বারের একজন সদস্য ছিলেন। আদালতে সরকার পক্ষ তার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন তা পড়িয়া দেখিবার জন্য তিনি অনুমতি চাহেন। ট্রাইব্যুনালে জজ তাহাকে কাঠগড়ায় এজাহার ও চার্জশীট পড়িবার সুযোগ দেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ মালেককে ঢাকার দায়রা জজ কোর্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে হাজির করা উপলক্ষে আদালত এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।

সকাল ১০টায় মামলার শুনানীর সময় নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও সকাল ৮টা-৯টা হইতেই আদালত এলাকায় উৎসাহী দর্শকদের অস্বাভাবিক ভীড় জমিতে থাকে।

জনসাধারণের এই অস্বাভাবিক ভীড়ের দরুন কর্তৃপক্ষের আদালত এলাকায় কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়।

আদালত এলাকায় প্রবেশ করার রাস্তার মুখে এবং আদালতের সম্মুখের রাস্তার অপর প্রান্ত ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরীর নিকট বহুসংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। আদালত প্রাঙ্গণের রাস্তার উভয় প্রান্তে পুলিশ বাহিনীকে জনতার এক বাধভাঙ্গা জোয়ারকে আটকাইয়া রাখিতে হয়। আদালতের আঙ্গিনায় অবশ্য জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আদালত আঙ্গিনায় অন্যান্য অফিসের লোকজন তাঁহাদের অফিসকক্ষের জানালায় এবং অফিসভবনের ছাদে দাঁড়াইয়া থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ইহা ছাড়া আদালত আঙ্গিনার বাহিরে উভয় পার্শ্বের বাড়ীর ছাদে এবং সুবিধামতো জানালার পার্শ্বে বহুলোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়।

বেলা তখন দশটা সোয়া দশটা। তখনও গভর্নর ডাঃ মালেককে লইয়া জেলখানার গাড়ী আসে নাই। আদালতের বারান্দায় কালো গাউন পরিহিত আইনজীবীদের অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে দেখা যায়। আদালতে উকিলদের জন্য সংরক্ষিত সকল আসন পরিপূর্ণ ছিল এবং বহুসংখ্যক উকিলকে কক্ষের চারিদিকে দণ্ডায়মান দেখা যায়।

বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটে জেলখানার কয়েদী বহনের একটি কালো গাড়ীতে করিয়া পিছনে ও সম্মুখে খোলা জীপে কড়া সশস্ত্র পুলিশ প্রহরাধীনে দখলদার আমলের সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ মালেককে আদালতে আনয়ন করা হয়।

ডাঃ মালেককে লইয়া জেলখানা কয়েদীদের গাড়িটি আদালত আঙ্গিনায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের ছাদে দণ্ডায়মান জনতা হৈ হুল্লা শুরু করিয়া দেন। আদালতের সম্মুখে গাড়িটি থামিলে সাদা পোশাক পরিহিত একজন তরুণ সিকিউরিটি অফিসারের কাঁধে ভর করিয়া ম্লান হাসি মুখে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ মালেক গাড়ি হইতে অবতরণ করেন। মাথায় সাদা গোল টুপী, সাদা শার্টের উপর কালো কোট এবং কালো প্যান্ট পরিহিত ডাঃ মালেক গাড়ী হইতে নামিয়াই ডান হাত তুলিয়া সকলকে সালাম জানান। এই সময় চারিপাশের জনতার মধ্যে অট্টহাসি পরিলক্ষিত হয়।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আসামীর কাঠগড়ায় একটি কাঠের চেয়ারে তাহাকে বসিতে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে তিনি তাহার কৌঁশুলীর সহিত কথাবার্তা বলেন। আদালত কক্ষে সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারগণ বিভিন্ন ভঙ্গিমায় তাঁহার ছবি গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহাকে মৃদু হাসতে দেখা যায়।

অতঃপর তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার কৌঁশুলী খান বাহাদুর নাজিরুদ্দীন আহমেদ মামলার শুনানীর জন্য সময় প্রার্থনা করিলে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বেলা প্রায় পৌনে ১১টায় শুনানী মুলতবী ঘোষণা এবং ১৩ নভেম্বর শুনানীর দিন ধার্য করেন।

বাহিরে তখনও বিক্ষুব্ধ জনতার হৈ চৈ। তাই ডাঃ মালেককে আদালত ভবনের অপর একটি কক্ষে লইয়া যাওয়া হয় এবং বাহিরের রাস্তার জনতাকে সরাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাহাকে লইয়া পুলিশকে ঐ কক্ষে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়।

এই সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তিনি জানান যে, জেলখানায় তিনি নিয়মিত ইত্তেফাকসহ অন্যান্য পত্রিকা পাইতেছেন। তিনি উপস্থিত ও তাঁহার পরিচিত আইনজীবীদের অনেকের কুশলাদি জানিতে চাহেন। কোন কোন উকিল ও সাংবাদিকদের গায়ে হাত বুলাইয়াও তাঁহাকে কথা বলিতে দেখা যায়।
বেলা ১১টায় পুনরায় কড়া পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে ডাঃ মালেককে জেলখানার কয়েদীদের গাড়ীতে করিয়া কেন্দ্রীয় কারাগারে লইয়া যাওয়া হয়।

অভিযোগ

সরকার পক্ষ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সরকার ও সার্বভৌমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও দখলীকৃত বাংলাদেশে গণহত্যা, গৃহদাহ এবং নারী নির্যাতনের ব্যাপারে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।
বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে ঢাকার সিআইডি পুলিশের ইন্সপেক্টর জনাব আবদুর রাজ্জাক গত ৩১.৩.৭২ ইং তারিখে এই মামলা দায়ের করেন।
অভিযোগে বলা হয় যে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের পর হইতে দখলদার বাহিনীর আমলে ডাঃ মালেককে বাংলাদেশের নিরস্ত্র ও অসহায় মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালিকে হত্যা, বাড়ীঘর পোড়াইয়া দেওয়া এবং গণহত্যার ব্যাপারে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করেন।
বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দালাল আইনের ১১ (খ) আর্টিকেলের ১২১ এবং ১২৯ (ক) ধারা মতে তাঁহার অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে। এই আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রহিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৮.১০.১৯৭২

ডঃ সাজ্জাদ হোসেনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল

গতকাল (রবিবার) জানা গিয়াছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ সাজ্জাদ হোসেনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে। পুলিশ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল আইনের ১১ (ডি) ধারায় (চতুর্থ অনুচ্ছেদ) চার্জশীট দাখিল করেছে।
যুদ্ধের সময় ডঃ সাজ্জাদ হোসেন বেআইনী ঘোষিত পিডিপি দলের নেতা জনাব হামিদুল হক চৌধুরী ও ঢাকা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি জনাব নূরুল ইসলামসহ কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র সফর করেন এবং পাক বাহিনীর পক্ষে ভাষণ দেন। তিনি লন্ডনের টাইম পত্রিকায় একট চিঠি লিখিয়া প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানী বাহিনী কোনো বুদ্ধিজীবীকেই হত্যা করে নাই।
পুলিশের ডিএসপি জনাব আতাউর রহমান ডঃ সাজ্জাদ হোসেনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য পরিচালনা করেন।
ঢাকার জনৈক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এই মামলার বিচারকার্য শীঘ্রই শুরু করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬.১১.১৯৭২

আজ হইতে গভর্নর মালেকের বিচার শুরু

আজ (সোমবার) হইতে পাকিস্তান সামরিক জান্তার প্রথম দালাল ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ এ এম মালেকের বিচার ঢাকায় সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের জজ জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরীর কোর্টে শুরু হইতেছে।

দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সহিত সহযোগিতা ও দেশদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপের জন্য ডাঃ মালেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছে। অভিযোগে আরও বলা হয়, আসামী ইয়াহিয়া টিক্কা নিয়াজীর সহিত সহযোগিতা করিয়া বাংলাদেশে পাক সামরিক জান্তার শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি এক পুতুল সরকার গঠন করিয়াছিলেন। জনাব নাজিরউদ্দিন আহামদ ও সাবেক ঢাকা জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব আমজাদ আলী ডাঃ মালেকের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করিতেছেন সিনিয়র স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর খোন্দকার মাহাবুব হোসেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩.১১.১৯৭২

ডাঃ মালেকের বিচার শুরু

আগামীকাল পর্যন্ত শুনানি মুলতবী—দালাল আইনে অভিযুক্ত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গভর্নর ডাঃ আবু মোতালিব মালেককে পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী গতকাল (সোমবার) কড়া পুলিশ প্রহরায় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাননীয় বিচারক জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরীর এজলাসে হাজির করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে দালাল আইনের (৭২)৪ (খ) ও ১১(ক) আর্টিকেল এবং সাধারণ দণ্ডবিধির ১২১, ১২১ (ক) এবং ১২৪ (ক) ধারা মতে তিনটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অভিযোগ উত্থাপন করা হইলে প্রতিবারই ডাঃ মালেক নিজেকে নির্দোষ বলিয়া দাবী করেন। কারণ দর্শাইয়া ডাঃ মালেক মামলার শুনানি কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখার আবেদন জানাইলে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আগামীকাল (বুধবার) সকাল দশটা পর্যন্ত মামলার শুনানি মুলতবী ঘোষণা করেন।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সিনিয়র পাবলিক প্রসিকিউটর খোন্দকার মাহাবুব হোসেন এবং তাঁহার সঙ্গে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক খান।

আসামী পক্ষে ছিলেন প্রবীণতম আইনজীবী খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন আহমদ ও ঢাকা জেলার সাবেক পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব আমজাদ আলী।

ডাঃ মালেকের পক্ষ সমর্থনকারী অন্যতম কৌসুলী [কৌশুলী] জনাব আতাউর রহমান খান গতকাল আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।

উল্লেখযোগ্য যে, সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে কড়া পুলিশ প্রহরায় একটি প্রিজন ভ্যান-এ করিয়া ডাঃ মালেককে আদালতে হাজির করা হয়। ইহার বহু পূর্ব হইতেই তাহাকে এক নজর দেখার জন্য আদালত প্রাঙ্গণে উৎসাহী দর্শকের ভিড় জমিয়া উঠে। সশস্ত্র পুলিশ সদর পথের মোড় হইতে আদালত কক্ষ পর্যন্ত ব্যূহ রচনা করিয়া থাকে।

প্রিজন ভ্যান হইতে নামিয়া আড়চোখে একবার উৎসাহী দর্শকদের প্রতি চাহিয়া ডাঃ মালেক নতমুখে আদালত কক্ষের দিকে অগ্রসর হন। মামলা শুরু হওয়ার আগে আধাঘন্টা ধরিয়া ডাঃ মালেক তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারী কৌশুলীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন।

মাননীয় বিচারক জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী এজলাসে আরোহণ করিলে সকাল ১০টা ৩৪ মিনিটে ডাঃ মালেককে আসামীর কাঠগড়ায় হাজির করা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে ডাঃ মালেককে হাজির করার পর, মামলার শুনানি শুরু করার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার আগেই তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় আদালতের নিকট মামলার শুনানি আরো কয়েকদিন স্থগিত রাখার আবেদন জানান। তিনি আবেদনে বলেন যে, তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস সোসাইটির পক্ষ হইতে ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট আইনজীবী স্যার ডিংগলফুট খুব শিগগীরই ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিতেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কৌশুলীদের সহিত আরো আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়াও তিনি আবেদনে উল্লেখ করেন।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে ডাঃ মালেকের স্ত্রী স্যার ডিংগলফুটের বিষয়ে আদালতে অবহিত করেন।

প্রকাশ, লন্ডন হইতে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরিত এক টেলিগ্রামে স্যার ডিংগলফুট তাঁহার ঢাকায় আগমনের কথা জানাইয়াছেন।

আসামীর আবেদনের প্রতিবাদ করিয়া সিনিয়র পাবলিক প্রসিকিউটর খোন্দকার মাহাবুব হোসেন বলেন, আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থন ও কৌশুলীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করার জন্য ইতিপূর্বে যথেষ্ট সময় দেওয়া হইয়াছে। বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য আর কোনো সময় দেওয়া যাইতে পারে না। বিবাদী পক্ষের কৌশুলী বলেন, আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের সাক্ষ্য ও অন্যান্য দলিলের অনুলিপি তাহারা পান নাই। জবাবে, সরকারী কৌসিলী [কৌশুলী] বলেন, বিবাদী পক্ষের চাহিদা মতো মামলার দলিলপত্রের অনুলিপি সরবরাহ করা হইয়াছে।

বিবাদীর কৌশুলী বলেন, তাহারা সমস্ত কাগজপত্র পান নাই।

এই সময় মাননীয় বিচারক বিবাদী পক্ষের আর কি কি নথিপত্রের প্রয়োজন উহার তালিকা প্রদানের নির্দেশ দেন।

সরকার পক্ষের কৌশুলী বলেন, শুনানি স্থগিত রাখার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের সপক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হউক।

বিবাদীর কৌশুলী মাননীয় আদালত, মায়ের অসুস্থতার জন্য আমাদের অন্যতম কৌশুলী জনাব আতাউর রহমান খান অনুপস্থিত। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ মুলতবী রাখা হউক।

ইহার পর মাননীয় বিচারক আবদুল হান্নান চৌধুরী দালাল আইনের (৭২) ১১(ক) ও ৪(খ) আর্টিকেল এবং সাধারণ দণ্ডবিধির ১২১, ১২১(ক) ও ১২৪(ক) ধারা ২৬শে মার্চ হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুবাহিনীকে সক্রিয় সহযোগিতা দান, বক্তৃতা, লিখিত বিবৃতি ও অন্যান্য উপায়ে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বৈরী মনোভাব প্রচার, অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার কাজে সহযোগিতা এবং পাকবাহিনীর সহিত যোগসাজশকারী দালাল অভিহিত করিয়া ডাঃ মালেকের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগসমূহ পাঠ করিয়া শোনান।

আসামী দোষ স্বীকার করে কিনা এই প্রশ্ন করা হইলে ডাঃ মালেক 'আমি নির্দোষ' বলিয়া আদালতে দাবী করেন।
আগামীকাল (বুধবার) সকাল ১০টা পর্যন্ত মামলার শুনানি মুলতবী ঘোষণা করিয়া মাননীয় বিচারক আদালত কক্ষ ত্যাগ করেন।
উল্লেখযোগ্য যে, মাথায় সাদা গোলটুপী ও সাদা জামার উপর কালো স্যুট পরিহিত ডাঃ মালেককে এইদিন বেশ সুস্থ দেখাইতেছিল।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪.১১.১৯৭২

বাদী পক্ষের ৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ ও জেরা

দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত দখলদার আমলের শেষ গভর্নর ডাঃ এ এম মালেকের বিচারের দ্বিতীয় দিনে গতকাল (বুধবার) বাদী পক্ষের ৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বিবাদী পক্ষের কৌশুলী অতঃপর তাহাদের জেরা করেন। ঢাকার এক নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাননীয় বিচারক আবদুল হান্নান চৌধুরীর এজলাসে ডাঃ মালেকের বিচার চলিতেছে। বিচারের প্রারম্ভে ডাঃ মালেকের পক্ষ সমর্থনকারী অন্যতম কৌশুলী আতাউর রহমান খান ট্রাইব্যুনালে বলেন, তাহার নিকট প্রেরিত এক টেলিগ্রামে স্যার ডিংগলফুট আগামী ১৭ই নভেম্বর সকাল ১০-৫০ মিনিটে তাহাকে ঢাকায় আগমনের কথা জানাইয়াছেন। উক্ত প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী আসামীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করিবেন। তাহার উত্তরে মাননীয় জজ বলেন, আপনারা মামলা চালাইয়া যান, স্যার ডিংগলফুট এই মামলায় আসামীর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিবেন।
জনাব আতাউর রহমান ট্রাইব্যুনালে দুইটি যুক্তি উত্থাপন করেন। প্রথমটিতে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর হইতে 'প্রক্লোমেশন অব ইনডিপেন্ডেন্স অর্ডার' ঘোষণা করা হয়। উক্ত আদেশ এখন বলবৎ নাই। সেহেতু বাংলাদেশ 'কলেবরেটর্স' আদেশ অনুযায়ী আসামীর বিচার চলিতে পারে না। দ্বিতীয় যুক্তিতে বলা হয়, আসামী গভর্নর পদ হইতে ইস্তফা দিয়া আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির আওতায় নিরপেক্ষ এলাকা ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেন, সেহেতু ১৯৪৭ সালের জেনেভা কনভেনশন আইনে ৪ ও ১৭ ধারা অনুযায়ী আসামীকে বিচার করিবার ক্ষমতা এই ট্রাইব্যুনালের নাই। জনাব রহমান আরও বলেন, আসামী ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। সেহেতু বাংলাদেশে তাহার বিচার হইতে পারে না।
ট্রাইব্যুনাল জজ বলেন, আসামী, বাংলাদেশ বাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সম্মিলিত কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ট্রাইব্যুনাল জজ উপরোক্ত প্রশ্ন ১৭ই নভেম্বর স্যার ডিংগলফুটের উপস্থিতিতে এই মামলায় যুক্তি প্রদর্শন করা কালে উত্থাপন করিতে বলেন। বিবাদী পক্ষের কৌশুলীর আবেদনক্রমে ট্রাইব্যুনাল আসামীকে বিবাদী পক্ষের কৌশুলীদের সাথে মামলা চলাকালে আলোচনার অনুমতি দেন।
গতকাল মামলায় সরকার পক্ষে মোট ছয়জন সাক্ষ্য প্রদান করেন। প্রথম সাক্ষী সিআইডি ইন্সপেক্টর জনাব আবদুর রাজ্জাক বলেন, আমি আসামীকে চিনি। তিনি ১৯৭১ সালের ১৪ই হইতে ১৯৭১ সালের ২রা অক্টোবর পর্যন্ত জেনারেল ইয়াহিয়া খানের স্পেশাল

এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭১ সালের ৩রা অক্টোবর তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দখলদার পাক বাহিনীর বর্বর পশুশক্তির দ্বারা বাংলাদেশে তাহাদের অধিকার রাখিতে চায় এবং এজন্য তাহারা ব্যাপক গণহত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি অপরাধ করে। আসামী উক্ত অপরাধজনিত কার্যে দখলদার বাহিনীকে সাহায্য করেন। তিনি যখন গভর্নর ছিলেন, তখন তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে জনসভা করিয়া জনসাধারণকে বাংলাদেশের মাটি হইতে মুক্তিবাহিনীকে খতম করিবার নিমিত্তে দখলদার বাহিনী ও রাজাকারদের সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে বলেন।

আসামী কেবিনেট মিটিং-এ স্বাধীন বাংলা রেডিও শুনিতে পারিবে না এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করেন। তাছাড়া মৃত রাজাকারদের আত্মীয় স্বজনের নামে সরকারের খাস জমি বিলি ও বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের কাগজপত্র সীজ করিয়া এই মামলার এজাহার দায়ের করা হইয়াছে।

আসামীর পক্ষে জনাব আতাউর রহমান খান সরকার পক্ষের সাক্ষী জনাব আব্দুর রাজ্জাককে জেরা আরম্ভ করেন।

প্রশ্ন : আপনি কখন জানিতে পারিলেন বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র?

উত্তর : আমি ১৯৭১ সালের ১১/১২ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে জানিতে পারি যে, বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র।

প্রশ্ন : আপনি কি জানিতেন কোথায় মুজিবনগর ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র?

উত্তর : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুজিবনগর কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমায় অবস্থিত।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র ইহা আপনি কোনো গেজেটে দেখিয়াছেন কি?

উত্তর : আমি ১৯৭২ সালের ২রা জানুয়ারী বাংলাদেশ গেজেটে দেখিতে পাই যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন হিসেবে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঘোষণা করা হইয়াছে।

প্রশ্ন : আপনি এই মর্মে ২ জানুয়ারির পূর্বে কোনো গেজেটে দেখিয়াছেন কি?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি কি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সাবেক গভর্নর ডাঃ মালেকের সরকারের অধীনে চাকরি করিয়াছেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : আপনি কি উক্ত সময়ে বেতন লইয়াছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, লইয়াছি।

প্রশ্ন : আপনি কি চাক্ষুষ আসামীকে কোনো দেশদ্রোহিতামূলক কাজ করিতে দেখিয়াছেন?

উত্তর : নিজ চোখে দেখি নাই কিন্তু তাঁহার কার্যের ফলাফল (Effect) দেখিয়াছি। তাছাড়া কাগজে তাহার কার্যাবলীর বিবরণ পড়িয়াছি।

প্রশ্ন : আসামী গভর্নর থাকাকালীন আপনি কি কোনো দিন গভর্নর হাউজে গিয়াছিলেন?

উত্তর : না।

ইহা ছাড়া সরকার পক্ষে জনাব হাবিবুল্লাহ চৌধুরী, জনাব আউয়াল, জনাব মুজিবুর রহমান, জনাব হাবিবুল্লাহ ও এ, এস, ই জনাব আবদুল আলী সরকার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বাদীপক্ষের কাগজপত্র প্রমাণ করেন।

আসামী পক্ষের কৌসিলী [কৌশুলী] তাহাদের এই মামলায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী নহে মনে করায় তাহদের জেরা করেন নাই।

সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনা করেন জনাব সিরাজুল হক খন্দকার ও মাহাবুব হোসেন। আসামী পক্ষে রহিয়াছেন মেসার্স আতাউর রহমান খান, আমজাদ আলী, নাজির উদ্দিন ও আরও অনেকে।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬.১১.১৯৭২

ডাঃ মালেকের মামলার শুনানি

আরো ১৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ—দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত দখলদার আমলের শেষ গভর্নর ডাঃ এ, এম, মালেকের বিচারের তৃতীয় দিনে গতকাল (বৃহস্পতিবার) বাদীপক্ষের ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। বিবাদীপক্ষের কৌসিলী [কৌশুলী] অতঃপর তাহাদের জেরা করেন। এই পর্যন্ত মোট ২৩জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ঢাকায় এক নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাননীয় বিচারক জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরীর এজলাসে ডাঃ মালেকের বিচার চলিতেছে।

মামলার শুনানির তৃতীয় দিনে তৎকালীন সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারী জনাব এ, এইচ, এম, আবদুল হাই তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন, আমি কেবিনেট মিনিস্টারদের সকল সভার কার্যবিবরণী নিজ হাতে লিখতাম এবং উক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীতে গভর্নর চীফ সেক্রেটারী ও আমার সহি থাকিত। আসামী কেবিনেট মিটিং-এ মৃত রাজাকারদের আত্মীয় স্বজনের নামে সরকারের খাস জমি বিনা সেলামিতে বিলি ও বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। আসামী কেবিনেট মিটিং-এ আরও সিদ্ধান্ত নেন যে, কেহ স্বাধীন বাংলা রেডিও শুনিতে পারিবে না। প্রতিটি কেবিনেট মিটিং-এ উচ্চপদস্থ মিলিটারী অফিসার অংশগ্রহণ করিতেন। কেবিনেট মিটিং-এর প্রস্তাব অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষক বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করিতেছেন তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে বলা হয়। তাছাড়া 'দুষ্কৃতকারীদের' প্রতিহত করিবার জন্য দেশে শান্তিসেনা গঠন করিবার পরিকল্পনা করা হয়।

জবানবন্দী শেষ হইবার পর আসামীর কৌশুলীর জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, গভর্নরসহ সকল মন্ত্রী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সকল জেলায় জনসভা করিয়া 'দুষ্কৃতকারীদের' নির্মূল করিবার জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দশ নম্বর সাক্ষী পাবলিকেশন ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারী জনাব এম, এ ওহাব তাহার জবানবন্দীতে বলেন, ১৯৭১ সালে আমি আসামী গভর্নর-এর পাবলিক রিলেশন অফিসার ছিলাম। আমি আসামীর সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনসভায় উপস্থিত ছিলাম। আসামী কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, পাবনা ও সিলেটের জনসভায় পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করিবার জন্য রাজাকার, মিলিটারী, শান্তি কমিটির সদস্যদের বলেন, বাংলাদেশ হইতে

দুষ্কৃতকারীদের খতম করিতে হইবে। ভারতীয় প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য তিনি সকলকে বলেন। আসামীর জনসভার ভাষণ আমি নিজে লিখিয়া টাইপ করিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠাইতাম।

আসামীর কৌশুলীর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, আমি লং হ্যান্ডে গভর্নর-এর ভাষণ লিখিতাম এবং আসামী ডাঃ মালেককে দেখাইয়া উক্ত ভাষণ পত্রিকা অফিসে পাঠাইতাম। পরের দিন গভর্নর-এর ভাষণ খবরের কাগজে প্রকাশ হইত।

এই মামলায় আসামীর তদানীন্তন প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ রোজারিও ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

আগামীকাল পুনরায় মামলার শুনানি আরম্ভ হইবে।

সরকার পক্ষে জনাব সিরাজুল হক, খন্দকার মাহাবুব হোসেন সিনিয়র স্পেশাল পিপি ও জনাব আঃ রাজ্জাক মামলা পরিচালনা করেন। আসামী পক্ষে রহিয়াছেন মেসার্স আতাউর রহমান খান, আমজাদ আলী, নাজির উদ্দিন আহমেদ ও হাবিবুর রহমান।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭.১১.১৯৭২

দালাল আইনে ডাঃ মালেকের বিচার
সওয়াল-জবাব সমাপ্ত : আগামীকাল রায়

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করার দায়ে দালাল আইনে অভিযুক্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ এ, এম, মালেকের মামলায় বাদী ও বিবাদী পক্ষে কৌসিলীদের [কৌশুলী] সওয়াল-জবাব গতকাল (শনিবার) ঢাকার বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। আগামীকাল (সোমবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী এই মামলার রায় ঘোষণা করিবেন।

গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে সরকারী কৌসিলী জনাব সিরাজুল হক সওয়াল-জওয়াবের সূত্রপাত করেন। তাঁহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেন বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সরকার পক্ষের সিনিয়র কৌশুলী খোন্দকার মাহাবুব হোসেন এবং এম, এ রাজ্জাক খান।

বিবাদী ছিলেন মেসার্স আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন। তাহাদিগকে সাহায্য করেন মেসার্স আমজাদ আলী, হাবিবুর রহমান খান, কে, এইচ, শাহাদৎ হোসেন। এইদিন সরকার পক্ষের অন্যতম কৌশুলী জনাব সিরাজুল হক সওয়াল-জওয়াবের সূচনা করিয়া বলেন যে, বাংলাদেশের জনগণ যখন হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দলে দলে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করিতে থাকেন তখন ডাঃ এ, এম, মালেক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের সহিত সহযোগিতা করেন। তিনি নিজের ইচ্ছায়ই মানব ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধকারীর সহিত সহযোগিতা করেন। ১৪ই ডিসেম্বর গভর্নর হাউজে বোমা বর্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আত্মসমর্পণ করেন নাই। বাংলাদেশের জনগণ যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছিলেন এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর গণহত্যা হইতে বাঁচিবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তিনি নিজের দেশের জনগণের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধে জঙ্গী ইয়াহিয়া শাহীকে সাহায্য করিয়াছেন।

জনাব হক আরো বলেন, তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি না হইলে মানবতা ও বিবেকের অবমাননা করা হইবে। তিনি বলেন, ইহা প্রতিশোধ নয়, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটি ইতিহাস—একটি দৃষ্টান্ত রাখা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, ২৬শে মার্চের পর তাঁহার কর্মপন্থা সম্পর্কে চিন্তা করার যথেষ্ট সময় ছিল। এই সংগ্রামের ফলাফল কি হইবে তাহা কি তিনি বুঝিতে পারেন নাই? তিনি বলেন, ইতিহাসে এই প্রথম জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একটি দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। এবং জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে রচিত আইন অনুযায়ীই তাঁহার বিচার করা হইতেছে। তিনি আরও বলেন যে, এই বিচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বর্তমান সরকারের এখতিয়ারের বৈধতার কোনো প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কারণ, এই সরকারই একটি শাসনতন্ত্রও প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা একটি বৈধ ঘোষণা। অতএব, ২৫শে মার্চের পর দেশের অখণ্ডতার অর্থ বাংলাদেশের অখণ্ডতাকে বুঝায়, পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে বুঝায় না। ২৫শে মার্চ রাতে হানাদার বাহিনীর প্রথম গুলীর সহিতই পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের মৃত্যু হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, ইয়াহিয়া বাংলাদেশে মীরজাফরের মতো একটি লোক পাইয়াছিল। ইয়াহিয়া খান বিশ্ববাসীর চোখে ধুলা দিতে চাহিয়াছিল যে, বাংলাদেশে একটি অসামরিক সরকার প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং একজন বাঙালিকেই গভর্নর নিযুক্ত করা হইয়াছে। ক্লাইভের অধীনে মীরজাফর যেরকম ভূমিকা পালন করিয়াছিল, ডাঃ মালেক ইয়াহিয়ার বিশ্বস্ত গভর্নর হিসেবে তেমনই ভূমিকা পালন করিয়াছেন। যেহেতু ডাঃ মালেক বাংলাদেশরই সন্তান সেই হিসেবে বাঙালির বিরুদ্ধে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিয়া সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করিয়াছেন। তিনি বাংলাদেশের জনগণের মনোবল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার এবং রাজাকারদের মনোবল জোরদার করার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি জনগণকেও মীরজাফরী করার কাজে সংগঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, জনাব সিরাজুল হকের বক্তব্য পেশ করার সময় উকিলদের মাঝখানে উপবিষ্ট ডাঃ মালেক কখনও ডান গালে হাত আবার কখনও বাম গালে হাত রাখিয়া গভীর মনোনিবেশ সহকারে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ শ্রবণ করিতেছিলেন।

এই সময় তাঁহাকে খুবই বিষণ্ন দেখাইতেছিল। একটি কলম দিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে কি যেন লিখিতে দেখা যায়।

সরকার পক্ষের অন্যতম কৌসিলী [কৌশুলী] জনাব সিরাজুল হক ডাঃ মালেকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের সাক্ষ্য প্রণয়নের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে, ডাঃ মালেক গভর্নর থাকাকালে ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এক মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে জেলা সমন্বয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই বৈঠকেই মুক্তিবাহিনীকে 'দুষ্কৃতকারী' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইহা ছাড়া শান্তিসেনা নামক প্যারা মিলিটারীও গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিছুসংখ্যক শান্তিসেনা সংগ্রহও করা হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি ও সমন্বয় কমিটির সদস্য ছিল। ইহা ছাড়া নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে তাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৫ হইতে ৩০ লক্ষ লোক রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাজাকারদের 'মতলবী তালিম' দেওয়ার জন্য এক শ্রেণীর ধর্মীয় নেতার সাহায্য গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মুক্তিবাহিনীর লোকদের তল্লাশীর উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরের সন্দেহজনক অঞ্চলে মাসে কমপক্ষে একবার ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। এমনকি, সেনাবাহিনী যেসব গ্রামে যাইতে না পারিবে সেইসব গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল।

রেডিও, টেলিভিশন হইতে রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের অপসারণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবাঞ্ছিত শিক্ষকদের নামের একটি তালিকা প্রণয়ন এবং তাহাদিগকে উচ্ছেদ করার (weed out) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল ডাঃ মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠক। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের প্রচারাভিযান জোরদার করার জন্যও সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইহা ছাড়া স্বাধীন বাংলা বেতার শ্রবণ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বেআইনী ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ডাঃ মালেক কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, নোয়াখালীতে বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকের সমাবেশে ভাষণ দানকালে মুক্তিবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। জনগণের মনোবল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে একশ্রেণীর ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীর দ্বারা জনগণের মতামতের বিকৃতিসূচক প্রবন্ধ লেখানোর প্রয়াস পাওয়া হয়। প্রচার মাধ্যমকেও ব্যবহার করা হয়।

ইহাছাড়া মুক্তিবাহিনীর মনোবল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য মুক্তিবাহিনীর ইপিআর, সৈনিক সদস্যগণকে দলত্যাগ করানোর উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস পাওয়া যায়। বলা হয় যে, মুক্তিবাহিনী ত্যাগ করিলে তাহাদিগের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে এবং তাহাদিগের সকল বকেয়া বেতন ও পাওনা পরিশোধ করা হইবে। জনাব সিরাজুল হক বলেন যে, এইসব উপায়ে মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করার জন্য ডাঃ মালেক চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, রাজাকারদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য নিহত রাজাকারদের পরিবার বর্গের মধ্যে বিনামূল্যে খাস জমি বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

জনাব হক বলেন, বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে ইহাদের প্রতি বার বার আহ্বান করা সত্ত্বেও ইহারা দখলদার বাহিনীর পক্ষ ত্যাগ করে নাই। তাহার এই সেবার নির্দশন স্বরূপ ইয়াহিয়া খান তাঁহাকে হেলালে কায়দে আজম খেতাবও দিয়াছে।

জনাব হক জেনেভা কনভেনশনের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আন্তর্জাতিক আইন কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্থানীয় আইনের পথে কোনো অন্তরায় হইতে পারে না। ডাঃ মালেক জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী নিরপেক্ষ জোনে আশ্রয় গ্রহণ করারও উপযুক্ত পাত্র নহে। কারণ যাহারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাহারা নিরপেক্ষ জোনে আশ্রয় নিতে পারে না। অতএব, নিরপেক্ষ জোনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আসামী বিচার এড়াইতে পারে না।

বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন বলেন যে, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র ও আইন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বহাল ছিল। তদুপরি, মুজিবনগর হইতে বেতারে ঘোষিত স্বাধীনতার আইনের চোখে কোনো মূল্য নাই। বাংলাদেশে তখন বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্ব ছিল না। বেতারের ঘোষণা কোনো সাক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। শ্রবণের সাক্ষ্য কোনো সাক্ষ্য নয়।

বিবাদী পক্ষের অন্যতম কৌঁসুলী জনাব আতাউর রহমান খান বলেন যে, সেনাবাহিনীর আমলে যে যে অবস্থা বিরাজ করিয়াছিল তাহাতে তাহাদের কথা অনুযায়ী গভর্নর পদ গ্রহণ

ছাড়া কাহারও পক্ষে গত্যন্তর ছিল না। তদুপরি, ডাঃ মালেক তখন একজন পাকিস্তানী নাগরিক ছিলেন তাহার আনুগত্য ছিল পাকিস্তানের প্রতি।

অতএব, এই অপরাধে তাঁহার বিচার করা যাইতে পারে না। তিনি আরও বলেন, ডাঃ মালেক বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করেন নাই। কারণ তিনি বাংলাদেশ সরকারের কার্যকলাপ ও মুক্তিবাহিনীর সমালোচনা করিয়াছেন। সরকারের সমালোচনা করার অর্থ ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা বুঝায় না। তদুপরি মুক্তিবাহিনীর সরকার নয় কিংবা সরকারের অংশ নয়। ইহা ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশের কোনো অংশেই বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ছিল না। অর্থাৎ বাংলাদেশের সরকারের কোনো অস্তিত্ব বাংলাদেশে ছিল না। অতএব, বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহার ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রশ্ন উঠিতে পারে না। জনাব আতাউর রহমান খান আরও বলেন যে, ডাঃ মালেক নিজের ইচ্ছায় কিছু করেন নাই। অতএব, তাহার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই। জনাব খান দালাল আইনকে কালো আইন বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন যে, আইনের দর্শনে দালাল আইনের কোনো স্বীকৃতি নাই। এই আইনের অধীনে যুক্তি তর্কের বা ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯.১১.১৯৭২

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, গণহত্যা ও নারী নির্যাতনে দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার অপরাধ—ডাঃ মালেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গতকাল (সোমবার) ঢাকার এক নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর আমলে বাংলাদেশে জঙ্গী ইয়াহিয়া শাহীর সর্বশেষ গভর্নর ডাঃ আব্দুল মোতালেব মালেককে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, গণহত্যা, নারী নির্যাতন, গৃহদাহ, লুটতরাজ চালানো এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বানচাল করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে দখলদার পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সরাসরি সহযোগিতা করার দায়ে অভিযুক্ত এবং বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১২১ ধারামতে তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাননীয় বিচারক আব্দুল হান্নান চৌধুরী রায় দান প্রসঙ্গে বলেন যে, ডাঃ এ, এম, মালেকের বয়স ৭০ বছর। তাহার এই বার্ধক্য এবং তদুপরি অতীতে তাহার রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১২১ ধারামতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হইল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, মাননীয় বিচারক তাহাকে দোষী সাব্যস্ত এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দান করিয়া ঘোষণার সময় দখলদার আমলে বাংলাদেশে জঙ্গী ইয়াহিয়া শাহীর সর্বশেষ তাঁবেদার গভর্নর ডাঃ এ, এম মালেকের মুখে ম্লান হাসি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া মাননীয় বিচারক সুদীর্ঘ সাড়ে ৩ ঘণ্টাব্যাপী তাহার লিখিত ২১ পৃষ্ঠার রায় পাঠ করিয়া শোনাইবার সময় আসামীর কাঠগড়ায় কড়া পুলিশ পরিবেষ্টিত অবস্থায় উপবিষ্ট ডাঃ মালেককে সর্বক্ষণই খুব বিষণ্ণ দেখাইতেছিল। তাহাকে কখনও বুকে দুই হাত

রাখিয়া, কখনও কাঠগড়ার সম্মুখে কাঠে দুই হাতের ভর রাখিয়া রায় শুনিতে দেখা যায়। ৭০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ ডাঃ মালেকের চোখমুখ এই সময় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ঠোঁট দুইটি বার বার কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মনে হয় কি যেন তিনি পাঠ করিতেছিলেন।

মাননীয় বিচারকের রায় ঘোষণা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ মালেক এবং তাহার কৌশুলীগণ নিজ নিজ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া এই রায়ের ব্যাপারে হাইকোর্টে আপীল করার জন্য মাননীয় বিচারকের অনুমতি প্রার্থনা করেন। মাননীয় বিচারক তাহাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

দালাল আইনে অভিযুক্ত ডাঃ মালেকের মামলার রায় শ্রবণের জন্য এই দিন ঢাকা জেলা ও দায়রা জজের আদালত কক্ষে তিল ধারণের ঠাঁই ছিলো না। সাংবাদিক গ্যালারীতে ভারতীয় সাংবাদিকসহ কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকও উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া এইদিন আদালতে আইনজীবীদের স্বাভাবিক ভিড় পরিলক্ষিত হয়। আদালতের আঙ্গিনায় এবং বাহিরে কড়া নিরাপত্তা পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়। আদালতের সম্মুখের রাস্তার মুখে, সদর রাস্তায় এবং পিছনে কোর্ট হাউস স্ট্রীট পুলিশকে দীর্ঘ বাঁশের লাঠির ব্যারিকেড নির্মাণ করিয়া এক বাধভাঙ্গা জনস্রোতকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয়। আদালত পার্শ্বের অফিস ভবনের ছাদে, বারান্দায় এবং দরজা জানালার পার্শ্বের সহস্র চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দিয়াছিল আদালতের দিকে।

মাননীয় বিচারক তাহার রায়ে বলেন যে, বাংলাদেশ দালাল অর্ডারের (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) ১৯৭২-এর ১২১ এবং ১২৪ (ক) ধারানুযায়ী বর্ণিত সকল অভিযোগে ডাঃ মালেক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। তাই তাহাকে ১২১ দণ্ডবিধি মতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ১ নং তফসিলে বর্ণিত ১২৪ (ক) দণ্ডবিধি অথবা দালাল আইনের ৪ (খ) ধারা অনুযায়ী পৃথক কোনো দণ্ড প্রদান করিলাম না।

মাননীয় বিচারক বিবাদীপক্ষের কৌশুলীদের উত্থাপিত যুক্তির উল্লেখ প্রসঙ্গে রায়ে বলেন যে, বিবাদি পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী বলিয়াছেন যে, অভিযুক্ত ডাঃ মালেক জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যেহেতু আশ্রয়লাভকারী ব্যক্তি অতএব এই আদালতের তাহার বিচার করার এখতিয়ার নাই। মাননীয় বিচারক তাঁহার রায়ে বলেন যে, বর্তমান মামলায় ডাঃ মালেক জন্মগত বাঙালি এবং তিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন, এ কথা বলা যায় না। এই আদালতে পেশকৃত এক দরখাস্তে সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি প্রকৃত অর্থে একজন বাঙালি। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী জেনেভা কনভেনশনের আরও কতিপয় বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। মালেক জেনেভা কনভেনশনের বিধান অনুযায়ী একজন আন্তর্জাতিক আশ্রিত ব্যক্তি নহেন।

বিবাদী পক্ষের কৌশুলী এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ যে স্বাধীন হইয়াছে তাহার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নাই। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিলের ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইয়াছে। অতএব বিবাদী পক্ষের এই যুক্তি সঠিক নহে। মাননীয় বিচারক তাঁহার রায়ে আরও বলেন, মৌখিক প্রামাণ্য সাক্ষ্য হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে দখলদার পাকিস্তানি

সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল এবং অভিযুক্ত ডাঃ এ, এম, মালেক গভর্নরের পদ গ্রহণ করিয়া দখলদার বাহিনীকে সরাসরিভাবে সাহায্য করিয়াছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ হইতে মতপ্রকাশ করা হইয়াছে যে, বাংলাদেশের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য তিনি এই পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জনগণের কল্যাণ করিয়াছেন এমন কোনো প্রমাণ এই মামলায় উপস্থাপিত হয় নাই। পক্ষান্তরে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে ধ্বংস করার ব্যাপারে দখলদার বাহিনীর হস্ত শক্তিশালী করার জন্য জনসাধারণকে উস্কানী দিয়াছিলেন। তিনি রাজাকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই রাজাকারগণ দখলদার বাহিনীকে গণহত্যা এবং মুক্তিবাহিনী ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি কয়েকটি ভাষণে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন। সাক্ষ্য হইতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে বেআইনী দখল অব্যাহত রাখার ব্যাপারে অভিযুক্ত ডাঃ মালেক দখলদার বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য সাহায্য এবং সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। তদুপরি এমন কোনো আইনের প্রয়োজনে তিনি গভর্নরের পদ কিংবা তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিশেষ সহকারীর পদ গ্রহণ করেন নাই।

ডাঃ মালেক তদন্তকারী অফিসারের নিকট বলিয়াছেন যে, তিনি জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য গভর্নরের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই ধরনের কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই।

বিবাদী পক্ষের কৌশুলী বলিয়াছেন যে, দালাল অর্ডিন্যান্স একটি খারাপ আইন এবং তাহা সর্বনিম্ন সাজা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া এই আদালতের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছে। কোনো অপরাধের জন্য সর্বনিম্ন নিরূপণসূচক ইহাই কেবল বিশ্বের একমাত্র আইন নহে। এমন কি ফৌজদারী বিধি যাহা বৃটিশ আমলে রচিত হইয়াছিল তাহাতেও সর্বনিম্ন সাজা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ ফৌজদারী বিধির ৩০৩ ধারার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই আইনেও সর্বনিম্ন সাজা নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, এই মামলায় সরকারের পক্ষের মোট ২৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ইহা ছাড়া মামলার প্রামাণ্য সাক্ষ্য হিসাবে প্রায় একশত দলিল পেশ করা হয়।

এই মামলায় সরকার পক্ষে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের যুদ্ধ অপরাধী মামলার প্রধান কৌশুলী জনাব সিরাজুল হক, সিনিয়র বিশেষ সরকারী কৌশুলী খন্দকার মাহবুব হোসেন এবং নবাগত জনাব আব্দুর রাজ্জাক। বিবাদী পক্ষে ছিলেন মেসার্স আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন আহমদ, আমজাদ আলী, মনসুর রহমান, হাবিবুর রহমান এবং কাজী শাহাদাত হোসেন।

রায় ঘোষণার পর ডাঃ মালেক আদালত কক্ষের পার্শ্বের অপর একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার কৌশুলীদের সহিত গোপনে শলাপরামর্শ করেন। তাহাকে যখন প্রিজনভ্যানে করিয়া কড়া পুলিশ প্রহরাধীনে জেলখানায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন বাহিরে অপেক্ষমান বিশাল জনতা টিটকারীসূচক দূর দূর হৈ হল্লা করিয়া দখলদার আমলে বাংলাদেশে জঙ্গী ইয়াহিয়া শাহীর সর্বশেষ গভর্নর ডাঃ আবদুল মোতালেব মালেককে বিদায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২১.১১.১৯৭২

সাজ্জাদ হোসেনের মামলার শুনানী ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত মুলতবী

গতকাল (বুধবার) ঢাকার এক নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল জজ জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরীর এজলাসে সাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনকে হাজির করা হয়। অভিযুক্ত আসামীর কৌশুলীর আবেদনক্রমে মামলার শুনানী আগামী ২২শে জানুয়ারী পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়। ঐদিন বাদী পক্ষের সাক্ষী হাজির করারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের জজ আবদুল হান্নান চৌধুরী আসামী পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষে দালালির জন্য তাহার বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হইয়াছে সে সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তিনি শুনানীর জন্য প্রস্তুত কিনা ইহা জানতে চাহেন।

আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নিজেকে তৈরী করতে না পারায় আসামী কৌসিলী [কৌশুলী] সৈয়দ মাজহারুল আহসান মামলার শুনানী দুই মাসের জন্য মুলতবী রাখার আবেদন জানান। সরকার পক্ষে সিনিয়র স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর খন্দকার মাহবুব হোসেন শুনানী মুলতবীর প্রশ্নে আপত্তি জানান। কিন্তু আদালত মামলার শুনানী ২২শে জানুয়ারী পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩.১১.১৯৭২

দখলদার আমলের মন্ত্রী
জসিমউদ্দিনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গতকাল (শনিবার) ঢাকার দুই নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ সিরাজুদ্দিন আহমদ ডাঃ মালেক মন্ত্রিসভার আইন ও পার্লামেন্ট দপ্তরের মন্ত্রী জনাব জসিমউদ্দিন আহমদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বিচারক তাঁহার রায়ে বলেন, "অভিযুক্ত জনাব জসিমউদ্দিন আহমদ মনে প্রাণে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করিতেন। তিনি বহুকাল সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন, তাছাড়া তিনি সিলেট বারের একজন সিনিয়র আইনজীবী, তাহার অতীত রাজনৈতিক কার্যকলাপের দিক লক্ষ্য রাখিয়া তাহার জীবন রক্ষা করা প্রয়োজন বিধায় আমি তাহাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম।

প্রকাশ, পাকিস্তানের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ চালানোর সময় তাহারা এই দেশের কিছু সংখ্যক লোকের সহায়তা চায়। আসামী এই দেশকে পাকিস্তানের শাসনাধীন রাখার জন্য বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করেন।

তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ক্ষেপাইয়া তুলিবার ও সেই সংগ্রামকে নস্যাৎ করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি করিয়াছেন এবং বক্তৃতা দিয়া বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ঘৃণার সঞ্চার করেন। আসামী মন্ত্রিসভার বৈঠক করিয়া বাংলাদেশ সমর্থক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং রাজাকারদের ১০ লক্ষে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিহত রাজাকারদের পরিবারবর্গের মধ্যে খাস জমি বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

বিচারক তাঁহার রায়ে উল্লেখ করেন, সাক্ষী প্রমাণ দৃষ্টে ইহাই প্রমাণ করে আসামী ইচ্ছাকৃতভাবে মালেক মন্ত্রী পরিষদে যোগদান করিয়া দখলদার বাহিনীর সাহায্য করেন ও নানা স্থানে সভা সমিতি করিয়া বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ঘৃণা সঞ্চার করেন। বিচারক সরকার পক্ষের কৌশুলীর সাথে একমত হইয়া বলেন আসামী এই দেশে পাক সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিচারক আসামীকে জেলখানায় প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান করেন। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন স্পেশাল পি পি জনাব এম, এ সোবহান। তাহাকে সাহায্য করেন স্পেশাল পি পি মেসার্স ফয়েজউদ্দিন ভূঁইয়া ও এ, বি, এম রফিকুল্লাহ। আসামী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মেসার্স খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন ও আহাম্মদ আলী মণ্ডল এডভোকেট।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬.১১.৯৭২

জামায়েত ইসলামী নেতা
মওলানা ইউসুফের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

৫ ডিসেম্বর '৭২-এর দৈনিক ইত্তেফাক থেকে ঃ গতকাল (সোমবার) ঢাকার তিন নম্বর স্পেশাল জজ মিঃ এসবি বড়ুয়ার এজলাসে বেআইনী ঘোষিত জামায়েত ইসলামী নেতা ও ডাঃ মালেক মন্ত্রী পরিষদের সাবেক মন্ত্রী মওলানা এ, কে, এম ইউসুফের দালালি মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। গতকাল মামলার শুনানীর প্রথম দিনে সরকার পক্ষের ৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও জেরা সমাপ্ত হইয়াছে। সরকার পক্ষের পহেলা সাক্ষী সি, আই, ডি ইন্সপেক্টর জনাব কে, এম, এ রাজ্জাক। তিনি তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি এই মামলার বাদী। তিনি বলেন আসামী ডাঃ মালেকের পুতুল সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করিয়া মুক্তিবাহিনীকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় হানাদার বাহিনীকে সক্রিয় সাহায্য দান করেন। সাক্ষী বলেন যে, আসামী রাজস্ব মন্ত্রী হিসেবে খুলনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং সভা সমিতি করিয়া জনগণকে হানাদার বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। তিনি পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করিতে বলেন। তাহা ছাড়া জনসাধারণকে মুক্তিসেনাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে বলেন।

জনাব রাজ্জাক তাহার সাক্ষ্যে আরও বলেন যে, বাংলাদেশের উপর মিলিটারী শাসন চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্তে তিনি খুলনা হইতে তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

আসামী পক্ষের কৌশুলীর জেরার জবাবে বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে বাংলাদেশের মুক্ত এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের শাসন চালিত হয়। আরো একটি প্রশ্নের জবাবে বাদী বলেন যে, তিনি স্বচক্ষে ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর সাথে পাক হানাদার বাহিনীর যুদ্ধ দেখিয়াছেন।

অদ্য (মঙ্গলবার) এই মামলায় সরকার পক্ষের আরও সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে। সরকার পক্ষে রহিয়াছেন স্পেশাল পিপি জনাব আবদুর রাজ্জাক খান ও জনাব কফিলউদ্দীন আহমদ। আসামী পক্ষে রহিয়াছেন মেসার্স নাজিরুদ্দীন আহমেদ ও নজরুল ইসলাম।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৫.১২.১৯৭২

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গতকাল (শুক্রবার) ঢাকার তিন নম্বর স্পেশাল জজ মিঃ এস, বি, বড়ুয়া বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলামী নেতা ও ডাঃ মালেক মন্ত্রী পরিষদের সাবেক রাজস্ব মন্ত্রী মাওলানা এ, কে, এম ইউসুফকে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬.১২.১৯৭২

খুলনায় সোলেমানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

২২ ডিসেম্বর স্থানীয় বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জনাব কে, এফ, রহমান বাংলাদেশ দালাল আইনের ৩০২ ও ৩৬৪ ধারায় এস, এম, সোলায়মানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩.১.১৯৭২

ডাঃ মালেকের মন্ত্রিসভার তথ্যমন্ত্রী মুজিবর রহমানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ঢাকার ৩ নং বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাননীয় বিচারক এস বি বড়ুয়া গতকাল (শনিবার) সাবেক পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর ডাঃ মালেকের মন্ত্রিসভার তথ্যমন্ত্রী জনাব মুজিবর রহমানকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১২১, ১২৪ (ক) এবং বাংলাদেশ দালাল আইন অনুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

আখতার গুণ্ডার ফাঁসী

একই দিন ঢাকার ৫নং স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের মাননীয় বিচারপতি জনাব এফ, রহমান বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা এবং দালাল আইনে মিরপুরের কুখ্যাত গুণ্ডা আখতারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, দখলদার বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট আখতার গুণ্ডা ৩ জন মিলিটারী ও ১০/১৫ জন অবাঙালি ষ্টেনগান রাইফেল ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ১৯৭১ সালের ৮ই এপ্রিল সকাল ১১টার সময় মিরপুরের নওয়াবের বাগ গ্রামের জনাব সিতাক হাজীর বাড়িতে প্রবেশ করে এবং নগদ পঁচিশ হাজার টাকা ও ১৪ ভরি স্বর্ণ লুট করিয়া চলিয়া যাইতে থাকে। ইহাতে জনাব সিতাক হাজী চিৎকার করিলে আখতার গুণ্ডা রাইফেলের সাহায্যে গুলী করিয়া জনাব সিতাক হাজী, সেফাতুল্লাহ ও জনাব আহমেদ মিয়াকে একজন একজন করিয়া ঘটনাস্থলে হত্যা করে।
ট্রাইব্যুনালে জজ তাঁহার রায়ে বলেন : আসামী এমনই একজন কুখ্যাত গুণ্ডা যে, সে একই সময়ে পর পর তিন ব্যক্তিকে গুলি করিয়া হত্যা করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় নাই। তাই আসামীকে আমি ফাঁসির হুকুম দিলাম।
সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সিনিয়র স্পেশাল পি পি খন্দকার মাহবুব হোসেন। আসামী পক্ষে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এডভোকেট এস. বি রহিম মামলা পরিচালনা করেন। ডা. মালেক মন্ত্রিসভার তথ্যমন্ত্রী জনাব মুজিবর রহমানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তিন নম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মিঃ এস, বি বড়ুয়া তাঁহার রায়ে বলেন :

অভিযুক্ত জনাব মুজিবর রহমান একজন বিশিষ্ট আইনজীবী, শিক্ষাবিদ ও রোটারিয়ান, সমাজে তাঁহার যে অবদান রহিয়াছে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে এই দণ্ডাদেশ দেওয়া হইল।

তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করা, বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপ ও বাংলাদেশকে পাক ঔপনিবেশিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তথাকথিত উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া।

বিচারক তাঁহার রায়ে বলেন : আসামী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ক্ষেপাইয়া তুলিবার জন্য ও সেই সংগ্রামকে নস্যাৎ করিবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় সভা সমিতি করিয়াছেন এবং পত্রিকায় বিবৃতি দিয়াছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১.১২.১৯৭২

১৯৯৯

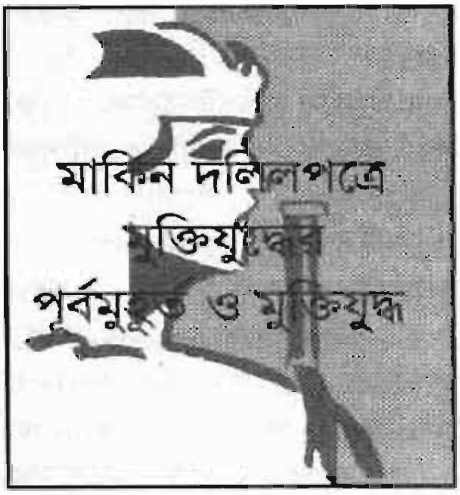

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা কী ছিল তা আমাদের জানা, সেটি ছিল বিরোধিতার কিন্তু এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয় নি। গবেষণার প্রতিবন্ধকতা ছিল দলিলপত্রের অভাব। সম্প্রতি, মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ সেসব দলিলপত্র উন্মুক্ত করে দেয়ায় সে প্রতিবন্ধকতা খানিকটা অপসারিত হয়েছে। বর্তমানে সেসব দলিলপত্রের দুটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমটি সঙ্কলন করেছেন রোয়েদাদ খান, গ্রন্থের নাম 'দি আমেরিকান পেপার্স : সিক্রেট অ্যান্ড কনফিডেনসিয়াল : ইন্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যান্ড বাংলাদেশ ডকুমেন্টস ১৯৬৫-১৯৭৩' (ইউপিএল, পৃ. ৯৯৭, মূল্য ১০৪০)। অর্থাৎ এসব দলিলপত্রে উপমহাদেশের ঘটনাবলি বিবৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, আমেরিকান সরকার কোন্ সময় কোন্ নীতি গ্রহণ করেছি এবং কেন।

এ ধরনের দলিলপত্র ইতিহাসের আকর। দলিলপত্রের ব্যাখ্যা যদি না থাকে তাহলে দলিল পত্রগুলো পড়ে আমরা বিশেষ সময়ের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারব। কিন্তু, বর্তমান সঙ্কলনে যাবতীয় দলিলপত্র সঙ্কলিত হয় নি। যেগুলো সঙ্কলকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেগুলোই শুধু সঙ্কলিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বাছাই দলিল পুরো ঘটনা তুলে ধরে না। তুলে ধরে সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গি। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমেই জরুরি হয়ে দাঁড়ায় সম্পাদকের পরিচয় জানা। তাহলে বোঝা যাবে, কোন বিষয়টিতে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

রোয়েদাদ খান পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের প্রথম ব্যাচের সদস্য। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন পাকিস্তানের তথ্যসচিব। পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তানের মন্ত্রী হয়েছিলেন। ইসলামাবাদে এক সাক্ষাৎকারে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, '১৯৭১ সালে বাংলাদেশে কি ঘটেছিল আপনি জানেন?' উত্তরে তিনি জানালেন, তিনি কিছুই জানেন না। বললাম, এটা কী বিশ্বাসযোগ্য যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে কী ঘটেছিল তা পাকিস্তানের তথ্যসচিব জানেন না। তিনি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সে সময় সামরিক দফতরে জনসংযোগ পরিচালক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী। তিনি 'মিলিটারি ইন পাকিস্তান : ইমেজ অ্যান্ড রিয়ালিটি' নামে গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে রোয়েদাদ খান সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আছে। করাচিতে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণকালেও তিনি একই কথা বলেছিলেন।

তিনি লিখেছেন, মার্চের শেষ সপ্তাহে রোয়েদাদ খান ছিলেন ঢাকায় এবং সব কিছুই তিনি অবলোকন করেছিলেন ও আগ্রাসীভাবে বাঙালিদের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি এবং তাঁর কাছে 'এভরি প্রব্লেম ওয়াজ আলটিমেটলি এ পি আর প্রব্লেম।' তিনি বাঙালিদের মধ্যে 'আল্লাহর ভয়' ঢোকাতে চাচ্ছিলেন। প্রয়োজনে বাঙালি জাতিকে শুদ্ধ করার ব্যবস্থাও করতে চাইছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে পাকিস্তানে

নিয়ে গেলে রোয়েদাদ সব পত্রিকায় তাঁর ছবি ছাপাতে চেয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর ভাষায় 'লেট দ্য ওয়ার্ল্ড নো দ্যাট দ্য বাস্টার্ড ইজ ইন আওয়ার হ্যান্ডস।'

'দি আমেরিকান পেপার্স'-এর ভূমিকা লিখেছেন জামসেদ মার্কার। তিনি রোয়েদাদের সমসাময়িক। পররাষ্ট্র সার্ভিসের মার্কার ওয়াশিংটন ও জাতিসংঘে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

জামসেদ মার্কার পররাষ্ট্র সার্ভিসে থাকায় তাঁর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা যাচ্ছে না। কিন্তু, তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন এমন কথা বলা যাবে না। ১৯৭১ সালের দলিলপত্রের ভূমিকায় ১৮ই মে'র পূর্বেকার দলিলপত্র সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেননি। না, মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নেই। আছে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সম্পর্কে উদ্ধৃতি ও মন্তব্য। জুলফিকার আলী ভুট্টো সম্পর্কে ভাল কিছু বিশেষণ তিনি ব্যবহার করেছেন। ১৬ই ডিসেম্বরের (১৯৭১) পর ভুট্টো দেখা করেন পররাষ্ট্র সচিব রজার্সের সঙ্গে। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে মার্কার লেখেন—"Where in Bhutto, with nothing in his hand except a demoralized an fragmanted country, presented a courageous, inspired and lucid exposition of his objectives and policies."

যে নথিপত্রগুলো রোয়েদাদ সঙ্কলন করেছেন সেখানে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও অন্যান্য কার্যকলাপের তেমন কোনো বিবরণ নেই। নেই ঢাকার কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের বিখ্যাত সেই রিপোর্ট যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন ২৫শে মার্চের পর। এ রিপোর্টে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার বিবরণ ছিল। হানাদারদের বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের কোনো বিবরণ নেই। নাকি, মার্কিন কূটনীতিবিদরা সে সব সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট পাঠান নি?

সুতরাং, নথি সঙ্কলনে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল তা অনুমেয়। তবুও একটা বিশেষ সময়ের ইতিহাসের আকরগ্রন্থ হিসেবে সঙ্কলনটি মূল্যবান। এসব দলিলপত্র পড়ে আমরা উপ-মহাদেশের প্রতি মার্কিন স্ট্র্যাটেজির স্বরূপ বুঝতে পারি এবং কেন তারা সে স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছে তাও বুঝতে পারি।

এনায়েতুর রহিম ও জয়েস এল রহিমের গ্রন্থের নাম 'বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার অ্যান্ড দি নিক্সন হোয়াইট হাউস' (পুস্তিকা, পৃ. ৪৬৯, মূল্য ৫০০ টাকা)। গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে ১৪টি প্রবন্ধ ও ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭০ থেকে মে ১৮-১৯৭২ পর্যন্ত নথিপত্র সঙ্কলন যার শিরোনাম 'ওয়াশিংটন ডকুমেন্টস'। রোয়েদাদ ১৯৭১ পর্যায়ে সঙ্কলন করেছেন (১১ মে, ১৯৭২ পর্যন্ত) ১৩২টি দলিল, অন্যদিকে এনায়েতুর রহিম সঙ্কলন করেন ৯৫টি দলিল। তাঁর দলিলপত্রের উৎস 'নিক্সন পেপারস' এবং 'ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ'-এর আলোচনার ভিত্তিতে উৎসারিত কাগজপত্র। দুটি সঙ্কলনে অনেক দলিল স্বাভাবিকভাবে এক। তবে, রোয়েদাদের সঙ্কলনে অনেক দলিল আছে যা আবার শেষোক্তটিতে নেই।

এনায়েতুর রহিম বালুরঘাট ফ্রন্টে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, আবার যুক্তরাষ্ট্রেও স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছিলেন। তাঁর ও জয়েসের প্রবন্ধে যে দুটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো নিক্সন-কিসিঞ্জারের পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাত (টিল্ট) ও মুজিবনগর

সরকারের মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদের বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্র যাতে মদদ যুগিয়েছিলেন মার্কিন সরকার। সুতরাং তিনি প্রধানত সেসব দলিলই সঙ্কলন করেছেন যা ঐ দুটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখানে উল্লেখ্য, এসব দলিলপত্রেও গণহত্যা ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দলিলপত্র প্রায় নেই। হয়তো কূটনীতিবিদরা সেসব ঘটনা তাঁদের রিপোর্টে উল্লেখ করেন নি। আর্চার ব্লাডের রিপোর্টটিও নেই এই সঙ্কলনে।
বর্তমান নিবন্ধটি মূলত 'দি আমেরিকান পেপার্স'-এর ওপর ভিত্তি করে রচিত। এখানে সঙ্কলিত ১৯৭১ সালে দলিলপত্রগুলো অবলম্বন করে ১৯৭১ সালের ঘটনার বিবরণ তুলে ধরতে চেয়েছি। মনে রাখা দরকার, মার্কিন কূটনীতিকদের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের মন্তব্য সংযোজন করেছি।
দলিলপত্রগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মাঠ পর্যায়ের কূটনীতিকদের সঙ্গে পররাষ্ট্র দফতরের আমলা, কিসিঞ্জার ও নিক্সনের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। মাঠ পর্যায়ের কূটনীতিকরা যে সব বিবরণ দিয়েছেন বিশেষ করে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় তা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয়, তার দরকারও ছিল না। ঘটনার সামগ্রিক বিশ্লেষণে তাঁদের যে মতামত প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলো আমরা গ্রহণ করতেও পারি, নাও পারি। তবে, এ কথা বলা খুব কঠিন যে, তাঁদের বিশ্লেষণ ভুল ছিল। বরং দেখা যায়, প্রায় ক্ষেত্রে তাঁদের বিশ্লেষণ যৌক্তিক ছিল।
এখানে প্রথমে আমি সঙ্কলিত দলিলপত্রের সাহায্যে ঐ সময়ের ঘটনা পুনর্নির্মাণ করব এবং এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি।

দুই

পঁচিশ মার্চ ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খান প্রবল গণআন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হলেন। বিদায়ী ভাষণে সে কথা স্বীকার না করে বরং ঔদ্ধত্য দেখালেন এ বলে যে, "All this is the result of the reckless conduct of those who acting under the cover of a mass movement struck blow at the very roots of the country during the last few months. The pity is that a large number of innocent but gullible people become victims of their evil design."
তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন, সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব শুধু বৈদেশিক আগ্রাসন রোধ করাই নয়, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করাও আইনগত এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব। সেনাবাহিনী এ কথা বলে পাকিস্তানে তখন এবং এখনও ক্ষমতা দখল করেছে। ১৯৭৫ সালের পর থেকে বাংলাদেশেও একই ঘটনা ঘটেছে। কারণ কী? কারণ, কাকুল সংস্কৃতিতে এরা দীক্ষিত।
সুতরাং ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এলেন। সে সময় থেকে ২৫শে মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত সময়টুকুকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ। উল্লেখ্য যে, ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে হানাদার পাকি-বাহিনী গণহত্যা শুরু করে এবং বঙ্গবন্ধু ঐদিন রাতেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

১৯৬৯ সালে ২৬শে মার্চ মার্কিন দূতাবাস একটি রিপোর্ট পাঠায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। ঐ রিপোর্ট ২৫শে মার্চে যাঁরা ক্ষমতায় আসেন সেসব কুশিলবের পরিচয় দেয়া হয়েছিল।

১. জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান : তাঁর সম্পর্কে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়, ইয়াহিয়া হলেন মদ্যপ, মেয়েমানুষে আসক্ত এবং শোনা যায় অধস্তন সামরিক অফিসারদের স্ত্রীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেন। মুসলমান মৌলবাদীরা তাঁর নিয়োগে খুশি হবে না। কারণ তারা পাশ্চাত্যঘেঁষা যে কোনো ব্যক্তির প্রতিই অখুশি, যেমন ছিল আইয়ুব খানের প্রতি।

শেষোক্ত মন্তব্যটি সঠিক নয়। কারণ মৌলবাদীরা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত তো বটেই, তারপরও ইয়াহিয়াকে সমর্থন করেছে। গণহত্যায় সহযোগিতা করেছে : যেমন জামাত-ই-ইসলাম। মৌলবাদী আমরা যাদের বলি, সঠিক অর্থে তারা মৌলবাদী নয়। মৌলবাদ বা ধর্ম তারা ব্যবহার করে নিজ স্বার্থে। যেমনটি করেছিল ১৯৭১ সালে।

২. এয়ার মার্শাল নূর খান : রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি রাজনৈতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং মন্তব্য করা হয়েছে এই বলে যে, ইয়াহিয়া খানের বিপরীতে যদি কোনো গ্রুপ দাঁড়ায় তা হলে নূর খান হবেন তার নেতা।

এ মন্তব্যও সঠিক প্রমাণিত হয় নি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও ক্ষমতার ক্ষেত্র থেকে তাঁকে সরে দাঁড়াতে হয়। তবে পাকিস্তানে অনেকে আমাকে বলেছেন, বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হলে লাহোরে প্রথম যে ক'জন এর প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন নূর খান ছিলেন তার মধ্যে একজন।

৩. ভাইস এ্যাডমিরাল সৈয়দ মুহাম্মদ আহসান : মার্কিনীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো এবং খুবই পাশ্চাত্যঘেঁষা। জামাত-ই-ইসলামীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল কিন্তু ইসলামী মৌলবাদী তিনি নন। এ মন্তব্যটি খানিকটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে। কারণ আহসান খুবই 'ওয়েস্টার্নাইজড' হলে জামাতীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে কীভাবে?

এ ছাড়া আরও তিনজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। এরা হলেন **লে. জেনারেল আবদুল হামিদ খান, লে. জে. মুহাম্মদ আতিকুর রহমান খান ও লে. জে. মুজাফফর উদ্দিন**। এরা সবাই বাংলাদেশে গণহত্যার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত ছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, রিপোর্টে যে ছয়জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। ফলে এ বিষয়টিকে এভাবেও দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরাই ক্ষমতা দখল করেছিল। এদের সবার বয়স ছিল ৪৬ থেকে ৫২-এর মধ্যে। ইয়াহিয়া ও হামিদের বয়স ছিল ৫২, আতিক ও মুজাফফর উদ্দিনের ৫১ ও ৫০, আহসান ও নূর খানের ৪৮ ও ৪৬। এ বয়স অতীব উচ্চাকাঙ্ক্ষার। সুতরাং ক্ষমতা হস্তান্তরে যে তারা সহজে রাজি হবে না তা স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে তা-ই ঘটেছিল। ব্যতিক্রম দেখা গেছে আহসান ও নূর খানের বেলায়। এদের সে জন্য ক্ষমতার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

এর পর খবরাখবর জানার মানসে মার্কিন কর্মকর্তারা যোগাযোগ করেন আইনজীবী এ. কে. ব্রোহীর সঙ্গে। ব্রোহী পরিচিত ছিলেন উদারপন্থী আইনজীবী হিসেবে। কিন্তু রিপোর্টে যে ব্রোহীর চিত্র পাই তা ভিন্ন। এতে বোঝা যায় পাকিস্তানে শীর্ষস্থানীয় আমলা ও পেশাজীবীদের মনে রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে ধারণার মিল ছিল। দু'একজন হয়তো ব্যতিক্রম হতে পারেন। ব্রোহীর সঙ্গে কর্মকর্তাদের আলাপ হয় ৩১শে মার্চ (১৯৬৯)।

ব্রোহী জানান, আবার পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছে, এতে তিনি ক্ষুব্ধ। তবে কর্মকর্তার মনে হয়েছে, যতটা না সামরিক শাসন, তার চেয়ে বেশি আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ায় তিনি ক্ষুব্ধ। কারণ, এ জন্যই সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ, আইয়ুব খান মূল রাজনৈতিক ইস্যুগুলোর মুখোমুখি হতে চান নি। এগুলো কী? পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভূমিকা, অবস্থান ও প্রতিনিধিত্ব। আইয়ুবের দশ বছর শাসনে রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে পতিতাবৃত্তি।

সামরিক শাসনের কি বৈধতা আছে? ব্রোহী মনে করেন, এ প্রশ্নের সাংবিধানিকতা বা বৈধতার বিষয়টি অবান্তর। আইয়ুবের রাজনৈতিক কাঠামো মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। অক্টোবর ১৯৬৮ থেকে মার্চ ১৯৬৯-এর ঘটনাবলি এর প্রমাণ। এবং সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকার কার্যকরভাবে কাজ করতে না পারার পরিপ্রেক্ষিতে একটি 'বিপ্লবী' অবস্থা বিরাজ করছিল, যা সংবিধানকে অচল করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ব্রোহী ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনকে 'শঠতা' আর মার্চ ২৫-এরটিকে বলেছেন, 'দি অনলি স্টেপ লেফট'। আইয়ুব খানের পতন হয়েছে; কিন্তু ব্রোহী মনে করেন, রাজনীতিবিদরাও ব্যর্থ হয়েছেন। ভুট্টো ও ভাসানী তাঁর মতে, 'নিহিলিস্ট'। পুরনো আমলের রাজনীতিবিদরা আগে নিজের স্বার্থ দেখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন "By demanding the impossible, the politicians had achieved nothing, and, indeed, had enabled the unrest then current to descend into breakdown of law and order which imperiled the very life of the country."

গোলটেবিল বৈঠকে যেসব রাজনীতিবিদ যোগ দিয়েছিলেন ব্রোহী তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। কথা বলেন নি শুধু ভুট্টো ও ভাসানীর সঙ্গে। কারণ তাঁরা যুক্তির কাছে মাথা নত করেন না।

ব্রোহী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পূর্ব-পাকিস্তানের ভবিষ্যত নিয়ে। আইয়ুব ও তাঁর পূর্বসূরিরা পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য (লেজিটিমেট) আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি কখনও নজর দেয় নি এবং এ কারণে পাকিস্তানের ঐক্য সঙ্কটাপন্ন হতে পারে। পূর্ব-পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবল বাসনা এখন নেই। কিন্তু তার আশা-আকাঙ্ক্ষার খানিকটা পূরণ না হলে ঘটনা চরমপন্থার দিকে মোড় নিতে পারে। ব্রোহীর এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য সফল হয়েছিল। কিন্তু এ কথাও উল্লেখ করতে হয় যে, তিনি যে অন্তিমে পাকিস্তানি তা বোঝা যায় তাঁর পরবর্তী মন্তব্যে। তিনি বলেছেন, পূর্ব-পাকিস্তানের 'Separatist impulses' আছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারে আছে কিছু কমিউনিস্ট, যারা পূর্ব-পাকিস্তানের এই অনুভবকে উৎসাহিত করে আরও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে। ব্রোহীর মতে, পূর্ব-পাকিস্তান লস্ট কেস এটি মনে না করে তার দাবির প্রতি বুদ্ধিমান প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারে। ব্রোহী জানিয়েছিলেন, পূর্ব-পাকিস্তানি আইনজীবীদের ওপর তাঁর প্রবল প্রভাব আছে, কারণ, তাদের অধিকাংশকে তিনি প্রশিক্ষিত করেছেন। সামরিক শাসকরা যদি চায় তাহলে এ ক্ষেত্রে তিনি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

১৯৬৯ সালের ২৮ মে'র রিপোর্টে জানা যায়, এক মার্কিন কর্মকর্তা দেখা করেছেন শিল্পপতি এমএএইচ ইস্পাহানির সঙ্গে। আলাপকালে তিনি জানলেন, ইয়াহিয়া তুরস্কের

প্রধানমন্ত্রী হোবায়দাকে বলেছেন, মার্কিনিরা শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন করে। করাচিবাসীদের ধারণা, মার্কিনিরা স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) ধারণার সমর্থক। এ কারণে মার্কিন কর্মকর্তা জানতে চাইলেন ইস্পাহানির কাছে যে, এ রকম ধারণা হওয়ার কারণ কী?

পরবর্তীকালে দেখি নির্বাচনে জয়লাভ করার পর ভুট্টোও একই কথা বলেছিলেন মার্কিন কর্মকর্তাকে। বোঝা যায়, পাকিস্তানিরা মার্কিন মনোভাব নিয়ে আশঙ্কায় ছিল এবং ১৯৭১ সালের মার্কিন মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর তারা বাংলাদেশে গণহত্যার কার্যক্রম চালিয়ে যায়।

মার্কিন কর্মকর্তার প্রশ্নের উত্তরে ইস্পাহানি বলেছিলেন, উত্তরটি সোজা। শেখ মুজিব ইউসুফ হারুনের বেতনভোগী ("ইন হিজ পে")। এর অর্থ, বঙ্গবন্ধু তখন চাকরি করতেন হারুনের কোম্পানিতে। হারুনকে আবার মনে করা হয় মার্কিন এজেন্ট। ইস্পাহানির মন্তব্য "Mujib is greatest threat to Pakistan and to Pak unity." শাসকবর্গের এই ধারণাই হয়তো ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রতি নীতিনির্ধারণে সহায়ক হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, মুজিব বা বাঙালিদের শক্ত হাতে দমন করলে পাকিস্তানের ঐক্য থাকবে।

ইস্পাহানি জানিয়েছেন, প্রাক গোলটেবিল বৈঠকের আমলে হারুনের সঙ্গে সখ্য ছিল শেখ সাহেবের। হারুন দেশে ফেরার পর শেখ মুজিবই হচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ প্রথম রাজনীতিবিদ, যাঁর সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন। তাই সবাই ঐ রকম ধারণা করছে। ইস্পাহানির মতে, "বিদেশী এজেন্ট সন্দেহেই হারুনকে আইয়ুব খান বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

৯ই জুন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-হাইকমিশনার রয় ফক্সের সঙ্গে ঢাকায় দেখা হয়েছিল এক মার্কিন কর্মকর্তার কোনো এক পার্টিতে। পূর্ব-পাকিস্তান সম্পর্কে ফক্স যা বলেছিলেন, দেখা যাচ্ছে তার পুরোটাই ঘটে গেছে। তিনি বলেছিলেন, ইয়াহিয়াকে ১৯৭০ সালের মার্চের মধ্যে নির্বাচন দিতে হবে এবং সে নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জয়ী হবে। কিন্তু নির্বাচনের আট মাসের মধ্যে 'Divisive Bengali Factionalism'-এর কারণে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং আবার সামরিক শাসন বলবত হবে। কিন্তু তৃতীয়বারের মতো বাঙালিরা সামরিক শাসন মেনে নেবে না। বিদ্রোহ হবে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। তবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। এ দুর্বলতার কারণে পিকিং এখানে আধিপত্য বিস্তার করবে।

ফক্সের ভবিষ্যদ্বাণীর এ অংশটুকু ভুল হয়েছে। এর একটা কারণ, পাশ্চাত্যের সবাই তখন কমিউনিজম বা চীনা আতঙ্কে ভুগছিল। ফক্স আরও বলেছিলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত অন্ধকার।

তিন

করাচিতে পাগারোর পীরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন মার্কিন কর্মকর্তা ডিএম কোচরান। রাজনৈতিক সুবিধার জন্য পীর মুজিবের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। মুজিবের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন এবং কর্মকর্তার মনে হয়েছে আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট। কিন্তু তাঁর নীতি সুবিধাবাদীর। কর্মীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন এ ঘোষণা করতে যে,

তারা আওয়ামী লীগ সমর্থন করবে এবং তারপর তিনি তাদের শুধু দোয়া করবেন। তিনি যোগ দেবেন না, কারণ প্রয়োজনে যাতে তিনি পিছু হটে আসতে পারেন।

পীর এর কারণ হিসেবে বলেছেন, তাঁর মনে হয়েছে শেখ মুজিবের কাজে কিছুটা অস্বচ্ছতা আছে। শেখ সাহেব যেমন এক ইউনিটের বিরুদ্ধে তেমনি আবার অনেক পাঞ্জাবি যেমন—নূর খান, ইউসুফ হারুনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ। এ ছাড়া পীরের মনে হয়েছে, প্রয়োজনে শেখ মুজিব কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মমতাজ দৌলতানার সঙ্গেও আঁতাত করে ফেলতে পারেন।

ইয়াহিয়া সম্পর্কে পাগারোর পীর মন্তব্য করেছেন, ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে শাসক এলিটদের মধ্যে এবং তাও এক শিয়ার কাছে। এখানে 'শিয়া' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। ইয়াহিয়া ক্ষমতায় থাকতে চাইবেন, তবে পীরের মতে, বেশি দিন থাকতে চাইলে তাকে ক্যুর সম্মুখীন হতে হবে।

দূতাবাসের রাজনৈতিক অফিসার কোচরান এর পর আলাপ করেছিলেন পিপলস পার্টির নেতা জে এ রহিমের সঙ্গে। রহিম এক সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন ফ্রান্সে। পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। পাগারোর পীরের মতো, রহিমও মনে করেন, পুরনো ক্ষমতাভোগী এলিটদের হাতেই ক্ষমতা আছে। এর রদবদল হতে পারে একমাত্র তরুণদের দ্বারা (যারা ভুট্টোর সমর্থক)। তরুণদের র‍্যাডিক্যালাইজড করতে হবে। জে এ রহিম পরে পিপলস পার্টির সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন, পার্টিকে নির্বাচনের সময় র‍্যাডিক্যালাইজডও করে তুলেছিলেন। পিপলস পার্টির তৎকালীন অনেক নেতার মতে, বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিনি উদগ্রীব ছিলেন।

পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিক দল সম্পর্কেও রহিম কিছু মন্তব্য করেছিলেন—

১. পাকিস্তান মুসলিম লীগ শক্তিহীন।
২. পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রগতিশীল ভঙ্গি হাস্যকর। আসগর খান বলছেন জমির সিলিং করা উচিত সেচযুক্ত ২শ' ৫০ একর পর্যন্ত। এর কারণ কী? কারণ আর কিছুই না। আইয়ুব খান থেকে সুক্কুরে তিনি ২শ' ৫০ একর জমি পেয়েছিলেন।
৩. কাউন্সিল মুসলিম লীগ হচ্ছে পাঞ্জাবি ও এলিটদের পার্টি।
৪. শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের কাম্য "নন-ইসলামিক ফর্ম"-এর সমাজ। ভুট্টোও তাই চান। 'নন-ইসলামিক ফর্ম' বলতে খুব সম্ভব রহিম ধর্ম-নিরপেক্ষতাকে বুঝিয়েছেন।
৫. জামাত-ই-ইসলামী হচ্ছে বিদেশীদের অর্থে পরিচালিত দল।

রহিমের মতে, একমাত্র ভুট্টোই সারা পাকিস্তানব্যাপী প্রগতিশীলদের সমর্থন পেতে পারেন।

চার

সাতই নভেম্বর (১৯৬৯) মার্কিন দূতাবাস থেকে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। এ রিপোর্টের কিছু অংশ সে সময়কার পরিস্থিতি বুঝতে সহায়ক হবে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল, ইয়াহিয়া এখনও দেশ পরিচালনা করে যেতে পারছেন এবং

এ ধারণাটা সৃষ্টি করতে পেরেছেন যে, তিনি সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত করতে চান না। সামরিক বাহিনীকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে তিনি সরিয়ে নিতে চান। এখন গুজব যে, খুব শীঘ্রই তিনি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবেন সংবিধান রচনার জন্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দেবেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল, দুই অঞ্চলের বৈষম্যের প্রশ্নটিকেই মোকাবেলা করতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। বাঙালিদের মতে, কেন্দ্রীয় সরকার এই বৈষম্য হ্রাসে উৎসাহী নয়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের মতে, পূর্ব-পাকিস্তানের দুর্বল অর্থনীতি পাকিস্তানের উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং বাঙালিরা বৈষম্যের যে কথা তুলেছে তা অযৌক্তিক। ফলে দুটি মতের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবরণ আছে রিপোর্টে। রিপোর্ট অনুযায়ী—পূর্ব-পাকিস্তানে আধিপত্য বিস্তার করে আছে মধ্য বাম আওয়ামী লীগ। এর পরে অবস্থান মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির। পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি জাতীয় কিছু দল আছে যেগুলোর আবেদন নেই। গত ছয় মাসে মুজিব তাঁর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছেন। বলতে গেলে পূর্ব-পাকিস্তানে তিনি এখন মুকুটহীন রাজা। এ সময়টারও সুযোগ নিয়েছে আওয়ামী লীগ। সারা অঞ্চলে বিস্তৃত করেছে তার সংগঠন। শ্রমিক ক্ষেত্রেও তাদের প্রভাব বৃদ্ধি হয়েছে এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে তাদের অবস্থান সবার ওপরে।

ন্যাপের (ভাসানী) অবস্থা খুব ভালো নয় তবে পূর্ব-পাকিস্তানের যে অর্থনৈতিক সমস্যা তাতে অন্তিমে অতি বামের হুমকি অগ্রাহ্য করা যায় না। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভাসানীর জনসভা জমে নি এবং তাদের কথাবার্তার সুরও তুলনামূলকভাবে নমিত হয়ে এসেছে। যারা রক্ষণশীল কমিউনিস্ট এবং মুজিববিরোধী তাদের কোনো আবেদন নেই জনমানসে এবং রাজনৈতিকভাবে তারা বড় কোনো ফ্যাক্টর নয়। পশ্চিম-পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলগুলো বহুধাবিভক্ত। কনভেনশন মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, পিডিপি, ন্যাপ বা পিপলস পার্টিকেও এখন আঞ্চলিক পার্টি (প্রাদেশিক) বলা দুরূহ। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে এক ইউনিটবিরোধী মনোভাব প্রবল। এবং এই ইস্যু কটি ইমোশনাল হয়ে উঠছে। পাঞ্জাবে আবার মানুষজন এক ইউনিটের পক্ষে। ধারণাটা অনেকটা এ রকম—পশ্চিমের ছোট ইউনিটগুলো নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে পারে। পাকিস্তান ভাঙার মূল কারণটি কিন্তু ঐ উপর্যুক্ত মন্তব্যের মধ্যেই নিহিত। পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিসত্তাগুলোকে দমন করছিল পাঞ্জাবিরা এবং এটা যে একদিন তাদের বিরুদ্ধে যাবে এটিও তারা জানত এবং মানসিকভাবেও তারা এ জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তারা ভাবতে পারে নি এত দ্রুত বিষয়টি ঘটে যাবে। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের ইমেজ পূর্ব-পাকিস্তানে হ্রাস পাচ্ছে। পশ্চিম-পাকিস্তানি আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ক্ষোভ বাড়ছে। যে কোনো মুহূর্তে একটি ঘটনা ঘটে যেতে পারে। রিপোর্টের ভাষায় "The moods like bits of sand on the head of a pin can blow off in unpredictable directions with scant forewarning. "ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের মূল্যায়নও রিপোর্টে সংযোজিত হয়েছিল।

আওয়ামী লীগ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল—লজিক্যালি মুজিবের শক্তি হ্রাস পাওয়ার কথা। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত শিখরে ছিল তাঁর অবস্থান। কিন্তু সে অবস্থানের হেরফের হয়নি এবং ভোটারদের কাছে তাঁর আবেদন এখনও প্রচণ্ড। শ্রমিক ফ্রন্টে আওয়ামী লীগের অবস্থা ছিল দুর্বল কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাও বাড়ছে। কারণ ন্যাপ নিয়ন্ত্রিত অনেক কারখানায় তারা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। ছাত্র ফ্রন্টে আওয়ামী লীগ সব সময়ই সবল। মুজিব তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন গড়ার জন্য তরুণ কর্মীদের গ্রামে পাঠিয়েছেন। এবং এ ক্ষেত্রে তিনি এত সফল হয়েছেন যে, আওয়ামী লীগ দাবি করতে পারে যে, বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে তার সংগঠন আছে। এর অর্থ সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগের অবস্থান আগের চেয়ে বেশ শক্তিশালী। মনে হচ্ছে নির্বাচন হলে মুজিব ষাট ভাগের বেশি ভোট পাবেন।

এ মূল্যায়ন থেকে বোঝা যায়, অন্তিম লড়াইয়ের জন্য বঙ্গবন্ধু আগে সংগঠনের দিকে নজর দিয়েছিলেন এবং নির্বাচনের আগে সংগঠন শক্তিশালী করে তুলেছিলেন, যার ফলে মুক্তিযুদ্ধকে একটি জাতীয় যুদ্ধে পরিণত করা গিয়েছিল। এ বিষয় থেকে শিক্ষণীয় এই যে, রাজনৈতিক দলের আসল ভিত্তি সংগঠন। শক্তিশালী সংগঠন ছাড়া ব্যক্তির জোরে রাজনীতি বা দল টিকে থাকতে পারে না। ভাসানী ন্যাপের ব্যাপারে মন্তব্য করা হয়েছিল, পাকশী (শাহ্‌পুর) সম্মেলনের পর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দল হিসেবে ন্যাপ দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকেও ন্যাপ বা ভাসানী পিছিয়ে পড়ছেন। তবে পূর্ব-পাকিস্তানে রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ছে। সুতরাং ভবিষ্যতে ভাসানী যদি কৃষক অ্যাকশন গ্রুপ গঠন করেন এবং তা যদি ন্যাপের সঙ্গে একত্রিত হয় তাহলে তারা সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যেতে পারে। কারণ মূল্যবৃদ্ধি চরম পন্থার সৃষ্টি করে এবং এ ধরনের পরিস্থিতি চরম বামপন্থী দলগুলোর সহায়ক। ১৯৬৯ সাল থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের দাবি আদায়ে ভাসানী ভায়োলেন্স প্রচার করছেন এবং ভবিষ্যতে যদি তিনি তাঁর চরম বাম সঙ্গী যেমন আবদুল মতিনকে সমর্থন করেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ন্যাপ যে দুর্বল হয়ে পড়ছে মনে হয় ভাসানী তা বুঝছিলেন। রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন না—এটি ভাবা ভুল। মনে হয় সে কারণেই নিজের অবস্থান ঠিক রাখার জন্য মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

এছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও মূল্যায়ন করা হয়েছিল, এক কথায় যার নির্যাস—ক্ষোভ বাড়ছে, যে কোনো সময় যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু কখন ঘটবে সে নির্দিষ্ট সময়টি শুধু বলা যাচ্ছে না।

রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ৬ই জানুয়ারি ১৯৭০ সালে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী সম্পর্কে। ফজলুল কাদেরকে আইয়ুব খান তার কিছুদিন আগে পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি পদে নির্বাচিত করেছিলেন।

'ষাঁড় সদৃশ ফজলুল কাদের', উল্লেখ করেছেন ফারল্যান্ড, ছয় ফুটের উপর লম্বা, ওজন দুশো পাউন্ডের বেশি। আলোচনার সময় তাঁর উপস্থিতি, এনার্জি, উৎসাহ এবং অশেষ আস্থা লক্ষ্য করার মতো। তাঁর ধারণা, মুসলিম লীগ আবার উঠে দাঁড়াবে। বাঙালি রাজনীতিবিদদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাঁর বক্তৃতা ছিল দীর্ঘস্থায়ী।

চৌধুরীর মতে, মুসলিম লীগের শক্তি গ্রামের মানুষ। ভবিষ্যদ্বাণী করে তিনি বলেছেন, পাঞ্জাব এবং ভাওয়ালপুরে লীগ ৮০% আসন পাবে। তিনি আরও বলেছেন, আইয়ুব খান কিছু ভুল করেছেন বটে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নমুখী প্রোগ্রাম গ্রহণ করার কারণে কৃষকরা তাঁকে ভক্তি করে। লীগ মধ্যপন্থী দল—ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের ঐক্যে বিশ্বাসী। যেসব লোক বৈদেশিক সাহায্যে পুষ্ট হয়ে বিভিন্ন দল, সংবাদপত্র, ছাত্র ও শ্রমিক দলে অনুপ্রবেশ করে প্রচারে প্রচারে দেশ ভাসিয়ে দিচ্ছে তাদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। [এর অর্থ ভারত, আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি] স্পষ্টভাবে চৌধুরী বলেছেন, ইসলাম রক্ষাই হবে প্রধান ইস্যু। কারণ পাকিস্তান মোল্লা মৌলবীতে আকীর্ণ এবং একজন হাজীর পিছে আছে হাজার লোক। ফজলুল কাদের চৌধুরীর ইসলাম ইস্যু পরবর্তীকালে থৈ পায় নি এবং এ ধারণাও ভ্রান্ত যে, একজন হাজীর পিছে আছে হাজার লোক। বর্তমান রাজনীতিতে একই ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ ইসলামকে ইস্যু করার চেষ্টা করছে এবং মৌলবাদীদের তোয়াজ করছে। কিন্তু, ইতিহাস বলে, অন্তিমে তা কাজে আসে না বরং ক্ষতিই করে।

ফারল্যান্ড উল্লেখ করেছেন, শেখ মুজিব সম্পর্কে চৌধুরী বলেছেন, তিনি ছিলেন মুজিবের গুরু এবং মুজিবের পড়াশোনার খরচ তিনিই চালিয়েছিলেন। মুজিব মেঠো বক্তৃতা ভালোই পারেন। তাঁর বক্তৃতা নেতিবাচক, যেখানে অতীতকে মহান করে তোলা হয় এবং ভবিষ্যতের এমন সব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যা পূরণ হবার নয়। তাঁর মতে, মুজিব তাঁকে বলছেন, ক্ষমতায় এলে তিনি দু'মাসের বেশি টিকবেন না। কথা বলতে বলতে ফজলুল কাদের এমন অবস্থায় পৌঁছে গেলেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীই বলে ফেললেন—বাংলায় (পূর্ব-পাকিস্তান) মুসলিম লীগই বিজয়ী হবে।

ভুট্টো সম্পর্কেও বেশ রসালো মন্তব্য করেছিলেন চৌধুরী। তিনি বলেছিলেন, ভুট্টো জীবন শুরু করেছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবে, তার পর হলেন জাতীয়তাবাদী, এখন পরিণত হয়েছেন আঞ্চলিকতাবাদী (সিন্ধুর) হিসেবে। ভুট্টো তাঁর জেলায় জিতবেন কি-না সে নিয়েও চৌধুরী সন্দেহ পোষণ করেন।

বলাই বাহুল্য, ফজলুল কাদের চৌধুরীর কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিক হয় নি। বরং তিনি পরিণত হয়েছিলেন একজন যুদ্ধাপরাধীতে।

পাঁচ

১৯৭০ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু গিয়েছিলেন পিন্ডি। সেখানে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন মার্কিন দূতাবাসের দু'জন কর্মকর্তা। রিপোর্টে পররাষ্ট্র দফতরকে তাঁরা জানিয়েছিলেন এ কথোপকথন যেন প্রচারিত না হয়। তাঁরা যখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন তিনি ছিলেন খুব কনফিডেন্ট মুডে। তিনি জানিয়েছিলেন, ঢাকার পল্টন ময়দানে ১১ জানুয়ারি তিনি যে জনসভা করবেন তাতে ৩/৪ লাখ লোক হবে। ১৬ তারিখে ময়মনসিংহে তিনি কৃষক র‍্যালি করবেন। ঢাকার ভারপ্রাপ্ত কনসাল এ্যান্ড্রু কিলগোরকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন, সে জনসভায় যেতে যাতে কিলগোর স্বচক্ষে দেখতে পারেন তাঁর র‍্যালিতে মওলানা ভাসানী থেকে বেশি লোক হয় কি-না। শেখ মুজিব

ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছিলেন, ৫ অক্টোবর নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানে তিনি ৮০ ভাগ ভোট পাবেন। নির্বাচনের পূর্বে তিনি অন্য কোনো দলের সঙ্গে আঁতাত করবেন না।
ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানে নির্বাচনী প্রচার চালাবেন। সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, এমনকি পাঞ্জাবেও কিছু আসনে আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।
ক্ষমতায় গেলে তিনি কী ধরনের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করবেন সে বিষয়েও মতামত প্রকাশ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সব প্রধান শক্তিগুলোর সঙ্গেই সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বের। নির্দিষ্টভাবে তিনি বললেন, ভারত থেকে কয়লা আমদানি করবেন। কারণ তাতে খরচ পড়বে টনপ্রতি ৭০ টাকা। আর চীন থেকে আনতে খরচ পড়ছে প্রতিটন ১৭০ টাকা। ভারতের সঙ্গে অবশ্য পানি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে। মুজিব জানালেন, তিনি শুধু ফারাক্কার কথা বলছেন না, তিনি সামগ্রিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার কথা বলেছেন। ভারতের সহযোগিতা ছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য সম্ভব না এবং তিনি এও অনুধাবন করেছেন যে, এ জন্য বৈদেশিক সহায়তা প্রয়োজন হবে।
শেখ মুজিব জানালেন, ক্ষমতায় এলে তাঁর লক্ষ্য হবে প্রতিরক্ষা ব্যয় কমানো। ১৯৫৮ সালে যে তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন তা জানালেন। মার্কিনিরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। আবার হয়তো তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাবেন।
একজন কর্মকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, অক্টোবরের নির্বাচনের পর ১২০ দিনের মধ্যে যদি সংবিধান তৈরি করা না যায় তাহলে কী হবে? শেখ মুজিব বললেন, "আমরা চেষ্টা করব। আমরা চেষ্টা করব। যদি আমরা মতৈক্যে পৌঁছতে না পারি, তাহলে মতৈক্যে পৌঁছতে পারলাম না।" এর অর্থ স্পষ্ট হয় নি কর্মকর্তাদের কাছে। তাদের মনে হয়েছে তিনি বোধ হয় বলতে চাচ্ছেন, পশ্চিম-পাকিস্তান মতৈক্যে না পৌঁছলে যার যার পথ দেখতে হবে।
বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু যা বলেছিলেন পরবর্তীকালে তাই পালন করার চেষ্টা করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালে নির্বাচনের আগেই তিনি মনস্থির করে ফেলেছিলেন। অর্থাৎ নির্বাচনের পর যদি তাঁকে ক্ষমতায় যেতে না দেয়া হয় তাহলে স্বাধীনতার পথে যাবেন এবং তখন থেকেই ধাপে ধাপে মানুষকে তিনি প্রস্তুত করছিলেন।

ছয়

ফেব্রুয়ারি মাসে ফারল্যান্ড বিস্তৃত এক রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন পররাষ্ট্র দফতরে। ঐ রিপোর্টে সেনাবাহিনীর মনোভাব সম্পর্কে জানা যায়। জেনারেল ইয়াকুব ও আরও অনেকের সঙ্গে আলাপের পর (ব্রিটিশ ব্রিগেডিয়ার জর্জ হার্ডার আলাপ করেছিলেন) তাঁদের মনে হয়েছে, জেনারেলরা মনে করেন অশান্তি ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল হয়ে পড়বে। সে জন্য সেনা অফিসাররা মনে করেন বর্তমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করাই বাঞ্ছনীয়।
মে মাসের এক রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, মানুষজন এখন নিশ্চিত যে, জেনারেল ইয়াহিয়া নির্বাচন দেবেন। তবে, তিনি যে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার জারি করেছেন তার প্রতিক্রিয়া দুই পাকিস্তানে হয়েছে দুই রকম। পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক, পূর্ব-পাকিস্তানে নেতিবাচক। পশ্চিম-পাকিস্তানে ডানপন্থীরা মনে হয় মাটি পাচ্ছে। পূর্ব-পাকিস্তানে

স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিই আধিপত্য বিস্তার করে আছে। অন্যদিকে সেনাবাহিনী মনে করছে না যে, গণতন্ত্র পাকিস্তানে টেকসই। রিপোর্টের ভাষায় "The military is increasingly skeptical (as are elements of the West Pakstani establishment) that the democratic process will prove viable in Pakistan." রিপোর্টের উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে, যতই দিন যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে সংবিধান প্রণয়ন দুরূহ হয়ে উঠবে। এমনকি বাঙালিরা ক্ষমতায় এলে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে এবং তখন ঘটনাপ্রবাহের ওপর নির্ভর করবে দুটি প্রদেশ আলাদা হয়ে যাবে, না, আবার সামরিক আইন জারি করা হবে।

জুন মাসে কিলগোর দেখা করেছিলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে। তখন তাঁদের মনে হয়েছে শেখ মুজিব আগের মতো উচ্ছল নন। তিনি জানালেন তিনি ধৈর্য হারাচ্ছেন। কারণ সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দারা শিল্পপতিদের পরামর্শ দিচ্ছে তাঁকে সমর্থন না জানানোর। যদি সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং 'ভেস্টেড ইন্টারেস্ট' এ ধরনের খেলা খেলতে থাকে তাহলে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন এবং সেনাবাহিনী বাধা দিলে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করবেন। কিন্তু তাহলে ভিয়েতনামের মতো অবস্থা হতে পারে—যেখানে কমিউনিস্টরা আধিপত্য বিস্তার করে আছে—শুধু এ কথা চিন্তা করেই তিনি চুপ করে আছেন। এই 'ভেস্টেড ইন্টারেস্টের' খেলার একটি উদাহরণ তিনি ইয়াহিয়াকে দিয়েছেন। সেটি হলো, পাগারোর পীর আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছেন।

সদরি ইস্পাহানী এরই মধ্যে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের একটা সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনে গিয়েছিলেন সন্তোষ। রিপোর্টে মওলানা সম্পর্কে ব্লাডের পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ব্লাডের মনে হয়েছে, মওলানা ক্ষমতা চান না বরং তিনি নিজের জন্য যে 'লিজেন্ড' সৃষ্টি করেছেন সেটি অটুট থাকুক, তাই চান। তিনি একজন 'এস্টাবলিশমেন্ট বিপ্লবী'। এর অর্থ তিনি বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা বদলাতে চান না, সরকারের জন্যও কোনো হুমকি নন। এবং হুমকি হওয়ার মতো সাংগঠনিক ভিত্তিও নেই। ব্লাডের ভাষায়, "he struck us as a figure with considerable nuisance value but porbably not posing any serious threat to the government or to the anticipated electoral process."

জুন মাসে করাচিতে একজন কর্মকর্তা দেখা করেছিলেন ইউসুফ হারুনের সঙ্গে। হারুন যা বলেছিলেন তা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানিয়েছিলেন, সামরিক বাহিনীর বেশ কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে, বিশেষ করে জেনারেল গুল হাসান ও জেনারেল উমরের সঙ্গে। তাঁর মতে, জেনারেলরা নির্বাচনের একটা বাতাবরণ তৈরি করতে চাচ্ছেন এবং সংবিধান যাতে প্রণীত না হয় সে রকম অবস্থা সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন। কারণ সংবিধান প্রণীত না হলে সেনাশাসন অব্যাহত থাকবে।

পাকিস্তানি জেনারেলরা যে নির্বাচনের আগে থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরে অ-রাজি ছিল এ কথাটি এই রিপোর্টের মাধ্যমে স্পষ্ট হলো। করাচিতে এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল উমর ভাব দেখিয়েছিলেন, এসব বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। আমরা জানতাম তিনি মিথ্যা

বলতেন। কিন্তু এখন আরও স্পষ্ট হলো, তারা ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্রে মেতেছিলেন এবং ১৯৭১ সালে গুল হাসান ও উমর ছিলেন ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী।
আইবিআরডি ভাইস প্রেসিডেন্ট পিটার কারগিল ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলেন জুন মাসে। কারগিল মার্কিন কর্মকর্তাকে এই কথোপকথনের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে আমাদের উপযুক্ত মন্তব্য তো সত্য প্রমাণিত হচ্ছেই, আরও অনুমান করা যাচ্ছে, জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁকে বলেছেন, ঘটনা এমন হতে পারে যে, সামরিক বাহিনীকেই আবার কর্তৃত্বে থাকতে হতে পারে। শুধু তাই নয়, তাঁকেও হয়তো বছর তিনেক থাকতে হবে। ইয়াহিয়া রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে কটুকাটব্য করে কারগিলকে বলেছিলেন, দেশে তিনি একজন দায়িত্বশীল রাজনীতিবিদও দেখেননি।
কিছুদিন আগে পাকিস্তান সফরকালে ১৯৭১ সালের নীতিনির্ধারকদের অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁরা বলেছিলেন, ১৯৭১-এর আগে থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানকে ছাড়া পশ্চিম-পাকিস্তান চলতে পারবে কি-না সে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা হচ্ছিল। পূর্বের টাকায় পশ্চিম তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিল। তখন অনুন্নত পূর্ব-পাকিস্তান ছিল ভারস্বরূপ। এ তত্ত্বের নাম দেয়া হয়েছিল 'লায়াবেলিটি তত্ত্ব'। আরও জানতে পেরেছিলাম ১৯৬৯-এর পর থেকে প্ল্যানিং কমিশনও এই বিষয়ে হিসাব-নিকাশ করছিল।
এই 'লায়াবেলিটি তত্ত্ব' ও ধারণা যে সঠিক তা জানা গেল দূতাবাসের ৩ জুলাইয়ের রিপোর্টে। ঐ রিপোর্টে সামরিক বাহিনীর মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা আছে। জানা যাচ্ছে, পাঞ্জাবের কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রধান চাচ্ছেন সামরিক বাহিনী ও সংসদীয় সরকারের সাথে 'বাফার' হিসেবে ইয়াহিয়া কাজ চালিয়ে যাক। সংসদীয় সরকার সামরিক বাহিনীর বাজেট কাটছাঁট করবে এবং সেই টাকা পূর্ব-পাকিস্তান ও অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে। পরিকল্পনা কমিশনের অধীন একটি বিশেষজ্ঞ দল কাজ করে যাচ্ছে। কাজটি হলো, যদি পূর্ব-পাকিস্তান না থাকে, তাহলে পশ্চিমের টাকা দিয়ে সামরিক ব্যয় মিটিয়ে বিদ্যমান উন্নয়নের ধারা বহাল রাখা যাবে কি-না? পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের প্রধান অর্থনীতিবিদ পারভেজ হাসান এক মার্কিন সাংবাদিককে জানিয়েছেন, বিশেষজ্ঞ দলের অনেকে মনে করেন, এটি সম্ভব। কয়েকজন অবশ্য মনে করেন, এটি সম্ভব নয়। অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ একটা চলছিল।
এ রিপোর্টে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর ছিল যে, গত দেড় বছরে (অর্থাৎ ১৯৬৯ থেকে) বেশ কিছুসংখ্যক সেনা অফিসারের প্রমোশন দেয়া হয়েছে, যার ফলে অফিসারের ঐ সংখ্যা ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জিতল। অনেকে এতে অবাক হলেও শেখ মুজিব হন নি। ঢাকার কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এ ছাড়া শেখ মুজিব সম্পর্কিত তাঁর একটি পর্যবেক্ষণ রিপোর্টও পাঠিয়েছিলেন পররাষ্ট্র দফতরে।
শেখ মুজিব, ব্লাডের মতে সারা জীবনই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, মানুষ হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্য বিচার করা দুরূহ। ব্যক্তিগত আলাপে তিনি "charming calm and confident." বক্তৃতামঞ্চে উঠলে তিনি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলতে পারেন। দলীয় নেতা হিসেবে তিনি কর্তৃত্বপরায়ণ ও "অ্যারোগ্যান্ট"। তিনি সব সময় বলেন, 'আমার মানুষ, আমার

দেশ, আমার বন, আমার নদী'। এটা স্পষ্ট যে, নিজেকে তিনি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেন (personification of Bangali aspirations)।
মুজিব প্রাথমিকভাবে হচ্ছেন "a man of action"—একজন জননেতা। তাঁর বিরোধীরা বলেন, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতা নেই, নীতিহীন, সুবিধাবাদী এবং ক্ষমতালোভী। ব্লাড আবার এসব অভিযোগ খণ্ডন করেছেন এভাবে—শেখ মুজিব কায়মনে ক্ষমতা চান এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজনীতিবিদদের প্রায় ক্ষেত্রেই সুবিধাবাদী বলা হয়। সুতরাং তাঁকেও এই অভিধা দেয়া হবে বলাই বাহুল্য। তিনি বুদ্ধিজীবী হতে না পারেন, কিন্তু, "Mujib demostrates considerable mental agility in private meetings".
ব্লাড পরবর্তী রিপোর্টেও উল্লেখ করেছেন যে, শেখ মুজিব প্রায় বলেন, পূর্ব-পাকিস্তান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশ, মধ্যপ্রাচ্যের নয়। এ দৃষ্টিভঙ্গিই সৃষ্টি করে এ প্রশ্নের যে দুটি অঞ্চল কি ঐকমত্যে পৌঁছতে পারবে? উপসংহারে বলা যেতে পারে, মুজিব তাঁর 'ছয় দফা' ও 'বাংলাদেশ'-এ বন্দি হয়ে গেছেন। এটা ভাবা খুব কষ্টকর, লিখেছেন আর্চার ব্লাড, যে বাঙালিদের ছাড়া মুজিব ইসলামাবাদে বসে শাসন করছেন। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যদি শেখ মুজিব হতাশা বোধ করেন তাহলে তাঁর পিছু হটার জায়গা আছে। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। ব্লাডের ভাষায় "to seek to strike out on his own as leader of an independent East Pakistan". এরপর চলে এলো একাত্তর।

সাত

একথা আর নতুন নয় যে, নিক্সন পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৯৭০ সালের শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে লেখা একটি চিঠিতে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিক্সন সেই চিঠিতে ইয়াহিয়াকে জানিয়েছেন, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী অস্ত্রের জন্য যে অনুরোধ জানিয়েছে, নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাতে সায় দিচ্ছে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চায়।
নিক্সনের এ চিঠি পেয়েই কি পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ চিন্তাভাবনা করছিল নাকি বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো চিন্তাভাবনা থেকেই কী অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছিল? এ অনুমান সম্পর্কে অবশ্য এ পর্যায়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে না। অদূর ভবিষ্যতে কখনও যদি পাকিস্তানের গোপন নথিপত্র পাওয়া যায় তখন হয়তো এ সম্পর্কে কিছু জানা যেতে পারে।
দূতাবাসের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় তাদের নীতি ছিল রাজনীতিবিদদের এড়িয়ে চলা। এ কারণে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে এড়িয়ে চলা হয়েছে আর ভুট্টোর ধারণা ছিল দূতাবাস তাঁকে এড়িয়ে চলছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইয়াহিয়া নিজেও মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করেছিলেন, ভুট্টোকে যেন এড়িয়ে চলা হয়।
এ থেকে বোঝা যায়, ইয়াহিয়া সে সময় ভুট্টোকে পছন্দ করতেন না। অন্যদিকে, ভুট্টো চাইছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সম্পর্ক গড়ে তোলার। ১৩ জানুয়ারির রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভুট্টোর বৈঠক হয়েছে। ভুট্টো তাদের বার বার

বোঝাতে চেয়েছেন তিনি মার্কিনিদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন নন। মার্কিনীরাও একই কথা বোঝাতে চেয়েছেন ভুট্টোকে।

ঐ বৈঠকে ভুট্টো তাদের জানিয়েছেন, তাঁর প্রথম কাজ শাসনতন্ত্র রচনায় অংশ নেয়া। এ কারণে শেখ মুজিবের সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসবেন। তিনি জানেন না, ছয় দফার ব্যাপারে শেখ মুজিবের মনোভঙ্গি কী হবে। অর্থাৎ তিনি কি তাঁর অবস্থানে দৃঢ় থাকবেন নাকি কিছুটা ছাড় দেবেন। ভুট্টো জোর দিয়ে বলেছেন (ছয় দফার পরিপ্রেক্ষিতে) বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ভূমিকা থাকতে হবে। দূতাবাসের কর্মকর্তাদের মনে হয়েছে শেখ সাহেবের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে ভুট্টোর মনে দ্বিধা আছে [Bhutto evinced hesitancy in speculating on chances of effective collaboration with Mujib] ভুট্টো আরও জানিয়েছেন, নির্বাচনের সময় পিপিপি'র প্রতি সেনাবাহিনী সহানুভূতিশীল ছিল না বরং নমনীয় ছিল আওয়ামী লীগের প্রতি। গভর্নর এ কে এম আহসান ও জেনারেল ইয়াকুব সহানুভূতিশীল ছিলেন মুজিবের প্রতি।

ভুট্টোর এই আলোচনা থেকে দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে—শেখ মুজিবের প্রতি তিনি কতটা নমনীয় হবেন সে সম্পর্কে তখনও মনস্থির করেন নি। অন্যদিকে, তাঁর মনে হয়েছে, সামরিক বাহিনী তাঁর প্রতি আস্থাশীল নয়। অথচ পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী একটি শক্তি। হয়তো এ কারণেই পরে তিনি ইয়াহিয়াকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে লারকানা নিয়ে গিয়েছিলেন। তাহেরা মাজহার আলী আমাকে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, খুব সম্ভব ফেব্রুয়ারিতে ভুট্টো লাহোরে একটি জনসভা করেন। সেখানে তিনি কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে এবং মনে হচ্ছিল, তিনি সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করেই কথা বলেছেন, তোয়াজ করছেন। লাহোর শুধু পাঞ্জাবের নয় সেনাবাহিনীরও একটি কেন্দ্র। তাহেরা মাজহার বলেছেন, তখন তাঁরা অনুধাবন করেননি কেন ভুট্টো এরকম আচরণ করছেন।

প্রথম বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যখন ভুট্টো মার্কিন কূটনীতিককে বলেন যে, তিনি গুজব শুনেছেন, আমেরিকা চায় পাকিস্তান দু'টুকরো হয়ে যাক যাতে পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ভারতের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ঘাঁটি গড়তে পারে। কারণ ভিয়েতনাম থেকে তাদের হটে আসতে হয়েছে। মার্কিন কূটনীতিক বিষয়টিকে অস্বীকার করে বলেন, বিষয়টি পাকিস্তানের জনগণের, তবে এ ধরনের সঙ্কটে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি পাকিস্তানিরা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে তাহলে তারা সফল হবে।

এই বৈঠকের পর মার্কিন কূটনীতিকের মনে হয়েছে, ভবিষ্যতে ভুট্টো পাকিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তাঁর মনে হয়েছে, ভুট্টো নিজের ভূমিকার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তবে প্রবলভাবে নয়।

আসলে নির্বাচনের আগে ভুট্টো নিশ্চিত ছিলেন না তাঁর দলের ফলাফল কী হবে। সেনাবাহিনী তাঁকে আশ্রয় দেয় নি, মার্কিনিরাও এড়িয়ে চলেছে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার পর তিনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং বুঝলেন যে তিনি জোরের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। কিন্তু নিজের অবস্থান আরও দৃঢ় করার জন্য তিনি দুটি কৌশল নিয়েছিলেন। এক. যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং দুই. সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

এখানে উল্লেখ্য, ঐ একইদিনে ভুট্টোর সঙ্গে চীনা, তুর্কি, সৌদি ও ফরাসি রাষ্ট্রদূতেরা দেখা করেন, কিন্তু ভুট্টো দীর্ঘ সময় কাটান চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে ভুট্টো চীনের সঙ্গেও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তুলতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে চীনের ভূমিকাকে হয়তো ভুট্টো প্রভাবান্বিত করে থাকতে পারেন।

এই বৈঠকের সংবাদ পাওয়ার পর মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব রজার্স ফারল্যান্ডকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, দূতাবাসের এই ভূমিকা অভিনন্দনযোগ্য। কারণ এর ফলে পিপিপি নেতার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা সহজ হবে। শুধু তাই নয়, ভুট্টোর সঙ্গে এ ধরনের যোগাযোগ রক্ষার নির্দেশ প্রদান করেন রজার্স।

১লা ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড পররাষ্ট্র দফতরে এক বিশাল রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তিনি জানান, ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে এবং ইয়াহিয়া এ ভেবে শঙ্কিত যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে না দেশটি ভাগ হয়ে যায়। তিনি চান না এ প্রক্রিয়ায় যেন তিনি জড়িত থাকেন।

ফারল্যান্ড ইয়াহিয়াকে জানান, যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে গুজব যাই রটুক না কেন, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে। পররাষ্ট্র সচিব ফারল্যান্ড জানান, ১৯৬৪ সালের পর পাকিস্তানের জন্য কোনো 'পলিসি পেপার' তৈরি হয় নি। এখন এক ক্রান্তিকালীন সময় অতিক্রম করছে পাকিস্তান। তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একটি 'পলিসি পেপার' তৈরি করেছেন। তাঁর মতে, পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কী হবে তা বিচার করতে হবে দক্ষিণ এশিয়ার পটভূমিকায়।

এরপর 'পলিসি অ্যাপ্রাইজাল পাকিস্তান' নামে দীর্ঘ একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। এতে ইতিহাস যেমন আছে তেমনি আছে পাকিস্তান ভেঙে গেলে কী করা যেতে পারে। সামগ্রিক ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রদূত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তা হলো :

১৯৬৮ সালের পর থেকে পাকিস্তানের অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। এখন দুটি অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ রাখাই হচ্ছে মূল রাজনৈতিক কাজ। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব অবশ্য বলছেন, বাঙালিরা 'এখনও' স্বাধীনতার জন্য তৈরি নয় কিন্তু দুই পাকিস্তানের বিষয়টিই বাস্তব হয়ে উঠছে।

রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেছেন, দুটি দলই আন্দোলনে বড়, শাসনে নয়। দুটি অঞ্চলে যদি পাকিস্তান ভাগ হয়ে যেতে চায় তাহলে সামরিক বাহিনী সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রোধ করবে। অন্যদিকে, নির্বাচনে জনমত স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে।

আসলে বিষয়টি তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের পিপিপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে, সামগ্রিকভাবে বিরোধী দলের শক্তি একেবারে উপেক্ষা করার মতো ছিল না। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে জনমত প্রায় সম্পূর্ণভাবে ছিল ছয় দফার পক্ষে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন যা 'স্ট্যাটাস কো' বা স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে।

ইসলামাবাদের মার্কিন কূটনীতিবিদরা আরও জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্পর্ক [পেশোয়ারে মার্কিন ঘাঁটি ছিল] তা আর নেই। যে কারণে, পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থ হ্রাস পেয়েছে। এবং পাকিস্তানের ঐক্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে একথা ধারাবাহিকভাবে মার্কিন সরকারগুলো বিশ্বাস করেছে। বিভক্ত পাকিস্তান নানা

সমস্যার সৃষ্টি করবে। রিপোর্টের ভাষায়—"Unity of Pakistan will present us with fewer problems and pose a lesser threat to area stability then the separation of the country into two independent states."
এতসব চিন্তাভাবনার পরও কূটনীতিবিদদের তখনই আশঙ্কা হয়েছিল পাকিস্তান থাকবে না। যে কারণে, রিপোর্টের শেষাংশের শিরোনাম : 'কনটিনজেন্সি অব ইস্ট-ওয়েস্ট পাকিস্তান স্প্রিন্ট রিকোগনিশন'। বা পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে গেলে স্বীকৃতির বিষয়টি কী হবে?
কূটনীতিবিদরা জানিয়েছেন, মূল প্রশ্ন এখন (ফেব্রুয়ারি ১৯৭১) পাকিস্তান থাকবে কিনা? যদি পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যায় তা হলে কী হবে? কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তখন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে পূর্ব-পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেবে কি দেবে না। তাঁদের মতে—

১. যদি দু'পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে আলাদা হয়ে যায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভাল। স্বীকৃতি নিয়ে ঝামেলা হবে না।
২. যদি বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তাহলে আমেরিকাকে দেখতে হবে সুস্পষ্টভাবে কে সেই লড়াইয়ে জিতছে। অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তান জিতছে এটি প্রমাণিত হলে স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে।
৩. যদি সেই 'সেপারেশন' 'ভায়োলেন্ট' হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তা সমস্যার সৃষ্টি করবে। কারণ, উভয় পক্ষই তখন স্বীকৃতির প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে।

পরবর্তীকালে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিকল্পটিকে বেছে নিয়েছিল।

আট

নির্বাচনে জয়ী হয়ে ভুট্টো শুধু আত্মবিশ্বাসী নয়, মনে হয়, ক্ষমতায় যাওয়ার একটা ছক কেটে নিয়েছিলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, নির্বাচনী রায় যদি বানচাল করা যায় তাহলে তিনি তখনই ক্ষমতায় না যেতে পারেন কিন্তু তারপর নানাবিধ কারণে হয়তো ক্ষমতায় যেতেও পারেন। আর যদি সম্পূর্ণ পূর্ব-পাকিস্তানের ক্ষমতায় না যেতে পারেন তাহলে অর্ধেক পাকিস্তানে ক্ষমতায় যাবেন। এ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এগোচ্ছিলেন।
তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য, কার্যকলাপ এবং মার্কিন কাগজপত্র সে কথাই প্রমাণ করে। ঐ সময়টা, অন্তত মার্কিন কাগজপত্র দেখে মনে হয়, ইয়াহিয়া খুব একটা চিন্তায় পড়েন নি। অবশ্যই তিনি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং হয়তো ভেবেছিলেন, দু'পক্ষই তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাখতে চাইবে। সে ক্ষেত্রে ঐ সময় তাঁর পর্যবেক্ষণগুলোতে খুব একটা পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়া তখন বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ তাদের হোমওয়ার্ক করেছে এবং সেই মতো এগুচ্ছে। শাসনতন্ত্র কী হতে পারে সে ব্যাপারেও তাদের সুনির্দিষ্ট মতামত আছে। কিন্তু ভুট্টো প্রস্তুত নন এবং তিনি 'পলিটিকিং' করে বেড়াচ্ছেন। ইয়াহিয়ার মনে হয়েছে, সে কারণে আসন্ন সংসদ অধিবেশনে ভুট্টো বাধা হয়ে দাঁড়াবেন। ইয়াহিয়ার এই মন্তব্য যথাযথ বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে, প্রস্তুত নন বলে যে ভুট্টো অধিবেশনে বাধা দিয়েছিলেন তা নয়, তিনি প্রস্তুতি নিতেই চান নি। কারণ, তখন তিনি ঠিক করে ফেলেছেন সংসদ অধিবেশন বসতে দেবেন না।

ইয়াহিয়া ফারল্যান্ডকে জানিয়েছিলেন, দুই নেতার সঙ্গেই তাঁর আলোচনা হয়েছে এবং তাঁর মনে হয়েছে, তাঁরা বুঝছেন যে, শাসনতন্ত্র না হওয়া পর্যন্ত সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হবে না। সুতরাং দু'পক্ষের মধ্যেই দেয়া-নেয়ার মনোভাবটি থাকতে হবে। ইয়াহিয়া আশাবাদী। তাঁর মনে হয়েছে, দু'পক্ষই প্রয়োজনে ছাড় দেবে।

মার্কিন কর্মকর্তারা কিন্তু ভুট্টোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন। আসলে পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার কারণে, শীর্ষ কূটনীতিবিদরা পশ্চিম-পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তার সংস্পর্শে আসতেন। পূর্ব-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না। সুতরাং সে ক্ষেত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানি দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ওপর খানিকটা হলেও প্রভাব ফেলতে পারে। পশ্চিম-পাকিস্তানের ঘটনাবলি তাই তাঁদের রিপোর্টে যতটা এসেছে, পূর্ব-পাকিস্তানের নয়।

৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড কনসাল জেনারেল লুপ্পিকে নিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করেন। শাসনতন্ত্র রচনার বিষয়ে ভুট্টো উল্লেখ করেন ছয় দফার দুই দফা—বৈদেশিক বাণিজ্য ও কর নিয়ে মতদ্বৈততা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সমঝোতা হলে আর বাধা থাকবে না। সংসদ অধিবেশন ডাকার ব্যাপারে ভুট্টো জানিয়েছেন, ভারত তার ওপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান যেতে দিচ্ছে না এতে সমস্যা হতে পারে কিন্তু, এতে কী সমস্যা হতে পারে তা তিনি বুঝিয়ে বলতে পারেন নি। বোঝা যাচ্ছে, শুরু থেকেই জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত রাখার ব্যাপারে ভুট্টো অজুহাত খুঁজছিলেন। এ বিষয়ে ভুট্টোর কন্যা বেনজীর যিনি তাঁর পিতার ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার ও মহিউদ্দিন আহমদের আলাপ হয়েছিল। তিনি এ সম্পর্কে যা বলেছিলেন তাতে বোঝা যাচ্ছে সংসদ অধিবেশনে যোগদানের বিপক্ষে আসলে কোনো যুক্তি ছিল না। তিনি বলছিলেন "ছয় দফা দাবির আড়ালে ছিল স্বাধীনতার দাবি, তা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতও তাই চেয়েছিল। ছয় দফা মানলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকত না।

দ্বিতীয়ত সত্তরের নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ দু'ধরনের রায় দিয়েছিল। একটি ছিল ছয় দফার পক্ষে, অন্যটি ছয় দফার বিরুদ্ধে। সুতরাং দুই পক্ষের সমঝোতার প্রয়োজন ছিল।

তৃতীয়ত ১৯৭০ সালে পূর্বাঞ্চলে সত্যিকার অর্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নি। মওলানা ভাসানী নির্বাচনে যান নি, ফলে শেখ মুজিব যে নির্বাচনে জিতেছিলেন তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। "নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের", বললাম আমি, "এ কমিশন ছিল কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত। নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত তো আর শেখ মুজিবের ছিল না। যে সব অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেগুলোতেই শুধু নির্বাচন স্থগিত রাখার আবেদন জানানো হয়েছিল।"

"আমার বক্তব্য, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নি। আজ যদি পাকিস্তানে নির্বাচন হয় এবং নওয়াজ শরীফ নির্বাচনে যান এবং আমি না যাই তাহলে কি তা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে? মওলানা ভাসানী নির্বাচনে যান নি, তাই তা চলে যায় আওয়ামী লীগের অনুকূলে।"

"নির্বাচন হয়েছিল এবং আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল।" খানিকটা উত্তেজিত হয়ে জানাই আমি।

"পশ্চিম পাকিস্তান তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়", বললেন বেনজীর।

"একটি ম্যান্ডেট নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে একটি দল।", জানালেন মহিউদ্দিন ভাই, "আর পশ্চিম পাকিস্তানিরা তা মানতে গররাজি হয়। তাহলে মি. ভুট্টো কী ধরনের সমঝোতা চেয়েছিলেন?"
"তার ব্যাখ্যাও দিচ্ছি", বললেন বেনজীর, "ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। কায়েদে আওয়াম (ভুট্টো) বলেছিলেন ঐ ধরনের বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। অনেকে ভুলে গেছেন কিন্তু আমি ভুলি নি যে কথা, তা হলো পার্লামেন্টে যাবেন না এ কথা ভুট্টো কখনও বলেন নি। তিনি দর কষাকষির জন্য সময় চেয়েছিলেন।
"কি ধরনের সমঝোতা তিনি চেয়েছিলেন", ফের প্রশ্ন করেন মহিউদ্দিন ভাই।
"আমি বিদেশ থাকাকালীন তাঁর 'দি গ্রেট ট্র্যাজেডি' প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে এর বিবরণ আছে।"
"বইটি আমি পড়েছি", গম্ভীর স্বরে জানালেন মহিউদ্দিন ভাই, "সামরিক বাহিনীর অনুকূলে ছিল যুক্তিগুলো। তাছাড়া 'ট্র্যাজেডি' কথাটার মধ্যে ছিল নিষ্ঠুর পরিহাস।"
এ মন্তব্য শুনে মুখের একটি রেখাও বদলালো না বেনজীরের। বললেন, "ট্র্যাজেডি হয়তো ছিল দু'দেশের জন্যই কিন্তু এটাই ছিল ঐ সময়কার অভিমত।"
"পিপিপি ছয় দফার সাড়ে পাঁচ দফা মেনে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন ঐ সময় মি. ভুট্টো", বললেন মহিউদ্দিন ভাই, "অথচ কেউ জানে না। শেখ মুজিবের সঙ্গে উনি কি ধরনের সমঝোতা চেয়েছিলেন?"
"তিনি চেয়েছিলেন শেখ মুজিব ছয় দফায় অনড় থাকবেন না। কারণ, পাকিস্তান তাহলে পাঁচটি দেশে পরিণত হবে।"
যাক, পুরনো কথায় ফিরে আসি। ফারল্যান্ডের সঙ্গে ঐ বৈঠকে ভুট্টো আবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে জোর দিয়েছিলেন। মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ফারল্যান্ড আবার ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এ সময় একটি ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি সামান্য কিন্তু ভুট্টোকে বোঝার জন্য ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ। আলাপ শেষে ভুট্টো ফারল্যান্ডকে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ওপর তাঁর বিশেষ সংগ্রহ দেখিয়েছিলেন। বোঝা যাচ্ছে, নেপোলিয়ন ভুট্টোর প্রিয় ব্যক্তিত্ব। কারণ? কারণ, নেপোলিয়ন ছিলেন অ্যাডভেঞ্চারিস্ট, ঝুঁকি নিয়েছিলেন, কৌশলী ছিলেন, বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। ভুট্টোর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়টি।

নয়

ফেব্রুয়ারি ১০ তারিখে ভুট্টো পেশোয়ারে। ফারল্যান্ড গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ভুট্টো ফারল্যান্ডের কাছে জানতে চাইলেন, যদি তাঁর সঙ্গে মুজিবের ঐকমত্য না হয়, শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব কী হবে? ফারল্যান্ড জানালেন, এটি পাকিস্তানের জনগণের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তাঁর কিছু বলার নেই। ফারল্যান্ড মন্তব্য করেছেন, ভুট্টোর সঙ্গে যে সময় তিনি দেখা করতে যান তার কয়েক ঘণ্টা আগে ইয়াহিয়া

ঘোষণা করেছেন মার্চের তিন তারিখে অধিবেশন বসবে। এবং ভুট্টো সে ঘোষণা শোনেন নি তা তো হতে পারে না। কিন্তু ফারল্যান্ডকে তিনি এ ব্যাপারে কিছুই বলেন নি এবং প্রতিক্রিয়া দেখান নি। ভাবটা এমন যে, অধিবেশন ডাকার ঘোষণা তিনি শোনেন নি। এ থেকেই বোঝা যায়, ভুট্টো মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে, তিনি অধিবেশনে যোগ দেবেন না।

এরপর ২৫শে ফেব্রুয়ারি ফারল্যান্ড দেখা করলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে। এই প্রথমবার তাঁর কাছে মনে হলো, ইয়াহিয়া বিমর্ষ, কারণ জানালেন তিনি, মুজিব-ভুট্টো কোনো সমঝোতা হচ্ছে না। ভুট্টো সম্পর্কে ইয়াহিয়ার বিভিন্ন মন্তব্য শুনে মনে হয়েছে, ভুট্টো সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভাল নয়, শেখ মুজিবকে আলোচনার জন্য দু'বার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি কিন্তু মুজিব তাতে সাড়া দেন নি। ইয়াহিয়া আভাস দিয়েছেন তাঁরা ঐকমত্যে না পৌঁছালে অধিবেশন কয়েক সপ্তাহ পিছাতে পারে। হতাশ স্বরে কথা বলছিলেন ইয়াহিয়া এবং বলছিলেন ঐকমত্যেও পৌঁছালে সমস্যা দেখা দেবে। এ শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রশ্ন জাগে। আমরা জানি, এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নীতিনির্ধারক স্বীকার করেছেন যে, '৭১ সৃষ্টিতে 'লারকানা ঘটনা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন, ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী হবেন শেখ মুজিব, তারপর ফিরে যান পশ্চিম পাকিস্তান। ভুট্টো তখন তাঁকে লারকানায় নিজ জমিদারীতে শিকারের আমন্ত্রণ জানাল। ইয়াহিয়া সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং তারপর পশ্চিম-পাকিস্তানের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইসলামাবাদ থেকে পাঠানো কোনো রিপোর্টে এর উল্লেখ নেই। নাকি ছিল যা রোয়েদাদ খান সঙ্কলিত করেন নি। এরপর ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার সঙ্গে ফারল্যান্ডের অনেকবার বৈঠক হয় কিন্তু কেউ এ বিষয়টি উল্লেখ করেন নি। ঐ সময় ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছিল তাও জানা যায় নি।

অন্যান্য সূত্র থেকে বিষয়টি পরীক্ষা করা যাক। ১৯৭৩ সালে মেজর জেনারেল ফজল মুকিম খান একটি বই প্রকাশ করেন 'পাকিস্তানস ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ'। বইটি পাকিস্তানে আদৃত হয়েছে এবং এ বই সম্পর্কে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেন নি। এর অর্থ, এতে বর্ণিত ঘটনাবলির এক ধরনের বিশ্বাসযোগ্যতা আছে, বিশেষ করে পাকিস্তানিদের মধ্যে। অনেকে বলেন, এর পেছনে তৎকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। তিনি লিখেছেন, ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকেও জেনারেল ইয়াহিয়া ঠিক করতে পারছিলেন না যে তিনি কী করবেন। বিভিন্ন মহলের চাপ ছিল তার ওপর। তাছাড়া বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার স্বার্থ ছিল যাতে মুজিব ক্ষমতায় যেতে না পারেন। অনেকেই পরামর্শ দিচ্ছিল, বাঙালিদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেয়ার জন্য। জেনারেলের ভাষায় পরামর্শটি ছিল এ রকম : "The killing of a few thousand would not be a high price for keeping the country together. Handing over power to Mujibur Rahman, a proved traitor, would be a blunder and history would never forgive Yahyah Khan for this."

পশ্চিম-পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনাকালে অনেকে এ তথ্য সমর্থন করেছেন। মেজর জেনারেল ফরমান আলী অনেক দিন ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানে। ১৯৭১-এর পুরো সময়টাতে তো বটেই। তিনি ছিলেন ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ। তিনি এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছেন—জেনারেল উমর "আমাকে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ঢাকা থেকে ফেরার পর তাঁরা লারকানায় যান। এর আগে ঢাকায় জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিব হবেন পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। তবে লারকানায়, ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বলেন, আপনি তো মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, আমি নই, জনসাধারণই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করেছে। পরে কিছু কথাবার্তার পর তিনি তাঁকে বলেন যে, মুজিবের স্বদেশপ্রেম যাচাই করতে হবে আর সে যাচাই পরীক্ষাটি হবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে। এতে যদি মুজিব প্রতিক্রিয়া দেখান তাহলে তিনি দেশপ্রেমিক নন, যদি না দেখান তিনি একজন স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি।"

"তখন নানা দিক থেকে ইয়াহিয়ার ওপর চাপ ছিল। তাঁর ওপর জেনারেলদের চাপ এত প্রবল ছিল যে, তিনি কার্যত আমাকে বলেই ফেলেন যে, দেখ, আমি পশ্চিম-পাকিস্তানে চললাম। আমার ধারণা, আমি বোধহয় একটা চরম অবস্থায় পৌঁছেছি। এ কথা বলছি, কেননা, ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হবার খায়েশ প্রকাশ করেছিলেন অথচ দেশ একটা।"

ফরমান আরও জানিয়েছেন, ভুট্টোর ওপরও পাঞ্জাবি সেনাচক্রের চাপ ছিল প্রবল। তা ছাড়া তিনি চাচ্ছিলেন নিজের দলকে উজ্জীবিত রাখতে। একটা কিছুর জন্য সংগ্রামের প্রেরণা জিইয়ে রাখতে না পারলে দল ভেঙে যাবার ঝুঁকি থাকে—নেতাকে আক্রমণাত্মক হতে হয়। ভুট্টো এ কাজটি করতে গিয়েই বাড়াবাড়ি করে সীমা অতিক্রম করেছিলেন।

এয়ার মার্শাল আসগর খানের সঙ্গেও আমার এবং মহিউদ্দিন আহমদের কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন "১৯৭০-এর নির্বাচনের আগে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তিনি বলছিলেন, ভুট্টো তাঁকে বলেছিলেন, নির্বাচন বাদ দিতে হবে। সৈনিক ইয়াহিয়া খান ও রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো ভালো টিম হবে এবং একসঙ্গে তাঁরা দেশ শাসন করতে পারবে। ইয়াহিয়ার মনে হয়েছিল প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের ব্যাপারটা কী হবে? ভুট্টো বলেছিলেন, পূর্ব-পাকিস্তান কোনো সমস্যা নয়। সেখানে হাজার বিশেক লোক খতম করে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রস্তাবে আপনার প্রতিক্রিয়া কী হলো? ইয়াহিয়া বললেন, হোয়াট ক্যান ওয়ান সে টু সাচ এ সাজেশন।"

নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান ঢাকায় গেলেন। মুজিবের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনাও হলো। ইয়াহিয়া ফিরে এসে ঘোষণা করলেন, মুজিব হবেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। এরপর সিনে এলেন ভুট্টো। ইয়াহিয়া খান গেলেন লারকানা। সেখানেই সিদ্ধান্ত হলো মুজিব যদি তাঁর স্ট্যান্ড থেকে না সরেন তাহলে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি রাওয়ালপিন্ডিতে সামরিক জান্তার এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়—

১. নির্বাচনের আগে ভুট্টো ভাবেন নি পিপিপি এত ভালো ফল করবে। তিনি ইয়াহিয়াকে নিয়ে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন।

২. ইয়াহিয়া বিষয়টি ঠিক সেভাবে তখনও চিন্তা করেন নি। সে জন্য বলেছিলেন, শেখ মুজিব হবেন প্রধানমন্ত্রী। ভুট্টো সম্পর্কে তার মনোভাব ভালো ছিল না।
৩. সেনাবাহিনী বিশেষ করে পাঞ্জাবি চক্র কোনো অবস্থাতেই শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি ছিল না।
৪. ভুট্টো অনুধাবন করেছিলেন, ক্ষমতায় যেতে হলে সেনাবাহিনীকে হাতে রাখতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ রাখতে হবে।
৫. ভুট্টো সেই কৌশল অনুযায়ী মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তুললেন এবং সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি ইয়াহিয়া খানকে লারকানায় নিয়ে গেলেন। সেখানে হয়তো তিনি ইয়াহিয়াকে ক্ষমতায় রাখার আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং এ আশঙ্কা হয়তো ব্যক্ত করেছিলেন বাঙালিরা ক্ষমতায় এলে ইয়াহিয়া ক্ষমতা হারাবেন। একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর পক্ষে কথা বলছিলেন।
৬. পাঞ্জাবি সেনাচক্রকে ইয়াহিয়ার পক্ষে আর নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাদের মুখপাত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন ভুট্টো। ইয়াহিয়াকে তা মেনে নিতে হচ্ছিল এবং এ কারণেই ফারল্যান্ডকে হয়তো বলেছিলেন ভুট্টো সম্পর্কে তাঁর ধারণা খারাপ কিন্তু ভুট্টোর পক্ষ তাঁকে নিতে হচ্ছিল। তবে এ কথা বলে রাখা ভালো যে, বঙ্গবন্ধু সম্পর্কেও তাঁর কোনো সহানুভূতি ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল নিরাপদে শুধু ক্ষমতায় থাকা।

এ প্রসঙ্গে ফরমান আলীর বইয়ে উল্লিখিত দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ফরমান লিখেছেন, ১৯শে ফেব্রুয়ারি তিনি দেখা করেছিলেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে। ইয়াহিয়া তাঁকে বলেছিলেন—

"I am going to sort out that Bastard." I said, "Sir, he is no longer a bastard. He is an elected representative of the people and he represent whole of Pakistan. I recommend that you hand over power to Mujib. I assure that he will be the most unpopular man in East Pakistan within six months."

ফরমান আরও জানিয়েছেন, ২০শে ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদ বৈঠক হয়েছিল এমএনএ'দের। অ্যাডমিরাল আহসান, লে. জে. ইয়াকুব ও মে. জে. ফরমান একমত হয়েছিলেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না হওয়ার অর্থ সামরিক হস্তক্ষেপ অর্থাৎ তাহলে বিশৃঙ্খলা হবে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করবে—এ বিষয়ে একমত হয়ে তাঁরা ইয়াহিয়াকে লিখেছিলেন। আসলে ঢাকায় থেকে তাঁরা মানুষের ক্রোধটি অনুধাবন করেছিলেন। ইসলামাবাদে বসে তো আর তা অনুধাবন করা যায় না। আসগর খান সেনাচক্রের যে বৈঠকটির উল্লেখ করেছিলেন এটা বোধহয় সেই বৈঠক। পূর্ব-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তারা একমত হয়েছিল। আরও একমত হয়েছিল ভুট্টোর কথামতো অধিবেশন স্থগিত রাখতে। যে কারণে এরপর অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারি ফারল্যান্ড ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করলে "ব্লাড অ্যান্ড ক্যাওস"-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন।

দশ

পহেলা মার্চ সংসদ অধিবেশন স্থগিত হলো। ২রা মার্চ ঢাকা থেকে এক ডেসপ্যাচে কনসাল জেনারেল জানালেন, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের টিকে থাকার সম্ভাবনা শূন্য এবং সংসদ অধিবেশন স্থগিত রাখার সঙ্গে দু'প্রদেশের মধ্যে সমঝোতার সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে গেছে ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামাবাদ থেকে ওয়াশিংটনে জানানো হয়, কেন্দ্র সামরিক শক্তি প্রয়োগ করবে। এ কারণে পূর্বাঞ্চলে তারা শক্তি বৃদ্ধি করছে। অন্তিমে কী হতে পারে সে অনুমানও বিধৃত হয়েছে। ঐক্য বিনষ্টের চেষ্টা সেনাবাহিনী যদি দ্রুত দমন করে ও পূর্ব-পাকিস্তানি নেতাদের গ্রেফতার করে তাহলে পশ্চিম-পাকিস্তানিরা তা মেনে নেবে। তবে প্রতিরোধ হলে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হলে পশ্চিম-পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ধরে রাখবে না শক্তির সাহায্যে। ফারল্যান্ডের বা দূতাবাসের এই বিশ্লেষণটি পরবর্তীকালে টেকে নি। দূতাবাস এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ৭ই মার্চ শেখ মুজিব যে বক্তৃতা দেবেন তা প্রায় স্বাধীনতা ঘোষণার মতোই হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী আবার ঠিক হয়েছিল।

নিয়ার ইস্টার্ন অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোও মতামত পাঠিয়েছিল যা সংযোজিত হয়েছিল মূল রিপোর্টে। ব্যুরোর কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, সামরিক বাহিনী যদি বাঙালিদের স্বাধীনতা স্পৃহা দমনে শক্তি প্রয়োগ করে এবং তাতে রক্তক্ষয় হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে ব্রিটেন, জাপানের মতো বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোর সাহায্যে সে রক্তপাত বন্ধে এগিয়ে আসা। সেটি অবশ্য কার্যকর হয় নি।

এখানে একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। কারণ এ তথ্যটি কোথাও উল্লিখিত হয় নি। তৎকালীন ছাত্রনেতারা জানিয়েছেন, ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য তাঁরা চাপ দিয়ে আসছিলেন। ড. কামাল হোসেনও লিখেছেন, ৬ই মার্চ তাঁরা বৈঠক করেছিলেন ৭ই মার্চের ভাষণে কী বলা যেতে পারে তা নির্ধারণের জন্য। কিন্তু বঙ্গবন্ধু চূড়ান্ত কিছু বলেন নি। রিপোর্টে দেখা গেছে, ৩ মার্চ বিদেশী সাংবাদিকদের শেখ মুজিব অফ দ্য রেকর্ড বলেছিলেন, ৭ই মার্চ তিনি স্বাধীনতার সমতুল্য ঘোষণা দেবেন। অর্থাৎ তিনি ১লা মার্চই এ বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছিলেন এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত ঘটনাবলি শুধু পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করছিলেন। মনস্থির না করলে ৩ মার্চ তিনি ঐ মন্তব্য করতেন না।

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব সিসকো কিসিঞ্জারকে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন ২রা মার্চ। বাংলাদেশ আলাদা হলে কী হতে পারে সে সম্পর্কে সিসকো যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার অধিকাংশই পরবর্তীকালে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য অংশগুলো উল্লেখ করছি—

১. স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তান নিঃসন্দেহে প্রথমে অর্থনৈতিক তারপর রাজনৈতিক সমস্যায় পড়বে। কারণ আওয়ামী লীগ যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেগুলো পূরণ করতে পারবে না, ফলে আওয়ামী লীগে ভাঙন ধরবে, চাপ পড়বে। বিরোধী, বিশেষ করে বামপন্থীদের বিরোধিতা বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং ভবিষ্যতে চরমপন্থার দিকে ঝোঁক বৃদ্ধি পেতে পারে। ["Increasing radicalization and political instability in East Pakistan."]

২. স্বাধীন হলে পূর্ব-পাকিস্তান তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে নিম্নহার তা বজায় রাখতে পারবে, যদি স্থানীয় সম্পদের সমাবেশ ঘটাতে পারে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে। কারণ পরবর্তী পনের বছরে জনসংখ্যা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪ মিলিয়নে দাঁড়াবে। সুতরাং এ জনসংখ্যা নিয়ে কীভাবে একটি রাষ্ট্র তার বেসিক নিডস মেটাতে পারবে?

৩. পশ্চিম-পাকিস্তান আয়তনে বড়, সম্পদও আছে। তাদের অবস্থা ভালো হতে পারে। তবে সেখানে সামরিক বাহিনীর প্রভাব বাড়বে এবং ভারতের সঙ্গে বৈরিতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে জনসংখ্যাও পশ্চিম-পাকিস্তানে সমস্যা সৃষ্টি করবে।

রিপোর্টে পূর্ব-পাকিস্তান আলাদা হলে কী ধরনের বিকল্প নীতি গ্রহণ করা যায় তারও বিস্তারিত আলোচনা আছে এবং সবশেষে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সৃষ্টি হলে স্বীকৃতির প্রশ্নটি আসবে এবং তখন যেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হয় সে সুপারিশও করা হয়েছিল। কিন্তু দলিলটি পড়ে মন হয় গণহত্যার ব্যাপকতা ও পাকিস্তানি বাহিনী কী ধরনের নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা তারা বলতে পারে নি।

প্রায় একই সময় কলকাতা থেকে মার্কিন কনসাল একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন কলকাতায় পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনের তৃতীয় সচিব একে চৌধুরীর (আনোয়ারুল করিম চৌধুরীর) সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। কনসাল জানাচ্ছেন, চৌধুরীর সঙ্গে হাইকমিশনে আরও চারজন বাঙালি আছেন। সুতরাং চৌধুরী যা বলছেন এতে সব বাঙালির মতামত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বলে ধরে নেয়া যায়। চৌধুরী যা বলেছিলেন পরবর্তীকালে মোটামুটি তাই ঘটেছে। তিনি বলেছিলেন—

দৈব কিছু না ঘটলে পাকিস্তানের ভাঙন অপরিহার্য। ইয়াহিয়া মুজিবের চার দফা মানবেন না। এই ভাঙন হবে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে, যাতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হবে। ইয়াহিয়াকে তার ঘনিষ্ঠজনরা সঠিক পরামর্শ দিচ্ছে না। এবং পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের গভীরতাও তারা অনুধাবন করছে না। পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলরা মনে করছে সামরিক শক্তি দিয়ে বাঙালিদের দমন করা যাবে। বাঙালি ১৯৬৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন রক্ত দিয়ে প্রতিরোধ করেছে, এবার প্রয়োজনে তার চেয়ে বেশি রক্ত দেবে।

চৌধুরী আরও বলেছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান যদি নিহত হন বা তাঁকে গ্রেফতার করা হয় তাহলেও আওয়ামী লীগের পরবর্তী চার-পাঁচ নেতা কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন।

এখানে একটি মন্তব্য করা যেতে পারে। সে সময় সব পর্যায়ের মানুষই মনে করতেন, বঙ্গবন্ধু যদি নাও থাকেন তা হলেও পরবর্তী পর্যায়ের নেতারা নেতৃত্ব দিতে পারবেন। এ বিশ্বাস তাদের ছিল। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো ছিল, নেতাদের কার্যক্রমের ওপরও মানুষের বিশ্বাস ছিল। এখন সে বিশ্বাস মানুষের নেই। অর্থাৎ সাংগঠনিক কাঠামো সুশৃঙ্খল বা শক্তিশালী নয়।

ভারত কী করবে সেই পরিস্থিতিতে সে সম্পর্কেও চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভারতের নেতৃস্থানীয় পাকিস্তানের ভাঙন চাইবে না, যদিও জনসংঘের মতো

ডানপন্থীরা এতে খুশি হবে। কারণ পাকিস্তান এখন ভারতের কাছে হুমকিস্বরূপ নয় বরং নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর জন্য পাকিস্তানকে হুইপিং বয় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তান হবে অস্থিতিশীল ও দুর্বল এবং তা ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। তবে চীন হয়তো সে পরিস্থিতিতে পূর্ব-পাকিস্তানে নাক গলাতে পারে যা ভারত পছন্দ করবে না। সবশেষে রিপোর্টে জনাব চৌধুরীর বক্তব্যের উপসংহার টানা হয় এভাবে—"He recounted the foregoing in a sad, matter of fact tone, but there seemed to be no doubt in his mind that disaster or enormous magnitude is about to overtake his country."

এরপরে রিপোর্টগুলোতে ১৫ মার্চ পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে, যা বাহুল্য ভেবে আলোচনা করা হলো না। সম্পাদক এরপর যে রিপোর্টটি সংকলন করেছেন তা ২৯ তারিখের। কিন্তু আমরা জানি ২৫ মার্চের নিষ্ঠুর গণহত্যার বিবরণ জানিয়ে ঢাকার কনসাল আর্চার ব্লাড একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। সেটি সংকলিত হয় নি। এনায়েতুর রহিমের সংকলনেও তা সংযোজিত হয় নি। তাহলে কি মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ ঐ রিপোর্টটি সরিয়ে ফেলেছিল? নাকি রোয়েদাদ খান ইচ্ছে করে তা সংকলন করেন নি।

এ প্রসঙ্গে সংকলিত আরেকটি রিপোর্টের কথা উল্লেখ করা যায়। দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা দৌলতানার সঙ্গে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছিলেন।

কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা দৌলতানা জানিয়েছিলেন, শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর বিস্তারিত আলাপ হয়েছিল। দৌলতানার মনে হয়েছে, মুজিব চরম কোনো পদক্ষেপ নিতে চান নি। কিন্তু এটাও বিশ্বাস করতেন যে, পশ্চিম-পাকিস্তান এস্টাবলিশমেন্টের প্রতিনিধি ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো কখনও রাজি হবেন না সে বিষয়ে, যেখানে বাঙালি শাসন করবে পশ্চিম-পাকিস্তান। বিশেষ করে মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইয়াহিয়া যাদের নিয়ে গিয়েছিলেন তাতে মুজিব ক্রোধান্বিত হয়েছেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কর্নেলিয়াস, পীরজাদা ও এমএম আহমদ, শেখ মুজিব যাদের মনে করতেন বাঙালিবিরোধী। দৌলতানা শেখ মুজিবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি এক পাকিস্তানের পক্ষে কি-না। যদি তিনি তাই চান তাহলে দৌলতানা উদ্যোগ নেবেন যাতে ছোট ছোট দলের ৪০ জন সাংসদ শেখ মুজিবকে সমর্থন করেন। আর তিনি যদি তাতে রাজি না হন তাহলে মুজিব যেন তা জানান, যাতে রক্তপাত রোধ করা যায়। শেখ মুজিব আন্তরিকভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য তার ওপর প্রচণ্ড চাপ আছে।

এগার

ঢাকা থেকে আর্চার ব্লাড ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে দীর্ঘ একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টে আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে। মার্কিন কূটনীতিবিদরা কীভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন আওয়ামী লীগ ও এর নেতাদের —এ রিপোর্ট পড়লে তা বোঝা যায়। এবং তাদের মূল্যায়ন যে খুব ভালো ছিল এমন বলা যায় না। ব্লাডের মতে—আওয়ামী লীগে একত্রিত হয়েছে নানা শ্রেণীর মানুষ (বড় ছাতার নিচে অনেকের আশ্রয় গ্রহণের মতো)। এতে আছে গরিব কৃষক, চরমপন্থী

ছাত্র, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত পেশাজীবী, ধনী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। এ বন্ধন সৃষ্টি করেছে একটি মাত্র বিষয়, বাঙালি জাতীয়তাবাদ বা পশ্চিম-পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারে এটিই ছিল মুখ্য বিষয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে একটি নেতিবাচক অনুভবকে আশ্রয় করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একত্রে থাকছে কীভাবে? কারণ, স্বাভাবিক অবস্থায় এদের মধ্যে ঐক্য সম্ভব নয়। কিন্তু সে ঐক্য আছে, কারণ মার্কিন কূটনীতিবিদদের মতে—"feeling are so deep and dedication to running their own affairs is so strong." এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপ্রতিরোধ্য সংগঠন ও অসামান্য নেতা। আওয়ামী লীগের সংগঠন বিস্তৃত ইউনিয়ন পর্যন্ত। এর প্রকৃতি উল্লম্ব এবং কর্তৃত্ব শেখ মুজিব ও তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ সহচরের মাধ্যমে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত প্রতিশ্রুত হয়। দলটির লক্ষ্য সংসদীয় গণতন্ত্র। কিন্তু তাঁদের মতে নেতার মনোভাব একনায়কী ("authoritarian ways") এবং [সংসদে] বিরোধী দলের অভাব ভবিষ্যতে কী হবে তা জানে। একদিক থেকে বলতে গেলে, তাদের এই ভবিষ্যদ্বাণী পরে ফলে গিয়েছিল।

অর্থনৈতিক দিক থেকে লীগের ম্যানিফেস্টোতে এক ধরনের সমাজতন্ত্রের কথা আছে। আবার একই সঙ্গে বলা হয়েছে, জাতীয়করণ ধীরে ধীরে করতে হবে, কারণ, ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে বাঙালির দক্ষতার অভাব। শেখ সাহেবের অনেক উপদেষ্টাও তা মনে করেন। স্বাধীনতার পর আমরা দেখি এই নীতি অনুসৃত হয় নি, ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। কূটনীতিবিদরা জানিয়েছিলেন, জাতীয়করণের নীতি এবং তার ফলে মধ্যবিত্তের সমর্থন কতটুকু অটুট থাকে তা হবে দেখার বিষয়। তাদের মতে, যতদিন এই জাতীয়তাবাদী অনুভব বজায় থাকবে ততদিন আওয়ামী লীগে ঐক্য অটুট থাকবে। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন গ্রুপ নির্ণয়ও চেষ্টা করেছেন তারা। যেমন—

বাম : এ অংশে থাকার কথা শ্রমিক ও ছাত্রদের। শ্রমিকরা এখনই ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়ার দাবি জানাচ্ছে। ছাত্ররা দাবি জানাচ্ছে জাতীয়করণের। এদিকে আরো থাকতে পারে বুদ্ধিজীবী ও অ্যাকাডেমিশিয়ানরা। আলাপ-আলোচনা করে কূটনীতিকরা জেনেছেন আওয়ামী লীগ তিনজন অর্থনীতিবিদকে খুব পছন্দ করে। এঁরা হলেন রেহমান সোবহান, ড. আনিসুর রহমান ও আখলাকুর রহমান। বামপন্থায় কিছু এমপিরও ঝোঁক আছে, যেমন শওকত আলী খান ও তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাদের অনুমান পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

অন্যদিকে ন্যাপ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করছে। কারণ তাদের মতে, আওয়ামী লীগের বিজয় পূর্ব-পাকিস্তানে সুদূরস্পর্শী আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনবে।

ডান : এদিকে থাকার কথা তাঁদের যাঁরা শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, চট্টগ্রাম ও ঢাকা চেম্বারের সভাপতি মো. ইদ্রিস ও মতিয়ুর রহমান, খুলনার মো. মোহসীন, এআরজিএম আলমগীর কবির। তবে আওয়ামী লীগ সমর্থক বেশ কিছু ব্যবসায়ীও জাতীয়করণ সমর্থন করেন। বিশেষ করে ব্যাংক জাতীয়করণ। কারণ তাদের মতে, এর ফলে বাঙালি ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে। এ কারণেই কি পরবর্তীকালে ব্যাংক জাতীয়করণ করা হয়েছিল?

আপাতদৃষ্টিতে কূটনীতিবিদদের মনে হয়েছে, নেতারা স্বায়ত্তশাসনেই সন্তুষ্ট হবে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি গ্রুপ (ছাত্র) স্বাধীনতাই চাইবে। ছয় দফার কোনো রকম ছাড় এরা মানবে না। ছাত্রলীগ দলের একটি বড় স্তম্ভ। এর মতামত আওয়ামী লীগের এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের প্রকৃতি কেমন? নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায় নি। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, এরা বিভিন্ন শ্রেণী বা মতাদর্শের।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ইস্ট পাকিস্তান আওয়ামী লীগ-এর সম্পাদক এবং শেষোক্তটির তিনজন সহসভাপতি আইনজীবী। তারা স্থানীয় মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছেন। যৌবন থেকেই তারা যুক্ত রাজনীতির সঙ্গে। জেল খেটেছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কূটনীতিবিদদের মনে হয়েছে তারা— "hard-bitten, pragmatic, professional politicians".

প্রথম সারির আওয়ামী নেতাদের বয়স ৫০-এর কাছে। যেমন সম্পাদক কামরুজ্জামানের বয়স ৪৪, কামাল হোসেনের ৩৩। এর সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করলে আওয়ামী লীগের আপাত স্থবিরতার কারণ কিছুটা বোঝা যাবে। শেখ হাসিনাকে বাদ দিলে প্রথম সারির আওয়ামী নেতৃত্বের অধিকাংশের বয়স ৬০-এর কাছাকাছি বা ওপরে। সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁদের কম। ত্যাগ তাঁদের কম নয়। ত্যাগ তাঁদের যথেষ্ট কিন্তু একটা বয়সের পর গ্রেসফুলি অনেক জায়গা থেকে সরে যেতে হয়। এটি এ ক্ষেত্রে হয় নি। নতুনরা সংগঠনে জায়গা করে নিতে পারে নি। কারণ দলের মধ্যে গণতন্ত্র তেমন চালু নয়, সর্বস্তরে ভোটের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন প্রায় অনুপস্থিত।

কূটনীতিকরা জানিয়েছেন, নির্বাচিতদের মধ্যে (জাতীয় সংসদ) ৭৮ জন ছিলেন আইনজীবী, ৭ জন ডাক্তার, ১০ জন অধ্যাপক, ৩ জন সাংবাদিক, ৩ জন ছাত্রনেতা, ১ জন শ্রমিক নেতা। নতুন অনেককে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তবে তাঁদের ভিত্তি শেখ মুজিবের তারা অনুগত। এখনও তাই করা হয়। নির্বাচিত যে ৫০ জন সদস্যের বয়স জানা গেছে তা এ রকম—

বয়স	সংখ্যা	হার
২৫-২৯	৪	৮%
৩০-৩৪	৫	১০%
৩৫-৩৯	৫	১০%
৪০-৪৫	১২	২৪%
৪৫-৪৯	১০	২০%
৫০-৫৪	৮	১৬%
৫৫-৫৯	২	৪%
৬০-৬৪	১	২%
৬৬-৬৯	-	০%
৭০-৭৫	৩	৬%

এমএনএ-দের একটা বড় অংশ অবয়বহীন (ফেসলেস)। এমএনএ থেকে এমপিদের অপেক্ষাকৃত বয়স কম এবং তাঁদের একটা বড় অংশ ছাত্রনেতা। শেষোক্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ক্যাপ্টেন মনসুর আলী।
শেখ মুজিবুর রহমানকে উল্লেখ করা হয়েছে রাজা বা 'দি কিং' হিসেবে। ব্লাড লিখেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শেখ মুজিব হচ্ছেন অবিসংবাদিত নেতা যিনি অধস্তনদের কাছে দাবি করেন এবং পান সম্পূর্ণ আনুগত্য। তিনি যা ঠিক করেন তা রাখেন মনের ভেতর, সব কিছু সবাইকে বলেন না কিন্তু ব্যবহার করেন সবাইকে। তিনি যতদিন আছেন ততদিন এই ব্যবস্থা চলবে, তারপর তা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। পরামর্শ গ্রহণ থেকে নয়, চালিত হন তিনি অনুভব দ্বারা। পঁচিশ বছর সার্বক্ষণিক রাজনীতিতে থাকার কারণে এই অনুভব পরিণত হয়েছে আত্মবিশ্বাসে। তিনি চিন্তাবিদ বা তাত্ত্বিক নন বরং এ ম্যান অব অ্যাকশন। তাঁর পরামর্শকের কমতি নেই এবং সবার কথাই তিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন। কিন্তু কেউ নিশ্চিত বলতে পারবেন না, সে পরামর্শের কতটা তিনি নিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন কাজ দেন। সুতরাং একজন জানেন না আরেকজন কী করছেন। একজনের সঙ্গে কথা বলেন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে, অপরজনের কাঁধে হাত রেখে সবাইকে তিনি খুশি করতে পারেন। তাঁর দলের শ্লোগান যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, দলীয় আদর্শ যত উচ্চই হোক না কেন, তিনি ভিশনারি নন। বরং বুদ্ধিমান, বাস্তববাদী রাজনৈতিক প্রাণী (পলিটিক্যাল অ্যানিমাল) বুদ্ধিজীবীদের তিনি সন্দেহের চোখে দেখেন এবং ভেবেচিন্তে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবের নিয়মিত পরামর্শকদের একজন আলমগীর রহমান। তিনি বলেছেন, সবাইকে বিশ্বাস করা তার 'স্টাইল' নয়।
মার্কিন কনসাল 'রাজা'র পরামর্শদাতা ঘনিষ্ঠজনদের কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন এবং সমষ্টিগতভাবে উল্লেখ করেছেন তাদের দরবার হিসেবে। এ দরবার হলো এ রকম—

১. ইনার সার্কেল-এ আছেন পুরনো আ. লীগ নেতা তাজউদ্দীন ও নজরুল ইসলাম। এখন সেখানে যুক্ত হয়েছেন কামাল হোসেন তার অ্যাকাডেমিক ও পেশাগত সুনাম ও দক্ষতার কারণে।
২. ঘনিষ্ঠ পরিচিতজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খান সারোয়ার মুর্শিদ। পার্টি ডকুমেন্ট ও অন্যান্য বিবৃতি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেন। শোনা যায়, শেখ সাহেব তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দেন। তাঁর স্ত্রী নূরজাহান মুর্শিদ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদক এবং অনুমান করা হচ্ছে, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের একটি তিনি পাবেন।
৩. বিশেষজ্ঞ রেহমান সোবহান। ব্রিটিশ শিক্ষিত বামপন্থী রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কামাল হোসেনের ঘনিষ্ঠ। সব সময় আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে জোরালো বক্তব্য ও দুই অর্থনীতির কথা তুলে ধরার কারণে শেখ মুজিব তাঁকে পছন্দ করতে শুরু করেন। ব্লাড মন্তব্য করেছেন, অনেকের মতে—
"his entree into upper echelons of the AL is constrained by his well known opportunism and by allegations that he is more destructive than constructive."

আওয়ামী লীগে অবশ্য এ ব্যাপারটি সব সময়ই ঘটেছে। নিজ যোগ্যতাবলে কেউ যদি নেতৃস্থানীয় কর্মী বা সাধারণের মধ্যে পরিচিত হয়ে ওঠেন বা দেখা যায় প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন তখন তাকে হেয় বা অপছন্দ করার জন্য যত রকম কৌশল প্রয়োগ করা যায় তা করা হয় এবং হচ্ছে। অধ্যাপক রেহমান সোবহানের ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছিল। বাংলাদেশের যৌক্তিকতার তত্ত্ব ও যুদ্ধের আগে পরে বাংলাদেশ গঠনে তাঁর অবদান তুচ্ছ করার মতো নয়। এখনও তিনি জড়িত গঠনমূলক অ্যাকাডেমিক কাজের সঙ্গে। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক তিনি [আরো অনেকে] কখনও পুরস্কৃত হন নি, আওয়ামী লীগ আমলেও। রাষ্ট্র সব সময় স্বীকৃতি দিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান যাদের তুলনামূলকভাবে কম বা নেই বা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের। ফিরে আসি পুরনো প্রসঙ্গে। ব্লাড জানাচ্ছেন, ব্রিটিশরা রেহমান সোবহানকে মনে করেন আওয়ামী লীগের 'সোশ্যালিস্ট উইন্ডো ড্রেসিং' হিসেবে। অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আছেন জহিরউদ্দিন আহমেদ, এমএনএ; আমিরুল ইসলাম, এমএনএ ও ফকির শাহবুদ্দিন এমপিএ, আইনগত বিষয়ে এরা পরামর্শ দেন।

ড. আনিসুর রহমান, ড. আখলাকুর রহমান, ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক যাঁকে বলা হয় শিক্ষকদের শিক্ষক, কামরুদ্দিন আহমদ যিনি পরামর্শ দেন শ্রমিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে।

দূতাবাস একটি স্পেকুলেশনও করেছিল। যদি ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় তা হলে কে কোন পদ পেতে পারেন—

প্রধানমন্ত্রী—শেখ মুজিবুর রহমান
প্রেসিডেন্ট—ইয়াহিয়া খান
স্পীকার—জহিরুদ্দিন খান
বৈদেশিক—কামাল হোসেন
গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী—সৈয়দ নজরুল ইসলাম
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা অর্থমন্ত্রী—রেহমান সোবহান
বাণিজ্য—মতিয়ুর রহমান বা এম আর সিদ্দিকী
পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান সচিব—মনসুর আলী।

এখানে উল্লেখ্য যে, এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি এবং পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুও তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। রেহমান সোবহান সম্পর্কে আবারও বাড়তি মন্তব্য করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ বা আমেরিকানরা রেহমান সোবহানকে খুব একটা পছন্দ করছে না। তাঁর সম্পর্কে আবার মন্তব্য করা হয়েছে এই বলে যে, "he strikes us as more of an iconoclast than a constructive, pragmatic economist and hence seems unsuited for a bureaucratic role."

ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগের সাধারণ নীতি কী হতে পারে সে সম্পর্কেও মন্তব্য করা হয়েছে। এবং এই মূল্যায়নও অনেকাংশে ছিল সঠিক। বলা হয়েছিল, আওয়ামী লীগ বিপ্লবী কোনো নীতি নেবে না বরং গ্রহণ করবে সংস্কারবাদী নীতি। জাতীয়করণের কথা যা

বলা হচ্ছে তা হবে বাঙালিকরণ অর্থাৎ পশ্চিম-পাকিস্তানি ম্যানেজারের জায়গায় বাঙালি ম্যানেজার, স্থানীয় অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ। সামাজিক খাত যেমন শিক্ষা, গৃহ প্রভৃতিতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি উঠবে। মহকুমাকে জেলা করা হবে এবং তা নিয়ন্ত্রিত হবে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত জেলা কাউন্সিল দ্বারা। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস বিলুপ্ত করে ছোট আকারে কম প্রভাবশালী সিভিল সার্ভিস বডি গঠন করা হবে।

বৈদেশিক নীতি কী হতে পারে—

পাক-ভারত : আওয়ামী লীগ প্রো ইন্ডিয়ান নয় কিন্তু সম্পর্ক উন্নয়ন করবে।

পরাশক্তি : ভারসাম্যপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক ।

পাক-চীন : আওয়ামী লীগ চীনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয় এবং চীনকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং চীনের মনোভাবও সে রকম বলে শোনা যায়।

পাক-সোভিয়েত : আওয়ামী লীগ সোভিয়েতদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। রুশদের মনোভাবও তাই।

পাক-মার্কিন : ভালো হবে, শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীন ইতিমধ্যে ইউএসপি গ্রান্টে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করে এসেছেন। আওয়ামী লীগ পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক মডেল পছন্দ করে। সংক্ষেপে আওয়ামী লীগ দাঁড়িয়ে আছে একজনের ওপর ভর করে এবং তিনি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি যতদিন আছেন ততদিন হয়তো সব ঠিক থাকবে। তিনি না থাকলেই নেতৃত্বে সঙ্কট দেখা দেবে।

বারো

ভুট্টো সম্পর্কেও মতামত জানিয়েছিল দূতাবাস পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে। ভুট্টোর জন্ম ধনী ও রক্ষণশীল পরিবারে। তাঁর শিক্ষার পটভূমিকা ভালো। ভুট্টোর আচার-ব্যবহার সম্পর্কে জানানো হয়েছে ২৮ জুনের চিঠিতে। এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল লাহোরের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ম্যানেজার রুডলফ রিখটার থেকে।

রুডলফ জানিয়েছেন, ভুট্টো লাহোর এলেই ওঠেন ইন্টারকন্টিনেন্টালে। সঙ্গে সঙ্গে একজন মাসি একদঙ্গল মেয়ে (স্টেবল অব গার্লস) নিয়ে হোটেলে চলে আসেন। তারা কিন্তু পতিতা নয়। প্রতি সন্ধ্যায় ভুট্টোর স্যুইটে গিয়ে তারা ভুট্টোর অতিথিদের জন্য নাচ-গান করে। ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করার জন্য গ্রাম থেকে অনেকেই আসেন। ভুট্টো সারা দিন ব্যস্ত থাকেন কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বৈঠকে। আর লোকজন অপেক্ষা করে রাত পর্যন্ত। তখন ভুট্টো এদের নাচ-গান শুনতে আমন্ত্রণ জানান। মদের নহর বয়ে যায় এবং তা চলে ভোর পর্যন্ত। অনেকে এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। পরে ভুট্টোকে এ কথা জানালে ম্যানেজারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং শব্দ যাতে বেশি না হয় সে ব্যবস্থা করবেন বলে জানান।

রিখটারের মতে, সারা দিন খেটে সারা রাত পার্টি করা ভুট্টোর পক্ষেই সম্ভব। 'এ ব্রিলিয়ান্ট ম্যান'। অশিক্ষিত লোক তাঁকে পছন্দ করে এবং তাঁর প্রত্যেকটি কথা গিলে খায়। তবে, এ কারণেই রিখটার মনে করেন, 'ভুট্টো ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস'। মনে রাখা দরকার ভুট্টো যখন হোটেলে এসব কাণ্ডকারখানা করছেন, বাংলাদেশে তখন গণহত্যা চলছে।

পুরনো রিপোর্টে জানানো হয়েছিল, আইয়ুবের পতনের পর ভুট্টো দ্বারস্থ হন ইয়াহিয়া খানের। ইয়াহিয়া তাঁকে ধীরে চলার উপদেশ দেন; কারণ তাঁর সামনে ভবিষ্যত পড়ে আছে। ভুট্টো সমাজবাদী নন, কিন্তু চরম সুবিধাবাদী। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক শক্তিতে ভুট্টো ভীত।

ইয়াহিয়া জানিয়েছেন, মার্চে ভুট্টো মুজিবের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি বলেছিলেন, 'ভায়াবেল' সংবিধান তিনি চান। এবং পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত দু'জনকেই সমঝোতা করে চলতে হবে। ইয়াহিয়ার মতে, ভুট্টো বিষয়টি বুঝেছেন কিন্তু শেখ মুজিব এ ক্ষেত্রে বেশি 'রেটিসেন্ট'।

তের

ঘটনার পুরনো বিবরণে ফিরে যাই। যুদ্ধ শুরু হলে ভারতের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিল এনইএ [নিয়ার ইস্ট অ্যাফেয়ার্স]। ২৯শে মার্চের রিপোর্টে তারা যে মূল্যায়ন করেছিল এ সম্পর্কে তা দেখা যাচ্ছে ঠিক। বলা হয়েছিল, ভারত এখন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং যদি দেখে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব তাহলে তারা তিনটি কাজ করবে—

১. সীমান্তের ওপার থেকে বাঙালিদের সাহায্য করবে সব কিছু দিয়ে (প্রচার থেকে অস্ত্র)।
২. স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষীদের সীমান্তের ওপার থেকে কাজ চালানোর সুযোগ দেবে।
৩. প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি তারা পর্যবেক্ষণ করবে। যখন তারা নিশ্চিত হবে যে, বাঙালিদের অনেকটা অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে, তখন স্বীকৃতি দেবে। মনে হয় না তারা এখনই সামরিক হস্তক্ষেপ করবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে ভারত থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিটিং দীর্ঘ একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন— "পাকিস্তান আর ঐক্যবদ্ধ থাকছে না। এ অঞ্চলে ভারতই হবে আসল শক্তি। সীমাবদ্ধ ভবিষ্যত ও প্রচুর সমস্যা নিয়ে সৃষ্টি হবে বাংলাদেশের। নতুন যে বাস্তবতা তার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা নেয়া উচিত।" কিন্তু নতুন বাস্তবতা কী?"

১. পূর্ব পাকিস্তান : যুদ্ধ, সম্পদের ক্ষতি, চরমপন্থীদের সুবিধা।
২. পশ্চিম-পাকিস্তান " : প্রত্যাবর্তন; হয়তো ক্যুয়ের মাধ্যমে উৎখাত হবে সরকার।
৩. ভারত : নৈতিক সমর্থন ও পরোক্ষভাবে অস্ত্র যুগিয়ে বাঙালিদের সাহায্য। বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে কিছু এলাকা গেলেই স্বীকৃতি।
৪. যুক্তরাষ্ট্র : এ যুদ্ধ দীর্ঘদিন চললে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি। কারণ র‍্যাডিক্যালাইজেশন হবে বাংলাদেশ আন্দোলনের। পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ও সশস্ত্র সাহায্য দেয়া হলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা হবে। অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে এবং সে ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানকে মানবিক সাহায্য দিলে পাকিস্তান সরকার বিরোধিতা করবে।

৫. যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে বহির্শক্তির হস্তক্ষেপ হতে পারে, ফলে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের 'ইরিশ্যানাল' প্রতিক্রিয়া হবে। সুতরাং এ যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ নিহিত। কিটিংয়ের যে বক্তব্যটি আমার কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে তা হলো—

তিনি বলেছেন, বার বার কেন পূর্ব-পাকিস্তানের ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ বিষয় বলা হয়েছে? এটা তো নির্বাচিত একটি সরকারকে হটিয়ে দিয়ে সামরিক নিপীড়ন। যুক্তরাষ্ট্রকে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। তাঁর ভাষায়—

"Then, too, it is perhaps relevant that we are already in this 'internal affair' to the extent of having provide much of the military means to Pakistan. I do not cite these points as argument but to illustrate that the United States has more to lose then to gain by reiteration of the 'internal affairs' formulation.

কিটিং আরও লিখেছিলেন, পাকিস্তানকে দৃঢ় ভাষায় তা জানাতে হবে। তাঁর মনে হয়েছে ইয়াহিয়া বা তাঁর উত্তরাধিকারী প্রয়োজনে নিজ স্বার্থে এসব গোপনীয় দলিলপত্র প্রকাশ করতে পারে; সুতরাং ভবিষ্যত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে ঐ শব্দাবলি বাদ দিতে হবে। তাঁর ভাষায়—

"For the same reason, we should eschew the 'internal affair', 'external involvement' and 'if requested by the GOP' formulations, be firm and candid about our opposition to the misbegotten policy of military repression in East-Pakistan, and in general address ourselves to influencing the GOP to change that policy with an eye on the historical record which surely will not deal kindly with the present Pakistan military regime."

কিটিংয়ের মূল্যায়নই সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। গণহত্যার ক্ষেত্রে কিটিং যে শব্দাবলি ব্যবহারে আপত্তি জানিয়েছিলেন, বর্তমানে বিশ্বে এখন তা আর সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। কোনো দেশের গণহত্যাকে এখন আর অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখা হয় না। এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আর নিজ দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার কিটিংয়ের এ রিপোর্টকে ভালোভাবে গ্রহণ করে নি এবং তাঁর প্রস্তাবগুলোকেও কোনো মূল্য দেয় নি। আরও উল্লেখ্য, কিটিং এই রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন গণহত্যা শুরুর এক সপ্তাহ পর ১৯৭১ সালের ২রা এপ্রিল।

প্রায় একই সময় রাষ্ট্রদূত একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, যা রাষ্ট্রদূত কিটিংয়ের রিপোর্টের প্রায় অনুরূপ। তিনিও লিখেছিলেন—প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এ ভায়োলেন্স বন্ধ করা; কারণ তা দীর্ঘদিন চললে ঘটনার আন্তর্জাতিকীকরণ হবে এবং তাতে অন্যান্য শক্তির সুবিধা হতে পারে। পূর্ব-পাকিস্তান অন্তিমে স্বাধীন হবেই। এ ক্ষেত্রে তিনটি প্রস্তাব বিবেচনা করতে পারে—

১. যেমন চলছে তেমন ('বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল')-এর বিকল্প পাকিস্তান সরকার পছন্দ করবে কিন্তু বাঙালিদের কাছে এ সিদ্ধান্ত অজনপ্রিয় হবে।

২. পশ্চিম-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা। ইয়াহিয়াকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বোঝানো হয়, আমরা মনে করি তিনি যে পথে চলেছেন তা আত্মহত্যার শামিল। এতে বাঙালিরা খুশি হবে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের উন্নতি হবে। তবে, এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান চীনের দিকে ঝুঁকবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ মন্তব্যও করেছেন, নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি সামরিক হস্তক্ষেপ নিন্দনীয়; কিন্তু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যেসব কাজ নৈতিক বিবেচনায় করছে তা নয়। তারা জাতীয় স্বার্থ বুঝেই পদক্ষেপ নিচ্ছে।

৩. এ কথা বলা যে যুক্তরাষ্ট্র কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী নয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের দুঃখ, কষ্ট ও মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করা। পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকদের 'প্রাইভেটলি' বোঝানো যে, শক্তি প্রয়োগ সমস্যার সমাধান করবে না। ফারল্যান্ড মন্তব্য করেছেন, এ সিদ্ধান্তে যে পাকিস্তানের দু'অংশ খুশি হবে না তা নয়; কিন্তু তিনি মনে করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে এটিই ভালো বিকল্প। তাঁর ভাষায়—

"It provides soundest basis on which we can try to build future relationship with people of Pakistan, both East and West."

এখানেই ফারাক ফারল্যান্ডের সঙ্গে কিটিংয়ের। ফারল্যান্ড অবস্থার যথাযথ বর্ণনা করলেও যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণের কথা বলেছিলেন তা পাকিস্তানের পক্ষেই।

এ সব রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র রিভিয়্যু গ্রুপ একটি পলিসি পেপার তৈরি করেছিল; পররাষ্ট্র সচিবের জন্য যার নাম—'পাকিস্তান-আমেরিকান রিলেশনস; এ রিঅ্যাসেসমেন্ট' (১৭.৪.১৯৭১)। এ রিপোর্টটি বেশ দীর্ঘ। উৎসাহী পাঠক 'দি আমেরিকান পেপার্স'-এ মূল দলিলটি পড়ে নিতে পারেন। রিভিয়্যু গ্রুপ তিনটি বিকল্প দিয়েছিল। প্রথমটি ছিল 'রিলিটিভ হ্যান্ডস অব পলিসি', দ্বিতীয়টি 'সিলেকটিভ ইনফ্লুয়েন্স', এবং তৃতীয়টি হলো কিটিং ও আর্চার ব্লাডের প্রস্তাব, যা প্রকারান্তরে ছিল বাংলাদেশে আন্দোলন সমর্থন করা। জোসেফ সি সিসকো রিপোর্টটি পর্যালোচনা করে দ্বিতীয় বিকল্প বা প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে বলেছিলেন। এটি ছিল প্রকারান্তরে ফারল্যান্ডের প্রস্তাবকে সমর্থন করা যা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে।

মার্কিন রিভিয়্যু গ্রুপের রিপোর্টে বিভিন্ন দেশের স্বার্থ সম্পর্কে মূল্যায়ন আছে, যা ইন্টারেস্টিং বিশেষ করে ভারতীয় স্বার্থের মূল্যায়ন। রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারত অখণ্ড পাকিস্তান চায়, যেখানে বাঙালিরা আধিপত্য বিস্তার করবে, এবং অন্তিমে তা ভারতের বিরুদ্ধে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের ঐতিহ্যবাহী ঘৃণা হ্রাস করবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে সেখানে চীনের প্রভাব থাকবে এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ দেখবে (অর্থাৎ বাংলাদেশ) যা ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ধারণা অবশ্য ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। ভারত আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিচ্ছে এ আশায় যে, ক্ষমতায় এলে আওয়ামী লীগ এ বিনিয়োগের ডিভিডেন্ড

দেবে। ডিভিডেন্ডটি হচ্ছে সহযোগিতাপূর্ণ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক গড়ে তোলা। রিপোর্টটি পর্যালোচনা করে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব কিসিঞ্জার যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে বিভিন্ন দেশের অবস্থানরত মার্কিন কূটনীতিবিদরা যে উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন, তার কোনো প্রতিফলন ছিল না। তিনি লিখেছিলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে যেন সময় দেয়া হয় নিজ সিদ্ধান্তে পৌছার। তাঁর ভাষায়—"The US position for now, therefore, will be to give President Yahyah time to follow through his effort to work out his own arrangements transitional to greater East Pakistan co-operation of autonomy." লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতা, গণহত্যা কোনো বিষয়েরই কোন উল্লেখ ছিল না চিঠিতে। এ প্রসঙ্গে ব্যুরো অব ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চের (১৮. ৫. ৭১) একটি গোপন প্রতিবেদনের উল্লেখ করতে হয়, যার নাম ছিল—"পাকিস্তান : দি ওয়েস্ট উইংস মর্নিং আফটার।" রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 'জঙ্গিদের চাপে পড়ে মার্চের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু, সে সিদ্ধান্তের এহেন পরিণতিতে 'কপোত' (বা নরমপন্থী)দের প্রভাব পড়ছে এবং প্রেসিডেন্ট সে দিকে নমনীয়। অর্থাৎ সামরিক জান্তা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

এ থেকে একটি সিদ্ধান্তে পৌছা যায়, 'জঙ্গি' গ্রুপটির সঙ্গে ভুট্টো আঁতাত করেছিলেন। মার্কিন মনোভাব জানার পর জঙ্গি গ্রুপটি আরও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। ইয়াহিয়াও নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন, আমেরিকা পক্ষে থাকলে আর কাকে ভয়। সে কারণে ২৫শে মার্চের সিদ্ধান্তের আর পরিবর্তন হয় নি। কিটিং বা ব্লাডের প্রস্তাব গ্রহণ করলে হয়তো এত রক্তক্ষয়, এত সম্পদহানি হতো না। আবার ঘটনার বিবরণে ফিরে আসা যাক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। চলছে গেরিলা যুদ্ধ। মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির জন্য ছড়িয়ে পড়ছেন বিশ্বে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর থেকেই লন্ডন, দিল্লি, অটোয়া, কলকাতা, ঢাকা, করাচি, লাহোর—সবখানে জানানো হয়েছে যে, রেহমান সোবহান এখন যুক্তরাষ্ট্রে। পাকিস্তানের প্রবল প্রতাপান্বিত প্রতিনিধি এম এম আহমদও ওয়াশিংটনে। রেহমান সোবহানের সঙ্গে অনেকের দেখা-সাক্ষাত হচ্ছে। টেলিভিশনে প্রচারও তিনি পাচ্ছেন বেশি। এম এম আহমদ তা পাচ্ছেন না, ফলে পাকিস্তান বিরক্ত। যারা রেহমান সোবহানের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁর প্রশংসা করছেন। পররাষ্ট্র দফতরের ভাষায়—"impressed with his inemotional refutations of GOP public statements, re (garding) East Pakistan question."

পররাষ্ট্র দফতর আশঙ্কা করছিল—মে মাসেই পাক-ভারত যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। কিন্তু দফতর বিভিন্ন সূত্রে জেনেছে পাকিস্তান যুদ্ধে যেতে আগ্রহী নয় কারণ, পীরজাদা ও হামিদ মনে করেন পাকিস্তানের পক্ষে এখন আর যুদ্ধ সম্ভব নয়। অন্যদিকে ইয়াহিয়া ভুট্টোর ওপর বিরক্ত, কারণ ভুট্টো ক্ষমতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছেন।

চৌদ্দ

পাকিস্তান কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদারে পরিণত হচ্ছিল তা বোঝা যায় সেপ্টেম্বরের এক রিপোর্টে। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন নিশ্চিত হওয়ার পর পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক

এস্টাবলিশমেন্ট পাকিস্তানের অনুগত হয়ে পড়ে। কারণ বিশ্বজুড়ে জনমত বাংলাদেশের পক্ষে, এমনকি মার্কিন জনমতও। এ সময় একটি পরাশক্তির সমর্থন পাকিস্তানের দরকার ছিল। যুক্তরাষ্ট্র পূর্বোল্লিখিত দুই নম্বর প্রস্তাব কার্যকর করতে থাকে। এরই আওতায় জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে আবদুল মালেককে গভর্নর করা হয়। টিক্কা খানের বদলি নাকি কমান্ডাররা পছন্দ করেন নি। ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মার্কিন প্রস্তাবাবলি পাকিস্তান মেনে নিচ্ছিল।

অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ইরানের শাহের সঙ্গে দেখা করেছিলেন পাকিস্তানকে সমর্থন প্রদানের জন্য কিন্তু শাহ তাতে উৎসাহ দেখান নি। ইসলামাবাদ থেকে দূতাবাস জানিয়েছিল তা সত্ত্বেও মুজিবের ব্যাপারে ইয়াহিয়া নমিত হন নি। অর্থাৎ বিচারকার্য চালাতে চেয়েছিলেন। ৬ই অক্টোবরের রিপোর্টে জানা যায়, পাকিস্তান যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পাকিস্তান যে আমেরিকার বশংবদ হয়ে যাচ্ছে তা আগস্টে নিক্সনের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠক থেকেই জানা যায়। ১১ই আগস্টের ঐ বৈঠকে নিক্সন ঘোষণা করেন তিনি ইয়াহিয়ার পক্ষে ওকালতি করছেন না ("holds no brief") কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মার্কিন স্বার্থ দেখতে হবে। রিফিউজি ইস্যু নিয়ে ভারতকে পাকিস্তান ভাঙতে দেয়া হবে না। পূর্ব-পাকিস্তানের ভবিষ্যত ভারত নির্ধারণ করবে তাও হতে দেয়া যাবে না। গণহত্যা যে কোনো বিষয় নয় তা বোঝা যায় নিক্সনের একটি উক্তিতে—"We will not measure our relationship with the Government in terms of what it has done in East Pakistan."

এর পরের দলিলপত্রগুলোতে ঘটনার তেমন ধারাবাহিক বিবরণ আর পাওয়া যায় না এবং সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। নভেম্বর ৫-এর এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছেন এবং পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পাওয়া 'মিসলিডিং' সব রিপোর্ট বিশ্বাস করছেন। আরও জানা যাচ্ছে যে, পূর্ব-পাকিস্তানকে হিন্দু শূন্য করার পরিকল্পনা করছে সেনাবাহিনী। সরকার চালাচ্ছে ফরমান আলী। নির্বাচনের জন্য তিনি এখন 'মানুষ' মনোনীত করছেন। অথচ আমার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ফরমান অস্বীকার করে বলেছেন—"সামরিক শাসনের পর দৃশ্যপট বদলে যায়। এ আইনে গভর্নর হাউসের নিজস্ব কোনো স্থান ছিল না। গভর্নর হাউসের নিয়ন্ত্রণ ছিল শুধু সচিবালয়, পুলিশ ও রাজাকারের ওপর। সেনাবাহিনী, ইউপিসিএএফ ছিল সামরিক আইন প্রশাসক ও কোর কমান্ডারের নিয়ন্ত্রণে। আমার অধীনে কিছুই ছিল না।"

নভেম্বর ১৯-এর এক রিপোর্টে জানা যায়, ফারল্যান্ড ইয়াহিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে, শেখ মুজিবই হচ্ছেন সব সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি। ইয়াহিয়ার মতে মুজিব নয়, ইন্দিরা গান্ধীই চাবিকাঠি। ইন্দিরা গান্ধীর জন্য একটি চিঠির খসড়া করা হয়েছিল নিক্সনের জন্য, যেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভারতকে দায়ী করা হয়েছে যুদ্ধের জন্য। অন্যদিকে ৮ই ডিসেম্বর ভুট্টো রওনা হয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে, উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। ওয়াশিংটনে নিক্সনের সঙ্গে তার এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল (১৫-২০ মিনিটের জন্য)। ১৮ই ডিসেম্বর। তার আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

পনেরো

উল্লিখিত দলিলপত্র বিশ্লেষণ করে বলা যায়, মাঠ পর্যায়ের মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর গ্রন্থ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা'য়ও (১৯৮২) একই মত ব্যক্ত করেছেন "এটা ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে, আমলাতন্ত্র ও হোয়াইট হাউসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের অভাব ছিল। বিশেষ করে পররাষ্ট্র দফতর পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বিবেচনা করেছিল। এই কারণে বাংলাদেশ মার্কিন নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়া একটি বিতর্কিত অধ্যায়।"

কিসিঞ্জার লিখেছিলেন, "নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা তিনটি বাধার সম্মুখীন হয়েছি : পররাষ্ট্র দফতরের ভারতপ্রীতি, সমালোচনামুখর জনমত এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার অভাব।"

আসলে তিনটি বিষয়কে একই শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং তা হলো পাকিস্তানের নীতির বিরোধিতা। মাঠ পর্যায়ের কূটনীতিবিদরা পাকিস্তানি নীতির সমালোচনা করছিলেন এ কারণে যে, তাঁরা সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন। কিসিঞ্জার বা নিক্সন ছিলেন ঘটনা থেকে অনেক দূরে। তাই তাঁদের রিপোর্টে বারবার যুদ্ধ থামাবার জন্য পররাষ্ট্র দফতরের প্রতি প্রস্তাব করছিলেন। এই বিষয়টিকেই নিক্সন দেখেছেন ভারতপ্রীতি হিসেবে। পাকিস্তানীরা যেমন পাকিস্তানের যে কোনো বিষয়ের সমালোচনাকে মনে করে পাকিস্তানের বিরোধিতা হিসেবে কিসিঞ্জারও সেভাবে বিচার করেছেন।

তখন কিসিঞ্জার কি শুধু চীনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির জন্য পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন? মনে হয় না। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তথ্য দিয়ে একই মন্তব্য করেছেন। মূল বিষয় ছিল নিক্সন। একজন ব্যক্তির মনোভাবই পুরো নীতি তৈরি করেছিল আর কোনো কিছু বিবেচনায় আনা হয় নি। কিসিঞ্জার তখন ক্ষমতার দিকে এগোচ্ছেন। ক্ষমতায় আরোহণের জন্য নিক্সনের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর প্রয়োজন ছিল। নিক্সনের মনোভাব তিনি জানতেন। তাই তিনি মাঠ পর্যায়ের আমলাদের রিপোর্ট উপেক্ষা করেছেন। নিক্সন যেভাবে চেয়েছেন সে ভাবেই তিনি তৈরি করে দিয়েছেন। এটি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও তাই ঘটেছিল। অন্যদিকে আমাদের এ ধারণাও সঠিক নয় যে, মার্কিন কর্মকর্তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন নি।

নিক্সন কেন এমনটি করেছিলেন? আনোয়ার হোসেন বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন জি. ডব্লিউ চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ থেকে। তিনি লিখেছেন "নিক্সনের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন দক্ষিণ এশীয় নীতিকে প্রভাবিত করেছিল। বহুদিন থেকেই নিক্সন ভারতবিরোধী এবং পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন। এর কারণ হলো ১৯৬৯-এ ভারত সফরের সময়ে তাঁর (তখন তিনি প্রেসিডেন্ট হন নি) যোগ্য সমাদর করা হয় নি। অথচ পাকিস্তানে তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা পেয়েছিলেন। ১৯৭০-এ ইয়াহিয়া যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলে নিক্সন তাঁকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেছিলেন যে এর আগে পাকিস্তানের প্রতি এতটা বন্ধুভাবাপন্ন কোনো প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে আসে নি।"

নিক্সন ব্যক্তিগতভাবেও ইন্দিরা গান্ধীকে অপছন্দ করতেন। ইন্দিরা যখন হোয়াইট হাউসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান তখন নিক্সন ইন্দিরাকে অপেক্ষা করতে বাধ্য করেছিলেন। তাছাড়া ডিসেম্বরে তিনি ইন্দিরাকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তার ভাষাও মর্যাদাপূর্ণ ছিল না।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন, ১৯৭১ সালে চীন, সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ তিন পরাশক্তির কেউ-ই 'বাংলাদেশপন্থী' বা 'বাংলাদেশ বিরোধী' ছিল না। সবাই নিজ নিজ স্বার্থ বিবেচনা করে অগ্রসর হয়েছে। ভারতও। "তাদের নীতি-নির্ধারণে বহুল প্রচারিত বিভিন্ন আদর্শিক মতের কোনো স্থানই ছিল না।"

এই বক্তব্যের সঙ্গে খানিকটা দ্বিমত পোষণ করতে চাই। অবশ্যই প্রত্যেক দেশ নিজ স্বার্থ দেখেছে এবং দেখবে।

১৯৭১-এ বাঙালিরা নিজেদের স্বার্থ দেখেছে, পাকিস্তান দেখেছে তার স্বার্থ। কিন্তু তার মধ্যে আদর্শিক ব্যাপার একেবারে থাকে না তা নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সব সময় তৃতীয় বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করেছে, যেমন সৌদি আরব করে ইসলামপন্থী দেশগুলোকে। কমিউনিজমের প্রভাববলয় বিস্তার করাও ছিল এক ধরনের আদর্শিক ব্যাপার। তা বাদ দিলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতাকামী দেশগুলো প্রায় ক্ষেত্রে সোভিয়েতের সহানুভূতি লাভ করেছে। অনুসরণ করেছে জোটনিরপেক্ষ নীতি।

অন্যদিকে আনোয়ার হোসেন যে 'বোম্বেটে' কূটনীতির কথা বলেছেন তা যুক্তরাষ্ট্র অনুসরণ করেছে। খুব কম ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ঐ সময় তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষকে সমর্থন করেছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত আনোয়ার হোসেন যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েতের 'বোম্বেটে কূটনীতি'র একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাতে দেখা যায়, ঐ সময় যুক্তরাষ্ট্র ৪২টি ঘটনার সঙ্গে এবং সোভিয়েত ১৩টি ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এ কথাও বিচার্য যে, যখন পরাশক্তিসমূহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নীতির রূপ দেয় নি, তখন গণহত্যার শুরুতেই ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন জোরালো ভাষায় এর নিন্দা করেছিল, যুক্তরাষ্ট্র নয়।

২০০০

"এমন একদিন আসবে, যখন আমি বেঁচে থাকি বা না থাকি তখন পাকিস্তানের জনগণ অনুধাবন করবে কীভাবে এবং কে পাকিস্তান ভাঙল।" হামুদুর রহমান কমিশনের সামনে পেশকৃত লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

সম্প্রতি হামুদুর রহমান কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তা হলো সম্পূরক রিপোর্ট। মূল রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নি। জেনারেল ইয়াহিয়ার বক্তব্য আছে মূল রিপোর্টে। লাহোর থেকে প্রকাশিত এ. বাসিত সম্পাদিত 'দি ব্রেকিং অব পাকিস্তান'-এ ইয়াহিয়ার বক্তব্য সঙ্কলিত হয়েছে। যেভাবেই হোক সম্পাদক ইয়াহিয়ার বক্তব্যটি যোগাড় করেছিলেন এবং তা সঙ্কলন করেছেন। এ পর্যন্ত কেউ, এমনকি পাকিস্তান সরকারও এর প্রতিবাদ করে নি। সুতরাং, ধরে নেয়া যেতে পারে বাসিত মূল বক্তব্যের প্রতিলিপিই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

বাসিতের গ্রন্থে ইয়াহিয়ার আরেকটি আর্জি ছাপা হয়েছে। ১৯৭৮ সালে ইয়াহিয়া লাহোর হাইকোর্টে একটি হেবিয়াস কার্পাস রিট করেছিলেন। সম্পূর্ণ রিট পিটিশনটি বাসিত সঙ্কলন করেছেন। যেহেতু এটি গোপন কোনো বিষয় নয়, সেহেতু এর সত্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। বর্তমান প্রবন্ধের ভিত্তি ইয়াহিয়ার কমিশনের সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্য এবং রিট পিটিশন।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর নির্দেশে ইয়াহিয়াকে বন্দি করে বান্নিতে পাঠানো হয়। খারিয়ার সেনানিবাসের কাছে, বন বিভাগের এক ডাকাবাংলোতে তাকে পাঠানো হয় ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর। বলা যেতে পারে নির্জন কারাবাস ছিল এটি। এর মধ্যে হামুদুর রহমান কমিশন গঠন করা হয় এবং তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয় ২৪ জানুয়ারির (১৯৭২) মধ্যে বক্তব্য পেশ করতে। ইয়াহিয়া লিখেছেন, সম্পূর্ণ স্মৃতির ওপর নির্ভর করে তিনি এ বক্তব্য পেশ করছেন, ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। তবে তাঁর কিছু "বন্ধু" জনসমক্ষে তাকে যেরকম মাতাল হিসেবে তুলে ধরেছেন, তিনি তা নন। সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কেই তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও বলেছেন যে, কমিশনের প্রধান পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি যিনি কলকাতার একজন বাঙালি। মন্তব্যটি তির্যক। কেননা, তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন, কমিশন প্রধান বাঙালি এবং কমিশনের প্রধান বিষয়ও বাঙালি। সুতরাং, কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে, তিনি পক্ষপাতদুষ্ট। কিন্তু বাঙালি হয়ে জন্মগ্রহণ করলেই যে কেউ কেউ বাঙালি হয় না তা আমাদের চেয়ে বেশি আর কে জানে।

ইয়াহিয়া জানিয়েছেন, তিনি ছিলেন পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান সুতরাং কমপক্ষে তাঁর কোর্ট মার্শাল হওয়া উচিত। তা যদি না হয় তাহলে কমিশনের সামনে তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে জেরা করা উচিত প্রকাশ্যে। তাহলে মানুষ জানতে পারত আসল সত্যটি কী?

১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ইয়াহিয়া ছিলেন প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। তিনি জানিয়েছিলেন, 'পিছন ফিরে তাকালে বুঝতে পারি কী কী ভুল করেছি। অনেক সময় অযথা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনেক সময় দেরি করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বীকার করি, কিছু ব্যক্তি পাকিস্তান বিনষ্টের যে ষড়যন্ত্র করেছিল তা আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি নি।'

ইয়াহিয়া লিখেছেন, ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর একটিই উদ্দেশ্য ছিল, তা হলো সাধারণ নির্বাচন দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যারাকে ফিরে যাওয়া। সে কারণে, যেসব রাজনীতিবিদ ষড়যন্ত্র করছিল পাকিস্তান এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাদের সহ্য করেছেন। তাঁর ভাষায়, "This is why I tolerated political leaders who hatching all types of conspiracies throughout my tenure in office—against me and even against Pakistan.

কিন্তু, ধৈর্য্য সহকারে সব সহ্য করেছেন তিনি পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য। পাকিস্তানের মানুষ একদিন বুঝবে, পাকিস্তান কারা ভাঙল। অবশ্য তিনি উল্লেখ করেছেন, "পাকিস্তান ভাঙার জন্য এককভাবে কাউকে দায়ী করা যাবে না। অনেকে একসঙ্গে পাকিস্তান ভাঙার জন্য কাজ করেছে। তাদের সবার মুখোশ উন্মোচিত হবে। তারা সবাই নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য পাকিস্তানের ঐক্যের বিপক্ষে কাজ করেছে। আমার বিশ্বাস আমি তাদের একজন নই।"

তাঁর কারণে ভারত জিতেছে এটি স্বীকার করতে ইয়াহিয়া নারাজ। পাকিস্তানের একটি "গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি" ছিল এবং তাতে কোনো ভুল ছিল না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার মুহূর্তে দু'পক্ষের যে অবস্থা ছিল তাতে একজন হাবিলদারও ভারতীয়দের জন্য জয় ছিনিয়ে আনতে পারত। পাকিস্তান পরাজিত হয়েছিল কারণ, যে অবস্থায় সেনাবাহিনী পড়েছিল তাতে কোনো সেনাবাহিনীর পক্ষেই জেতা সম্ভব ছিল না। এরপর তিনি সত্য কথাটি বলেছেন, "পূর্ব পাকিস্তানকে ডিফেন্ড করে আমি বা কেউ কেউ জনসমক্ষে যা বলেছি তা ভুলে যান। প্রথমদিন থেকেই আমি জানতাম পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধের ফল কী হবে।"

তাঁর ভাষায়, "Forget about the public speeches I and other have made to defend East Pakistan. I knew the result of the India-Pakistan war on the Eastern from day one. To be frank, I knew it even before the first shot in the regular war was fired."

কেন পরাজিত হতো পাকিস্তান? তার কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তাঁর ভাষা ব্যবহার লক্ষণীয়। তাঁর ভাষায়, সাময়িক পাগলামীর কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তান আদর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা এমন এক জায়গায় পৌঁছেছিল যেখান থেকে পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত মেনে নিতে তারা রাজি ছিল। তিনি আরও লিখেছেন, "আমি পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের কথা বলছি না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকেও আমি দোষ দিচ্ছি না। আপনারাই তদন্ত করে দেখুন, কেন মরিয়া হয়ে বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছিল।"

এরপর ইয়াহিয়া ১৯৬৯ থেকে তাঁর কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

দুই

১৯৬৯ সালে ক্রমবর্ধমান আন্দোলনে আইয়ুব খান হতাশ হয়ে পড়লেন। এবং ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এলেন। এ সম্পর্কে তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন, আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, অধিকাংশ সামরিক কর্তা সে সব বক্তব্যই দিয়েছেন। এতে নতুনত্ব নেই। ইয়াহিয়া বলছেন, সবচেয়ে সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে তাঁকেই ক্ষমতা নিতে হয়েছিল। তিনি ক্ষমতা চান নি। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন বেসামরিক কর্তৃত্বই সবার ওপরে। ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর একটাই এজেন্ডা ছিল—ক্ষমতা হস্তান্তর।

এরপর ইয়াহিয়া যা বলছেন তার সঙ্গে তাঁর আগের মন্তব্য খাপ খায় না। তিনি বলেছেন, খুব কাছে থেকেই আইয়ুব খানের সরকার পরিচালনা তিনি দেখেছেন এবং যা দেখেছেন তা তাঁর ভালো লাগে নি। সুতরাং ক্ষমতা নিতে তাঁর খারাপ লাগে নি কারণ তাঁর বিশ্বাস আর কোনো জেনারেল তাঁর থেকে বেশি গণতন্ত্রমনা নন।

ইয়াহিয়ার ভাষায়—"I openly admit that I welcomed the chance to take away power from Ayub. I Knew that if any army commander would restore civil rule it would be myself, I took power because I trusted myself. I did not knew any army general more 'democratic' than myself."

এরপর তিনি রাজনীতিবিদ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা পাকিস্তানের ব্যাপারে যতটা প্রযোজ্য বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে ততটা প্রযোজ্য নয়। হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। তিনি বলছেন, পাকিস্তানের আসল ট্র্যাজেডি হলো, রাজনীতিবিদরা সবসময় প্ররোচিত করেছেন সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা নিয়ে যতদিন খুশি শাসন চালাতে। জেনারেলদের পিছে থেকে কাজ করার ইচ্ছা তাদের প্রবল।

ইয়াহিয়া মনে করেন, তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন। আর এই ঘোষণার ফলে, পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার বিশ্বাসঘাতক চিন্তা যারা লালন করছিল তারা এক হয়ে যায়। লিখেছেন তিনি, "আমার বিশ্বাস এই বিশ্বাসঘাতকরা না থাকলে পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ থাকত।"

অনেকে লিখেছেন এবং পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকরাও বলেছেন যে, সামরিক জান্তা নির্বাচনের ফলাফলের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। ইয়াহিয়া বলছেন, কথাটা ঠিক নয়। নির্বাচনের ফলাফল যে এরকম হবে তা তারা জানতেন। কিন্তু, পাকিস্তানের দুই অংশ দুই প্রান্তে। আঞ্চলিকভাবে "immature" দু'টি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন দুজন 'charismatic individuals' এবং এর মধ্যেই নিহিত ছিল বিচ্ছিন্নতার বীজ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রধানমন্ত্রী, দেশ থাকবে না—পাকিস্তানে এ ধরনের কথাবার্তা সত্ত্বেও ইয়াহিয়া মনস্থির করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তান থেকেই হবে। তবে, এ ধরনের পূর্ব পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের ওপর যথেষ্ট অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল। ইয়াহিয়া লিখেছেন, "পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের আস্থা

আমি অনেকটা অর্জন করেছিলাম। কিন্তু, এই আস্থা নষ্ট করার জন্য শক্তিশালী চক্র সবসময় সচেষ্ট ছিল। অন্তিমে এই সন্দেহই জয়ী হয়। অযৌক্তিক ফোবিয়া কারও পক্ষে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। সবশেষে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ হয়ে যায় অযৌক্তিক, পাঞ্জাব এবং সামরিক বাহিনীবিরোধী।" ইয়াহিয়া সব কিছু মেনে নিতে চেয়েছিলেন সেনাবাহিনীর বিরোধিতা ছাড়া। তিনি সব বিষয়ে ছাড় দিতে রাজি ছিলেন এমনকি বাঙালি সেনাপ্রধান নিযুক্তিতেও। কিন্তু, পূর্ব পাকিস্তানে নাকি সেনাবাহিনী থাকবে না এটি মানতে রাজি ছিলেন না। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। জেনারেলরা যতই গণতন্ত্রের কথা বলুন না কেন সেটি কথার কথা। সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব সবখানে থাকুক এটা তাঁরা চান। এই কর্তৃত্ব না থাকলে তারা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। কিন্তু, এখানে একটি বিষয় অস্পষ্ট। তা হলো, ইয়াহিয়া হঠাৎ সেনাবাহিনী প্রসঙ্গটি কেন আনলেন? এ বিষয়ে কি কারও সঙ্গে তাঁর দর কষাকষি হচ্ছিল? এসব বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। তবে, একটি সত্য এ প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন। সেটি হলো, যেদিন পাকি সেনারা নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা শুরু করেছিল, সেদিনই পাকিস্তান শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ভাষায়—

"This is the time to submit that in my assessment the battle for Pakistan was lost when the army confronted the civilians on the street of East Pakistan".

তিন

গণতন্ত্র নিয়ে ইয়াহিয়া তাঁর ভাষ্যে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু, এর মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা আছে অনেক। তাতে বোঝা যায়, গণতন্ত্র ততটুকুই তারা চেয়েছিলেন, যতটুকু তারা মনে করেন দেয়া যায়।

ইয়াহিয়া বলছেন তিনি জানতেন, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পূর্ব পাকিস্তানে বাস করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠই দেশ শাসন করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরকম হলো কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ইয়াহিয়া দেন নি। আমি পাকিস্তানের অনেক নীতিবির্ধারকের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি। কিন্তু, কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নি। যদিও সবাই বলেছেন, গণতন্ত্রে তাঁরা বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসের ধরনটা হচ্ছে, পাকিদের কখনও ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে না। এবং এ পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৭০-পরবর্তী ঘটনাবলি পরিচালনা করা হয়েছিল। ইয়াহিয়ার ভাষ্যেও তার প্রমাণ আছে।

নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া ঠিক করলেন পূর্ব পাকিস্তান সফর করবেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করবেন। কারণ, তিনি চেয়েছিলেন মুজিব যাতে বুঝতে পারেন যে, তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। নির্বাচন হয়েছে, এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে ইয়াহিয়া চলে যাবেন ব্যারাকে, এটাই তো হওয়ার কথা। শেখ মুজিবকে বোঝাবার কী ছিল? এখানেই ইয়াহিয়া মূল কথাটা বলে ফেলেছেন। "আমি জনতাম এর দরকার আছে", লিখেছেন ইয়াহিয়া "কারণ ভারতীয় এজেন্টরা তার মধ্যে সেনাবিরোধী ফোবিয়া ঢুকিয়ে দিয়েছে।" তাঁর ভাষায়, "I knew that there was a real need for this as

Indian agents had implanted a phobia in his mind against the Pakistan Army."

ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর কী ধারণা প্রেসিডেন্টের আসলে কোনো ক্ষমতা নেই? শেখ সাহেব ঠিকই উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যতদিন জেনারেলরা তাঁর সঙ্গে আছে ততদিনই তিনি ক্ষমতাধর। ইয়াহিয়া লিখেছেন, তিনি শেখ মুজিবের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলেন। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর 'ট্রেন্ডস' সম্পর্কে তিনি কী জানেন? এবং ইয়াহিয়া বিস্মিত হলেন জেনে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে শেখ মুজিব যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

ইয়াহিয়া বলেছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন শেখ মুজিবের আশপাশে যেসব পাকিস্তানবিরোধী আছে তাদের প্রভাব ক্ষুণ্ন করে মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে। এটি যে মিথ্যা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যই তো শেখ মুজিব ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁকে মানসিকভাবে ইয়াহিয়া কী প্রস্তুত করবেন?

ইয়াহিয়া বলছেন, তিনি শেখ মুজিবকে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক করতে চেয়েছিলেন। ছেলেমানুষী প্রস্তাব বলে মুজিব তা উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং যথাযথই ছিল। তখন ইয়াহিয়া প্রস্তাব করেছিলেন এমন কোনো সেনা অফিসার যাকে তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর নাম দিলে ইয়াহিয়া তাঁকে সামরিক আইন প্রশাসনের কাঠামোয় স্থান দেবেন। মুজিব বললেন, তিনি পরামর্শ করে জানাবেন। ইয়াহিয়া লিখেছেন, এই পরামর্শের কথা শুনেই তিনি বুঝে নিলেন প্রস্তাবটি মাঠে মারা গেছে এবং ঠিক তাই হলো। তিনি পরে জানালেন, সেনাবাহিনী ৭৫% ছাঁটাই করে দিতে হবে। ইয়াহিয়া কি আর তা মানতে পারেন? তবে, ইয়াহিয়ার মতে, তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন শেখ মুজিবের আস্থা অর্জনে এবং এক সময় তাঁর মনে হয়েছে, মুজিব তাঁকে বিশ্বাসও করেছেন। কিন্তু, সেনাবাহিনীকে তিনি কখনও বিশ্বাস করেন নি। এবং কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা এতে আরও ফাটল ধরিয়েছেন। তবে, ইয়াহিয়া তাঁদের নাম বলেন নি।

এরপর ইয়াহিয়া কী করতে চেয়েছিলেন তা বর্ণনা করেছেন। সেটি বড় কথা নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো তাঁর এই মন্তব্য, যে, ভুট্টোকে তিনি সমর্থন করছেন। তিনি বলছেন, ভুট্টো যখন বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে, কিন্তু তার একক ইচ্ছায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে দিতে পারা যায় না, তখন ইয়াহিয়া মনে করেন, এটি "ভ্যালিড পয়েন্ট"। কিন্তু গণতন্ত্র মানলে, (যেখানে তিনি বলছেন, তাঁর মতো গণতন্ত্রী জেনারেল ছিল না) ভুট্টোর দাবিকে "ভ্যালিড পয়েন্ট" বলা যায় না।

জানুয়ারি ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া এসেছিলেন ঢাকায়। শেখ মুজিবকে তিনি জানিয়েছিলেন, প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ফেব্রুয়ারির (শেষ দিকে) আগে সংসদের অধিবেশন ডাকা যাবে না, তখনই তিনি কঠোর এবং বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন। তিনি জানালেন ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে অধিবেশন ডাকতে হবে। এবং এ ব্যাপারে তিনি কারও সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক নন। ইয়াহিয়া লিখেছেন, "আমি বলব এটি

আন্তরিক মনোভাব নয়, যদিও এর লজিক অস্বীকার করা যায় না।" তাঁর ভাষায়, "I must say that this was not a sincere stand although its logic could not be faulted". এই একটি মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, শাসকরা কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন।

শেখ মুজিব যে ইয়াহিয়ার কথায় কান দিলেন না এটাই তাঁর দোষ হয়ে গেল। কারণ, এরপর ইয়াহিয়া সেই মান্ধাতা আমলের মন্তব্যগুলো করেছেন, যা শুধু অযৌক্তিক নয়, মিথ্যাও বটে।

তিনি লিখেছেন, তাঁর কাছে যেসব খবরাখবর আসছিল তাতে তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, আওয়ামী লীগে বামপন্থী ও চরমপন্থীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর সঙ্গে কাজ করছিল ভারতীয় প্রভাবিত এজেন্টরা। কারণ, তারা বাংলাদেশ তৈরির পটভূমিকা তৈরি করেছিল। এবং যত দিন যেতে লাগল ততই পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকিস্তান ভাঙার মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে সময়টিকে বিবেচনা করছে। শেখ মুজিবের বিভিন্ন বক্তৃতায়ও তা প্রতিভাত হয়ে উঠতে লাগল। "আমি সব সময় বিশ্বাস করেছি" লিখেছেন ইয়াহিয়া "একটি সময় উঠে দাঁড়াতে হয় এবং লড়াই করতে হয়। আমি ঠিক করেছিলাম বেসামরিক বিদ্রোহ দমনে আমি সেনাবাহিনী ব্যবহার করব না। কিন্তু অবাধ্যতা যদি ব্যবহার করা হয় আলাদা দেশ গঠনে তাহলে তা দমন করার জন্য যা প্রয়োজন তা করব। যা পরিকল্পনা করেছিলাম তাই করেছি।" অর্থাৎ জানুয়ারিতে ইয়াহিয়া ঠিক করে ফেলেছিলেন সেনাবাহিনী দ্বারা বিদ্রোহ দমন করবেন। সে সময় থেকে মার্চ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা ছিল লোক দেখানো। এ সময়টি ছিল পাকিস্তানের প্রস্তুতি গ্রহণের সময়।

ইয়াহিয়া লিখেছেন, তিনি শেখ মুজিবকে বলেছিলেন ভুট্টোর সঙ্গে আলাপ না করে ছোট দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই। এ কথায় মুজিব অবাক হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর চাপে পড়ে ইয়াহিয়া এ ধরনের মন্তব্য করছেন। কিন্তু ইয়াহিয়া লিখেছেন, তিনি চাপে পড়ে এ কথা বলেন নি। তাহলে কেন তিনি এ কথা বললেন তার বিশদ ব্যাখ্যা করেন নি। তবে, মনে রাখা দরকার, এরই মধ্যে তিনি লারকানায় গিয়ে ভুট্টোর সেই বিখ্যাত শিকার পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। শেখ মুজিব বিশ্বাস করতেন, সেনাবাহিনী কখনও পূর্ব পাকিস্তানের কারও কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তিনি বার বার বলেছেন, ইয়াহিয়ার ভাষায়, "Yahya my friend but not pak Army." ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সামনে তিনটি বিকল্প পথের কথা তুলে ধরেছিলেন।

এক—সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ শাসনতন্ত্র তৈরি করতে পারে। কিন্তু তা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য কার্যকর হবে না।

দুই—পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ এগোতে পারে, কিন্তু ভুট্টোকে সঙ্গে না নিলে মুজিব কার্যকরভাবে শাসন করতে পারবেন না। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষ করে পাঞ্জাবে পিপিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তিন—আওয়ামী লীগ পিপিপিকে নিয়ে একটি কোয়ালিশন গঠন করতে পারে।

ইয়াহিয়া বার বার শেখ মুজিবকে অনুরোধ করেছিলেন ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করতে, এক পর্যায়ে মুজিব মুচকি হেসে বললেন, "ভুট্টোর সঙ্গে কি আমি একা কথা বলব, না

ভুট্টো ও তাঁর সেনা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলব?" ইয়াহিয়া লিখেছেন, মুজিব তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন জেনারেলরা না থাকলে তিনি ক্ষমতাহীন। লিখেছেন ইয়াহিয়া, "To be honest, I could not be too dogmatic about it either, I put up a brave face but even I knew that Sheikh Mujib knew that it was only a brave face." উল্লেখ্য, এ কথাটি আগে ইয়াহিয়া স্বীকার করতে চান নি। তিনি কয়েকবার মন্তব্য করেছেন, ক্ষমতা তাঁরই হাতে। আরেকটি বিষয় এখানে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, ইয়াহিয়ার মাধ্যমে সেনা কর্মকর্তা ও ভুট্টো এ কথাই শেখ সাহেবকে বার বার বলতে চেয়েছেন যে, ভুট্টোকে ক্ষমতার অংশীদার না করলে তাঁকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর সামনে আর কী পথ খোলা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া?

চার

জানুয়ারির শেষ দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে থাকে এবং এর জন্য দায়ী ছিল আওয়ামী লীগ কর্মীরা, জানাচ্ছেন ইয়াহিয়া খান। এ ধারণা শুধু তাঁরই নয়, সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানিদের। তারা আওয়ামী লীগকে সামগ্রিকভাবে জনগণ থেকে আলাদাভাবে বিচার করতে চায়। এ কথা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যেতে চায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সমগ্র জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। ১৯৭১-এ যা ঘটেছে তা শুধু আওয়ামী লীগ কর্মীদের কারণেই নয়, জনগণের কারণে। এ পর্যায়ে ইয়াহিয়া খান কিছু মিথ্যারও আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন লিখেছেন, বন্দুক দেখিয়ে ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছিল। যারা আওয়ামী লীগার নয় তাদের পরিকল্পিতভাবে হেনস্থা করা হচ্ছিল, তাদের সম্পদ লুট করা হচ্ছিল। সংক্ষেপে সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। হ্যাঁ, সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা তথা বিকল্প একটি রাষ্ট্রের কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছিল, তার মানে এ নয় যে, বন্দুকের মুখে ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছিল বা লুটপাট করা হচ্ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের বিষয় নিয়ে ইয়াহিয়া দু'জন প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। গভর্নর আহসান কোনো রকম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন না। অন্যদিকে ইয়াকুব আগ্রহী ছিলেন এসব 'বিশৃঙ্খলা' দমনে। ইয়াহিয়ার মনে হয়েছিল, জেনারেল ইয়াকুব খাঁটি একজন সামরিক আইন প্রশাসকের মতোই কথা বলেছিলেন এবং তা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু আসল সময়ে এই জেনারেল কাবু হয়ে গিয়েছিলেন, জানিয়েছেন ইয়াহিয়া। "I felt disgusted with him."

পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের কথাও তিনি আলোচনা করেছেন যা আলোচনার প্রয়োজন নেই এবং-এ বিবরণে আবারও অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিহারীদের নিয়ে আসা হয়েছে। যা হোক, এক পর্যায়ে ইয়াহিয়া একটি সত্য মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, ১৯৭১ সালের আগেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মন তারা হারিয়েছিলেন এবং "মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, দীর্ঘস্থায়ী সামরিক শাসনের কারণে আমরা পাকিস্তানিরা এই দাম দিয়েছি। পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় বাহিনী জয় করে নি। তাদের সাহায্যে স্থানীয় জনগণই তা নিয়েছে..."।

তাঁর ভাষায়—"East Pakistan was not conquered by the Indian Army. On the otherhand, it was taken over by the local population with their aid..the triumph of disgusted Pakistan over their own motherland."

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি যখন এ রকম, তখন ইয়াহিয়া বার বার শেখ মুজিবকে জানিয়েছিলেন যে, যেহেতু তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন সেহেতু তিনি যেন সংযম প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁর হঠাৎ মনে হলো, মুজিব যেন আর প্রধানমন্ত্রী হতে চান না। "তিনি নিজেই নতুন একটি রাষ্ট্রের পিতা হতে চান। নিজেকে তিনি বিচার করছেন তখন আব্রাহাম লিঙ্কন অথবা কায়েদে আজমের কাতারে। তিনি হয়ে উঠছিলেন একজন মেগালোম্যানিয়াক। এক্ষেত্রে তিনি অবশ্য একা ছিলেন না। অনেকের মধ্যেই এই ধারা দেখা দিচ্ছিল।" এই অনেকের নাম অবশ্য ইয়াহিয়া উল্লেখ করেন নি।

তারপর সেই বিখ্যাত লারকানা বৈঠকের উল্লেখ করব এবং পাঠককে বিশেষভাবে বিবরণটি পড়ার জন্য অনুরোধ করব। আমি নিচে তার হুবহু অনুবাদ করছি—

"ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে আমি পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে লারকানায় গেলাম জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করতে। শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তবে তিনি অনুরোধ জানালেন, জাতীয় সংসদ বসার আগে এ ধরনের আলোচনার জন্য একটা সময়ের প্রয়োজন (reasonable time)। অন্তিমে, এ আলোচনা হয়েছিল যখন পিপিপি-র নেতারা ঢাকায় গিয়েছিলেন। বেশ কয়েক দফা আলোচনার পর পিপিপি নেতারা পাশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে এলেন। আমাকে জানানো হলো, দুটি প্রধান দলের মধ্যে আরও আলোচনা প্রয়োজন। আমি নিশ্চিত হলাম যে, দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতার অবকাশ আছে।"

এখানে যে বিষয়টি ইয়াহিয়া তুলে ধরছেন তা হলো ভুট্টো আলোচনায় প্রস্তুত ছিলেন এবং সামগ্রিক বিষয়ে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না। ফেব্রুয়ারি থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা ছাড়া উপায় ছিল না। প্রেসিডেন্ট অধিবেশন আহ্বান করলেন। কিন্তু তখনই পিপিপি অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করল। তারা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে লাগল।

কেন তারা এমন করছিল সেটা জুলফিকার আলী ভুট্টোই কমিশনকে বলতে পারবেন। ইয়াহিয়ার এতে একটু খারাপ লেগেছিল। কারণ সৈনিক হিসেবে তিনি রাজনীতির ব্যাপার-স্যাপারগুলো বুঝছিলেন না। তাঁর ভাষায়, "Soldiers like myself sometime cannot see the finer points of political interaction. Frankly, I could not see it at all. May I say that I was dismayed with this attitude." দেখুন, ভাষা কত নমিত, পরিস্থিতি আরও সঙ্কটময় হয়ে উঠলে জেনারেল ইয়াকুবকে গভর্নরের দায়িত্ব দেয়া হলো। ইয়াহিয়া লিখেছেন, মার্চের ২/৩ তারিখে তিনি ইয়াকুবকে লিখিতভাবে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন, যে কোনো মূল্যে পূর্ব পাকিস্তানের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে। সে সময় ভুট্টো ইয়াহিয়ার রুমে ছিলেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভুট্টো কেন সে সময় ইয়াহিয়ার রুমে ছিলেন এবং ইয়াহিয়া তাঁর

সামনেই বা কেন ইয়াকুবকে নির্দেশ দিলেন? ইয়াহিয়া এর ব্যাখ্যা দেন নি। তিনি লিখেছেন, "ভুট্টো উৎসাহের সঙ্গে আমাকে সমর্থন জানালেন, বললেন, জেনারেল আপনি পাকিস্তানকে রক্ষা করেছেন।" আমার নিজের অবশ্য তা মনে হচ্ছিল না, বুঝছিলাম পাকিস্তান ভেঙে যাচ্ছে। জুলফিকার ভুট্টোকে বললাম, "মনে রাখবেন এর মূল্য হয়ত পাকিস্তান নিজেই। ভুট্টো এটা তো চিন্তার মধ্যে আনলেনই না বরং বখে যাওয়া ছেলের মতো ব্যবহার করলেন।"

জেনারেল ইয়াকুব এর মধ্যে পদত্যাগ করলেন। এ পদত্যাগে ইয়াহিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ইয়াকুবকে কাপুরুষই শুধু বলেন নি, বিদেশী চর হিসেবেও ইঙ্গিত করেছেন। আরও অনেক সেনা কর্মকর্তাও চলে আসতে চাচ্ছিলেন। ইয়াহিয়া লিখেছেন, তিনিই শুধু তাঁর স্থানে অটল ছিলেন এবং তারপর কেন তাঁকে এভাবে রাখা হয়েছে তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

পাঁচ

মার্চ মাসের যে বিবরণ ইয়াহিয়া দিয়েছেন তা পড়লে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, তিনি তো সব ঘটনা যথাযথভাবেই উপস্থাপিত করেছেন কিন্তু এ উপস্থাপনায় মাঝে মধ্যে এমন সব শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, অন্তিমে উপসংহারে পৌঁছতে হয় যে, দোষটা তাহলে সেনাবাহিনীর নয়।

ইয়াহিয়া লিখেছেন, মার্চের ১০ তারিখ তিনি ঢাকায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে তাঁর সঙ্গে বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ২৫ তারিখে সংসদের অধিবেশন আহ্বানের মনস্থিরও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে, সেনাবাহিনীর কেউ তাঁকে ঢাকা যেতে দিতে রাজি নয়। বরং তারা মুজিব থেকে তাঁকে দূরে রাখতে চায়। "This made no sense to me" লিখেছেন ইয়াহিয়া। মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান আসতে রাজি নন। স্বার্থান্বেষী মহল বলছিল, এই প্রত্যাখ্যান সেনাবাহিনীর মুখে চপেটাঘাত। ইয়াহিয়া এটা মানতে রাজি ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী মুজিব নন। তাঁর ভাষায়—"After obtaining a massive vote of confidence from Pakistani Electorate, he stood transformed as the accredited representative of East Pakistan." লক্ষ্য করুন, বলা হচ্ছে পাকিস্তানিদের ভোটে জেতার পর তাঁর মর্যাদার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু পাকিস্তানিদের ভোটেই নির্বাচিত হলে তিনি পাকিস্তানের স্বীকৃত প্রতিনিধি নয় কেন? এটিই মূল বিষয়। শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পাকিস্তানের নেতা হিসেবে মানতে রাজি ছিল না। গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা তো সারা দেশের নেতা। অঞ্চলবিশেষের নয়। গণতন্ত্রের এই মূলনীতি।

ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন। ঢাকায় এসে দেখলেন যে, রাষ্ট্র তাঁর নিয়ন্ত্রণে নেই। রাজধানীর জীবনযাত্রা স্থবির। তাঁর মতে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে অবাঙালি ও যারা আওয়ামী লীগের সমর্থক নয় তাদের প্রতিনিধি হত্যা করা রুটিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্ষণ, লুট, গণহত্যা হচ্ছিল আকছার। এবং "আমার চোখের সামনেই তা হচ্ছিল।" তাঁর

ভাষায়—"In rapid sequence, the state of affairs deteriorated to an extent where the killing of non-Bengalis and non-conformist became a routine affair. Arson, rape, loot and other genocidal atrocities became rampant. This took place right under my nose."
ইয়াহিয়া খান শুধু নয়, পাকিস্তানিরা প্রায় সবাই এই তত্ত্ব ব্যবহার করে।
ইয়াহিয়া খান বলছেন, সেনাবাহিনীর সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা শুকনো খাবারের ওপর বেঁচে ছিল, তাদের নিয়মিত গালিগালাজ করা হচ্ছিল (যেমন, ইয়াহিয়া কুত্তা) সবচেয়ে জঘন্য ছিল ইংরেজি পত্রিকা 'দি পিপল' যা শেখ মুজিব স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ করতেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এসব প্ররোচনার মুখেও চরম ধৈর্য্য ধরেছিল। "আমি তাদের ব্যবহারে গর্বিত এবং এ জন্য আমি তাদের সালাম জানাই"।
ইয়াহিয়া লিখেছেন, "একটা সময় আসবে যখন আওয়ামী লীগ বুঝবে তারা বাঘের লেজ মোচড়াচ্ছিল কেননা তারা [সেনাবাহিনী] বেসামরিক লোকদের প্রতি পোষা মার্জারের মতো আচরণ করছিল। শুধু দেশাত্মবোধের কারণেই সেনাবাহিনী এ ধরনের ব্যবহার করছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ টিকবে না। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। আমি তার ব্যক্তিগত সাক্ষী।"
পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে গণহত্যা করে নি এটি বোঝাবার জন্যই ইয়াহিয়া খানের এই ভনিতা। শুধু তাই নয়, কৌশলে তিনি বরং উল্লেখ করেছেন, আওয়ামী লীগাররা ২৫ মার্চের আগে থেকেই গণহত্যা চালাচ্ছিল।
ইয়াহিয়া লিখেছেন, সময় নষ্ট না করে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠক করলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে জানালেন, পুরনো ধাঁচে বাঙালিরা আর পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে না। তিনি চারটি দাবি জানালেন। এর একটি হলো, জাতীয় সংসদের দু'টি অধিবেশন আহ্বান, একটি বাঙালিদের আরেকটি পশ্চিম পাকিস্তানিদের। এটি ছিল কনফেডারেশনের একটি প্রেসক্রিপশন। ইয়াহিয়া এটা মানতে রাজি ছিলেন না।
এখানে লক্ষণীয় যে, ইয়াহিয়া মুজিবের বাকি তিনটি দাবির ব্যাপারে চুপ। তিনি শুধু একটি দাবি তুলে ধরেছেন। কিন্তু নিশ্চয় এটি ছিল চরম এবং শেষ বিকল্প। এখানেই ইয়াহিয়া ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়েছেন। প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, শেখ মুজিব প্রথম থেকেই চরম সব দাবি করছিলেন যা মেনে নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।
এ পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের ডেকে পাঠালেন। যাঁরা এলেন তাঁরা হলেন, ভুট্টো, ওয়ালী খান, দৌলতানা, মুফতি মাহমুদ, খান কাইয়ুম, সরদার শওকত হায়াত, বিজাঞ্জো এবং আরও কয়েকজন। ইয়াহিয়া তাঁদের সব জানিয়ে বললেন, মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে। তাঁরা কথা বললেন এবং ফিরে এসে জানালেন, মুজিবের দাবি মানা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে কী করণীয় সে সম্পর্কে তাঁরা কিছু জানালেন না। ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, "আমাকেই" এসব ভাবনা ভাবতে হবে। একমাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টো জানালেন, শক্তি প্রয়োগ করতে, এতে যতজনই মারা যাক না কেন বা সমগ্র বিশ্ব যাই ভাবুক না কেন? তাঁর ভাষায়—"... Advised me to restore the

authority of the administration by massive use of armed forces regardless of the number of civilian casualties or the world reaction to such moves."

ভুট্টো আরও জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানকে এভাবে ভাঙতে দেয়া যায় না। "আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি যেভাবে বলছেন সেভাবে বেসামরিক লোকদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ব্যবহার করা যায় কিনা? কেন নয়? এটা কী প্রকাশ্য বিদ্রোহ নয়"? বললেন তিনি। আমি বললাম, এটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের বিদ্রোহ। এটির সঙ্গে যুঝবে রাজনৈতিক দল, সেনাবাহিনী নয়। তিনি সরাসরি আমাকে বললেন, বিদ্রোহ দমনের জন্য তখনই তাঁকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। আমি বললাম, ক্ষমতা হস্তান্তর করলে তো একমাত্র মুজিবকেই করতে হবে। বুঝলাম, জুলফিকার আলী ভুট্টো আমার এই— "Obdurate pro-Mujib attitude"-এ হতাশ হলেন।

ইয়াহিয়া খান লিখেছেন, ভুট্টোর এই পরামর্শ শুনলে তখনই পাকিস্তান ভেঙ্গে যেত। তিনি ভুট্টোর এই প্রস্তাব নিয়ে অন্য নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁরা একবাক্যে ভুট্টোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। অনেকে এও বললেন যে, নির্বাচনের ফলাফল যতদিন 'ভ্যালিড' থাকবে ফেডারেশনেও ততদিন পূর্ব পাকিস্তান থাকবে। সবাই একবাক্যে বললেন, ভুট্টোকে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের একক নেতা হিসেবে মানতে রাজি নন। "আমি জানতাম," লিখেছেন ইয়াহিয়া "এসব আলোচনা ভুট্টোর ভালো লাগছিল না। অবশ্য, তিনি জানতেন, আমি তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র প্রতিনিধি মনে করলেও শেখ মুজিবের সঙ্গে সমমর্যাদায় ফেলতে রাজি ছিলাম না এবং এখন পর্যন্ত আমার সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার কোনো কারণ নেই।

ছয়

ইয়াহিয়া এর পর সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। যাঁরা তখন ঢাকায় ছিলেন তাঁরা হলেন জেনারেল হামিদ, টিক্কা, পীরজাদা, ওমর, মিঠা, ফরমান, খাদিম রাজা এবং আরও কয়েকজন। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তা হলো, পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হতে তারা দেবেন না। শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়া এ বার্তা পাঠালেন যে, জাতীয় সংসদের মাধ্যমে তিনি যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন সেনাবাহিনী তা-ই মেনে নেবে। শেখ মুজিব জানালেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ হবে সেনাবাহিনীর বাজেট হ্রাস করা। এমন ভাবে হ্রাস করা যাতে সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। ইয়াহিয়া বলেছিলেন, সেনাবাহিনী সিভিল কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে এবং পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার শপথ নিয়ে যদি তিনি তা করতে চান অবশ্যই করবেন।

এই যে বিবরণ এর মধ্যে সত্যতা কতটুকু? যেখানে আলোচনা চলছে জাতীয় সংসদের সেখানে বলা নেই কওয়া নেই শেখ মুজিব বলবেন, প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁর প্রথম কাজ হবে সেনাবাহিনীকে সাইজ করা! এটি অবিশ্বাস্য। ইয়াহিয়া তাঁর বিবরণের শুরুতেও মুজিবের এ ধরনের দুয়েকটি সংলাপ দিয়েছেন। প্রথম থেকেই তিনি বঙ্গবন্ধুর যে ছবিটি আঁকতে চেয়েছেন তা হলো অনমনীয় এবং সেনাবিদ্বেষী এক ব্যক্তিত্ব। সেনাবাহিনী কেন গণহত্যা

চালালো এ বিষয়টির কারণ হিসেবেই এ যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে যে, সেনাবাহিনীকে অপমান করা হচ্ছিল এবং বলা হচ্ছিল তা ধ্বংস করে দেয়া হবে।

এ সময় ইয়াহিয়া খবর পেলেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এবং কোনো রাজনৈতিক নেতার পক্ষে সে সিদ্ধান্ত বদল করা সম্ভব নয়। এ পর্যায়ে সেনা কমান্ডারের একটি অংশ চাপ দিতে থাকে ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের। কিন্তু ইয়াহিয়া তা প্রত্যাখ্যান করেন।

আওয়ামী লীগের "defiant attitude" থেকে "আমি ঠিক করলাম সামরিক বিকল্পই ব্যবহার করব।" লিখেছেন ইয়াহিয়া, "২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলাম বেসামরিক প্রশাসনে সহায়তা করতে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করতে।" লক্ষ্য করুন 'সশস্ত্র' শব্দটি। ২৬শে মার্চের আগে সশস্ত্র বিদ্রোহ হলো কোথায়? ইয়াহিয়া আরও লিখেছেন, "আমি নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলাম 'মিনিমাম ফোর্স' ব্যবহার করতে। শেখ মুজিবসহ সমস্ত বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেফতার করতে এবং শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতাকে যেন শারীরিক কোনো ক্ষতি না করা হয় এবং সম্মানজনক ব্যবহার করা হয় তারও কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলাম। বন্দি অবস্থায়ও শেখ মুজিবের প্রতি প্রধানমন্ত্রী (নির্বাচিত) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। একতরফাভাবে বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য এটি ছিল পুরস্কার। "তখন থেকে" লিখেছেন ইয়াহিয়া, "পাকিস্তানের ভাগ্য হয়ে গেল জুয়াখেলার মতো। অন্তিমে এই জুয়ায় লাভ হয় নি। আমি সেই ঝুঁকি নিয়েছিলাম এবং সে জন্য শাস্তি পেতেও প্রস্তুত। ইতিহাসই এর বিচার করবে।"

ইয়াহিয়া লিখেছেন, অনেকে বলেন, সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা আগে থেকেই করা ছিল এবং "আমি তা কার্যকর বা তত্ত্বাবধান করতে এসেছিলাম। This is nonsens. পূর্ব পরিকল্পনা হলে কোনো নেতা পালাতে পারতেন না।" ইয়াহিয়া তারপর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনী পাঠাতে থাকেন এবং এ জন্য তিনি বেশ গর্বিত। লিখেছেন তিনি, "This historic airlift was a remarkable feat of military planning and execution." তাঁর মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ ধরনের সরবরাহের নজির কোথাও নেই। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ জন্য গর্বিত হতে পারে।

ইয়াহিয়া বলছেন, এরপর ভারতীয় প্রচারণা নতুন মোড় নিল। তারা বলল, বাস্তুত্যাগীদের চাপের কারণে তাদের সামরিক হস্তক্ষেপ করতে হবে। ইয়াহিয়া স্বীকার করেছেন, অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায় ভারত চলে গেছে। ইংরেজিতে বাক্যটি উদ্ধৃত করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। "A large number of Hindus had, indeed, voluntarily migrated to India."

এর অর্থ স্বেচ্ছায় ভারতে বসবাসের জন্য তারা গেছে যা আদৌ সত্য নয়। তিনি লিখেছেন, আওয়ামী লীগও সশস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য অনেককে প্রেরণ করেছে। কিন্তু পশ্চিমী মনে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা গণহত্যা চালিয়েছে। এটি মোটেও সত্য নয়। তাঁর ভাষায়, "This was far from truth."

পাকিরা যদি বার বারও বলে গণহত্যা হয় নি, তা হলেও এর জবাব দেয়ার কিছু নেই। যেহেতু শাসকরা সেখানে স্বৈরাচারী সেহেতু তাদের ধারণা গোয়েবলসের মতো একই

মিথ্যা বার বার বললে মানুষ তা সত্য হিসেবে স্বীকার করে নেবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হবার নয়। 'গণহত্যা হয় নি'—এ কথা বার বার বলা সত্ত্বেও কেউ তা বিশ্বাস করে নি। এমনকি অনেক পাকিস্তানিও এখন প্রকাশ্যে গণহত্যার কথা বলছেন।

ইয়াহিয়া বলছেন, প্রচার যুদ্ধে পাকিস্তান হেরে গেছে। এবং পৃথিবীকে ভারত মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলেছিল যে কারণে, পূর্ব পাকিস্তান ভারত 'দখল' করে নিলেও কেউ কিছু বলে নি। নগ্ন আগ্রাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবিক হস্তক্ষেপ।

ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারটি নিয়ে অনেক ভেবেছেন। তাঁর উপসংহার হলো, বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পাকিস্তান দেরি করে ফেলেছে। তাঁর ভাষায়—"Pakistan woke up too late to take punitive action against its many traitors with suitable cudgels." দেশপ্রেমিক জনগণকে সংগঠিত করা উচিত ছিল এর বিরুদ্ধে। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতারা তার কিছুই করেন নি। ফলে অবস্থাটা গৃহযুদ্ধের মতো জটিল হয়ে পড়ত, ঔপনিবেশিক মুক্তির আন্দোলনের চেহারা নিত না। ইয়াহিয়া এ ক্ষেত্রে সত্য কথাটি বলেছেন। পাকিরা সব সময় ১৯৭১-এর যুদ্ধকে বলে গৃহযুদ্ধ। ইয়াহিয়া স্বীকার করেছেন যে, এটি ছিল 'কলোনিয়াল ওয়ার'। এর অর্থ পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা পূর্ব পাকিস্তান শোষিত হচ্ছিল এবং শোষণ থেকে বাঁচার জন্য তারা যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছিল। তাঁর এই বাক্যেই মুক্তিযুদ্ধ যৌক্তিকতা পেয়ে যায়।

পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের তিনি এই একবারই দোষী করেছেন। তারপর আবার পুরনো গৎ-এ ফিরে গেছেন। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করার জন্য একটি ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ভারতীয় সমর্থনে আওয়ামী লীগ একটি গণআন্দোলন তৈরি করতে পেরেছিল। একা আওয়ামী লীগের পক্ষে পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করা সম্ভব হতো না। এটা সম্ভব হয়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ দল ও ব্যক্তিসমূহ না বুঝে ভারতের এই ফাঁদে পা দিয়েছিল। স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদদের জন্য পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে যাদের মুখোশ এখনও উন্মোচিত হয় নি। আর দোষটা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে "আমার মতো মানুষের ওপর।" ইয়াহিয়া হতাশ এখানেই। তিনি কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, কমিশন খুঁজে দেখুক কে দোষী। হয়ত তাদের বেশি দূর খোঁজাখুঁজি করতেও হবে না। কারণ, অনেক বিষয়কে চাপা দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং এ কারণে ইয়াহিয়া প্রকাশ্যে বিচার দাবি করেছেন। তাঁর ভাষায়—"I have an uneasy feeling that attempts are being made to push things under the rug where I do not belong. The commission must ask the question : is it right to push the commander under the rug? Should not be brought out put on public trial instead?"

এর পর ইয়াহিয়া অনেক পাতা ব্যয় করেছেন এ কথা বোঝাতে যে, পাকিস্তানের যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল চমৎকার। ভারতীয়রা স্থল ক্ষেত্রে খুব একটা সুবিধা করতে পারে নি। আত্মসমর্পণ করার কথা ছিল না, ইত্যাদি ইত্যাদি যা এই আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। জবানবন্দি শেষে স্বাক্ষর করেছেন এভাবে—ইয়াহিয়া খান, বেআইনীভাবে আটক একজন জেনারেল।

সাত

হামুদুর রহমান কমিশনের জবানবন্দি দেবার সাড়ে ছয় বছর পর ইয়াহিয়া খান লাহোর হাইকোর্টে রিট করেন। তিনি তখনও অন্তরীণ। ১৯৭৮ সালে রিট করা হয়। রিটে তিনি যে এফিডেভিট করেছিলেন তাতে আবার নিজ প্রসঙ্গ ছাড়াও ১৯৭১ সাল ফিরে এসেছে। কারণ ১৯৭১-এর কারণেই তাঁকে অন্তরীণ করা হয়েছিল।

ইয়াহিয়া আরজিতে জানিয়েছিলেন যে, তিনি একজন পেশাদার সৈনিক, যিনি মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ব্রিগেডিয়ার পদ লাভ করেছিলেন। এত কম বয়সে এর আগে কেউ ব্রিগেডিয়ার হন নি। আগাগোড়াই তিনি সৈনিক এবং সৈনিক থাকতে চেয়েছেন, যে কারণে ক্ষমতার বিষয়টি নিয়ে তিনি বাড়াবাড়ি করেন নি। এবং সৈনিক ছাড়া তিনি কিছু হতে চান নি। তাঁর ভাষায়—"One reason power did not go to my head is that I do not have Bonapartist tendencies, I am a professional soldier of the conservative vintage. My horizon is limited by the army. I am a soldier to the narrow of my bones. I have never pretended to be anything else. I am nothing if not a soldier."

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইয়াহিয়া তাঁর প্রধান কৃতিত্বগুলো বর্ণনা করেছেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে। তিনি বলেছেন, ক্ষমতায় এসেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন তিনি ও তাঁর পরামর্শকরা।

১. পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করতে পারে একমাত্র পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং সেই সেনাবাহিনী ঠিক রাখা যাবে যদি তাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জড়িত করা না হয় এবং সে কারণে যত শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন দিয়ে সেনাবাহিনীকে আক্ষরিক অর্থে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
২. বিদেশী কোনো শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকলে পাকিস্তানের পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল। সে কারণে, যে দুটি শক্তিকে তাঁরা পছন্দ করেছিলেন তা হচ্ছে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র।

এ পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে তিনি যে কাজ করেছেন সেটিকে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হিসেবে মনে করেন। এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে কিসিঞ্জার, নিক্সনের বেশ ক'টি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন যেখানে তাঁরা তাঁর প্রশংসা করেছেন।

তাঁর দ্বিতীয় কৃতিত্ব করাচী স্টীল মিল স্থাপন, যেটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন এ 'ইউনিক সোভিয়েট গিফট' হিসেবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের বিবরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি লিখেছেন, ভুট্টোর একটি অভ্যাস ছিল আর্মি জেনারেলদের পার্টিতে যাওয়া। এ রকম একটি পার্টিতে আইয়ুব খান তাঁর সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের পরিচয় করিয়ে দেন। ভুট্টোর

ঘনিষ্ঠ জেনারেল গুল হাসান ইয়াহিয়াকে বলেছেন, ভুট্টো প্রায়ই অনাহূতভাবে তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং ডিনার না খেয়ে যেতেন না। জেনারেলরা ভুট্টোর এ দুর্বলতার কথা জানতেন এবং তা নিয়ে হাসিঠাট্টাও করতেন। ভুট্টো জেনারেলদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য তাঁর স্ত্রীকে ব্যবহার করতেন। ভুট্টো আসলে তুলে ধরতে চাইতেন যে, জেনারেলদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ এবং ঘনিষ্ঠতা তাঁর শক্তির ভিত্তি হিসেবে কাজ করত। বা অনেকে তাই মনে করত। যা হোক ইয়াহিয়াকে উৎখাত করার জন্য ভুট্টো সমর্থ হয়েছিলেন কয়েকজন জেনারেলকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করায়। যে মুহূর্তে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সে মুহূর্তে ভুট্টো তাতে বাধা দিয়েছেন। এবং এভাবে তিনি পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করেছেন। ভুট্টো যখন ইয়াহিয়ার মন্ত্রিসভার সদস্য তখনও তিনি ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া লিখেছেন, তিনি বিষয়টি জানতেন, কিন্তু কিছু করেন নি। ইয়াহিয়াকে কামুক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। মদ্যপ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ইয়াহিয়া বলেছেন, অন্যকে পাথর ছুঁড়ে মারা তাঁর কাজ নয়। কিন্তু ভুট্টোর নিজেরই 'ড্রাগ প্রব্লেম' ছিল। তাঁর নৈতিক স্খলনের বিষয়ে ইয়াহিয়া কোনো অপপ্রচার চালান নি। অন্যদিকে ভুট্টো একজন ভদ্রলোক ও একজন শৃঙ্খলাপরায়ণ সামরিক অফিসার হিসেবে ইয়াহিয়ার ইমেজ ধূলিস্মাৎ করতে চেয়েছেন। ইয়াহিয়া বলেছেন, "আমি সন্ত নই। আমি পাপী। আমার ব্যক্তিগত চরিত্রে নানা দোষত্রুটি আছে। আমার পাপের জন্য সবসময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছি। কিন্তু সন্ধ্যার পরও আমি এমন মাতাল থাকতাম যে, সরকারি কাজকর্ম করতে পারতাম না—এ ধরনের ইমেজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল আমার বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চালানো। গর্ব করছি না, কিন্তু আমি বলতে পারি কোনো রকম পানীয় স্পর্শ না করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি দৈনিক ষোলো ঘণ্টা কাজ করেছি। সত্য কথা বললে, ভুট্টো এ ধরনের দাবি নিজের জন্য করতে পারবেন না।"

এরপর ইয়াহিয়া গুজরাটের আকলিম আখতার বা জেনারেল রানীর প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। হামুদুর রহমান কমিশনেও জেনারেল রানীর কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াহিয়া বলেছেন, বিভিন্ন বারাঙ্গনা ও জেনারেল রানীকে নিয়ে তাঁর নামে রসালো সব গল্প ছড়ানো হয়েছে। অন্য কাহিনীগুলো সত্য হোক না হোক জেনারেল রানী সম্পর্কিত সব কাহিনী মিথ্যা। ভুট্টোই ধর্ম-মা হিসেবে ইয়াহিয়ার সঙ্গে রানীর পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলেছেন, "দালালের ভূমিকায় ভুট্টো ছাড়া আমার কোনো অধস্তনের কাজ করার সাহস ছিল না।" তাঁর ভাষায়—"All I wish to say that with the possible exception of Bhutto, none of my associates or subordinates have even dared to assume the role of a pimp for me."

ইয়াহিয়া বলেছেন, নিজের পরিবারের প্রতি ভুট্টোর খানিকটা মানবিক হওয়া দরকার। তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের অবহেলা করেন। প্রথম স্ত্রীকে গ্রামে ফেলে রেখেছেন। দ্বিতীয় জনের প্রতি এত নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন যে, মহিলা স্নায়ুপীড়িত হয়ে উঠেছেন। তাঁর মার প্রতিও তিনি খারাপ আচরণ করেছেন। কৌশল এবং অভ্যাস হিসেবে ভুট্টো সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে স্ক্যান্ডাল ছড়ান, যা কোনো ভদ্র সন্তানের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইয়াহিয়া লিখেছেন, এ সব জানা সত্ত্বেও ভুট্টোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেন নি। কারণ "It is not the army tradition to hit below the belt."

ইয়াহিয়া লিখেছেন, ভুট্টো খুব জটিল মানুষ এবং ছোটোলোকেমী করতে তাঁর বাধে না। লিয়াকত খান, কায়েদ-এর মাজার বা ইন্দাজ হাইওয়েতে তিনি তাঁর নামফলক বসাতে চেয়েছেন। 'অনেকে বলেন, আমি ভুট্টোর প্রতি পক্ষপাত করেছি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের প্রশ্নে, কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, যে ব্যক্তিটি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে আমার মধ্যে কোনো ইতস্ততাবোধ ছিল না। ভুট্টোর সঙ্গে গোপন আঁতাত করে শেখ মুজিবকে ক্ষমতার বাইরে রাখার চিন্তা আমি কখনও করি নি। আমি কখনও জুলফিকার ভুট্টোকে পছন্দ করি নি। আরও স্পষ্ট করে বলতে হয়, আমি তাঁকে অপছন্দ করতাম। ভুট্টো যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন আমাকে জীবন্ত কবর দিয়ে রেখেছেন। দু'জনের মধ্যে আমাকে একজন বেছে নিতে হলে, কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে 'ম্যান ফ্রাইডে' হিসেবে চাইতাম না—এমনকি নরকেও যেখানে আমাদের দু'জনেরই যাবার সম্ভাবনা বেশি।"

এরপর ইয়াহিয়া উল্লেখ করেছেন কীভাবে ভুট্টো তাঁর পরিচিত হয়ে উঠলেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর নাম ব্যবহার করতে লাগলেন। তাঁর মতে, মুজিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের যে অবনতি তার কারণ ভুট্টো। লিখেছেন তিনি, ভুট্টো যদি একটু কম স্বার্থপর এবং একটু বেশি দেশপ্রেমিক হতেন তাহলে মুজিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ফাটল ধরানোর চেষ্টা করতেন না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি শেখ মুজিবের অনীহা সৃষ্টির একটা বড় কারণ ভুট্টো।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম "জুলফিকার ভুট্টো অ্যান্ড মাইসেলফ; দি অফিসিয়াল ইন্টারঅ্যাকশন।"

ইয়াহিয়া লিখছেন, যথানিয়মেই তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন। এবং কোনো বিকল্প না দেখে আইয়ুব খান তাঁকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন।

তিনি সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন ক্ষমতা হাতে নিলেন তখন ভুট্টোই তাঁর সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন। প্রথম সাক্ষাতকারেই ভুট্টো বলেছিলেন, তিনি ইয়াহিয়ার 'রাজনৈতিক হাত' হতে চান। অনির্দিষ্টকালের জন্য ইয়াহিয়া সেনাপ্রধান থাকবেন এবং জনগণের ব্যাপারটা দেখবেন ভুট্টো এবং এভাবে রোমক আমলের মতো তাঁরা দুজন যুগ্ম সম্রাট হয়ে পঁচিশ বছর শাসন করবেন।

ইয়াহিয়া লিখেছিলেন, তাঁর ওসব পরিকল্পনা বা চিন্তা তাঁকে হতবাক করে দিয়েছিল এবং তিনি তাকে একটি চড় লাগাতে চেয়েছিলেন। ভুট্টো নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরতে চাইতেন এবং বলতেন, আইয়ুব খানকে তিনিই ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। এটি মিথ্যা। সেনাবাহিনী বরং আইয়ুবকে জানিয়েছিল, অবস্থা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সবাই জানে, পাকিস্তানিরা 'তামাশা'র ভক্ত এবং এবং ভুট্টো ছিলেন একজন 'তামাশাঅলা'।

আইয়ুব ইয়াহিয়ার কাছে যা চেয়েছিলেন তা হলো, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁর প্রতি যেন বৈরী আচরণ না করা হয়। তিনি অনেক টাকা করেছিলেন এবং তা ভোগ করতে চেয়েছিলেন। অনেক দিন ক্ষমতায় থাকার পর মানসিকভাবেও তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভুট্টোর কারণে তিনি ক্ষমতা ছাড়েন নি। ভুট্টোকে ইয়াহিয়া উল্লেখ করেছেন আত্মগর্বে মদমত্ত এক ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে। তাঁর ভাষায়—"Zulfiqar Bhutto was an unprincipled ego-centric who could go to any length to acquire power and use power." ভুট্টোর প্রতি সহনশীলতা দেখানোটাই তাঁর ভুল হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন। এবং আরও স্বীকার করেছেন, পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তারাই যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য দায়ী—As the commander-in-chief, I am ashamed to admit that the real causes for the defeat of the Pakistan Army are to be found at the level of the formation commanders, both before and during the war."

এরপরও ভুট্টো সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে ধরেছেন ইয়াহিয়া। লিখেছেন, ভুট্টো হচ্ছে বৃশ্চিক। যাঁর হাত থেকে খাবার খাবে তাঁকেই কামড়াতে তিনি দ্বিধা করবেন না। একটি ঘটনার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। ভুট্টো তখন তাঁর মন্ত্রী, চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই ইয়াহিয়াকে জানালেন যে, ভুট্টো তাঁর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছেন চীন সফরের জন্য। কিন্তু তারা তাঁকে জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্টের অনুরোধ ছাড়া এ ধরনের সফর সম্ভব নয়। ইয়াহিয়া ভুট্টোর অনুরোধ রেখেছিলেন। কিন্তু স্বীকার করেছেন, এটি তাঁর ভুল হয়েছিল কারণ ভুট্টো চীনাদের 'রং সিগন্যাল' দিয়েছিলেন। 'রং সিগন্যাল'টি হলো ভুট্টো তাদের বুঝিয়েছিলেন তিনি যে রকম জনপ্রিয় তাতে ক্ষমতা তাঁরই করায়ত্ত হবে। এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সঙ্গে রাখা পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ নয়।

এ প্রসঙ্গে ইয়াহিয়া বলতে চেয়েছেন, পাকিস্তানি রাজনীতিবিদরা নিজ স্বার্থে কী ধরনের কাজ করে। মওলানা ভাসানীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এ পরিপ্রেক্ষিতে। লিখেছেন তিনি, ভাসানীকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। তো এই ভাসানী তাঁকে একবার নব্বই দফা দাবিনামা পেশ করেন। তিনি মওলানাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার নব্বই দফার কী হবে?" উত্তরে ভাসানী বললেন, "আপনি একজন প্রশাসক এবং আমি একজন আন্দোলনকারী। ব্যবসায় থাকার জন্য আমাকে দাবিনামা পেশ করতে হবে। আপনি যা ভালো মনে করেন তা-ই করবেন। আর মানুষ আমার কাছে যা আশা করে আমি তাই করব।"

এরপর তিনি আবারও সেনাবাহিনীর প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন, "গণহত্যার জন্য পাকিস্তানি বাহিনীকে দায়ী করা হয়। এটি সত্য নয়। আমি যখন কর্ণধার তখন পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে। তবে এ কারণে আমার থেকেও বেশি দায়ী জুলফিকার ভুট্টো।"

এবোটাবাদে যখন ইয়াহিয়া বন্দি তখন ইয়াহিয়ার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা মারফত ভুট্টো একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। বার্তাটি ছিল, ওয়ালি খানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হচ্ছে। ইয়াহিয়া খান যদি ওয়ালি খানের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেন তবে মুক্তি পাবেন। ইয়াহিয়া রাজি হন নি। ভুট্টো এতে চটে গিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন জেলেই তাঁকে কাটাতে হবে। এবং

সেখানেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। ইয়াহিয়া লিখেছেন, আসলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য ভুট্টোকেই তো কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত।

এরপর ইয়াহিয়া নিজের প্রকাশ্য বিচার দাবি করেছেন। তিনি পাকিস্তানকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর পিঠে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁকে আটক রাখা হয়েছে। এই ছুরি মেরেছেন ভুট্টো, যিনি বিশ্বাস করেন শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। কিন্তু কেন তাঁকে তখনও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে? ইয়াহিয়ার মতে, তাঁকে বাঁচিয়ে না রাখলে সেনাবাহিনীতে প্রতিক্রিয়া হবে। তাঁর ভাষায়—"I wonder why he permitted me to live. I think he was afraid of the Army reaction to my death in custody."

আট

শেখ মুজিবের ওপরও একটি অধ্যায় ব্যয় করেছেন ইয়াহিয়া। এ অধ্যায়টির নাম 'শেখ মুজিব : ওয়াজ হি এ ভিকটিম অব মাস হিস্টিরিয়া অর দি ইমপ্লানটেড আর্মি ফোবিয়া?"

এ অধ্যায়টিও তিনি শুরু করেছেন ভুট্টোকে দিয়ে। তাঁর মতে পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য যে, তারা এ রকম রাজনীতিবিদ পেয়েছে। কী রকম রাজনীতিবিদ? যেমন ভুট্টো—নীতিহীন, ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী এক ব্যক্তি যিনি বাঙালিকে ঘৃণা করতেন কারণ বাঙালিরা তাঁর 'গুণে' মুগ্ধ ছিল না। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না জেনে এ ব্যক্তিটি পাকিস্তান ভাঙার জন্য দু'বার চিন্তা করে নি।

আরেকজন 'ক্যারিসমেটিক' ব্যক্তিত্ব হলেন শেখ মুজিব। একজন ছাত্রনেতা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের দিগন্তে তিনি উদয় হন। ভুট্টো তাঁকে ফয়সালাবাদ জেল থেকে মুক্ত করে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা পালন করতে পারেন। ভুট্টো চেয়েছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। এবং এমনভাবে খেলার পরিকল্পনা ছকে ছিলেন যাতে বিচ্ছিন্ন না হওয়া ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের আর কোনো উপায় না থাকে। তাতে যদি রক্তপাত হয় তাতেও ভুট্টোর কিছু যায় আসে না।

ইয়াহিয়ার মতে, ভুট্টো-মুজিবের যে দ্বন্দ্ব তা অনেকটা লোক দেখানো। তাঁদের দু'জনের লক্ষ্য ছিল এক। তা হলো, পাকিস্তানকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়া। ভুট্টো চেয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান শাসন করতে। আর শেখ মুজিব চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে, যাতে তিনি বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা পালন করতে পারেন। দু'জনই যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছিলেন। তাঁদের লাভ হলো পাকিস্তানের ক্ষতি। ভুট্টো আবার গালভরা একটি উপাধি নিয়েছিলেন—কায়েদে আওয়াজ। এ নামটি তাঁর কানে মধু বর্ষণ করত। ইতিহাসে তিনি তাঁর নাম খোদাই করতে চেয়েছেন এবং পাকিস্তানের বিনিময়ে তা করেছেনও।

এরপর শেখ মুজিবের মূল্যায়ন করেছেন ইয়াহিয়া। এই মূল্যায়নে নৈর্ব্যক্তিকতা থেকে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে বেশি। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এমন সব মন্তব্য করেছেন

যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। তাঁর মতে মুজিব হচ্ছেন, "an immature person who thrives on publicity and mass hysteria. ছাত্রনেতা হিসেবে তাঁর উত্থান, কিন্তু ছাত্রনেতার সেই ভাবটি তিনি ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। তিনি একজন 'এজিটেটর'। চিন্তা বা বিশ্লেষণ করার কোনো ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি পারেন অঙ্গভঙ্গি করতে এবং চিৎকার করতে এবং তা তিনি ভুট্টোর থেকে ভালো করতে পারেন। তিনি দুঃখিত, কিন্তু তাঁর মনে হয়েছে "Mujib is a born liar." একই সঙ্গে তিনি লোভী এবং ঘুষ দিয়ে তাঁকে বশ করা যায়। সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে তিনি কথা রাখেন না। তাঁর ওপর নির্ভর করা যায় না। ইয়াহিয়ার মতে, মুজিবের ধারণা, তিনি চালাক এবং মানুষকে তিনি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু আসলে তিনি বোকা এবং তাঁকে ব্যবহার করা যায়। ইয়াহিয়ার মতে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং ভুট্টো মুজিবকে ব্যবহার করেছেন এবং মুজিব বুঝে উঠতে পারেন নি কে তাঁকে ব্যবহার করছে।

ইয়াহিয়া লিখেছেন, শেখ মুজিব যখন ফয়সালাবাদে বন্দি তখন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের কর্ণেল কাইয়ুমকে পাঠানো হয়। তাঁদের কথোপকথন টেপবন্দি করা হয়েছে এবং ভুট্টো যদি তা নষ্ট না করে থাকেন তবে পাকিস্তানের সামরিক আর্কাইভসে টেপটি থাকার কথা। পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে তা তাঁকে জানতে দেয়া হয় নি। তিনি ভীত ছিলেন এই ভেবে যে, সেনাবাহিনী তাঁকে হত্যা করবে। তাঁর প্রকোষ্ঠের বাইরে যখন মাটি খোঁড়া হচ্ছে তখন তা দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কর্ণেল কাইয়ুমকে বিশ্বাস করে তিনি অনেক কথা বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, আগরতলায় ভারতীয় কিছু প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল। এরা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি অধীনে থেকে কাজ করেছিলেন এবং শেখ মুজিবকে অনেক টাকা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ধারণা সতর্কভাবে তাঁর মাথায় ঢোকানো হয়েছিল। এক কথায়, বাংলাদেশ স্থাপনের জন্য ভারতীয়রা সর্বতোভাবে সাহায্য করতে রাজি ছিল। কর্ণেল কাইয়ুমের কাছে নাকি মুজিব স্বীকার করেছেন তিনি যে বিপুল পরিমাণ অর্থ পেয়েছিলেন ভারতীয়দের কাছ থেকে তার অনেকটা তিনি সরিয়েছেন। ভারতীয়রা তাঁকে বুঝিয়েছিল যে, সেনাবাহিনী কখনো তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এবং এটি ইয়াহিয়া বিশ্বাস করেন। কারণ, তাঁর সঙ্গে আলোচনাকালে মুজিব সব সময় সন্দেহ প্রকাশ করে বলতেন যে, সেনাবাহিনী কখনও তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হবে না। এবং তাঁকে সোজাসুজি বলেছিলেন যে, ভুট্টো তাঁকে বলেছেন, নিজেদের বাঁচাবার একমাত্র পথ এককভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা। সেই সময় থেকে ইয়াহিয়ার মনে হয়েছে, ভুট্টো পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে তৎপর যাতে তিনি তাঁর 'বাঙালি ভাইদের' ছাড়া শাসন করতে পারেন। পাকিস্তানের এ রকম সব নেতা থাকতে পাকিস্তানের শত্রুর দরকার নেই। এবং ইয়াহিয়ার মনে হয়েছে, তা সত্ত্বেও পাকিস্তান এতদিন টিকল কীভাবে? তাঁর ভাষায়—"Of course, if Pakistan had such leaders, it did not need my enemies to break it. The wonder is how it survived so long.

নয়

পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী কে? এ প্রশ্নের উত্তরও দেয়ার চেষ্টা করেছেন ইয়াহিয়া। তিনি জানাচ্ছেন, ভুট্টো তাঁর দলীয় সংসদ সদস্যদের ঢাকায় না যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সামরিক বাহিনীর জেনারেলদের সঙ্গেও শলাপরামর্শ করছিলেন। ইয়াহিয়া এসব খবর পেয়ে ভুট্টোকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কথা জানান। জবাবে ভুট্টো বলেন, "জেনারেল সাব, আমরা রাজনীতির মানুষ। আমরা এসব বলি সাধারণ মানুষের জন্য।" ইয়াহিয়া তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাঁর এসব উক্তি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। ভুট্টো চুপ করে রইলেন। ইয়াহিয়া তাঁকে বললেন, তাঁর মনে হচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের আশা ভুট্টো ছেড়ে দিয়েছেন এবং তিনি চান পশ্চিম পাকিস্তানের কারও কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। ভুট্টো তখন তাঁকে সোজাসাপটাভাবে জানালেন, ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের দিন ফুরিয়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, ইয়াহিয়াকে তিনি জানালেন, সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে দমন করতে। শুধু তাই নয়, গোটা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে গ্রেফতার করে হত্যা করার পরামর্শও দিলেন। আরও বললেন, গোটা পাকিস্তান রক্ষার জন্য ১০ লাখের মতো বাঙালি মারা যেতে পারে এবং এ জন্য ইয়াহিয়ার প্রস্তুত থাকা উচিত। ইয়াহিয়া লিখেছেন—"He suggested to me to round off and then kill the entire leadership of the Awami League in cold blood. In his opinion, the cost of integrity of Pakistan may be the lives of millions of Bengalis and that I should prepare for this."

ইয়াহিয়া জানাচ্ছেন, ভুট্টো বাঙালিদের বলতেন 'emotional foes' এবং 'misguided people,' ইয়াহিয়া তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করতে মানা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "Bhutto's contempt for Bengali people was truly morbid." ইয়াহিয়া খান তাঁকে বলেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান গিয়ে দেশপ্রেমিক লোকদের সংগঠন করতে। ভুট্টো বিদ্রূপ করে জওয়াব দিয়েছিলেন, এ সবের জন্য ওয়ালী খান উপযুক্ত।

সুতরাং ইয়াহিয়া মনে করেন পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্ষমতায় যাওয়ার লোভ। তিনিই এক দেশে দুই প্রধান রাজনৈতিক দল ও দুই প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন। এবং এটি ছিল বিচ্ছিন্নতার রসদ। ভুট্টোর হুমকি দেয়া বক্তৃতা 'ইধার হাম, উধার তুম'-এর বিপরীতে শেখ মুজিব ১২ ডিসেম্বর (১৯৭০) করাচিতে এক বক্তৃতায় পাকিস্তানের সংহতির কথা বলেছিলেন। এ পর্যায়ে ভুট্টোর চেয়ে মুজিব ছিলেন ঢের বেশি দেশপ্রেমিক।

সপ্তম অধ্যায়েও ইয়াহিয়া ভুট্টোর কথা বলে গেছেন। তিনি লিখেছেন, "I found Mujib ready to cooperate in saving Pakistan from disintegration"। ঢাকায় বৈঠকের সময়ও ভুট্টো ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার করেছেন। ইয়াহিয়া বলেছেন, ভুট্টো ঢাকায় এসেছিলেন কফিনের শেষ পেরেকটি ঠুকে দিতে। তাঁর ভাষায়—"Bhutto had

come to Dacca to drive the last nail in the coffin of a united Pakistan. He was openly talking of seceding West Pakistan from East Pakistan. What a topsy-turvy man!"

দশ

শেখ মুজিবকে জীবিত অথবা মৃত নিয়ে আসার হুকুম দিয়েছিলেন টিক্কা খান। করাচি এসে এ সংবাদ শুনে ইয়াহিয়া খান নতুন নির্দেশ দিলেন। তা হলো শেখ মুজিবের গায়ে হাত তোলা যাবে না। অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো আর্মি অ্যাকশনে খুব খুশি হয়েছিলেন, মুজিবের গ্রেফতারে আরও বেশি। শুধু তাই নয়, ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেকোনোভাবে হোক শেখ মুজিবকে হত্যা করতে। ভুট্টোর এ ধরনের চিন্তাভাবনায় "লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে আসত" লিখেছেন ইয়াহিয়া। এবং অপছন্দের কাউকে হত্যার ব্যাপারে ভুট্টোর কল্পনা ছিল মর্বিড। ইয়াহিয়া বলছেন, ভুট্টো যেভাবে বলছেন সেভাবে কেউ যদি তাঁর হত্যার পরিকল্পনা করত তাহলে তা জেনে তাঁর কেমন লাগত? ইয়াহিয়ার মতে, এসব মানুষ আসল রাজনীতিবিদ নন। এগুলো হচ্ছে ফ্যাসিস্ট চিন্তাভাবনা। তাঁর ভাষায়, "I wonder how Zulfiquar Bhutto would feel if some one someday planned his death as he had been planning for the death of his own enemies. In my humble view, the person who keeps thinking of bumping off people is not a real politician. This is fascist thinking. I abhor it."

ভুট্টোর ষড়যন্ত্র সেখানেই শেষ হয় নি। ইয়াহিয়া জানতে পারলেন, জেনারেল গুল হাসান এবং এয়ার মার্শাল রহিমের সঙ্গে ভুট্টো ষড়যন্ত্র করেছেন ক্ষমতা দখলের। একদিন ভুট্টো এসে তাঁকে বললেন, "জেনারেল, আজ হোক কাল হোক, আমাকে ক্ষমতা দিতে হবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বন্ধুর মতো আগে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে ভালো হয় না?" শুধু তাই নয়; বারংবার তিনি ইয়াহিয়াকে বলছিলেন শেখ মুজিব একজন বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং সেনাবাহিনীর উচিত তাঁকে খতম করে দেয়া। এবং বার বারই ইয়াহিয়া জানিয়েছেন, মুজিব বিশ্বাসঘাতক হলেও পাকিস্তানের দু-তৃতীয়াংশ মানুষের প্রতিনিধি। ভুট্টো বললেন আশ্চর্য হয়ে, "আপনি একজন বিশ্বাসঘাতককে ছেড়ে দেবেন!" ইয়াহিয়া বললেন, "কেন নয়। আমি যদি একজন ষড়যন্ত্রকারীর সঙ্গে বসে খেতে পারি তাহলে আমি একজন বিশ্বাসঘাতককে স্যালুটও করতে পারি যে ক্ষেত্রে তাঁর পিছে আছে জনসমর্থন।" ইয়াহিয়ার ভাষায়—"So far as I remember, my precise words were why not? If I can sup with a conspirator, I can also salute a traitor, particularly when he has the popular mandate!"

ইয়াহিয়া একথা বলেছিলেন কি না জানা যাবে না। তবে, লিখেছেন, তাঁর এ কথা শুনে ভুট্টো থমকে গেলেন। এক পেগ হুইস্কি চাইলেন। তাঁকে তা দেয়া হলো। এক চুমুকে তা শেষ করে জানতে চাইলেন, ইয়াহিয়া কী জানেন? ইয়াহিয়া যা জানেন তা বললেন।

ইয়াহিয়া লিখেছেন, ভুট্টো ভাবছিলেন তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। না, তাঁকে গ্রেফতার করা হয় নি। ইয়াহিয়া শুধু তাঁকে বলেছিলেন জেনারেলদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি না করতে।

ইয়াহিয়া আরজিতে গণহত্যার প্রসঙ্গ আবারও এনেছেন। এবং দ্ব্যর্থকণ্ঠে জানাচ্ছেন, আর্মি গণহত্যা করে নি। তবে, আরজির সংক্ষিপ্তসারে তিনি জানিয়েছেন, গণহত্যার দোষে যদি কাউকে দোষী করতে হয় তাহলে করতে হবে জেনারেল টিক্কা খান ও ভুট্টোকে। ভুট্টোর প্রতি টিক্কার দরদ ছিল। ইয়াহিয়া লিখেছেন, টিক্কা খানকে গভর্ণর না করে তাঁর উপায় ছিল না। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর নিযুক্তরা ব্যর্থ হচ্ছিলো। তখন সেনাবাহিনীর কট্টরপন্থীরা টিক্কার নাম প্রস্তাব করে। এবং ইয়াহিয়া মনে করেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী একটি ফাটল সৃষ্টির জন্য টিক্কা এসব কাজ করেছিল।

সংক্ষেপে এই হলো পাকিস্তান ভাঙার ইতিহাস এবং এই বিচ্ছিন্নকরণে ভুট্টো ও শেখ মুজিবের সমঝোতা ছিল। দু'জনই সমানভাবে দোষী। তবে, জুলফিকার ভুট্টো শেখ মুজিব থেকে বেশি দায়ী।

এগার

ইয়াহিয়ার দুটি প্রতিবেদনের মূল সুর একই, পার্থক্য আছে ডিটেলে। তাঁর মূল বক্তব্য, তিনি ছিলেন একজন সামরিক একনায়ক। এ শব্দটি অকপটেই তিনি উল্লেখ করেছেন। ১৯৬৯ সালে ক্ষমতা তাঁকে নিতে হয়েছিল। ক্ষমতা তিনি দখল করেন নি। নির্বাচন দিয়ে তিনি ব্যারাকে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতিবিদদের কারণেই সমস্ত ঝামেলা লেগে গেলো। এই রাজনীতিবিদ হলেন দু'জন—জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং শেখ মুজিবুর রহমান।

এরাও দুজনে কোনো সমঝোতায় আসতে চান নি। ফলে, পাকিস্তান বাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। এই হস্তক্ষেপের দরুন কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ভারত ১৯৪৭ সাল থেকেই মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তান ভাঙার চেষ্টা করছে। শেখ মুজিবকে তারা করায়ত্ত করে নিয়েছিল। অন্তিমে লড়াইয়ে পাকিস্তান হেরে গেলো, যদিও তার একটি গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি ছিল।

পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী কে? দায়ী দুজন—শেখ মুজিব ও ভুট্টো।

এ দৃষ্টি নিছক একজন জেনারেল ইয়াহিয়ার নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি পুরো পাকিস্তানের [আমার লেখা 'পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেল ও মুক্তিযুদ্ধ' এবং 'সে সব পাকিস্তানি' গ্রন্থে বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করেছি] এবং এই মনোভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে হামুদুর রহমান কমিশনেও। কিন্তু ইয়াহিয়া, কমিশন বা পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কয়েকটি বিষয়ের তারা সদুত্তর দিতে পারেনি। এই বিষয়গুলো ছিল মৌলিক। যেমন নির্দ্বিধায় সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে ক্ষমতা অর্পণ। এ নিয়ে তা আলোচনা হতে পারে না। এবং এ জন্য তো দায়ী ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো। ভুট্টো কী করেছিলেন তা ইয়াহিয়া জেনেও তো কোনো ব্যবস্থা নেননি।

১৯৭২ সালে ইয়াহিয়া কমিশনের যে ভাষ্য রচনা করেছিলেন তা অনেক নমিত। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পর তিনি বন্দি বা মানসিকভাবে তাঁর পক্ষে মেনে নেয়া ছিল কষ্টকর। তার ওপর জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন ক্ষমতায়। সুতরাং, একটা নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি এনে তিনি লেখার চেষ্টা করেছেন এবং অকপটে কিছু মন্তব্যও করেছেন। যেমন :

১. পাকিস্তানের ভাঙার জন্য এককভাবে কেউ দায়ী নয়।
২. বাংলার মুসলমানরা কেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছিল তা ভেবে দেখা দরকার।
৩. পাকিস্তান বাহিনী যে অবস্থায় [অর্থাৎ জনসমর্থনহীন] লড়েছিল সে অবস্থায় জেতার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

কমিশনে প্রদত্ত বক্তব্যে ভুট্টোকে তিনি সরাসরি দোষারোপ করেন নি। বরং ভুট্টোকে সমর্থনই করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ভুট্টো যখন বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যেতে পারে কিন্তু তার ইচ্ছায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে দিতে পারা যায় না, তখন এটি ভ্যালিড পয়েন্ট হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।" এ যুক্তি অবশ্য সব পাকিস্তানিরই।

ইয়াহিয়ার ভুট্টোর প্রতি নমিত থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ, ভুট্টো তখন ক্ষমতায়। সেনাবাহিনী তাঁর পক্ষে। কমিশনও তাঁর পক্ষে। পাকিস্তানে কোনো বিচারক শাসকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেন না। সুতরাং তিনি এমন কিছু বলতে চাননি যাতে সমস্ত দায়দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায়। তাঁর আশা ছিল, হয়তো খানিকটা সময় পেলে ভুট্টো তাঁর প্রতি নমিত ব্যবহার করবেন যেমনটি তিনি করেছিলেন ভুট্টোর প্রতি।

ভুট্টো ক্ষমতায় থাকাকালীন কোনো নমনীয়তা দেখান নি। ভুট্টো ক্ষমতাচ্যুত হলে তিনি হাইকোর্টে রিট করেন। তাঁর এক সময়ের অধস্তন জিয়াউল হক তখন ক্ষমতায়। ইয়াহিয়া আশা করছিলেন এই রিটের মাধ্যমে তিনি মুক্তি পাবেন। এ কারণে, রিটের আরজি আমরা দেখছি অপেক্ষাকৃত আক্রমণাত্মক। এবং প্রতি ছত্রে ছত্রে ভুট্টোর প্রতি বিষোদগার। ভুট্টোর ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন তাতে সত্যতা আছে। কারণ মার্কিন নথিপত্রেও এসবের ইঙ্গিত আছে। 'বিষোদগার' শব্দটি ব্যবহার করলাম এ কারণে যে, ১৯৭২ সালে এসব কথা তিনি বলেন নি। ইয়াহিয়া ভেবেছিলেন, এ আক্রমণাত্মক ভঙ্গি হয়তো জিয়াউল হককে খুশি করবে এবং তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত হবে। আরজিতে ইয়াহিয়া ভুট্টোর যে চরিত্রটি এঁকেছেন তাতে খুব একটা অতিরঞ্জন নেই। পাকিস্তানের অনেক নীতি নির্ধারকের সঙ্গে আলাপ করেছি। ভুট্টো সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনাও এ রকম। শেখ মুজিব সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেছেন কিন্তু যেহেতু তাঁর কোনো চরিত্রগত ত্রুটি উন্মোচন করা যায় নি; সেহেতু তাঁকে ভারতের ক্রীড়নক হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিব বা বাঙালিত্বের পক্ষে যারাই কথা বলবে তারাই ভারতের ক্রীড়নক। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এ কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের একদল বাঙালিও তা বলছেন। এবং এ ধরনের চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়েছেন বাংলাদেশে পাকিস্তানের কাকুলে প্রশিক্ষিত সামরিক কর্মকর্তা ও স্বাধীনতাবিরোধীরা। সুতরাং পাকিদের এই অভিযোগে আর নতুনত্ব নেই। বাংলাদেশের পাকিস্তানিদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

পাকিস্তান ভাঙার জন্য আরজিতে ইয়াহিয়া আগের মতোই ভুট্টো ও মুজিবকে দায়ী করেছেন। তবে, দায়টা ভুট্টোর ওপরই বেশি চাপিয়েছেন। পাকিস্তানিরা অবশ্য, পাকিস্তান ভাঙার জন্য এ দুজন ছাড়া ইয়াহিয়ার নামও যুক্ত করে।

গণহত্যার কথা ইয়াহিয়া কোনো প্রতিবেদনে স্বীকার করেন নি। আর্মির যে বড় ধরনের কোনো ত্রুটি ছিল তাও তিনি অস্বীকার করেছেন। হামুদুর রহমান কমিশনেও গণহত্যার কথা স্বীকার করা হয় নি। তবে, সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তার ওপর মাত্র দোষারোপ করা হয়েছে, সমগ্র সেনাবাহিনী বা সেনামানসিকতার ওপর নয়। কারণ পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করে, ওপরে আল্লাহ আর নিচে মিলিটারি। এর বাইরে কোনো জগত নেই, শক্তিও নেই। জে. মোশাররফ এর নবতর প্রমাণ। ইয়াহিয়ার দু'টি প্রতিবেদন একটি বিষয়ই আবার তুলে ধরে, একজন পাকিস্তানি, একজন পাকিস্তানিই। বাঙালিদের সম্পর্কে তাদের পূর্ব ধারণা আছে, যা কিছুতেই পরিবর্তনযোগ্য নয়। এবং পাকিস্তানও ভেঙে না গেলে এ পূর্ব ধারণার পরিবর্তন হবে না এবং উপমহাদেশে তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানও সম্ভব হবে না।

২০০০

মুক্তিযোদ্ধা কে? আজ ত্রিশ বছর পর, এই প্রশ্ন করলে অনেকে অবাক হবেন। কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমাদের সমাজে স্বতসিদ্ধ অনেক বিষয়কেই বিনা কারণে বিতর্কিত করে তোলা হয়? মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা তেমনি দুটি শব্দ। অথচ, এ নিয়ে বিতর্ক হওয়ার কথা ছিল না এবং বিতর্ক হওয়া কাম্যও নয়। এ প্রশ্নের উত্তরের আগে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করি।

১৯৭১ সালের এক সুন্দর সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে আমরা ছাত্ররা ভীড় করে দাঁড়িয়ে। মনে তীব্র আশা, আকাঙ্ক্ষা, উত্তেজনা। তৎকালীন ছাত্রনেতা আ.স.ম. আবদুর রব উঠলেন কলা ভবনের বাড়ি-বারান্দার উপর। স্থাপিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশের ফলক। উত্তোলিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। বাংলাদেশ তখনো বাংলাদেশ হয় নি, পরিচিত তখন তা পাকিস্তান নামে।

আ.স.ম. আবদুর রব মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন ভারতে। মুক্তিযুদ্ধের পর, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিপ্লবী দল। সে বিপ্লবী দলে অনেক মেধাবী তরুণ আকর্ষিত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন অনেক তরুণ। রব এরপর মাগুর মাছের চাষ শুরু করেছেন; সম্পূর্ণ উল্টোদিকে ঘুরে সামরিক সরকারের সমর্থক হয়ে সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতনে সাহায্য করেছেন, বিভ্রান্ত করেছেন। অথচ তাঁর ভুল ও স্বার্থপর রাজনীতির জন্য যে এত প্রাণ ঝরে পড়েছিল তার জন্য কখনো তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন নি। কিন্তু সব সময় বিজ্ঞাপিত করেছেন নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে।

মেজর জলিল? একই রকম কাণ্ড করেছিলেন। বা জেনারেল জিয়া বীরউত্তম? যিনি জাতীয় আল-বদর আবদুল মান্নানকে মন্ত্রী করে ধনী হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। জাতীয় রাজাকার গোলাম আজমকে থাকতে দিয়েছেন সম্মানজনকভাবে। বা মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন 'মুক্তিযোদ্ধা সংসদ' যা গত একদশক সমর্থন করেছে স্বৈরশাসক এরশাদকে এবং 'রণবীর' উপাধি দিয়েছিল জেনারেল এরশাদকে যিনি আদতেই ছিলেন না মুক্তিযোদ্ধা।

তা'হলে কীভাবে বলি রব, জলিল বা জিয়া মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন? অনেকে অবশ্য বলেন, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যিনি মুক্তিযোদ্ধা, তিনি মুক্তিযোদ্ধাই, তারপর তিনি যা-ই করুন-না কেন। কিন্তু তাঁরা তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখেন নি। অনেকে বলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কী যে তা এতদিন পরও সমুন্নত রাখতে হবে? আমরা অনেকেই মনে করি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাদামাটা অর্থ হলো গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা বজায় রাখা অর্থাৎ রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা রাখা, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, প্রগতির বিকাশ, আইনের শাসন বা সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ মূলত এসব লক্ষ্যকে সামনে রেখেই হয়েছিল।

এই যে প্রশ্ন, এগুলো তো ওঠার কথা নয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই নানা প্রশ্ন উঠেছে বা উঠানো হয়েছে। এর অনেক প্রশ্ন আমরাই

তুলেছি, বুঝে না বুঝে। জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে। হয়ত আমাদের অনেকেই এ বিতর্ক সৃষ্টি করতে চাই নি। কিন্তু তা সৃষ্টি হয়েছে। আর শত্রুপক্ষ তো ছিলই। তারা এই সুযোগ গ্রহণ করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিজেদের আবার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই প্রশ্নগুলো আরো জোরদার করে তুলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ধার ক্ষয় করে দিতে চেয়েছে এবং তাতে যে তারা অসফল হয়েছে এমন কথা বলা যায় না।

কিন্তু প্রশ্নগুলো উঠল কীভাবে? প্রথমেই বলা হলো যারা যুদ্ধ করেছেন প্রত্যক্ষভাবে বা ছিলেন ভারতে তারাই মুক্তিযোদ্ধা। এভাবে সারা দেশে হীনমন্যতার প্রাচীর তুলে ভাগ করে ফেলা হলো সমাজকে। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে সুবিধা নিলেন। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা নির্ণয়ের জন্য সার্টিফিকেট বিতরণ করা হতে লাগল। এই কয়েক বছর আগেও 'প্রকৃত' মুক্তিযোদ্ধাদের বাছাই করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এবং ধারাবাহিকভাবে 'প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের' নাম ছাপা হতে লাগল পত্রিকায়। এখনো মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মুখপত্রে ধারাবাহিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ছাপা হচ্ছে। হয়ত এদের অনেকেই এখন জীবিতও নেই।

১৯৭২ সালে, যখন এইসব ঘটনা ঘটে তখন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা তো মুখিয়েই ছিল। স্বাধীনতার প্রথম দিনই ষোড়শ বাহিনীতে যোগ দিয়ে লুটতরাজ শুরু করে দিল অনেকে। মুক্তিযুদ্ধ করে যারা ফিরেছিল তাদের অনেকেও যোগ দিয়েছিল এদের সঙ্গে। ফলে, মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে অনেকেরই বিরূপ ধারণার জন্ম হয়েছিল। সাধারণ ক্ষমা সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করে নি। সবকিছু মিলিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষের মনে যে বিশাল আশা আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়েছিল তাতে চিড় ধরল। পরবর্তীকালে, মুক্তিযোদ্ধাবিরোধিরা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে অনেক মুক্তিযোদ্ধাও আর নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয় দিতেন না। এখানে উল্লেখ্য মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার চেতনা যারা লালন করেছেন তারা কখনো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেদের বিজ্ঞাপিত করেন নি।

সামরিকায়নের অর্থ কী? কবে থেকে সামরিকায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল?

সাদামাটা কথায়, সামরিকায়ন মানে সিভিল সমাজের বিপরীতে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামরিক গোষ্ঠীর প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজকে নির্দিষ্ট দু'টি ভাগে ভাগ করে দেয়া। সামরিক সমাজের অন্তর্গত হবে মূলত সামরিক গোষ্ঠী ও তাদের অধস্তন কিছু বেসামরিক ব্যক্তি। বিপরীতে বাংলাদেশের অগণিত সাধারণ মানুষ যা অন্তর্গত সিভিল সমাজের। সংখ্যাগরিষ্ঠের সিভিল সমাজ হবে সংখ্যালঘিষ্ট সামরিক সমাজের অধস্তন। অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াও, সমাজ রাজনীতি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা সিভিল কর্তৃত্ব বিনষ্ট করবে এবং প্রয়োজনে সিভিল ইনসটিটিউশনসমূহ, যেমন, পার্লামেন্ট, নির্বাচন প্রথা, বেসামরিক আমলাতন্ত্র এগুলোকে বিনষ্ট করবে বা এমন সংস্থায় পরিণত করবে যার ওপর আর সিভিল সমাজের আস্থা থাকবে না। এ জন্য মনোজগতে সিভিল সমাজের আধিপত্যের প্রতীকসমূহও বিনষ্ট করা হয়।

সামরিকায়ন প্রক্রিয়া শুরু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকে। এর সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ১৯৯০ পর্যন্ত। অর্থাৎ দু'জন জেনারেল—জিয়া এবং এরশাদের পুরো সময়কালটাই ছিল সামরিকায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। বাংলাদেশে যেদিন থেকে সামরিক শাসনের ভিত্তি

প্রোথিত হয়েছে সেদিন থেকে মুক্তিযোদ্ধাবিরোধীদের শক্তিশালী করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সামরিকায়ন শুরু হয়েছে সেদিন থেকে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেই একমাত্র বাংলাদেশের জনগণ হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বতোভাবে যোগ দিয়েছিলেন। তৃণমূল পর্যায়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধই একমাত্র অভিঘাত হেনেছিল। ক্ষমতায় যে-সব সামরিক শাসক ছিলেন তারা এ কথা জানতেন। তাই প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখ করতে তারা কার্পণ্য করতেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিনষ্ট করতে সচেষ্ট থেকেছেন। এর দু'টি দিক ছিল—এক দিক হচ্ছে প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা এবং তা যে সামরিকবাহিনীই করেছে এবং সে জন্যই সফল হয়েছে তা প্রকাশ করা। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে সামরিক শাসকরা এভাবেই সেনাবাহিনী ও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে চেয়েছেন। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের চিহ্নগুলো বিনষ্ট করা হয়েছে। এবং সাহায্য করেছে প্রগতিবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দলগুলোকে শক্তিশালী হতে। যেমন, জামায়াতে ইসলাম। কারণ, সামরিক শাসক মূলত প্রগতিবিরোধী ও রক্ষণশীল এবং সামরিক শাসন প্রতিটিই মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিরোধী। সুতরাং দু'পক্ষ কখনো কখনো একে অপরের বিরুদ্ধে বললেও মূলত তারা এক ছিল। এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করতে কীভাবে তারা সফল হয়েছে তার একটি উদাহরণ দিই। এরশাদের পতনের ঠিক আগে এবং পরে আমি অনেককে বলতে শুনেছি—আরে জামায়াত কবে কী করেছে তা মনে রাখলে চলবে? তারা তো আগের মতো নেই, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তারাও ছিল এবং সামরিক শাসন তারা পছন্দ করে না। তা হলে, জাতীয় পরিষদে জামায়াত কি এখন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না, অবসারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারদের ক্লাব বিএনপি-কে সমর্থন করছে? এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাঘ কখনো ঘাস খায় না, হরিণ কখনো মাংস খায় না।

অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল জিয়াউর রহমান এ কাজটি শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ অবধি দোদুল্যমান ছিলেন। তাঁর হত্যার কারণ হতে পারে এ দোদুল্যমানতা। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এরশাদের এ ক্ষেত্রে কোনো দোদুল্যমানতা ছিল না। সামরিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সামরিকায়ন করতে চেয়েছেন, এ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে কাজ শুরু করেছিলেন, সফলও হয়েছিলেন কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেন নি।

মুক্তিযুদ্ধ যেহেতু আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের সবচেয়ে বড় সম্পদ, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি—তাই অতি ধীরে তারা আঘাত হেনেছিলেন তার উপর। যে-ভাবে তারা বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বা সামগ্রিকভাবে করতে চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের বিকৃতায়ন তাকেই আমরা উল্লেখ করতে চাই মুক্তিযুদ্ধের সামরিকায়ন হিসেবে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা দেশ শাসন করেছেন এবং এ দীর্ঘ সময়ে তারা যে সামরিক সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার একটি পর্যায় ছিল মুক্তিযুদ্ধের সামরিকায়ন।

প্রথমে জিয়াউর রহমানের কথা ধরা যাক। ক্ষমতায় আসার পর বেছে বেছে তিনি এমন সব ব্যক্তিদের বিভিন্ন উচ্চপদে বসাতে লাগলেন যাদের পরিচয় ছিল পাকিস্তানপন্থি হিসেবে। যে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের জন্ম সে বাংলাদেশে পাঁচ বছরের মাথায় যদি

পাকিস্তানপন্থিদের শাসনক্ষমতায় বসানো হয় তার অর্থ মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার বিরোধিতা করা। এরা কারা? উদাহরণস্বরূপ শফিউল আজম, বিচারপতি সাত্তার বা তবারক হোসেন প্রমুখ। মুজিব আমলে বিভিন্ন অভিযোগে যে ন'জন সিএসপি অফিসারকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল তাদের পুনর্নিয়োগ করা হয়। জিয়ার পুনর্বিন্যাসের চরিত্রটি বোঝা যায় মন্ত্রিসভার গঠন দেখলে। অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ দেখিয়েছেন, ১৯৭৬-৮১ সালের মধ্যে জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা বা মন্ত্রী হিসেবে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ১৩ জন সামরিক কর্মকর্তা, ৮ জন বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ১৮ জন শিল্পপতি ও ৩১ জন দলছুট রাজনীতিবিদ। এই ৩১ জনের মধ্যে ১৯ জন ছিলেন আবার বাংলাদেশবিরোধী।

এ পরিপ্রেক্ষিতে খানিকটা দীর্ঘ হলেও অধ্যাপক মুশাররফ হোসেনের একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে চাই—

"... তিনি ক্ষমতায় এসেই যে-সকল ব্যক্তিকে তাঁর সরকারে যোগদান করার জন্যে আমন্ত্রণ জানান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, বিচারপতি সাত্তার, সর্বজনাব কাজী আনওয়ারুল হক, হাফিজ উদ্দিন, মির্জা নুরুল হুদা, মুহাম্মদ শামসুল হক, শফিউল আজম, আজিজুল হক, জহিরুল হক প্রমুখ। এরা সবাই পাকিস্তান আমলে আইউব/ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। এঁদের 'সততা' ও 'দক্ষতা' সর্বজনবিদিত। 'পাকিস্তান মডেল' সম্বন্ধে এঁদের জ্ঞান অত্যন্ত গভীর এবং কী করে বাংলাদেশে "পাকিস্তান উন্নয়ন মডেল"-কে বাস্তবায়িত করতে হবে এ ব্যাপারে এদের কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। তবে মুক্তিযুদ্ধ নামক একটি ঘটনা সম্বন্ধে এদের কী ধ্যান-ধারণা এটা বোঝা মুশকিল।"

১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল একটি মৌল বৈশিষ্ট্য। পাকিস্তানপন্থিদের কাছে স্বভাবতই তা ছিল উষ্মার বিষয়। তাই দেখি, শেখ মুজিবকে হত্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রেডিও পাকিস্তান ঘোষণা করল, বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে নীতি হিসেবে বর্জন করা হয়েছে। রেডিও পাকিস্তান এ ঘোষণা দিয়েছিল কি না পরে অবশ্য তা বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে এক সামরিক ফরমান অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের ৬৬ ধারার একটি উপধারা ও ১২২ ধারা বিলুপ্ত করা হলো যার ফলে পাকিস্তানি দালালরা পেল ভোটার হওয়ার সুযোগ। আগে এতে আইনগত বাধা ছিল। ৩৮ ধারায় সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক দলসমূহের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৯৭৬ সালের মে মাসে এক সামরিক ফরমান জারি করে তা বাতিল করা হলো। ফলে, বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু হলো যার ঝোঁক ছিল পাকিস্তানের দিকে।

জিয়াউর রহমান পাকিস্তানি দালালদের তোষণ করতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নিজের ক্ষমতা সংহত ও বৃদ্ধিই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য, সিভিল সমাজ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিল না।

পাকিস্তানপন্থিদের দলে ভেড়ানোর জন্য এপ্রিল ১৯৭৭ সালে তিনি ফরমান জারি করে ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রের বেশ কিছু মূলধারা ও বৈশিষ্ট্য বদল করলেন। সিভিল সমাজের ওপর এটিই ছিল জিয়ার পরিকল্পিত প্রথম হামলা।

শাসনতন্ত্র সংশোধনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল 'গণমনে অসন্তোষ'; এই 'গণ' বা 'জন'রা ছিল স্বাধীনতাবিরোধী, পাকিস্তানপন্থি, জিয়া যাদের তোষামোদ করতে চাইছিলেন। তাঁর সংশোধনগুলো ছিল নিম্নরূপ—

১. শাসনতন্ত্রের ৬ ধারায় বাংলাদেশের নাগরিকদের উল্লেখ করা হয়েছিল বাঙালি হিসেবে। এই ধারা সংশোধন করে বাঙালিকে করা হলো বাংলাদেশী। কিন্তু বাংলাদেশীদের জাতীয় সত্তা স্পষ্ট করে তোলার কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। ১৯৭২ সালের ৯ ধারায় সুস্পষ্টভাবে তার উল্লেখ ছিল। এতে পাকিস্তানপন্থিরা খুশি হলো এ ভেবে যে, জাতিসত্তা আবার দ্বি-খণ্ডিত হলো—এখন বাংলাদেশের বাঙালি ও ভারতীয় বাঙালি আলাদাভাবে চিহ্নিত হলো।
২. সংবিধানের শিরোনামের নিচে যুক্ত হলো "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।"
৩. সংবিধানের প্রস্তাবের শুরুতে "জাতীয় মুক্তির জন্যে ঐতিহাসিক সংগ্রামের" পরিবর্তে যুক্ত হলো "জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের।"
৪. ৮ ধারায় ছিল "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।" এর পরিবর্তে যুক্ত হলো "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার।"
৫. ২৫ ধারায় একটি উপধারা সংযোজিত হলো "রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সুসংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন।"
৬. ৪২ ও ৪৭ ধারা সংশোধন। শেষোক্ত ধারা পাকিস্তানপন্থিদের সবচেয়ে বেশি খুশি করেছিল কারণ, এতে রাষ্ট্রীয়করণনীতি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংসদ বাতিল করা যাবে বলে বলা হলো। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী এর জন্য প্রয়োজন ছিল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

সিভিল প্রশাসনের বিরুদ্ধে সামরিক প্রশাসনকে শক্তিশালী করে তোলা জিয়া ও এরশাদ দু'জনের শাসনেরই ছিল মূল বৈশিষ্ট্য। এ কারণে, রাষ্ট্রীয় তহবিল তছনছ করতে তাঁরা দ্বিধা করেন নি। এর কারণ কী? কারণ এঁদের ক্ষমতার উৎস ছিল বন্দুকের নল বা ক্যান্টনমেন্ট। সুতরাং ক্যান্টনমেন্টকে খুশি রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁদের শাসনামলে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশে ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯৭৭ সালের বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে, দেশরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা ও পুলিশ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি ৩০ লাখ যা জাতীয় ব্যয়ের ১৭.৬ ভাগ। ১৯৭৬ সালের জন্য ১৪৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ করে মুজিব সরকার। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেই তা বৃদ্ধি করেন ২০৬ কোটি ৩০ লাখ যা জাতীয় আয়ের ৩১.১ ভাগ। ১৯৭৭ সালে সে পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৭ কোটি ৪০ লাখ।

জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে সামরিকবাহিনীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৩০০ ভাগ। শেখ মুজিবের আমলে, রক্ষীবাহিনী ও বাংলাদেশ রাইফেল্‌স-এর সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২০ হাজার ও ১৫ হাজার। জিয়ার আমলে

রক্ষীবাহিনী ভেঙে নিয়ে রাইফেলসের সদস্য সংখ্যা উন্নীত করা হয় ৩০ হাজারে, সৃষ্টি করা হয় ৩৬ হাজার সদস্যের সশস্ত্র পুলিশ, আট হাজার সদস্যের আনসারবাহিনী ও ৯ লক্ষ ৬০ হাজার সদস্যের গ্রাম প্রতিরক্ষাবাহিনী।

একথা সর্বজনবিদিত যে, নিজ ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য জেনারেল জিয়া সামরিক গোয়েন্দাবাহিনীকে ব্যবহার করেছিলেন যা এখনো অব্যাহত। বলে রাখা ভালো, এ বিষয়ে লিখিত দলিলপত্র পেশ করা সঙ্গত কারণেই সম্ভব নয়। অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন ১৯৮৮ সালেই লিখেছিলেন—"তিনি গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত অন্যান্য অনেককেই তাঁর সরকারের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করেন। সামরিকবাহিনী ও তাদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছুই জানি না। তবে গত বারো বছর ধরে এ দেশে যে-সব কাজকর্ম হচ্ছে তার মূল নায়কেরা নেপথ্যে অবস্থান করলেও তাদের পরিচয় অনেকেই অবগত আছেন। এদের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে বা স্বার্থান্বেষী এবং দলছুট রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে জানা যায় যে, সরকারের সমর্থন নতুন রাজনৈতিক দল সৃষ্টি বা পুরানো দলগুলোকে ভাঙা থেকে আরম্ভ করে আপস, বিরোধী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভয়ভীতি সঞ্চার করা বা তাদের চরিত্রহানিকর প্রচারণা প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের জন্যই সামরিক গোয়েন্দাবাহিনী একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে আসছে।"

জিয়াউর রহমানের আমলে, মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রচারটি করা হতো তা হলো গণমাধ্যম ছিল বন্দি। মেনে নেয়া গেল সে যুক্তি। কিন্তু, জিয়াউর রহমানের আমলে তা একেবারে সরকারের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, চলে যায় সামরিকবাহিনীর প্রহরাধীনে। মন্ত্রণালয়ের প্রতিদিনকার নির্দেশে তার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। তবে, ঐ আমলে গণমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য হলো, শেখ মুজিব তো বটেই, মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত যাবতীয় চিত্রাবলি, খবর বন্ধ করে দেওয়া। মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত সে-সব তথ্যই প্রচার করা হতো যার সঙ্গে জিয়াউর রহমান বা সামরিকবাহিনী যুক্ত। এটি ছিল সামরিকায়ন প্রক্রিয়ার একদিক অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের কারণে নয়, সামরিক কর্মকর্তাদের কারণে। জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন শেখ মুজিবের আমলকে নয়, শেখ মুজিবকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে এবং এতে তিনি খানিকটা সফলও হয়েছিলেন। একটি প্রজন্ম এ প্রচারের মাধ্যমে জেনেছে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে যা যুক্ত তার সবই খারাপ আর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যা যুক্ত তার সবই ভালো। এরাই মূলত পরবর্তীকালে বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের বড় ফল জাতীয়তার প্রশ্নটিও জেনারেল জিয়া ঘোলাটে করে তুলেছিলেন। আমরা যে বাঙালি হিসেবে যুদ্ধ করেছিলাম তা তিনি ভুলিয়ে দিতে চাইলেন। বললেন আমরা বাংলাদেশী। জাতীয়তার প্রশ্নে ধর্মকে গুরুত্ব দেয়া হলো, মুক্তিযুদ্ধের মৌল আদর্শ তা ছিল না। এটি মুক্তিযুদ্ধের মর্মমূলে আঘাত হেনেছিল। জেনারেল জিয়া ১৯৭২ সালে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় লিখেছিলেন, যেদিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা, "আমার মতে ঠিক সেই দিনই বাঙালি হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ, জন্ম হয়েছিল বাঙালি জাতির।"

এর ঠিক পাঁচ বছর পর, জেনারেল জিয়া সংবিধান সংশোধন করে অন্তর্ভুক্ত করলেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। এ তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন পাকিস্তানের সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত খোন্দকার আব্দুল হামিদ। ১৯৭৬ সালে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমীর আলোচনা সভায় তিনি বলেন, "আমাদের জাতীয়তাকে 'বাংলাদেশী জাতীয়তা' বলাই এপ্রোপ্রিয়েট বা সংগত। ... এই জাতির রয়েছে গৌরবময় আত্মপরিচয়, নাম-নিশানা, ওয়ারিশী উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য-ইতিহাস, ঈমান-আমান, যবান-লিসান, শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য, সংগঠন ও সবকিছু। বাংলাদেশী জাতির আছে নিজস্ব জীবনবোধ, জীবনধারা, মনস্তাত্ত্বিক গড়ন-গঠন, ভাবধারা। আছে সমষ্টিগত বিশেষ মনোভঙ্গি, আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ানুভূতির বন্ধন। এদের হৃদয়তন্ত্রীতে বাজে একই সুখ-দুঃখের সুর, একই আবেগ অনুভূতির ঝঙ্কার। এদের জীবনে ও মনোজগতে রয়েছে এমন অসংখ্য বৈশিষ্ট্য, যা সারা পৃথিবী থেকে এদের স্বাতন্ত্র্য দান করেছে—এমনকি অন্যান্য দেশের বা অঞ্চলের বাংলাভাষী ও ইসলাম অনুসারীদের থেকেও। ইসলামের কথা বললাম এ জন্যে যে, এদেশের ৮৫ শতাংশ লোকই মুসলিম। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই বাংলাদেশী জাতীয়তার উপাদান। এগুলো বাকল নয়, আসল সারাংশ। আর এই সারাংশই আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তার আসল শক্তি, ভিত্তি ও বুনিয়াদ।"

এই জাতীয়তাবাদে যুক্ত হয়েছিল ধর্ম আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। মুক্তিযুদ্ধের এবং সংবিধানের মূলনীতির একটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। জিয়াউর রহমান প্রচারিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের মানুষকে স্পষ্টত দু'ভাগ করেছিল। এই জাতীয়তাবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রচলিত হলো এমন কিছু শব্দ যা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শ্লোগানের বিপরীত যেমন, 'জয় বাংলার' পরিবর্তে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।' 'আমার সোনার বাংলা'র বিপরীতে 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ।'

জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি ক্ষমতায় এসে ঐ পরিচিতিটিকেই বড় করে তুললেন এবং পূর্ববর্তী রাজনৈতিক নেতাদের থেকে যে তিনি সৎ, প্রচারের মাধ্যমে তাই তুলে ধরলেন। এর আড়ালে জিয়াউর রহমান সিভিল সমাজের যে ক্ষতি করে গেলেন তা গেলো চোখ এড়িয়ে।

স্বল্পবাক, ধীরস্থির, ছোটখাটো, 'মুক্তিযোদ্ধা' জেনারেল জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় এলেন তখন মানুষ খানিকটা আশার আলো দেখেছিল। শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের মর্মান্তিক পরিণতি, মোশতাকের বিশ্বাসঘাতকতা ও মেজরদের তাণ্ডব, দুর্বলচিত্ত বিচারপতি সায়েমের শাসন—এসব কিছুর পর অপেক্ষাকৃত তরুণ জেনারেলকে মনে হয়েছিল স্থিতিশীলতার প্রতীক। মুজিব আমলের সামগ্রিক পরিস্থিতির তুলনায় মনস্তাত্ত্বিকভাবে সবাই জিয়াউর রহমানের ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। তার ওপর তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। সবাই বিশ্বাস করেছিলেন তাঁকে।

জিয়াউর রহমানের নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা ছিল ক্ষমতা দখল ও পাকাপোক্ত করার। অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকার নিয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, জিয়া কখনো নিজের গলা বাড়িয়ে দেন নি; সব সময় অন্যের কাঁধে ভর করে এগিয়েছেন এবং ঠাণ্ডা মাথায়। উদাহরণ, তাঁর বন্ধু ও উদ্ধারকারী এবং

সহমুক্তিযোদ্ধা পঙ্গু কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো। ম্যাসকারেনহাস লিখেছেন, জিয়া ছিলেন "Vengeful, savage, authoritarian ... No General in the history of the sub-continent massacred his own troops the way that General Zia did after the aborted coup of 2nd October 1977." এক ব্যক্তি যিনি জিয়ার নৃশংসতা দেখেছেন স্বচক্ষে, বলেছিলেন ম্যাসকারেনহাসকে যে, জিয়া, "একহাতে খুন করে একই সঙ্গে অন্যহাতে খেতে পারেন।" কিন্তু জিয়া সব সময় বলেছেন—"I did not capture power. I was made to assume power."

ক্ষমতা করায়ত্তের জন্য নীরবে জিয়া একদিকে যা করার করেছেন, অন্যদিকে, নিজেকে কেন্দ্র করে গণমাধ্যমে বিপুল প্রচার চালিয়েছেন। এ বক্তব্যই তিনি বারবার তুলে ধরতে চেয়েছেন যে, তিনি বা তার দল, শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ থেকে অধিক গণতন্ত্রী। কিন্তু, অচিরেই সমাজ সচেতন অংশের কাছে এ কারচুপি ধরা পড়ে। জিয়ার এককালীন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ওসমানী বলেছিলেন, "প্রেসিডেন্টের হাতে সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ তাঁকে একনায়ক করে দিচ্ছে।" এমনকি খোন্দকার মোশতাকের মতো ব্যক্তিও মন্তব্য করেন, "জিয়াউর রহমানের গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্রের থেকেও খারাপ। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি শাসনতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু জিন্দাবাদ ধ্বনি একনায়কের এই ভূমিকাকে আড়াল করতে পারবে না।"

ক্ষমতায় থাকার জন্য তিনি সামরিকায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্যদিকে বারবার নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সিভিল সমাজের ওপর কুঠারাঘাত করেছেন। কিছু আদর্শের ভিত্তিতে, রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল যে বাংলাদেশ তিনি মুক্তিযোদ্ধার ইমেজ ব্যবহার করে সে-সব আদর্শকে উৎপাটিত করতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর অবদানকে এভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে—

১. সমাজে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং বিপক্ষদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা এবং শেষোক্ত পক্ষকে শক্তিশালী করা।
২. জাতীয়তার প্রশ্নে সম্পূর্ণ জাতিকে দু'টি বিবদমান পক্ষে রূপান্তরিত করা।
৩. রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রধান মেরুকরণ আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ বিরোধিতা এবং শেষোক্ত রাজনীতির ধারাকে শক্তিশালী করা।
৪. সিভিল সমাজের বিপরীতে সামরিক সমাজকে শক্তিশালী ও আধিপত্যকারী শক্তি হিসেবে বিকশিত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা।

জিয়ার এক সময়কার সহকর্মী এয়ার ভাইস মার্শাল মাহমুদ মন্তব্য করেছেন—"জিয়া সবাইকে ও সবকিছুকে—সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে দূষিত করেছে। জাতির অবমাননার ক্ষেত্রে শেখ মুজিব থেকে তাঁর অবদান বেশি।"

সামরিকায়ন নিয়ে জিয়াউর রহমানের মনে দোদুল্যমানতা থাকলেও জেনারেল এরশাদের মনে তা ছিল না। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ পদদলিত করে স্বীয় শাসন নিরঙ্কুশ রাখতে তিনি যা যা করার তাই করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান ফসল যা

বাঙালি জাতির সনদ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল তিনি তার ওপরই বারবার আক্রমণ চালিয়েছেন। একের-পর-এক এনেছেন সংশোধনী।

সিভিল সমাজের বিরুদ্ধে এরশাদের প্রতিশোধমূলক সবচেয়ে ক্ষতিকর সংশোধনী ছিল অষ্টম সংশোধনী। এর দু'টি দিক ছিল। একটি হলো হাইকোর্ট বিকেন্দ্রায়নের যে প্রশাসনিক নীতি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, ১০০ অনুচ্ছেদে ৫টি নতুন দফা সংযোজন করে তা সংবিধানের অন্তর্গত করা। অন্যদিক হলো—রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ইসলামকে ঘোষণা করা। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন। ঢাকার বাইরের মানুষকে বোঝানো যে, ঢাকাতেই সবকিছু ধরে রাখার ইচ্ছে সরকারের নেই। সরকার ঢাকার বাইরে সরকারকে নিয়ে যেতে চায়। দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য ছিল ইসলামপন্থি দলগুলোকে বোঝানো যে, সরকারি মদদ তারা সবসময় পাবে আর অজ্ঞ জনসাধারণকে বোঝানো যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশে ইসলামকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে জিয়াউর রহমান যে কাজ শুরু করেছিলেন সামরিকবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে জেনারেল এরশাদ এই সংশোধনীর মাধ্যমে তা সম্পন্ন করতে চাইলেন।

অষ্টম সংশোধনী পেশ করা হয়েছিল অবৈধ সংসদ হিসেবে পরিচিত ১৯৮৮ সালের সংসদে। এই সংশোধনী পাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

আওয়ামী লীগ ও বামপন্থিরা সংশোধনীর দ্বিতীয় দিকটি নিয়ে সোচ্চার ছিল। বুদ্ধিজীবীরা মামলা করেছিলেন হাইকোর্টে যার নিষ্পত্তি এখনো হয় নি। মাধ্যমিক কারকরা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন প্রথম দিকটি নিয়ে। তারাও মামলা করেন হাইকোর্টে। হরতাল পালন করা হয়। রাজপথে প্রতিবাদ হতে থাকে। শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন—"ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানি করা হয়েছে। আমরা যখনই সুযোগ পাবো ৮ম সংশোধনী বাতিল করে দেব। মূলত বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কমিটি ঘোষণা করে, ৮ম সংশোধনী এরশাদের "গণবিরোধী কার্যক্রমের সর্বশেষ পদক্ষেপ।"

অষ্টম সংশোধনীর বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, একমাস শুনানীর পর সুপ্রীমকোর্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রায় প্রদান করে। বিচারকগণ "ঢাকায় হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চসহ বিভিন্ন স্থানে হাইকোর্টের ৬টি বেঞ্চ স্থাপনের বিধান সম্বলিত জাতীয় সংসদে পাসকৃত ৮ম সংশোধনী" অবৈধ ঘোষণা করেন তবে সংশোধনীর অপর বড় অংশ "রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করার বিষয়টি এই আদেশের অংশ নয়। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল থাকবে।" এই রায় এরশাদবিরোধী আন্দোলনকে শক্তি যোগায়। কারণ সামরিক প্রতিনিধির কোনো কার্যক্রমকে সিভিল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আদালতে নাকচ হওয়ার ঘটনা এর আগে ঘটে নি।

জুলাই ১৯৮৯ সালে ভোটারবিহীন সংসদে পেশ করা হয় নবম সংশোধনী। এই সংশোধনীর মূল কথা ছিল—একাধিক্রমে কেউ দু'বারের বেশি রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। উপরাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ ভোটেই নির্বাচিত হবেন। যদিও আগের তুলনায় এ সংশোধনী তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু অনুমান করা হচ্ছিল—"বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ভিত্তিকে স্থায়ী করার জন্য এই সংশোধনীর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। ... শুধু তাই নয়, আপন জনগণ

ও বিশ্বের চোখে দেশ শাসন করার প্রকৃত বৈধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ বর্তমান সরকার তার স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার জন্য এই সংশোধনী পাস করিয়েছে।"

নবম সংশোধনীর বিরুদ্ধে আইনজীবীরা ছিলেন সবচেয়ে সোচ্চার। এ বিল সম্পর্কে ড. কামাল হোসেন বলেছিলেন, "এ বিল কেবল প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের জন্যই অবমাননাকর নয়, উপরন্তু তা জনগণ ও গণতন্ত্রের পক্ষেও অবমাননাকর।" আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক শামসুল হুদা চৌধুরী বলেন, "এই সরকার নিজেই অবৈধ। এই সরকারের আমলে সকল সংশোধনীই অবৈধ"।

এভাবে সামরিকবাহিনীর প্রতিনিধি জেনারেল এরশাদ মুক্তিযুদ্ধ ও সিভিল সমাজের মূল সনদ সংবিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে সংবিধানে প্রথম পরিবর্তন আনা হয়। তারপর থেকে সংবিধানে এত সংশোধন আনা হয়েছে যে, মূল সংবিধান এখন গবেষণার বিষয় এবং সংবিধানে জিয়া ও এরশাদ আমলে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছিল তা গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে নয়। উদাহরণস্বরূপ আবারও উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৭৫ সালের ২নং আইনের ২ ধারা বলে "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে। ..." শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হয়েছে। বা সংবিধানের ৫৫/১ ধারা যেখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি কর্ম পালন করবেন। এ ধারা কখনো মানা হয় নি।

এরশাদের আমলে সংবিধানে এত সংশোধনী আনা হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষ দূরে থাকুক এলিটদের অনেকেও এ সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এসব সংশোধন, সাংবিধানিকভাবে (তাঁর মনে হয়েছে) তাঁর নিরঙ্কুশ শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে অন্যদিকে সংবিধানের মূল চরিত্র যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিধৃত তা বিনষ্ট করেছে। একই সঙ্গে অতি সাংবিধানিক কিছু কার্যক্রমও হাতে নিয়েছিলেন যা তিনি চেয়েছিলেন কনভেনশনে পরিণত করতে।

সামরিকবাহিনীর প্রতিনিধি জেনারেল এরশাদ চেয়েছিলেন সংবিধানের বিকৃতায়ন। সংবিধানকে সামনে রেখে অতি সাংবিধানিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হয়েছে সংবিধানকে। এর উদ্দেশ্য ছিল একটিই—সাংবিধানিক সমস্ত ইন্সটিটিউশনকে হেয় প্রতিপন্ন করা। কিছু কিছু বিষয়কে কনভেনশনে পরিণত করা। এভাবে সামরিক সংস্কৃতি বিকাশ করা, সামরিকায়ন সম্পন্ন করা।

এখানে উল্লেখ্য যে, এরশাদ যখনই এ ধরনের কোনো কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন তখনই সিভিল সমাজ এর প্রতিরোধ করেছে, বিশেষ করে মাধ্যমিক-কারকদের পেশাজীবী অংশ। আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে আইনজীবীরা। সিভিল সমাজের পক্ষে আইনজীবীদের ধারাবাহিক আন্দোলনের এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁরা রাজপথে প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকদের সমর্থন জানিয়েছেন। অন্যদিকে, আইনের মাধ্যমেই অতি সাংবিধানিক কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। যখনই কেউ, অতি সাংবিধানিক কোনো কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করতে চেয়েছেন, বিনা খরচায় সম্মিলিতভাবে তাঁরা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৯৮৬ সালে রাজাকার হিসেবে পরিচিত বিচারপতি নূরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি করা হলে হাইকোর্টে রীট করা হয়। গণআন্দোলনের সময় ঢাকায় ১৪৪ ধারা

জারি করা হলে সংবিধানবিরোধী বলে মামলার প্রস্তুতি নিলে সরকার তা প্রত্যাহার করে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার আদেশ দিলে তার বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়। সিভিল সমাজের প্রতিনিধিদের এ ধরনের কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে সামরিক সমাজের বিরুদ্ধে সিভিল সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং চলমান গণআন্দোলনকে সহায়তা করে বেগবান করে।

সংবিধানের সঙ্গে যুক্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রশ্নটি। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের মূল কথাই ছিল সিভিল সমাজ, যার অর্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা পরিচালিত হবে সংবিধানের ভিত্তিতে। বলা যেতে পারে, সামরিক শাসন ছিল সংবিধান বা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত। যে পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়টুকুকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধীকাল বললেও ভুল হবে না।

সামরিক সমাজের প্রতিনিধিরা প্রথম থেকে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের অবস্থান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুদৃঢ় করেছে। জিয়াউর রহমান এ ধারা শুরু করেছিলেন আর এরশাদ তা করছিলেন সংহত। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত দেখা গেছে যাদের বিচার হওয়ার কথা ছিল যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তারা মর্যাদা পেয়েছেন দেশের কর্ণধার হিসেবে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আপামর জনসাধারণ অংশ নিয়েছিলেন। ক্ষমতা যারা দখল করেছিলেন তারা একথা জানতেন, তাই প্রকাশ্যে তারা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিনষ্ট করতে চেয়েছেন। এর দু'টি দিক ছিল—এক দিক হচ্ছে, প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা এবং তা যে সামরিকবাহিনীই করেছে এবং সে জন্যই সফল হয়েছে এ কথা প্রকাশ করা। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তারা এভাবেই সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে চেয়েছে। অন্যদিকে, মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকচিহ্নগুলোকে বিনষ্ট করতে চেয়েছে। এবং প্রগতিবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী দলগুলোকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছে। যেমন, জামায়াত ইসলামী। কারণ, সামরিক শাসনও মূলত প্রগতিবিরোধী ও রক্ষণশীল।

সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃতায়নকেই আমরা উল্লেখ করতে চাই মুক্তিযুদ্ধের সামরিকায়ন হিসেবে। কীভাবে এরশাদ এ কাজটি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন তার দু'একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

১. ১৯৭২ সালের জুন মাসে সাভারে জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ মূল নকশা অনুযায়ী শুরু হয়। ১৯৮২ সালে এরশাদ ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করলেন, স্মৃতিসৌধের কাজ তিনি সম্পন্ন করবেন। করেছেনও। কিন্তু "ধর্মীয়করণের ধুয়া তুলে এর ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে। দেশকে ইসলামীকরণের অজুহাত ও ধর্মীয়করণের ধুয়া তুলে জাতীয় স্মৃতিসৌধের মূল নকশা থেকে অনির্বাণ শিখা" বাদ দেয়া হয় কিন্তু ক্যান্টনমেন্টগুলোতে তা আছে। মূল নকশা থেকে বাদ দেয়া হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাদুঘর, ম্যুরাল ও পাঠাগার।
২. জিয়ার আমলে চাপে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সংগ্রহ ও প্রকাশনার একটি প্রকল্প নেয়া হয়। কিন্তু কখনই প্রকল্প পরিচালনার পথ মসৃণ করা হয় নি। এরশাদ আমলে সে প্রকল্প বন্ধ করে দেয়া হয় এবং মূল্যবান দলিলপত্র স্থানান্তরিত করা হয় একটি

গ্যারেজে। তারপর তা নিয়ে প্রবল প্রতিক্রিয়া হলে তা স্থানান্তরিত করা হয় জাতীয় জাদুঘরে, যার কর্মকর্তা ছিলেন এরশাদ সরকারের একজন প্রধান সমর্থক। দলিল স্থানান্তর করা যেত জাতীয় অভিলেখাগারে যা সাধারণ মানুষের গবেষণার জন্য উন্মুক্ত।

৩. প্রচারমাধ্যমে এরশাদ সবসময় উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যে, মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছিল সামরিকবাহিনীর কারণে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে তিনি বিভক্ত করে দিয়েছিলেন এবং একটি অংশ তাকে উপাধি দিয়েছিল 'রণবীর'। এই অংশটি সবসময় মুখর ছিল এরশাদ-বন্দনায়। তাঁর আমলে কিস্তিতে কিস্তিতে সংশোধিত ও 'প্রকৃত' মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এভাবে, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানের আসনও তিনি টলিয়ে দিয়েছিলেন, অন্য দিকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন মুক্তি যুদ্ধ না-করেও তিনি মুক্তিযোদ্ধা।

৪. এরশাদ আমলে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের ওপর গান, কবিতা প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে মুক্তিযুদ্ধের গান শীর্ষক ক্যাসেট ও রেকর্ড বের হলে পরিচালককে সংস্থা থেকে তৎক্ষণাৎ বদলি করা হয়েছিল।

সিভিল সমাজ যে এর প্রতিবাদ করেনি তা নয়। বিবৃতি, মিছিল সবই হয়েছে, কিন্তু প্রতিবাদের অন্য একটি ধারাও লক্ষণীয় এ সময়। এরশাদ যত মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন তত মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বইপত্রও প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র প্রকাশিত "একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা : কে কোথায়"। ১৯৮৭ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় বলা হয়, "সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পনেরো খণ্ডে সমাপ্ত স্বাধীনতাযুদ্ধের যে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় মূলত দালালদের সুকৌশলে চেপে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই তা প্রণীত হয়েছে। দালালদের কার্যকলাপ প্রকাশের জন্য সবচেয়ে উপযোগী দলিলগুলোই এতে মুদ্রিত হয় নি; তদুপরি যে-সমস্ত দলিল মুখরক্ষার জন্য ছাপা হয়েছে তাতেও বিকৃতি ঘটানো হয়েছে দালালদের পরিচয় গোপন রাখার মাধ্যমে। আমরা কেউই আমাদের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতাকারী, গণহত্যার নায়ক, দালালদের সবাইকে চিনি না বা তাদের তৎকালীন ঘৃণ্য কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত নই, স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে কীভাবে দালালদের রক্ষার জন্য সত্যের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থেই দেয়া হয়েছে।"

মুক্তিযুদ্ধের বইয়ের প্রসঙ্গ যখন উঠলই তখন এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। গত কুড়ি বছরে রাষ্ট্রীয় পোষকতায় এ বিষয়ে যে অজস্র বইপত্র পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল তা হয় নি। হ্যাঁ, রাষ্ট্রীয় পোষকতায় মুক্তিযুদ্ধের দলিল প্রকাশিত হয়েছে এবং একটি আলোকচিত্র সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। সে সংকলনে অবশ্য মুক্তিযুদ্ধ থেকে এরশাদ বেশি কীর্তিত হয়েছেন। হ্যাঁ, এর কিছু দায়দায়িত্ব যে আমাদের ওপর বর্তায় না তা নয়। আমরাও এ ব্যর্থতার জন্য কমবেশি দায়ী। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বই গুরুত্বপূর্ণ

স্বাধীনতাযুদ্ধের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য। এটি হয় নি দেখেই বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছে গোলাম আজম ও শেখ মুজিবুর রহমান হয়ত তেমন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। হয়ত গণহত্যা বিষয়টিও তার কাছে সুস্পষ্ট নয়। পরিষ্কার নয় হয়ত স্বাধীনতা বোধও, কারণ, জন্ম থেকেই সে স্বাধীন দেশের নাগরিক, কিন্তু এর জন্য পূর্ববর্তী প্রজন্মকে যে কী মূল্য দিতে হয়েছে তা সে জানে না। যদি তাকে তা জানানো হয় তাহলে স্বাধীনতা সম্পর্কে তার মমত্ববোধ অন্য মাত্রা পাবে।

এ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ-সংক্রান্ত যেসব বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষের অনুপস্থিতি। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় পোষকতায় প্রকাশিত প্রকাশনার কথা উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যেসব বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে সে-সব বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন বিষয়টি কোনো না-কোনোভাবে এসেছে। রণাঙ্গন সংক্রান্ত অধিকাংশ বইয়ের রচয়িতা তাঁরা যাঁরা যুক্ত ছিলেন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে। এটি অবশ্য কোনো দোষের কথা নয়। কিন্তু তাঁদের রচিত বইতে সামরিকবাহিনীই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সচেতন অথবা অসচেতনভাবে। ফলে, একটি ধারণা গড়ে ওঠা অসম্ভব নয় যে, সামরিকবাহিনীর যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের জন্যই সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতা। ১৯৭৫ সাল এবং বিশেষ করে ১৯৮২ সালের পর থেকে এ বিষয়ে সচেতনভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে, যাঁরা সচেতন এ বিষয়ে তাঁরা সযত্নে বিষয়টি পরিহার করেছেন, ফলে, তাঁদের বই অন্যমাত্রা পেয়েছে। যেমন মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম। তাঁর 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ের' ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"সশস্ত্র তৎপরতার অধিকতর বর্ণনা যেন জনগণের রাজনৈতিক বোধ ও মুখ্য ভূমিকা থেকে আমাদের দৃষ্টিকে সরিয়ে না দেয়। কেবলমাত্র সামরিক ও গেরিলা তৎপরতার আলোকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্মকথা অনুধাবন সম্ভব নয়। বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ কালব্যাপী রাজনৈতিক সংগ্রামই হলো স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।--স্বাধীনতাযুদ্ধ কোনো সামরিক অভিযান নয়—স্বাধীনতা যুদ্ধ জনগণের। জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনো বিজয় সূচিত হয় না। জনগণ ব্যতীত কোনো স্বাধীনতা আসতে পারে না।"

দুঃখের বিষয়, আমরা তা মনে রাখি না। আর এ কারণে, কুড়ি বছর পর রাজনৈতিক কর্মী আকতারুজ্জামান মণ্ডল তাঁর '১৯৭১: উত্তর রণাঙ্গনে বিজয়' গ্রন্থে দুঃখ করে লিখেছেন—"চরম পরিহাসের ব্যাপার এই যে, ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যেসব ইতিহাস লেখা হয়েছে এবং ৭৫ সালের পর থেকে যেসব প্রচারণা চলেছে, কেবল ইউনিফরম পরিহিতি সাথি বন্ধুরাই যেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রধান কৃতিত্বের দাবিদার। দামাল ছেলেদের রচিত ইতিহাসকে উপেক্ষা করে বাস্তব সত্যকেই পাশ কেটে যাওয়া হচ্ছে।"

সামগ্রিকভাবে, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংরক্ষণ বা মুক্তিযোদ্ধাদের পদক প্রাপ্তির বিষয়টি নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা যাক। প্রথমেই ধরি, জাতীয় স্মৃতিসৌধের কথা, এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। জেনারেল এরশাদের আমলে তা সম্পন্ন হয় তা আগেই উল্লেখ করেছি। মূল পরিকল্পনায় তিনি বিচ্যুতি ঘটিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনের বিষয়টি এমনভাবে প্রচার করা হয়েছিল যে, মুক্তিযুদ্ধের রক্ষাকর্তা

সামরিক সরকারই। জেনারেল জিয়া ও এরশাদ প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের কথা বললেও কিন্তু যেখানে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল এবং যা অবস্থিত ঢাকার কেন্দ্রস্থলে সেখানে কিন্তু কোনো বিজয় স্মারক নির্মাণে তাঁরা সম্মত হন নি। অন্যদিকে প্রধান প্রধান ক্যান্টনমেন্টে অনির্বাণ শিখা, স্মারক চিহ্ন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সংগ্রহশালাও স্থাপিত হয়েছে। স্বাধীনতা জাদুঘর হয় নি যে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সামরিক জাদুঘর হয়েছে এবং বিজয় সরণীর পাশে শহরের সবচেয়ে সুন্দর জায়গাটুকু এ জাদুঘরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এর নকশাও অনুমোদিত হয়েছে। এর কারণ একটিই, সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক চিহ্নগুলো থাকলে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মনে সব সময় অমর হয়ে থাকবে মুক্তিযুদ্ধের গাথা। এবং এ চেতনা বহমান থাকলে অসম্ভব হয়ে উঠবে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কার্যকলাপ।

এরপর ধরা যাক মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতির প্রশ্নটি। আসলে অন্যদিক থেকে বিচার করলে, স্বীকৃতির প্রশ্ন তোলার অর্থই হচ্ছে তাদের অপমান করা। কিন্তু প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতির প্রশ্নটি তোলা হয়েছে, নিবন্ধের শুরুতে তার ইঙ্গিত দিয়েছি। মুজিব আমলেই মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট দেওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টিকে একেবারে অ্যাবসার্ড পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হলো বারবার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এতবার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন করা হলো, রাজাকারদের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হলো না কেন? সে তালিকা করা ছিল সহজ ও প্রয়োজনীয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের যে-সব পদক দেয়া হয়েছিল এবার তার একটা খতিয়ান নেয়া যাক। বীরশ্রেষ্ঠ পেয়েছেন সাত জন। ঐ সাত জনই সামরিকবাহিনীর। বীরউত্তম পেয়েছেন আটষট্টি জন। এর মধ্যে বাষট্টি জন সামরিকবাহিনীর। বীরবিক্রম পেয়েছেন একশ পঁচাত্তর জন, এর মধ্যে একশ উনচল্লিশ জন সামরিকবাহিনীর। বীরপ্রতীক পেয়েছেন চারশ ছাব্বিশ জন। তার মধ্যে মাত্র একশ ছত্রিশ জন সাধারণ নাগরিক। মোট ৬৭৬টি পদকের মধ্যে ১৭৬ টি পেয়েছেন অসামরিক মুক্তিযোদ্ধারা, বাকি ৫০০ পেয়েছেন সামরিকবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা। সামরিকবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমি খাটো করে দেখছি এ কথা যদি কেউ মনে করেন তা হলে ভুল হবে। আমি শুধু কিছু তথ্য মাত্র উল্লেখ করছি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এ পদক দেয়া হয়েছিল ১৯৭৩ সালে বেসামরিক সরকারের আমলে। আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু পদক তালিকা তৈরি করেছিলেন কারা? বেসামরিক প্রতিনিধি, আমলাবৃন্দ না সামরিক আমলাবৃন্দ? এর অর্থ, শুরু থেকেই এ ধরনের একটা অস্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল। এ প্রসঙ্গে বেলাল মোহাম্মদের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক স্মৃতিকথার কথা মনে এল। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, একবার দুই সামরিক অফিসারের কথোপকথন তিনি শুনেছিলেন। তাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল মুক্তিযুদ্ধের পর কীভাবে সামরিক আধিপত্য বিস্তার করা যায়! সেই দু'জন অফিসারের একজন বি. এন. পি. সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি জেনারেল ওসমানীকে বলা হতো সর্বাধিনায়ক। কিন্তু কেন? রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব যাঁর নামে যুদ্ধ

হয়েছিল তাহলে তিনি কী ছিলেন? বা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বা তাজউদ্দীন আহমদ? সেই সময় জেনারেল ওসমানীর নামে বিমানবন্দর, উদ্যান, কলেজ অনেক কিছুর নামকরণ হয়েছে জাতীয়ভাবে, কেউ কোনো কথা বলেন নি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নামে কোনো কিছুর নামকরণ হলেই সবাই প্রতিবাদ করেন। কেন? নিহত চার নেতার নামে কিছুদিন আগে ঢাকা শহরে চারটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে তাও অনেক দেন-দরবারের পরে। তাজউদ্দীন, যিনি শক্ত হাতে প্রবাসী সরকারের হাল না ধরলে যুদ্ধ হতো আরো প্রলম্বিত তাঁর নামে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কোনো বড় কিছুর, নিদেনপক্ষে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের নামকরণও করা হয় নি। এসব অবশ্যই আমাদের মানসিক দীনতার পরিচায়ক। বাংলাদেশে শহর এলাকায় ক'টি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে শহীদদের নামে। কিন্তু, প্রতিটি সেনানিবাসের রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে শহীদের নামে। অনেকে প্রশ্ন করবেন, বেসামরিক কর্তারা কেন তা করলেন না? বলে রাখা ভালো, ঐ হলো সময়টা বাংলাদেশ ছিল প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সামরিক শাসনের অধীন। এবং পৌর কর্পোরেশনগুলোর প্রধান প্রায় ক্ষেত্রেই ছিলেন সামরিক অধিকর্তারা।

১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত, জাতীয় প্রচারমাধ্যমে পারিবারিক ও গোষ্ঠীস্বার্থে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। এসব প্রচারমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ে সত্যিকার ইতিহাস এমনকি বিজয়দিবসের চিত্রও তুলে ধরা হয় নি।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাবিরোধীদের পুনর্বাসনের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। গত একদশকে তাদের একটি শক্তিতে পরিণত করা হয়েছে যারা অনেকাংশে নির্ভরশীল সামরিক শাসকদের ওপর। জাতীয় আল-বদর, কথিত মওলানা আবদুল মান্নান একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বাসভবন ভেঙে নির্মাণ করেছেন সুউচ্চ ইনকিলাব ভবন যা আল-বদর/রাজাকারদের স্বাধীনতাত্তোর স্বীকৃতির প্রতীক। ইনকিলাব অর্থ বিপ্লব। আবদুল মান্নান এ নাম ব্যবহারের পর এর অর্থও বদলে গেছে। এভাবে প্রতিটি পর্যায়ে বাংলাদেশবিরোধীদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

এ সব কিছুর উদ্দেশ্য সেই একটিই—মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিলুপ্তিকরণ কারণ তা সামরিক শাসনের বিপরীত। যার ফলে, বাংলাদেশে গত একদশক প্রগতিবিরোধী শাসন কায়েম করা সম্ভব হয়েছিল এবং এর জন্য আমরা সবাই, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত কমবেশি দায়ী। প্রায় সময়ই আমরা এসব ক্ষেত্রে নিশ্চুপ থেকেছি, আপস করেছি। কারণ, কমবেশি আমরা সবাই হয়ত শাসকের কাছ থেকে এর বিনিময়ে সুবিধা নিয়েছি।

কিন্তু সাধারণ মানুষ? মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থে তারাই করেছিলেন এবং এ যুদ্ধে মানসিক ও সম্পদগতভাবে তারাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। সম্প্রতি, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে, আসাদ চৌধুরীর সম্পাদনায় *'যাঁদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ'* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পাঁচশো জনের জীবনকাহিনী সংকলিত হয়েছে। এই জীবনকাহিনীগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এঁদের অধিকাংশই সাধারণ মানুষ যাঁদের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক ছিল নিবিড়। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট সংকলিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে মোট ৮৫ হাজার জন প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, তার মধ্যে ৫১৭৭০০ জন ছিলেন বেসামরিক এবং বেশির-ভাগই

ছিলেন কৃষক পরিবারের। [সাইয়িদ আতীকুল্লাহর রিপোর্ট : দৈনিক সংবাদ] এসব নীরব মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশ যুদ্ধশেষে আবার ফিরে গেছেন নিজ নিজ কাজে।]

১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে আবার তাঁরা ফিরে এসেছিলেন রাজপথে। ডিসেম্বরের চার তারিখে ঢাকা শহরে আমরা লাখো মানুষের ঢল দেখেছি। মিছিলে ছিল বাংলাদেশের পতাকা। ছাত্র, মধ্যবিত্ত, সাধারণ মানুষ আবার মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন বিএনপি বা আওয়ামী লীগ নয়, এ জয় মানুষের এবং মানুষ মুক্তিযুদ্ধের একটি ফসল নির্ভেজাল গণতন্ত্র চান এবং এ বিজয় বাংলাদেশের আরেক বিজয়। সামরিকায়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এভাবে আবার সাধারণ মানুষ ফিরিয়ে এনেছেন, মিছিলে মিছিলে পতাকা বহন করে।*

১৯৯৯

---

* এ প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। বর্তমানে এর পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায় ও আমার লেখা 'বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম' (১৯৯৫) গ্রন্থ থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়েছে।

গোলাম আজম গং মানহানির মামলা করেছে সাংবাদিক কলামিষ্ট আবেদ খান, ইমপ্রেস টেলিফিল্ম, টিভির কর্মকর্তাসহ উনিশ জনের বিরুদ্ধে। কারণ, একাত্তরের রাজাকার আল-বদররা কী করেছিল তা নিয়ে আবেদ খান একটি প্রতিবেদন নির্মাণ করেছিলেন ইমপ্রেস টেলিফিল্মের প্রযোজনায়। টেলিভিশন তা প্রচার করে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে। প্রতিবেদনে তেমন অস্বাভাবিক বা অসত্য কিছু ছিল না। থাকলে, সে-সময়ই প্রতিক্রিয়া হত। কিন্তু প্রতিক্রিয়া ঠিকই হয়েছিল কিছু রাজাকারের মনে। তারই প্রতিফলন দেখি কয়েকদিন আগে দায়েরকৃত এই মামলায়।

গোলাম আজমরা সব সময়ই গোলমাল করবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ১৯৭১ সাল থেকেই তারা তা করে আসছে। তবে, সব বাদ দিয়ে মানহানির মামলা করায় সবাই খানিকটা বিস্মিত হয়েছে। হায়! রাজাকার আল-বদরদের মান, তার আবার হানি!

গোলাম আজম গংয়ের মামলা করার কারণ কী?

১. "জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের আইনসিদ্ধ একটি রাজনৈতিক দল।"

২. "জামায়াত ইসলামী ১৯৭১ সালে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল সেটা ছিল তাদের রাজনৈতিক অবস্থান।"

৩. "কিন্তু কোনো আধাসামরিকবাহিনীর কার্যকলাপের সঙ্গে জামায়াত কোনোভাবে জড়িত ছিল না।"

৪. "মামলার বাদীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের বের করা তথ্য, সাক্ষ্য এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষ্য প্রভৃতি অস্বীকার করে বলেছেন যে, উক্ত বিষয় তদন্ত করার জন্যে এই গণতদন্ত কমিশনের কোনো আইনানুগ কর্তৃত্ব নেই এবং বাদীরা বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িত নয়।" [জনকণ্ঠ ২.৫.৯৯]

বাদীদের মধ্যে বাংলাদেশে রাজাকার ও আল-বদর হিসেবে পরিচিত সবাই আছে। আছে রাজাকার-শ্রেষ্ঠ গো. আজম, তৎকালীন আল-বদর নেতা মতিউর রহমান নিজামী, শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত ও পরে খালাসপ্রাপ্ত খালেক মজুমদারসহ ১০ জন। এককথায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরা। তাদের মানহানির মূল্য ১৭ কোটি টাকা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, গত ত্রিশ বছর এদেরকে সবাই আল-বদর রাজাকার আখ্যা দিয়ে আসছে। দু'টি গণতদন্ত কমিশনের অধিবেশন হয়েছে লক্ষাধিক লোকের সামনে, এরা কিছু বলেনি। এখন বলছে কেন? নিজামী কিছুদিন আগে এক সভায় বলেছেন, তারা আগের মতো নেই। আগে কেমন ছিলেন? পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন 'ডাল মে কুছ কালা' ছিল। বাংলা ভাষায় জামায়াতের দান আছে একটি সেটি হলো, বাংলা ভাষায় দু'টি

শব্দ চালু করা—আল-বদর ও রাজাকার। সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের বলা হয় রাজাকার। যারা মানুষ হত্যায় ছিল নিবেদিত তারা আল-বদর। এতদিন এর পর তারা বুঝল তাদের মানহানি হয়েছে। কারণ, দু'টি। একটি হলো, সবাই তাদের রাজাকার, আল-বদর বলে কিন্তু মানুষ বলে না। মানুষ উপাধিটি তাদের চাই।

তারা কি জানে না ১৯৭১ সালে তাদের হাত ছিল রক্তরঞ্জিত? জানে। কিন্তু, এও জানে বাস্তবের বা সাধারণ মানুষের লজিক আর আদালতের লজিক এক নয়। আদালত আমরা মান্য করি বটে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের ও আমাদের লজিক এক নয়। হয়ত আমরা কম বুঝি। যেমন, বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বিরোধিতাকারী ছিল গো. আজম। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত হত্যা, ধর্ষণ ও লুটের সঙ্গে। সে-জন্যে নৈতিক কারণে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কেউ বাংলাদেশের নাগরিক থাকতে পারে না। এ বাস্তবতার কারণে গো. আযমের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল। আদালত রায় দিয়েছে, গোলাম আজম বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা বলি, বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখল অবৈধ। সামরিক আইন জংলি আইন, এর বৈধতা নেই। পত্রিকায় দেখেছি, আদালত সামরিক আইনের বৈধতা স্বীকার করেছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে গোলাম আজমদের হয়ত ধারণা, বাস্তবে কী ঘটেছে তা বড় ব্যাপার নয়, আদালতে কী ঘটবে সেটিই বড় ব্যাপার এবং সেটা তো সবাই মেনে নেয়, নয় কি? আদালতে হয়ত প্রমাণিত হতে পারে গোলাম আদৌ রাজাকার নয়, রাজাকার শব্দটির অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। সে সময়কার পত্রিকায় যে লেখা হয়েছে মতিউর রহমান নিজামী আল-বদরপ্রধান বা কামরুজ্জামান আল-বদর সংগঠক তা মুদ্রণ প্রমাদ। তাহলে?

আরেকটি বিষয় ধর্তব্য। জামায়াত নেতারা আরজিতে বলছে, জামায়াত আইনসিদ্ধ দল। তারা ইঙ্গিত করতে চাচ্ছে, তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ অসিদ্ধ ছিল না এবং নেই। বাস্তব সত্যটা এই যে, সহিংস ও স্বাধীনতাবিরোধী রাজনীতির জন্যে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। জেনারেল জিয়া বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখল করে জামায়াতকে বৈধ ঘোষণা করেন নিজের পক্ষ ভারি করার জন্যে। সে কারণে দু'টি দলই পরস্পরের কাছে কৃতজ্ঞ। তাই বিএনপি ও জামায়াত অনায়াসে জোট বাঁধতে পারে। আমাদের লজিক বলে, অবৈধভাবে দলটিকে বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু এটি হচ্ছে নৈতিক স্ট্যান্ড।

আমরা সেই স্ট্যান্ড না-হয় না-ই নিলাম। আমরা বাস্তব মানি। বাস্তব হলো, সামরিক শাসকরা জামায়াতকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। কারণ, ইতিহাস বলে সামরিক শাসক ও ডানপন্থি দলগুলোর মধ্যে নৈকট্য ছিল। আরো বাস্তব হলো, বিএনপি ও জাপা জোট বেঁধেছে জামায়াতের সঙ্গে এবং আওয়ামী লীগও সময় সময় নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে জামায়াতের প্রতি। বা জামায়াতবিরোধী প্রবল ভূমিকা তারা কখনো নেয়নি। ফলে জামায়াত লাভবান হয়েছে এবং জামায়াত জানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন তারা পাবে। সে কারণেই তারা যে খুনিদের দল নয়, রাজনৈতিক দল সে-কথাটির ওপর জোর দিচ্ছে।

জামায়াত বলছে, অখণ্ড পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ছিল তাদের রাজনীতি। অর্থাৎ একেক দলের রাজনীতি একেক রকম হতে পারে। তার সঙ্গে হত্যার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু

বাস্তবটা হলো, পাকিস্তানের প্রতি অনুগত থাকা এবং না-থাকাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মৌল বিষয়। পাকিস্তান একটি আদর্শ, যে-আদর্শের বিপরীত হলো বাংলাদেশ। যারা ছিল বাংলাদেশের অনুগত তারা ছিল মুক্তিযোদ্ধা। যারা অনুগত ছিল পাকিস্তানের তারা পরিচিত হয়ে উঠেছিল রাজাকার নামে।

গণতদন্ত কমিশনের আইনানুগ কর্তৃত্ব নেই এবং তারা যে হত্যার সঙ্গে জড়িত নয়, এটা আবেদ খানদের প্রমাণ করতে হবে কেন? আদালতে আমাকে কেন প্রমাণ করতে হবে যে, বাংলাদেশে গণহত্যা হয়েছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। সংবিধানটিই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় এবং আদালত কি সংবিধানের জোরে গঠিত নয়?

এ প্রসঙ্গেই একটি প্রশ্ন করতে চাই। মানুষের জন্যে আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। মানুষের ইচ্ছায়, বাংলাদেশ মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে কোনো আইন হতে পারে না। [প্রেস কাউন্সিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটি আইন করেছে] এবং এ বিষয়ে কোন আদালতের কী কর্তৃত্ব থাকতে পারে? আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, যদি এ বিষয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে তা নজরে আনার এখতিয়ারও কি আদালতের আছে?

এ প্রশ্নে কাজী শাহেদ আহমেদ ভালো লিখেছেন—'রোববার স্বাধীন বাংলাদেশের কোর্টে আসামী হিসেবে হাজির হবে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধারা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রধান আসামী মুক্তিযুদ্ধ।' মুক্তিযুদ্ধকে আসামী করে বাংলদেশের অস্তিত্বকে প্রশ্ন করে কোনো অধিকার মানুষ কি দিয়েছে আদালতকে?

এ সময়টি জামায়াত কেন বেছে নিয়েছে আদালতে যাওয়ার? কারণ, তারা তাদের পুরোনো মিত্র এবং যে শাসকরা তাদের সহায়তা করেছিল সেই বিএনপি ও জাপার সঙ্গে জোটবদ্ধ। তারা রাজনৈতিক সম্মান প্রত্যাশী। আওয়ামী লীগ তাদের প্রতি নমনীয় ছিল এবং হয়তবা আছে। তারা এও জানে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন হিসেবে পরিচিত যাদের স্লোগান 'একাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার' সেটি গর্জে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে, রাজাকারদের বিরুদ্ধে নয় এবং একথা যে বেঠিক নয়, তার প্রমাণ এখনো তারা নিরুত্তর। প্রতিবাদ মিছিল দূরে থাকুক একটি প্রতিবাদ বিবৃতিও তারা দেয়নি। যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে গর্ব করে কাদের সিদ্দিকী আওয়ামী লীগের সমালোচনা করলেন, তার গর্জনও শোনা গেল না। শুধু যে বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতিবিদরা অপছন্দ করে তারাই প্রতিবাদ জানিয়েছেন। যেমনটি সব সময় জানান। জামায়াত জানে, রাজনীতিবিদরা তাদের সাথি হবে। রাজনীতিবিদরা এ প্রসঙ্গে দুটো বক্তব্য দেবেন। এক. আবেদ খান অনুষ্ঠান করেছেন নিজ দায়িত্বে। তাকে তো আমরা অনুষ্ঠান করতে বলিনি। সুতরাং যার যার দায়িত্ব তার তার। দুই বুদ্ধিজীবীরাই জামায়াত ও গোলাম আজম প্রসঙ্গ কাগজে লিখে লিখে তাকে প্রমিন্যান্ট করে তুলেছে। নইলে সবাই তো ভুলেই গিয়েছিল যে গো. আজম নামে একজন রাজাকার আছে। এই বুদ্ধিজীবীরা সবার জন্যে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ তাদের কারণে মসৃণভাবে কিছু করা যায় না। বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ, রাজাকার, মুক্তিযোদ্ধা প্রভৃতি প্রসঙ্গ জিইয়ে রেখেছে। বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে গো. আজমদের ক্রোধ এক কারণেই।

এ দেশে কথা ছিল জনগণ মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াবে আর রাজাকার আল-বদররা পালিয়ে বেড়াবে। কিন্তু হয়েছে উল্টোটা। এর জন্যে দায়ী অবশ্যই রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ এবং এ দায় কখনো না কখনো তাদের নিতে হবে। জামায়াত দেখেছে, রাজনীতিবিদরা তাদের তোয়াজ করে, বুদ্ধিজীবীরা নয়। দেশের মানুষও সম্মান করে না। সুতরাং মান উদ্ধারে তারা দ্বারস্থ হলো আদালতের।

তারা ১৭ কোটি টাকার মামলা করায় কি প্রমাণিত হবে যে গো. আজমরা ১৯৭১ সালে রাজাকার বা আল-বদর ছিল না? এতে কি প্রমাণ হবে যে, ১৯৭১ সালে রাজাকার আল-বদররা ধর্ষণ করেনি, লুট করেনি, হত্যা করেনি? মনে রাখা দরকার, যে একবার রাজাকার সে সব সময় রাজাকার।

আমরা দেখতে চাই মানুষ/ সমাজ কী বলে বা অন্য কোনো রায় মানুষ/ সমাজের রায়ের চেয়ে শক্তিশালী কি না? আমরা দেখতে চাই সমাজ তাদের সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে কি না? গো. আজমকে যদি সব রাজনৈতিক দল মিলে দেশের প্রেসিডেন্টও করে তাহলেও সবাই তাকে রাজাকার-ই-আজমই বলবে, প্রেসিডেন্ট আজম নয়। নিজামী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সবাইকে দমিত করে ফেলে, তবুও সবাই নিজামীকে মন্ত্রী নিজামী নয়, আল-বদর নিজামীই বলবে। জোর করে মওলানা উপাধিধারী আব্দুল মান্নান তো ইনকিলাবী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, তাই বলে কি লোকে তাকে সম্মান করে, না ডা. আলীমের কথিত হত্যাকারী হিসেবেই জানে? সাঈদী সংসদ সদস্য হয়েছে দেখে কি লোকে তাকে সম্মান করে, না রাজাকার সাঈদীই বলে? আদালত শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যার দায় থেকে খালেক মজুমদারকে মুক্তি দিয়েছে কিন্তু সমাজ কি সে রায় মেনে নিয়েছে? একমাত্র রাজাকার আদর্শে বিশ্বাসী ছাড়া কেউ কি ১৯৭১ সালের পর সন্তানের নাম গোলাম আজম বা মতিউর রহমান নিজামী রেখেছে? শুধু তাই নয়, এ রকম নাম কারো থাকলেও প্রকাশ্যে কেউ কি তা বলতে চায়? না বলার আগে ইতিউতি থাকায়।

আমরা ব্যর্থ হয়েছি রাজাকার বিচারে, দমনে। সে-আফসোস থেকে যাবে। তবে ইতিহাসের রায় থেকে তাদের মুক্তি নেই। সেটিই ইতিহাসের অমোঘ বিধান।

১৯৯২

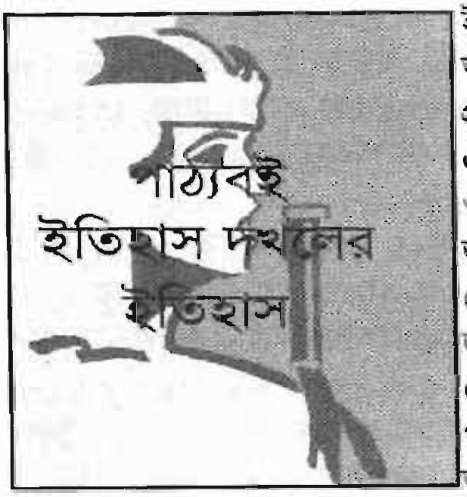

ইতিহাস মানুষের আবেগে যে অভিঘাত সৃষ্টি করে অন্য কোনো বিষয় তা করে কি না সন্দেহ। জাপানী প্রধানমন্ত্রী জাপানেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের একটি স্মৃতিসৌধে গেলে জাপানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, জাপানে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে চীন-কোরিয়ায় জাপানী সৈন্যদের গণহত্যার প্রসঙ্গ না থাকায় চীন, কোরিয়া প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে, কোরিয়ায় ২০ জন তরুণ প্রতিবাদে তাদের আঙ্গুলের ডগা কেটে ফেলে। ভারতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে পাঠ্যপুস্তক তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখার চেষ্টা করলে ভারতেও প্রতিবাদের বন্যা বয়ে যায়। সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে যদি এ ধরনের বিষয় থাকে বা এমন সব তথ্য দেওয়া হয় যা সত্য নয় তা'হলে প্রতিবাদ হওয়াটা স্বাভাবিক। সে কারণে দেখি, জোট সরকার সংশোধন করে স্কুল পর্যায়ে যেসব পাঠ্যবই প্রকাশ করেছে তা নিয়ে বাদ প্রতিবাদ শুরু হয়েছে, খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিন এর বিরুদ্ধে লেখা হচ্ছে, সমাজে সৃষ্টি হয়েছে টেনশনের।

ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সবাই। পাঠ্য হিসেবে ইতিহাসের চাহিদা আজ সবচেয়ে নিচে, ঐতিহাসিক নিদর্শন রক্ষার বিষয় এ অঞ্চলে অগ্রাধিকার পায় না, কিন্তু ইতিহাস রচনা বা নির্মাণের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায় শাসকদের কাছে। কারণ, মানুষ এ পৃথিবীতে কোনো না কোনোভাবে নিজের ছাপ রেখে যেতে চায়, ইংরেজিতে বলা যায়, আনসাঙ, আনলেমেন্টেড যেতে চায় না। আর ইতিহাসই পারে মানুষকে অমরত্ব দিতে।

দ্বিতীয় সব দেশেই কোনো না কোনো পর্যায়ে ইতিহাস নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি চলে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ, আমেরিকায় গণতন্ত্র আরো দৃঢ় হলে, জনসাধারণ সচেতন ও সোচ্চার হয়ে উঠলে, শাসকদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেলে, শাসকরা ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। যে কারণে, সে সব সমাজে এসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু, এশিয়াতে এ বিষয়টি এখনও বিদ্যমান। শাসকরা সব সময় ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়াতে চান না, ভয় পান।

ইন্দোনেশিয়ার পাঠ্যবইয়ে, সুহার্তো যে গণহত্যা চালিয়েছিলেন যাকে সুহার্তোর সহযোগী সিআইএ'র একজন কর্মকর্তা বলেছিলেন, বিশ শতকের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড, তার কোনো উল্লেখ্য নেই। বিজেপি ভারতে ক্ষমতায় আসার পর গুজরাটের পাঠ্যবইয়ে বলা হচ্ছে, আর্যরা ভারতের দেশীয়, বাকি সব বহিরাগত। অথচ, আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকে মনে করেন, আর্য বলে কোনো জাতি-ই ছিল না। মহারাষ্ট্রের এক পাঠ্যবইয়ে সরাসরি বলা হয়েছে 'ইসলাম শুধু সন্ত্রাস শেখায়।' পাকিস্তানের পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশের গণহত্যা বা অভ্যুদয় সম্পর্কে কিছুই নেই। একজন প্রশ্ন তুলেছেন, স্মৃতিতে এতোবড় শূন্যতা ও বিকৃতি—প্রশ্ন জাগে এ অঞ্চলে কি ইচ্ছাকৃতভাবে সবাই সব ভুলে যায়—নাকি অতীতের মুখোমুখি হতে চায় না? নাকি এটিই এশীয় রীতি, প্রশ্ন করেছেন এক গবেষক।[১] এ

অঞ্চলের একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমার মনে হয়েছে দু'টি অনুমানই সত্য। আমরা যখন যা প্রয়োজন ভুলে যাই, বিশেষ করে রাজনীতিবিদরা। না হলে, কোনো কোনো রাজনীতিবিদ ৩/৪ বার দল বদলের পর ভোট পেয়ে নির্বাচিতই বা হয় কী করে বা রাষ্ট্রীয় পদই বা দখল করে কী করে? এবং আমরা অতীতের বা সত্যের মুখোমুখি হতে চাই না। একটি উদাহরণ দিই। খেমেররুজ কম্বোডিয়ায় গণহত্যা চালিয়েছিল। এক গবেষক এ বিষয়ে তথ্য আহরণ শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঘাতকদের বেলায় তথ্য সংগ্রহের সময়ও এমনটি ঘটেছিল।

অন্যদিকে জার্মানির কথা উল্লেখ করা যায়। দু'টি বিশ্বযুদ্ধ এবং অগণিত মানুষ হত্যার জন্য দেশ হিসেবে তারা দায়ী। কিন্তু, জার্মানিরা অতীতের মুখোমুখি হয়েছে, নিজেদের কৃতকর্মের মূল্যায়ন করেছে, সামাজিক টেনশন হ্রাস পেয়েছে। এর জন্য অবশ্য কৃতিত্বের দাবিদার রাজনীতিবিদরা। ইউরোপের রাজনীতিবিদরা নিজ নিজ দেশের এ বিষয়গুলো পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন, সফল হয়েছেন। দেশ এগিয়েছে। ইতিহাস তাদের টেনে ধরে রাখেনি। আসলে সভ্যতার, মননের একটা পর্যায়ে না গেলে বোধহয় এ ধরনের চিন্তা করা যায় না।

নিউজ উইকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ানে পাঠ্য ইতিহাস বইয়ে স্মৃতি অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, মুছে দেওয়া নয়। হাজারি মন্তব্য করেছেন এ অঞ্চলের সরকাররা যদি ঠিক করে কী শেখাবে তাদের সন্তানদের তা'হলে 'পরিণত' জাতি হিসেবে বিকশিত হতে বেগ পেতে হবে।[২]

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সব সময় বিতর্ক হয়েছে। এই তিনটি দেশের পাঠ্যপুস্তকে একটি সাধারণ বিষয় হল সাম্প্রদায়িকতা। যে কারণে, এ অঞ্চলে শিশুরা এসব পাঠ্যপুস্তক পড়ে যখন যুবকে পরিণত হয় তখন মনের গভীরে তারা সাম্প্রদায়িকই থেকে যায়। ধর্মান্ধতা শেখানোও একটি বড় বৈশিষ্ট্য। প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"ভারতীয় পাঠ্য পুস্তকগুলো সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিশেষত মুসলমানদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট ও পূর্ব ধারণায় পরিপূর্ণ। পাকিস্তানি পাঠ্য পুস্তকগুলোও এ থেকে আলাদা নয়। ভারত ও হিন্দু বিরোধী একটি মনোভাব তৈরিই এর প্রধান লক্ষ্য। এ দুটো দেশের ক্ষমতাসীনরাও পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির এই প্রক্রিয়ায় ভীষণভাবে আগ্রহী। পাঠ্য পুস্তকগুলো যে, শুধুমাত্র পূর্ব ধারণা নিয়ে লেখা হচ্ছে তা কিন্তু নয়। এর পিছনে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই পূর্ব ধারণার ভিত্তি হলো অজ্ঞতা। রাজনৈতিক কোন কৌশল নয়। ভারতীয় এবং পাকিস্তানি পাঠ্য পুস্তকগুলো একটি পূর্ব ধারণা থেকে এবং তা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে লেখা হচ্ছে। এই পাঠ্য পুস্তকগুলোর মাধ্যমে তরুণদের মনে ঘৃণার বীজ বপন করা হচ্ছে।"[৩]

আমাদের ইতিহাসে ধর্ম একটা বড় উপাদান হিসেবে কাজ করেছে ও করছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে ইতিহাস পড়ে আসছি (উপমহাদেশে) তা রচিত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং তিনটি দেশেই যে রাজনীতি চলছে তাতেও ধর্ম খানিকটা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা

পালন করছে। ইতিহাস আমাদের মনে এ ধারণারই সৃষ্টি করেছে যে, হিন্দু/ রাষ্ট্র বা মুসলমান/ রাষ্ট্র—একে অপরের ওপর অত্যাচার করেছে। এ কারণে, ভারতে যেমন হিন্দু শাসকদের মহিমা উচ্চারিত হয়, এখানেও সেই একইভাবে মুসলমান নৃপতিদের মহিমান্বিত করা হয়। আমরা কখনও খতিয়ে দেখার চেষ্টা করিনি যে, মধ্যযুগে "রাষ্ট্র কখনো ধর্মান্তরের জন্য কোন ব্যাপক প্রচেষ্টা করে নি।"[৪] রোমিলা থাপার যথার্থই লিখেছিলেন "ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং জাতি সমার্থক নয়।"[৫]

রোমিলা থাপার আরো লিখেছেন, জেমস মিলের 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস'-এর সবচেয়ে তাৎপর্যপুর্ণ দিক বোধ হয় তা এক হিসেবে ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার সূচনা করেছিলো। এবং পরে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ঐতিহাসিক সমর্থন যুগিয়েছিলো। ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় ইতিহাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করার রীতি প্রচলন করেন। এই তিনটি অধ্যায় হল হিন্দু সভ্যতা, মুসলমান সভ্যতা এবং ব্রিটিশ সভ্যতা (বিচিত্র হল খ্রিস্টান সভ্যতা নয়।)[৬]

স্কুলে আমরা যে ইতিহাস পড়ি, তা পড়ে "মনের গভীরে অল্পদিনের মধ্যেই এমনভাবে গেড়ে বসে যে পরবর্তীকালে আমাদের ব্যক্তিচরিত্র এবং সামাজিক ব্যবহারে তার প্রতিফলন দেখা যায়।—ফলে দুটি জিনিস প্রায়ই ঘটে—প্রথমত এই সব প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই আমরা ক্ষেপে যাই, মানতে চাই না, এমনকি যদি কেউ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন তবু। দ্বিতীয়ত ইতিহাসের শিক্ষার ফলেই কোন ব্যক্তি, জাতি, দেশ বা সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমরা কখনো অকারণে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতে শিখি বা অযথা স্তুতিপ্রশংসা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি।"[৭]

গত তিন দশকের পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে আমরা এর সত্যতা খুঁজে পাব এবং অনুধাবন করা সহজ হবে—কেন দু'টি জেনারেশনের আচরণ বিপরীতধর্মী।

গত ত্রিশ বছর ধরে ইতিহাস নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে যা জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। রাজনীতির কারণে ও স্বার্থে এই দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে এসেছে যে, কয়েকটি প্রজন্ম এতে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের ধারণা ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে দেশে তাঁদের স্থান হবে না।

দেশের তিনটি দল—বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াত ইসলামী মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাতে বাধ্য এবং এ প্রক্রিয়ায় ইতিহাসে চলছে সংযোজন, বিয়োজন এবং উধাও করণ। আওয়ামী লীগ যখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তখন বঙ্গবন্ধু ছাড়া কিছুই গুরুত্ব পায় না। বিএনপি যখন ইতিহাস পর্যালোচনা করে, তখন জিয়াউর রহমানই হয়ে ওঠেন মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক। জামায়াত ইদানীং প্রশ্ন করছে গণহত্যা কী? বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে তারা জড়িত নয়। আসলে হওয়াটা উচিত ছিল মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও জনতা। স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় জড়িত তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, আওয়ামী লীগ ছাড়াও বামপন্থী ও দলহীন মানুষদের ভূমিকাও ছিল মুক্তিযুদ্ধে, যারা সম্মুখ সমরে ছিলেন তারা ছাড়াও অবরুদ্ধ দেশে যারা বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করেছেন তারাও মুক্তিযোদ্ধা, জিয়াউর রহমানের অবদানও আছে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এবং

২৭শে মার্চ ঘোষণার কারণে। কিন্তু, পাঠ্যবইয়ে কখনও সুসংহতভাবে এসব বিষয় প্রতিফলিত হয় নি।

হরবংশ মুখিয়া আশা প্রকাশ করেন, "এখন আমরা ইতিহাসচর্চার ধারা সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে পারব। এখন বিশেষ কোনো শাসক বা শাসক শ্রেণীর ইতিহাসমাত্র না পড়ে সমস্ত সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করবো, একমাত্র তখনই আমাদের ইতিহাসচেতনা প্রকৃতই এবং যুক্তিযুক্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারবে।"[৮]

এ আশা বাংলাদেশে করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান আমলের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস পড়া জেনারেশন এখনও সমাজ-রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ইতিহাস আবার ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। দু'তিন জেনারেশন পর হয়ত এ আশা করা যেতে পারে।

বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলোতে তবুও মুক্তিযুদ্ধ বা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিষয়টি আছে। ইংরেজি বইতে তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। একই দেশে দু'ধরনের মানসিকতার ছেলে মেয়ে গড়ে উঠেছে। ইংরেজি মাধ্যমে মার্কোপোলো থেকে যিশুখ্রিস্ট, গান্ধী পর্যন্ত অনেকের অনেক কিছু জানা যাবে, জানা যাবে না বঙ্গবন্ধু বা বাংলাদেশের সম্পর্কে। এবং ইংরেজি মাধ্যমে যারা পড়াচ্ছেন তারা এ ব্যাপারে লজ্জিতও নয়। লজ্জিত নয় মন্ত্রণালয়ও। এ বিষয়ে গবেষণা করে একজন গবেষক লিখেছেন—"যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশে যেসব শিশুর জন্ম, তাদের পাঠ্যসূচিতে যদি মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস না থাকে তবে তারা কীভাবে জানবে কোন চেতনায় বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। আর তা যদি সম্ভব না হয় তবে কোন্ প্রেরণায় তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নের জন্য অগ্রসর হবে?"[৯]

মাদরাসার অবস্থা আরো শোচনীয়। অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারি এ বিষয়ে পর্যালোচনা করে লিখেছেন—" এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এই যে, স্বাধীনতার এত বছর পরও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার তারিখ এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত প্রকাশিত পুস্তকে এ ধরনের ভুল তথ্য ও ব্যাখ্যা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে হচ্ছে।"[১০]

এই বাক্যটি লেখার চেয়ে যন্ত্রণার আর কী হতে পারে?

আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে সেই কবে কী লেখা হয়েছিল সেটিই বলবৎ। নতুন চিন্তা, ধ্যানধারণা কিছুই পাঠ্যপুস্তককে আলোকিত করে না। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে থাপার মন্তব্য করেছিলেন, "ইতিহাসের কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে প্রায় কখনোই স্থান পায় না। সুতরাং এক, এমনকি দুই পুরুষ আগে ছাত্ররা যা শিখতেন ঠিক সেই একই বিষয় ও পদ্ধতিতে এখনকার ছাত্ররাও ইতিহাস চর্চা করেন।"[১১] আমাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

দুই

গত ত্রিশ বছরে আমাদের দেশে পাঠ্যবইয়ের বিবর্তন কীভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া দুরূহ। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই।

আরো আশ্চর্য যে, এ যাবৎ যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে তার সংগ্রহও বোর্ডে নেই। এতেই স্পষ্ট পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে এক কথায় অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী। প্রকাশিত সব বছরের পাঠ্যপুস্তকের কপি যে তাদের গ্রন্থাগারে থাকা উচিৎ এ বোধ তাদের অনুপস্থিত। অথচ বোর্ডের কর্মকর্তারা সবাই শিক্ষক।

একটি শিশু বা কিশোর তখনই পড়তে বা জানতে আগ্রহী হবে যখন সে বইটি সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করবে। এ কারণে, বিদেশে পাঠ্যপুস্তক সচিত্র ও দৃষ্টিনন্দন। আমাদের এখানে পাঠ্যপুস্তক কদাকার, নিম্নমানের ছাপা-বাঁধাই, এবং অসংখ্য ভুলে ভর্তি। এ বছরের পাঠ্যপুস্তকেরও একই অবস্থা। কোনো বছরই কোনো সরকার নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্য পুস্তক তাদের হাতে তুলে দিতে পারেন না। পাঠ্যপুস্তকের ভাষা এক কথায় অসম্ভব। একটি উদাহরণ দিই। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ের ভূমিকাটা দেখা যাক। ফেব্রুয়ারি ২০০১ ও নভেম্বর ২০০১ সংস্করণের 'পরিবেশ পরিচিতি'-র ভূমিকা লিখেছেন যথাক্রমে ডঃ তপনকান্তি চৌধুরী ও ডঃ সফিউর রহমান।

দুটি ভূমিকারই বাক্য, দাড়ি-কমা পর্যন্ত এক। প্রশ্ন উঠতে পারে ডঃ চৌধুরীর (যেহেতু তাঁরটা আগের) ভূমিকা নকল করলেন কেন ডঃ রহমান? বোর্ডের চেয়ারম্যান থেকে তা'হলে প্রথমেই আমরা নকলের বিষয়টা শিখলাম। তারপরের প্রশ্ন—ভূমিকাটা কাদের জন্য? চতুর্থ শ্রেণীতে ১১/১২ বছরের শিশুদের জন্য, না তাদের অভিভাবকদের জন্য? ভূমিকার একটি লাইন দেখুন—"পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে শিশুরা তাত্ত্বিক ও তথ্যগত জ্ঞান লাভের সাথে সাথে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় মৌলিক দক্ষতাসমূহও অর্জন করবে এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত আচরণিক পরিবর্তন ও মূল্যবোধেরও বিকাশ ঘটবে।"

এখন প্রশ্ন, আট মাসের মধ্যে এ বইয়ে একটি দেশের জন্মবৃত্তান্ত পরিবর্তন করা হলো, ভূমিকায় তার একটি ব্যাখ্যাও নেই কেন? এ প্রশ্ন সব বইয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্য। এতে যে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল তার মাশুল কে দেবে? কী মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে ডঃ রহমান? পাঠ্যবইয়ের রচয়িতারা একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ চাপিয়ে দেয়ার জন্য অতীতের ঘটনাগুলোকে নিজেদের মতো করে লিখছেন। সেগুলো আর যাই হোক ইতিহাস নয়।

পাঠ্যপুস্তকের আজকের যে দৈন্যদশা তা পাকিস্তানি আমলেও ছিল কি না সন্দেহ। পাঠ্য পুস্তক এমন যা দেখা মাত্রই ছাত্রটি আগ্রহ বোধ করবে পড়ার। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে প্রথমেই শিশুর মনে অনীহা যোগায় পাঠ্যবই সম্পর্কে। বোর্ডের টাকার অভাব আছে শুনি নি। এগুলো কি খুবই দুরতিগম্য বাধা? ঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিলে ঠিক সময়ে বই বের হবে না কেন? শিশুদের প্রতি সদয় দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে বই সুন্দর হবে না কেন? বছরের পর বছর এগুলো হচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পাঠ্যক্রম ও প্রকাশনার সঙ্গে যারা জড়িত (মন্ত্রণালয় থেকে বোর্ড) তাদের নান্দনিক বোধ নিতান্তই স্বল্প। এ পরিপ্রেক্ষিতে যে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, "বোর্ডের বই পোড়ালে আলো পাওয়া যেতে পারে, পড়লে জ্ঞানের আলো পাওয়া যাবে না,"[১২] তা যুক্তিযুক্ত। এবং গত দু'তিন প্রজন্মের ছাত্রদের শিক্ষার ভিত্তি যে দুর্বল হচ্ছে তার একটি কারণ পাঠক্রম ও ভুল ছাপা পাঠ্যবই। এবং আমরা শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ কেউই এ বিষয়টি মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করি নি, জোরালো ব্যবস্থা নেয়ার দাবিও জানাই নি।

তিন

মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ বা বাংলাদেশের অভ্যুদয় পাঠ্যবইগুলোতে আগেও ছিল। অনেকে বলবেন এটাতো স্বাভাবিক। আমি বলব, না এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক ১৯৯৬-এর পঞ্চম, অষ্টম ও নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক উদাহরণ স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করব। এসব পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ বা বাংলাদেশের অভ্যুদয় আলোচিত হয়েছে।[১৩]

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য 'পরিবেশ পরিচিতি'।[১৪] 'পরিবেশ পরিচিতি'র দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম—বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এ অধ্যায়টি বেশ দীর্ঘ, ১৯ পৃষ্ঠার। এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে প্রাচীনকালের বাংলাদেশ, মধ্যযুগের বাংলাদেশ, বাংলাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন, ইংরেজ শাসনের ফলাফল, ইংরেজ শাসনের অবসান, ভারত ও পাকিস্তান, পাকিস্তান আমলে বৈষম্য, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা, নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস এ ক'টি পৃষ্ঠায় তুলে ধরা নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার। তাঁরা একটি রূপরেখা দিয়েছেন যা স্বাভাবিক। কিন্তু এ রূপরেখা নির্মাণে তাঁদের মধ্যে যে একধরনের দ্বন্দ্ব ছিল, তা বোঝা যায়। কারণ, সম্পাদনা ও রচনায় যাঁরা আছেন তাঁদের কর্মকাণ্ডের জন্য বাইরে তাঁদের যা পরিচিতি, বইটি রচনা-সম্পাদনায় তার খানিকটা বৈপরীত্য লক্ষ করি।

এ বইয়ের চতুর্থ পৃষ্ঠায় 'জাতীয়তা' শিরোনামে লেখা হয়েছে—"আমাদের জাতীয়তা বাংলাদেশী।" বস্তুত এটিই বাকি রচনার সুর ঠিক করে দেয়। এটা তো সত্যি যে, সংবিধান ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এখন আমরা বাংলাদেশী হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু এটাও তো সত্যি যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিতে। সংবিধানেও তাই উল্লেখ ছিল। বন্দুক দিয়ে তা বদলানো হয়েছে। বন্দুকের কথা শিশুদের না-হয়-না-ই বললাম। কিন্তু বন্দুকের কথা উল্লেখ না করেও এটা কীভাবে বলা যায় তা হয়ত তারা ভেবে দেখতে পারতেন। না হলে গোড়াতেই শিশুদের ভুল শেখানো হবে এ অর্থে যে, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার ও সাফল্যের একটি বড় উপাদান এই একটি বাক্যেই নাকচ হয়ে যাচ্ছে।

আমি জানি, সীমাবদ্ধ ব্যবস্থায়, সীমিতসংখ্যক পৃষ্ঠার মধ্যে হাজার বছরের ইতিহাস তুলে ধরা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তা হাজার বছরের ইতিহাস পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর না জানলে কী আসে যায়। এর অনেকটা হয়ত বাদ দেয়া যেত। যা হোক, লেখকদের এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান রচনায় অনেক কিছু বাদ দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু শব্দ বা বাক্য আছে, যা বাদ দেয়া বোধহয় সমীচীন নয়।

"বাংলাদেশের অভ্যুদয়" অধ্যায়ের প্রথম প্যারার তিন লাইন—"ন' মাস যুদ্ধ করে এ দেশের অধিবাসীরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে।" আপাতদৃষ্টিতে বাক্যটিকে সঠিক মনে হবে কিন্তু আসলে কি তাই? মনে হয় না। আসলে এ তিন লাইনে বক্তব্যটি হওয়া উচিত ছিল, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বাঙালিরা পরাজিত করেছিল ঠিকই তবে তারা আত্মসমর্পণ করেছিল বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর কাছে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উল্লেখ করায় সমস্যাটি কোথায় হচ্ছে তা দেখাচ্ছি।

'প্রাচীনকালের বাংলাদেশ' উপ অধ্যায়ের প্রথম শিরোনাম—রাজনৈতিক অবস্থা। এখানে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ইত্যাদির উল্লেখ আছে কিন্তু সচেতনভাবে বাদ দেয়া হয়েছে রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গের। অন্তত দু'লাইন ব্যয় করে এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল যে, ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত একটি অভিন্ন বঙ্গ বা বাংলা ছিল এবং সেখানে উল্লিখিত গোত্রসমূহ বাস করত, বা উল্লিখিত অঞ্চলসমূহ ছিল। আজকের বাংলাদেশে প্রাচীনকালের এসব অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত। পরে অবশ্য আট নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে—"অতীতের বঙ্গদেশ আজকের বাংলাদেশের চেয়ে আয়তনে বড় ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যও বঙ্গ দেশের সীমানার মধ্যে ছিল।" সুরটা বেশ সম্প্রসারণবাদির। এ ধরনের বক্তব্য শিশুদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। ভ্রান্ত ঐতিহ্য তুলে ধরা শুভ নয়। কারণ, পরে আবার দেখি বাঙালির ঐতিহ্য হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বাধীনতাযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় আলোচনা করতে গিয়ে লেখককে বেশ কসরত করতে হয়েছে। এখানে আইয়ুব খান, ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সালের উল্লেখ আছে। উল্লেখ করা হয়েছে সত্তর সলের নির্বাচনও। তারপর ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন—"এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল জনসমাবেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।"

এখানে আসলে মূল বিষয়টি নৈর্ব্যক্তিকতার আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন ঠিকই কিন্তু সেটি আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্য অসহযোগ আন্দোলনের জন্য নয়, বরং "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" এ দুটি বাক্যের জন্য। এটি ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা। এ বাক্য দুটি তাঁরা উল্লেখ করেন নি। কারণ, তা হলে পরবর্তী বাক্য ক'টি আবার অসার হয়ে যায়। পরবর্তী লাইন কটি হলো—

"২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন এবং স্বাধীনতা রক্ষায় বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানান। সারা দেশ অস্ত্র হাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

লক্ষ্য করুন, স্বাধীনতার ঘোষণা তাহলে দেয়া হয়েছিল ২৭শে মার্চ। তবে বক্তব্যটি খানিকটা শুদ্ধ করা হয়েছে 'পাঠ' শব্দটি ব্যবহার করে। কিন্তু ঘোষণাটি যে পাঠ করলেন তা কার পক্ষে—শেখ মুজিবের পক্ষে না নিজের পক্ষে? বাক্যটি পড়ে মনে হবে মেজর সাহেবের ঘোষণা শুনে সারা বাংলাদেশ ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধে।

মুজিবনগর সরকারের উল্লেখ আছে এ রচনায়। উল্লেখ আছে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও জেনারেল ওসমানীর। কিন্তু যাঁর নির্দেশে সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে সেই তাজউদ্দীন আহমদের উল্লেখ নেই।

এ সময় কালে বাংলাদেশ জুড়ে যে ধ্বংসলীলা হয়েছে, রাজাকার, আল-বদররা সারা দেশ জুড়ে যে উন্মত্ততার, নৃশংসতার সৃষ্টি করেছিল, তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। বলা যেতে

পারে স্পেসের অভাব। কিন্তু একটি লাইন এদের সম্পর্কে যোগ না করলে যে, সত্যের অপলাপ হবে। অর্থাৎ শুধু পাকিস্তানি বাহিনী নয়, দেশজুড়ে রাজাকার, আল-বদররাও হত্যা করেছিল। এ ধরনের পাক সহযোগিদের বিরুদ্ধে নিরন্তর ঘৃণা সৃষ্টি করা ও জাগিয়ে রাখা জাতীয় কর্তব্য হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। শেষ লাইনে আছে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। কার কাছে? এরপর যুক্ত হয়েছে " এমনিভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়।"

অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য—'সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ।'[১৫] পৃষ্ঠা ১২৭ থেকে ১৪৮ পর্যন্ত বিধৃত হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস—যার শিরোনামে 'বাংলাদেশ'। এখানে দৃষ্টিভঙ্গি বরং অনেক স্বচ্ছ ও সংহত। জাতীয় চেতনার সংজ্ঞা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "এটি মূলত একটি মানসিক ধারণা। ... তবে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি জাতির রাষ্ট্রীয় সত্তা সংগঠিত ছিল না।" ঠিকই আছে। কিন্তু তারপরই বলা হচ্ছে—"জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় আদর্শ। আমরা বাংলাদেশী। আমরা আমাদের বহু যুগ লালিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক। আমাদের নিজস্ব ভাষা সমৃদ্ধ সাহিত্য রয়েছে। হাজার বছরের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি, জীবন পদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠানে আমাদের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ বিধৃত। এ সবের সমন্বয়েই আমাদের জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি। এ জাতীয়তাবাদের প্রেরণাই স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি।"

পুরো বিষয়টি কি পরস্পর বিরোধী হয়ে যায় না? সমস্যাটা আরও সৃষ্টি হয় যখন রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির সঙ্গে যে এ আদর্শ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাতো বলাই বাহুল্য। বরং এ কথা বললে অশুদ্ধ হতো না যে, ১৯৭২ সালে ছিল এটাই আদর্শ, ১৯৭৫ সালে আদর্শ হল এই। নয়ত আগের অধ্যায়ে যেখানে উল্লেখ হয়েছে বাঙালি জাতীয়তার কথা তারপর এখানে এসে তা বাংলাদেশী হয়ে গেলে ছাত্রদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে বাধ্য।

নবম ও দশম শ্রেণীর বাংলাদেশের ইতিহাস—এ[১৬] বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের যে পটভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে, তা যথাযথ এবং বলা যেতে পারে নির্ভরশীল, নিদেনপক্ষে ঘটনাবলি। বিতর্কমূলক বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এখানে। দু'এক ক্ষেত্রে বোঝা যায়, লেখক বা সম্পাদনা পরিষদ বুঝতে পারছিলেন না, কী করবেন। যেমন—একটি উদাহরণ, "২৭ শে মার্চ তারিখে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর (পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র হতে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন থেকে শুরু হয় স্বাধীনতাযুদ্ধ।" শেষ বাক্যটিই পুরো বিষয়টি গণ্ডগোল করে দিল। কারণ এতে, বোঝানো হচ্ছে জিয়াউর রহমানের ঘোষণাই স্বাধীনতাযুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যা সত্য নয়। কিন্তু এখানে প্রশংসনীয় যে, ৭ই মার্চের ভাষণ-এর গুরুত্ব বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে খুব বড় রকমের বিকৃতি আছে এসব বইয়ে তা নয়। তবে বিকৃতি আছে ২৭ মার্চের ঘোষণার। দেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া বাঞ্ছনীয়।

আমাদের যেন কোনো জাতীয় বীর নেই। এঁদের যথাযথ মর্যাদা না দিলে জাতি হিসেবে নিজেদের মর্যাদাই খাটো করা হয়। জাতীয় বীর শিশুদের-কিশোরদের মনে জাতি, দেশের প্রতি ভালবাসা ও অন্যায়কে ঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। ভাষা আন্দোলনের কথা সকলেই উল্লেখ করেছেন। উনসত্তরের গণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম শ্রেণীর বইয়ে উল্লেখ আছে ফারুক, আসাদ প্রমুখের। সার্জেন্ট জহুরুল হকেরও। '৬৯ সালে মানুষ ভালোবেসে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছিল। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কোথাও এর উল্লেখ নেই। স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে তিনটি বইয়ে-ই এই ধারণা দেয়া হয়েছে, মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তাঁর ডাকে সবাই স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এটি এক ধরনের বিকৃতি বা মিথ্যা, যা শিশুদের শেখানো উচিত নয়। মিথ্যা শেখানো অপরাধ।

জাতীয়তার ক্ষেত্রে সব ক'টি বইতে দোদুল্যমানতা লক্ষণীয়। তিনটি বইয়েরই মৌল বৈশিষ্ট্য মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী হিসেবে, দল হিসেবে জামায়াত, মুসলিম লীগের কোনো উল্লেখ নেই। দশম শ্রেণীর বইতে রাজাকার আল-বদরের উল্লেখ আছে কিন্তু বাঙালির প্রধান বিরোধিতাকারী হিসেবে গোলাম আজমের কোনো উল্লেখ নেই। যে আল-বদররা বুদ্ধিজীবীদের খুন করেছে তাদের প্রধান হিসেবে মতিউর রহমান নিজামীর নাম ও ছবি থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। শিশুরা কি জানবে না তাদের পূর্ব পুরুষরা কাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে? এক ধরনের সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িকতাও আছে বিভিন্ন বর্ণনায়। এ ধরনের মনোভাব কখনই মুক্তিযুদ্ধ বা প্রগতি কোনোটির পক্ষেই নয়। মুক্তিযুদ্ধে মিত্র কে ছিল, শত্রু কে ছিল তাও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা উচিত।

তিনটি বইয়ের ভাষাই শিশু বা কিশোর উপযোগী নয়। ফলে দেশে, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যেমন কোনো আবেগ বা ভালোবাসা জাগে না তেমন শত্রু পাকিস্তানি বা রাজাকার আল-বদরদের সম্পর্কে কোনো ঘৃণাও জাগে না। গণহত্যা, এর নিষ্ঠুরতার কোনো ছাপ পাওয়া যাবে না এসব রচনায়, যা দুঃখজনক। নির্বিকার ভঙ্গি হয়ত কোনো ক্ষেত্রে ভালো, সব ক্ষেত্রে নয়। পঞ্চম শ্রেণী ছাড়া বাকি দু'টি শ্রেণীর পাঠ্যবই যতটা খারাপভাবে, ভুলভাবে ছাপা সম্ভব, তা করা হয়েছে। এ ধরনের পাঠ্যবই দেখলে আর যা-ই হোক পাঠ সম্পর্কে কোনো আগ্রহ জাগে না। মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ তো দূরের কথা।

এ তিনটি বইয়ের রচনা বা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন পরিচিত শিক্ষক। তারা কেন এ ধরনের অস্বচ্ছ ইতিহাস নির্মাণ করলেন। তা'হলে, কি অ্যাকডেমিশিয়ানরাও বিদ্যমান রাজনীতিতে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন। ইন্টারেস্টিং এই যে, যাঁদের কাছ থেকে অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আশা করা গিয়েছিল, তাঁরাই বরং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির খানিকটা হলেও পরিচয় দিয়েছেন। যাঁদের কাছে আশা করা গিয়েছিল স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির তাঁরাই দোদুল্যমানতায় ভুগেছেন।

চার

সাধারণভাবে দেশের ইতিহাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্তি নিরসনে ১৯৯৬ সালে অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমদকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা

হয়। কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, ইতিহাসের সব বিষয় ছাত্রকে জানাতে হবে এমন কোন কথা নেই। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যায়ক্রমে যে ক্লাশের জন্য যতটা উপযুক্ত সেভাবে দেয়া হবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও একইভাবে বিবৃত হবে। কমিটি সংক্ষিপ্ত সময়ে যতোটা সম্ভব ত্রুটি মোচনে চেষ্টা করে। ডঃ পাটোয়ারী লিখেছেন, "স্বীকার করতে হবে ১৯৯৬ সালে স্কুল পাঠ্য পুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংশোধনের পর মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এতে বিস্তৃত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ একরৈখিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সামরিক যুদ্ধ হিসেবে অতীতে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সংশোধনী কমিটি এটিকে জনযুদ্ধ হিসেবে চিত্রায়িত করেছে।"[১৭]

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের বিষয়টি। এতে কারো আপত্তি নেই। কিন্তু, কোন রকম বিশেষজ্ঞ কমিটি ছাড়া, গোপনে কিছু কিছু বইয়ের সংশোধন করা হলো। টার্গেট ছিল একটি—মুক্তিযুদ্ধ। অর্থাৎ, মুক্তিযুদ্ধের বিষয় যে যে বইয়ে আছে তা সংশোধন করার।

এখনও সমস্ত পাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়নি। যেগুলো হয়েছে সেগুলোও সব সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। পত্রিকার মতে, "এ বছর প্রাথমিক স্তরে ৮৫টি বই পরিমার্জন করা হচ্ছে।"[১৮] আরো জানা গেছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ১৭টি বইয়ের পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং "দলীয় দৃষ্টিকোণ প্রক্ষেপের কারণে অন্যান্য বিতর্কযোগ্য বিষয় ছাড়াও সরাসরি তথ্য বিকৃতি ঘটেছে।" শুধু তাই নয় "প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের রচনায় বাংলায়, সমাজ, ইতিহাস ও পৌরনীতির ১৯টি বইয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে অহেতুকভাবে বিতর্কের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে বলে অনেকের অভিমত।"[১৯]

সংশোধিত সবগুলি পাঠ্যপুস্তক আমার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয় নি। যে কটি বই পেয়েছি তার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে এ প্রবন্ধ। অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনার জন্য বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিয়েছি যাতে পাঠক বুঝতে পারেন পাঠ্যপুস্তক নিয়ে কী ঘটছে। কারণ, সব পাঠকের পক্ষে সব পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ করে পড়া সম্ভব হবে না। আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি শুধু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রসঙ্গে।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বাংলা বইয়ের নাম আমার বই। প্রথম শ্রেণীর আমার বই-এ সংকলিত হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের জীবনী।[২০] ডঃ পাটোয়ারি জানাচ্ছেন, বর্তমানে (২০০১) মতিউর সংক্রান্ত যে রচনা তা আসলে ১৯৯১ সালের রচনার পুনর্মুদ্রণ।[২১] ১৯৯১ বা বর্তমান সংস্করণে যা আছে তা'হলো—

১৯৯১ / বর্তমান সংস্করণ

"আমরা স্বাধীন জাতি। বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতার জন্য আমরা লড়াই করেছি। আমাদের অনেক বীর জীবন দিয়েছেন। মতিউর ছিলেন পাইলট। উড়োজাহাজ চালাতেন। মতিউর দেশের দুশমনদের শেষ করতে চেয়েছিলেন। একদিন তিনি উড়োজাহাজ নিয়ে আকাশে উড়লেন। জাহাজ ছুটে চলছে আকাশে। দুশমনের সাথে মতিউরের লড়াই হল। মতিউর জীবন দান করলেন। শহীদ হলেন মতিউর। মতিউরকে আমরা ভালবাসি। মতিউর আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ।"

১৯৯৬/পূর্বতন সংস্করণ

"বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ। আমরা স্বাধীন জাতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। তাঁর ডাকে আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি। আমাদের অনেক বীর জীবন দিয়েছেন। মতিউরও জীবন দিয়েছেন। মতিউর ছিলেন পাইলট। উড়োজাহাজ চালাতেন। মতিউর পাকিস্তানি হানাদারদের সাথে লড়াই করতে চেয়েছিলেন। একদিন তিনি উড়োজাহাজ নিয়ে আকাশে উড়লেন। জাহাজ ছুটে চলছে আকাশে। দুশমনের সাথে লড়াই হল। মতিউর জীবন দান করলেন। শহীদ হলেন মতিউর। মতিউরকে আমরা ভালবাসি। মতিউর আমাদের বীরশ্রেষ্ঠ।"

আপাতঃ দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়বে না। পূর্বতন সংস্করণে তিনটি নতুন বাক্য সংযোজন করা হয়েছিল। "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। তাঁর ডাকে আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি, " এবং "মতিউর পাকিস্তানি হানাদারদের সাথে লড়াই করতে চেয়েছিলেন।" তিনটি বাক্যই সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে এবং স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে শিশুদের একটি যোগসূত্র ঘটিয়ে দেয়। বর্তমান সংস্করণে স্বাভাবিক ভাবেই লাইন তিনটি বাদ গেছে। "মতিউর পাকিস্তানি হানাদারদের সাথে লড়াই করতে চেয়েছিলেন।" আর "মতিউর দেশের দুশমনদের সাথে লড়াই করতে চেয়েছিলেন"—এর মধ্যে পার্থক্য আছে। 'পাকিস্তানি হানাদার' শব্দ দুটি নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে এবং তা একটি নির্দিষ্ট চিত্র তুলে ধরে। 'দুশমন' যে কেউ হতে পারে। [বাংলা চলচ্চিত্র' দোস্ত দুশমন'-এর সঙ্গেও শিশুরা তা গুলিয়ে ফেলতে পারে।] পূর্বতন সংস্করণে দু'টি শব্দ ছিল নির্দিষ্ট এবং সত্য। বর্তমানেরটি নির্বস্তুক।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আমার বই-তে ছিল বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের জীবনী।[২২] মতিউরের জীবনীতে যে ধরনের সংশোধন আনা হয়েছে এখানেও সেটি করা হয়েছে। পূর্বতন সংস্করণে নূর মোহাম্মদের জীবন খানিকটা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং কী পরিস্থিতিতে তিনি যুদ্ধে যোগ দিলেন তাও বলা হয়েছিল।

পূর্বতন সংস্করণ

"আমরা স্বাধীন জাতি। বাংলাদেশ আমাদের দেশ। আমাদের দেশের পতাকা আকাশে ওড়ে। আমাদের মন গর্বে ভরে ওঠে। অনেক বীর দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। মার্চ ১৯৭১ । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হল। নূর মোহাম্মদ শেখ যুদ্ধে যোগ দিলেন।"

বর্তমান সংস্করণ

"বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধ করে পরাধীন বাংলাকে স্বাধীন করেছে। তার আগে পশ্চিম পকিস্তান আর পূর্ব বাংলা নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকেরা বাংলার নিরীহ ও সরল মানুষের ওপর খুব অত্যাচার করেছে। পীড়ন আর শোষণে জর্জরিত হয়েছে বাংলার মানুষ। ...

মার্চ ১৯৭১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হল। নূর মোহাম্মদ যুদ্ধে যোগ দিলেন।"
বর্তমান সংস্করণ ও পূর্বতন সংস্করণে ভূমিকার বিষয়টি একই, বরং বলা যেতে পারে বর্তমান সংস্করণে তা বিশদ যদিও তা দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। কিন্তু রচয়িতাদের মূল লক্ষ্য ভূমিকা নয়, স্বাধীনতার যুদ্ধ কার ডাকে শুরু হয়েছিল তা বাদ দেয়া এবং সেটি দেয়া হয়েছে।
ব্যাপক পরিবর্তন শুরু করা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণী থেকে বা তৃতীয় ভাগ থেকে। আমার বই তৃতীয় ভাগে মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা সম্পর্কে দু'টি রচনা আছে।[২৩] সে দুটি হলো—'বিজয় দিবস' ও 'বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর'। প্রথমে দেখা যাক 'বিজয় দিবস'-এ কী সংশোধন করা হয়েছে।

পূর্বতন সংস্করণ

"এদেশের জনগণের ওপর পাকিস্তানি শাসকরা অত্যাচার ও নির্যাতন করত। কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বাঙালিরা ছিল বঞ্চিত। এই অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে শুরু হল আন্দোলন।"

বর্তমান সংস্করণ

"পাকিস্তানের শাসকেরা এদেশের লোকজনের ওপর অত্যাচার চালাত, ফলে এদেশের মানুষের দুঃখকষ্টের শেষ ছিল না। কিন্তু এ দেশের মানুষ তা মেনে নিতে পারে নি। তারা মাথা তুলে দাঁড়ায়। সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়।"
পাকিস্তানি শাসকদের নির্যাতনের কথাটা বাদ গেছে। বাঙালিরা ছিল 'বঞ্চিত'—এতে যা বোঝায়, মানুষের 'দুঃখকষ্টের' শেষ ছিল না—তা বোঝায় না। অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যঞ্জনা অন্য রকম। সেই ব্যঞ্জনা নষ্ট করে দেয়া হল 'দেশের মানুষ তা মেনে নিতে পারে নি' বাক্যে। আর যেটি মূল টার্গেট অর্থাৎ যা বাদ দেয়ার জন্য এতো ভনিতা, তা'হলো—'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে শুরু হল আন্দোলন।"
না, এখানেই শেষ নয়। এরপর পূর্বতন সংস্করণে ছিল—"১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ। সেদিন রাতের আঁধারে পাকিস্তানের সৈন্যরা এদেশের মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা বাঙালিদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।"

বর্তমান সংস্করণে তা বদলে করা হয়েছে

"১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ। সেদিন রাতের আঁধারে পাকিস্তানের সৈন্যরা এ দেশের মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢাকা শহরেই তারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে। সারা দেশে তারা খুন করে লাখ লাখ মানুষ। এদেশবাসী এত অত্যাচার সহ্য করবে কেন?'
তারপর, শুরু হল স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ।

গত সংস্করণে ছিল—"সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।"
বর্তমান সংস্করণে আছে—"নয় মাস ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলল।" এখানে "সর্বস্তরের মানুষ" বাদ দেয়ার অর্থ মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধ হিসেবে না দেখান। এ কাজটি সাধারণত সামরিক বাহিনীর জেনারেলরা করতে ভালোবাসে। গত সংস্করণে এরপর আরো ছিল—
"এ সময় সারাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী নির্মম অত্যাচার ও গণহত্যা চালায়।" এ লাইনটি বর্তমান সংস্করণে বাদ দেয়া হয়েছে। যার অর্থ সত্য অপহৃত হয়েছে। ছাত্রদের সত্য জানতে না দেওয়া একটি অপরাধ।
'বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর'-এও বাদ দেয়া হয়েছে কিছু অংশ। আগের সংস্করণে ছিল ২৫ শে মার্চে 'কালবিলম্ব না করে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সারা দেশ ব্যাপী পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠল। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের মানুষ শপথ নিল যে স্বাধীনতার জন্য তারা আমরণ যুদ্ধ করবে। শুরু হল ন'মাস ব্যাপী আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ।"
এ লাইনগুলো বদল করে দেয়া হয়েছে—
"পুড়িয়ে দিল শহর, বন্দর ও গ্রাম। এ দেশের মানুষ শপথ নিল, স্বাধীনতার জন্য তারা আমরণ যুদ্ধ করবে। শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ।" পূর্বতন সংস্করণের সত্য সব এখানে অনুপস্থিত।
"আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ"—এ যে প্যাশন তা কি আছে "শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ"-এ? 'মহান' শব্দটি কেন রচয়িতাদের খারাপ লাগল, বুঝলাম না। আগের সংস্করণে কেন-ই বা ভাল লেগেছিল?
চতুর্থ শ্রেণীর আমার বই-তে সংকলিত হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের জীবনী। ১৯৯৪ সাল থেকে জীবনীটি ছিল। ১৯৯৬ সালে রচনাটির কিছু অংশ সংশোধন করা হয়। বর্তমানে সেই সংশোধিত অংশ বদল করে ১৯৯৪ সালের পাঠ বহাল রাখা হয়েছে। এখানে কী ছিল আর কী সংশোধন করা হয়েছিল তা উল্লেখ করা হচ্ছে—

১৯৯৪/ বর্তমান সংস্করণ

" ১৯৭১ সাল। সে বড় গৌরবের সময়। সে বড় দুঃখের সময়। গৌরব, কারণ বাংলার মানুষ লড়াই করেছিল বীরের মত। দুঃখ, কারণ পাকিস্তানি বাহিনী নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছিল শান্তিপ্রিয় মানুষদের।
১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু, পাকিস্তানি শাসকরা কখনও চায়নি বাঙালিরা দেশ পরিচালনার অধিকার লাভ করুক। তাই একদিকে তারা বলল আলোচনার কথা। অপরদিকে গোপনে তৈরি হল আক্রমণের জন্য। সেই নিষ্ঠুর আক্রমণ শুরু করল ২৫ শে মার্চ রাতে। সেনাঘাটি থেকে অস্ত্র হাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা বের হয়ে এল। শুরু হল নির্মম হত্যাকাণ্ড।"
পূর্বতন সংস্করণের রচনাটি পড়া না থাকলে প্রথম দৃষ্টিতে এখানে কোন বৈসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু, দু'টি পাঠ মিলিয়ে পড়লে ফারাকটা স্পষ্ট হবে।

২০০০/পূর্বতন সংস্করণ

"সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান ছিলেন একজন মহান দেশ প্রেমিক। তিনি দেশকে পাকিস্তানি শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করেছেন। লড়াই করে তিনি শহীদ হন। তাঁর এই দেশ প্রেমের কথা চিরকাল আমাদের মনে থাকবে।

১৯৭১ সালের আগে এদেশ ছিল পাকিস্তানের অংশ। তখন এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের শাসকরা এ দেশকে নানা ভাবে শোষণ করত। তাদের অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ দেশের বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এ দেশের জনগণের অধিকার আদায়ের দাবি ধাপে ধাপে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা এ দেশের নিরীহ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিল। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য গঠন করা হল মুক্তিবাহিনী। নয় মাস ধরে চলে মুক্তিযুদ্ধ। এ সময়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা শহর-বন্দর গ্রামের হাজার হাজার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। হত্যা করে লাখো নিরীহ বাঙালিকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বহু বীর সন্তানকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এদের মধ্যে একজন বীরযোদ্ধা হামিদুর রহমান।"

হামিদুর রহমান দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, শহীদ হয়েছিলেন এ জন্যই তিনি বীরশ্রেষ্ঠ। পাকিস্তানি শাসকরা অত্যাচার শোষণ করত দেখে বাঙালিরা এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ধাপে ধাপে আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা গণহত্যা করেছিল। লক্ষ্য করুন 'নিরীহ' শব্দটির ব্যবহার। অর্থাৎ নিরীহ মানুষকে দলে দলে হত্যাই গণহত্যা, যেমনটি সাম্প্রতিক কালে হয়েছে বসুনিয়ায়, রুয়ান্ডায় বা প্যালেস্টাইনে। বর্তমান সংস্করণ পড়লে যা উল্লেখ করলাম তা কি অনুধাবন করা যায়? কেন বাঙালিরা যুদ্ধ করেছিল, কার নেতৃত্বে এসব কি বোঝা সম্ভব? পূর্বতন সংস্করণে পাকিস্তান, মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা সব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ চিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু, শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। বাক্যটি বাদ দেয়ার জন্য উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলো বাদ দেয়া হয়।

এ ছাড়া চতুর্থ শ্রেণীর এই পাঠ্য বইতে সানাউল হক রচিত 'মুজিব ছড়া' ও আসাদ চৌধুরীর 'জানাজানি' কবিতা দুটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ বছর এ দুটি বাদ দেয়া হয়েছে। কেননা কবিতা দুটিতে আছে 'মুজিব' ও 'বাঙালি' নামে দু'টি শব্দ।

পঞ্চম শ্রেণীর আমার বই সংগ্রহ করতে পারি নি। পাটোয়ারির প্রবন্ধ ও বিভিন্ন খবরের কাগজে রিপোর্টিং দেখে এ বিষয়ে আঁচ করতে পেরেছি। পঞ্চম শ্রেণির আমার বই-য়ে ছিল 'বীরশ্রেষ্ঠ মুস্তাফা কামাল' এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে রচিত 'স্মরণীয় বরণীয় যারা'। ১৯৯৫ সালে এ দু'টি রচনা সংকলিত হয়। পাটোয়ারি উল্লেখ করেছেন, বর্তমান সংস্করণে মুস্তাফা কামাল শীর্ষক রচনায় কোন পরিবর্তন করা হয় নি। একটি লাইন পরিবর্তন করা হয়েছে—

পূর্বতন সংস্করণ: "গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

বর্তমান সংস্করণ ; "১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে তারা অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু করল হত্যা ও ধ্বংস যজ্ঞ।"
অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা বাদ।
'স্মরণীয় বরণীয় যারা' শিরোনাম বদল করে নতুন শিরোনাম দেওয়া হয়েছে—'স্মরণীয় যাঁরা, বরণীয় যাঁরা।' এতে কী হেরফের হল বোঝা গেল না। পূর্বতন সংস্করণের সঙ্গে বর্তমান সংস্করণের কোন মিল নেই। আগের সংস্করণে কারা, কেন এবং কার দ্বারা শহীদ হলেন সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ ছিল। বর্তমান সংস্করণে সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি বরং কবিত্বময় কিছু বাক্য লেখা হয়েছে—
"এমনি আরও কতজনকে হত্যা করা হয়েছিল, তার কোন ইয়ত্তা নেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদের কারো ক্ষত বিক্ষত লাশ পাওয়া গিয়েছিল, কারো তাও পাওয়া যায় নি। এই শহীদদের রক্তে ভিজে আছে বাংলাদেশের মাটি। যেমন, তাঁদের জন্য ভিজে আছে তাঁদের স্বজনদের চোখ। একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে, এই শহীদেরা দলে কত ভারি, আর সারা দেশে তাঁদের কত স্বজন ছড়িয়ে আছে। ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, এই স্বজন কেবল শহীদদের সন্তান, তাদের ভাই, তাদের আপনজন নয়—দেশের জন্য যারা প্রাণ দিলেন আমরা সকলে তাদের স্বজন। তাদের বুকের ভেতর থেকে একটা প্রতিজ্ঞাই আপনা থেকে বেরিয়ে আসবে।
'আমরা তোমাদের ভুলব না।'[২৪] এই চাতুর্যময় বাক্য জালের কারণ, রাজাকার আল-শামস ও আল-বদরদের খুন করার কথা বাদ দেয়া। পূর্বতন সংস্করণে তার উল্লেখ ছিল।

পাঁচ

প্রাথমিক পর্যায়ে বা প্রাইমারি লেভেলে আলাদাভাবে ইতিহাস পড়ানো হয় না। তার বদলে পড়ানো হয় পরিবেশ পরিচিতি। এ পাঠ্য বই সমাজ, ভূগোল, ইতিহাস, পৌরনীতির মিশ্রণ। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পরিবেশ পরিচিতি পাঠ্য। এবার পরিবেশ পরিচিতির ইতিহাস অংশটুকু সংশোধন বা বদল করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির বইয়ে যে রচনাটি সংশোধন করা হয়েছে তার শিরোনাম 'আমাদের জাতীয় পতাকা'।
তৃতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিত-র রচনাটির দুটি পাঠ নিচে উদ্ধৃত করা হলো[২৫]—

১৯৯৬/ পূর্বতন সংস্করণ

"'১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হয়। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বেশি আসন লাভ করে। কিন্তু জনগণের রায়কে অস্বীকার করে পাকিস্তানের সরকার আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে দিল না। বরং বাঙালিদের কঠোরভাবে দমন করার পথ বেছে নিল।
১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন বঙ্গবন্ধু মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পাক বাহিনী সেই রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা

দেশবাসীকে জানানোর জন্য ২৫ শে মার্চ চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে সেটি প্রচার করেন। ২৭ শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার আর একটি ঘোষণা প্রচার করেন। ২৬শে মার্চ থেকেই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। এ জন্য ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।"

সংশোধিত/ বর্তমান সংস্করণ

"১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হয়। এ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে বাঙালিরা বেশি আসন লাভ করে। কিন্তু জনগণের রায়কে অস্বীকার করে তাদেরকে সরকার গঠন করতে দেওয়া হল না। তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করার পথ বেছে নেওয়া হল।

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা হাজার হাজার নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে। এতে সারা দেশ ক্ষোভ ও ঘৃণায় ফেটে পড়ে। পরের দিন অর্থাৎ ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর থেকে শুরু হয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ। এ জন্য ২৬ শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।"

১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ২৬শে মার্চ। এ তথ্যগুলো বাদ দেয়ার জন্যই বর্তমান সংস্করণে এই পাঠ সংশোধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের এই বইয়ের সংস্করণে একই রচনায় উল্লেখ করা হয়েছিল মেজর জিয়া ২৭ শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ১৯৯৬ সালের সংস্করণে এ তথ্য সংশোধিত হয় নি। বর্তমানে তাও সংশোধন করে জোর জবরদস্তি মূলক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ২৬শে মার্চ।

চতুর্থ শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতিতে ১৪টি অধ্যায় আছে দু'টি সংস্করণেই।[২৬] এর মধ্যে বদল হয়েছে একটি অধ্যায়। দশম অধ্যায়টি। পূর্বতন সংস্করণে এ অধ্যায়ের নাম ছিল : 'দুই মহান বাঙালি' আর বর্তমান সংস্করণে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথিকৃত।'

চতুর্থ শ্রেণির একটি শিশু কতটা গ্রহণ করতে পারে? ধারণা ছিল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ইতিহাসটি পর্যায়ক্রমে (তা ব্যক্তির জীবনী বা বিবরণ হতে পারে) তুলে ধরা। সে জন্য চতুর্থ শ্রেণিতে দু'জনের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পরিবর্তিত, 'স্বাধীনতার পথিকৃত' শিরোনামটিও সুন্দর। এ অধ্যায়ে পথিকৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে ৫ জনকে।

'মহান বাঙালি' ও 'স্বাধীনতার পথিকৃত'-এর মধ্যে তফাৎ আছে নিশ্চয়। ৫০ বছর ১০০ বছর ধরে পাঁচ জন পথিকৃত হতে পারে না। আলাদা বাংলাদেশের প্রস্তাবের কথাই যদি হয় পথিকৃতের ভিত্তি তা'হলে, ১৯৪৭ এর খ্যাত অখ্যাত অনেক রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদই এ ধরনের কথা বলেছেন। নির্দিষ্ট আলাদা রাষ্ট্র গঠনর বিষয়টি যদি হয় মূল বিষয় তা'হলে সে দাবি তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই। পরিবর্তিত সংস্করণে স্বাধীনতার পথিকৃতদের মহান বাঙালি বলতে চান কেউ হয়ত আপত্তি করবে না। কিন্তু, পথিকৃতদের তালিকায়

অন্যদের কথা বাদ দিই, জিয়াউর রহমানের নামটা আনা হয়েছে নিছক গায়ের জোরে। এবং এটি করতে গিয়ে আরো চারজনের জীবনী সংযুক্ত করতে হয়েছে।

বিষয়টা যে কষ্টকর তা বোঝা যায় 'অনুশীলনী' বিশ্লেষণ করে। ৩নং অনুশীলনীতে আছে 'বাম পাশের শব্দগুলোর সঙ্গে ডান পাশের শব্দগুলোর মিল কর।' সেখানে এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে মিলে ঋণ সালিশী আইন, শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ৬ দফা। দু'টিই বাংলাদেশের মাইল ফলক। জিয়াউর রহমানের সঙ্গে আছে 'বীরোত্তম' খেতাব যা অনেকেই পেয়েছেন।

৪ নং অনুশীলনী তে আছে—'ঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন দাও।' এখানে লক্ষ করুন চারজনের অবদান—'শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক' শেরে বাংলা 'উপাধি পান'; 'হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্ট' গঠন করেন; 'মাওলানা ভাসানীর জীবনের শিক্ষা'; 'শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা পেশ করেন'; আর জেনারেল জিয়ার ক্ষেত্রে 'জিয়ার স্কুল জীবন শুরু হয়' বোঝা যাচ্ছে জিয়ার সঙ্গে পূর্বোক্ত চারজনের মতো কৃতিত্ব যুক্ত করা যাচ্ছে না। কিন্তু সেটিতো বিষয় না, বিষয়টি হচ্ছে ইতিহাস দখলের।

'মহান দুই বাঙালি' শিরোনামের ভূমিকাটি যুক্তিযুক্ত। "আমাদের বাংলাদেশে অনেক মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা এখন এই দুই মহান বাঙালি সম্পর্কে কিছু জানব।'

স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, অনেক মহান বাঙালি আছেন। কাউকে খাটো করার ইচ্ছে নেই, এর মধ্যে বর্ষীয়ান ফজলুল হক, তাই তিনি আলোচ্য, আর আলোচ্য বঙ্গবন্ধু যেহেতু তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বাধীনতার।

দু'টি জীবনীতেই তাঁদের জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে। ফজলুল হকের পিছে খরচ করা হয়েছে ৩৮ লাইন, শেখ মুজিবের পিছে ৬৩ লাইন। এই অসঙ্গতি চোখে পড়ে। অনেকে বলতে পারেন,' ফজলুল হক ও শেখ মুজিব কি এক? এক না বিরাট পার্থক্য সে আলোচনা তুলনামূলক, বা বাঙালির স্বাধীনতার নেতৃত্বের জন্য অবশ্যই শেখ মুজিবের জীবনী বড় হতে পারে কিন্তু একেবারে দ্বিগুণ নয়। কারণ, এটি শিশুপাঠ্য, নির্দিষ্ট একটি ফরম্যাট তার মেনে চলা উচিত। কিন্তু এই আতিশয্যের কারণ, আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায়। এই আতিশয্য যে ভারসাম্য নষ্ট করে, ভালো বিষয়কে দৃষ্টিকটু করে তোলে দলবাজরা তা কখনও বোঝে না। ইতিহাস নিয়ে সমস্যাটা সেখানেই তৈরি হয়।

এবার দেখা যাক 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথিকৃত' অধ্যায়টি। ভূমিকাটি আগে দেখা যাক—"বাংলাদেশে অনেক মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শেরেবাংলা ... জিয়াউর রহমান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ছিলেন অসীম সাহসী। বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের জন্য ছিল তাঁদের অপরিসীম দরদ। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁরা স্কুল, মাদ্‌রাসা ও কলেজ স্থাপন করেছেন।" শেষ লাইনটি দেখুন। তাঁরা স্বাধীনতার পথিকৃত কিন্তু তাঁদের অবদান স্কুল, মাদ্‌রাসা স্থাপন। এ দু'টি বিষয়ে যে বিরাট পার্থক্য তা এদের নজরে পড়েনি? পড়েছে, কিন্তু মুশকিল হল ৭১ পূর্ব রাজনীতি যদি হয় বাংলাদেশের পটভূমি তা'হলে প্রথম চার জনের কোন না কোন অবদান পাওয়া যাবে। কিন্তু, জিয়াউর

রহমান তো তখন একজন লেফটেন্যান্ট বা ক্যাপটেন, তাত্ত্বিক ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতারই বিরোধী। কারণ, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ইতিহাস তো মানুষ দমনের ইতিহাস। লালনের নয়। সুতরাং, উল্লেখ করতে হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা। কিন্তু, এটিও সঠিক নয়। বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি এই পাঁচজনের মধ্যে কারো অবদান থাকে, তা'হলে তা ফজলুল হকের, অন্য কারো নয়। এভাবে, পুস্তকের রচয়িতা পাঁচ লেখক (দু'জন আবার ডক্টরেট উপাধিধারী) ইতিহাস বিকৃত করলেন এবং সূক্ষ্মভাবে, যা আপাতদৃষ্টিতে নজর এড়িয়ে যাবে।

এবার দেখা যাক কোন পথিকৃতের পেছনে কতো লাইন খরচ হয়েছে বর্তমান সংস্করণে—

এ. কে. ফজলুল হক ৩২ লাইন

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৩৯ লাইন

আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৩৯ লাইন

শেখ মুজিবুর রহমান ৩১ লাইন

জিয়াউর রহমান ৪৪ লাইন

ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? স্বাধীনতা যুদ্ধের বা মুক্তিযুদ্ধের একজন কমান্ডার ৪৪ লাইন আর যাঁর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হল তাঁর জন্য ৩১ লাইন। বাকী তিনজনের ক্ষেত্রে না' হয় মেনে নিলাম ভারসাম্য আছে। মিথ্যাকে যে সত্য করার জন্য একটু চাতুর্য দরকার এই লেখকদের তাও নেই। মনে হয় আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস তারা। ফলে প্রথমেই হয়ে ওঠে এটি দৃষ্টিকটু একটি ইতিহাস, বিশ্বাসযোগ্যতা তখনই নষ্ট হয়ে যায়।

এবার পথিকৃতদের কীভাবে দেখানো হয়েছে দেখা যাক—

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক—

পূর্বতন সংস্করণ ঃ "আমরা অনেকেই শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের নাম শুনেছি। তিনি আমাদের সকলের গর্ব। শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের পুরো নাম আবুল কাশেম ফজলুল হক। রাজনীতিতে অসাধারণ শক্তিশালী ও সাহসী ভূমিকার জন্য তাঁকে 'শেরে বাংলা' অর্থাৎ বাংলার বাঘ বলা হয়।" শিশুদের জন্য সংক্ষিপ্তভাবে ভারসাম্যপূর্ণ স্টেটমেন্ট।

বর্তমান সংস্করণ ঃ "আমরা শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের নাম শুনেছি। তিনি আমাদের দেশের গর্ব। তাঁর পুরো নাম আবুল কাশেম ফজলুল হক। শেরে বাংলা (বাংলার বাঘ) তাঁর উপাধি। উপাধিটি কিন্তু বাঙালিরা দেয় নি। ১৯৩৭ সালে ভারতের লক্ষ্ণৌ শহরে মুসলিম লীগের অধিবেশন ছিল। উর্দু ভাষায় তাঁর সাহসী বক্তৃতা শুনে সভাস্থলে 'শেরে বাংলা' খেতাব দেওয়া হয়। এ নামে তাঁকে সবাই চেনে।"

এখন দেখুন : ১. "আগে ছিল সকলের গর্ব।" এই সকলে আপামর বাঙালির একটি ইঙ্গিত ছিল যার ব্যাপ্তি বিশাল। এখন হল 'দেশের গর্ব' যা সীমিত ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ইঙ্গিত। এ ক্ষেত্রে শেরে বাংলাকেও একদিন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পথিকৃত ঘোষণা করা হতে পারে। কেন এ মন্তব্য তা পরে উল্লেখ করছি। এখানে আরো বলা দরকার । ফজলুল হক যখন শেরে বাংলা উপাধি পান তখন ছিল অভিন্ন ভারত। এ উপাধিটি অভিন্ন বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে দেয়া হয়েছিল।

২. "১৯৩৭ সালে ভারতের লক্ষ্ণৌ শহরে মুসলিম লীগের অধিবেশন ছিল। উর্দু ভাষায় তাঁর সাহসী বক্তৃতা শুনে সভাস্থলে 'শেরে বাংলা' খেতাব দেওয়া হয়।" অর্থাৎ মুসলিমরাই তাঁকে হিরো বানিয়েছিল। এবং তাঁর কৃতিত্ব উর্দু ভাষায় বক্তৃতা দেয়া। এটি সঠিক নয়।
পুরো ভূমিকাটিতে একদিকে শেরে বাংলাকে নিছক মুসলিম নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে যাতে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ম্লান হয়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। অন্য দিকে এতে বাংলাদেশের মানুষের টিপিক্যাল হীনম্মন্যতা প্রকাশিত হয়েছে।
বাকী প্যারাগ্রাফগুলোতে বাক্যের গঠন বদল করা হয়েছে। তাতে যে হেরফের নেই তা নয়। কিন্তু, সেই বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গেলাম না। তৃতীয় প্যারাটি এরিই মাঝে অবান্তর হিসেবে ঢুকে পড়েছে নতুন সংস্করণে। সেটি হল এ রকম—"ফজলুল হক ছোটবেলায় খুব ডানপিটে ছিলেন। তিনি নদীতে সাঁতার কাটতেন। নদীতে ছিল অনেক কুমীর। মা আতঙ্কে ভুগতেন পাছে তাঁর ছেলেকে কুমীরে খেয়ে ফেলে। ফজলুল হক বলতেন কুমীর আমাকে খাবে না, আমি এ দেশ থেকে কুমীর তাড়াব।"
কোন পরিপ্রেক্ষিতে অবান্তর এ প্যারাগ্রাফ এল তা বোঝা দুরূহ। বর্তমান সংস্করণে একটি লাইন যুক্ত হয়েছে (কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে)। ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের সভায় তিনি 'পাকিস্তান প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। এটি ফজলুল হকের বিশেষ কৃতিত্ব হিসেবে বিবেচিত হয় যা পূর্বতন সংস্করণে উল্লিখিত হয় নি। এর একটি কারণ, পাকিস্তান শব্দটিকে তারা পারতপক্ষে আনতে চায় নি। ছিল পরিত্যাজ্য। এটি ইতিহাস অস্বীকার করা। অন্যদিকে সূক্ষ্মভাবে এখানে ফজলুল হককে মুসলমানদের একজন বড় নেতা (যেন তিনি আজীবন মুসলিম লীগার ছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা বোধ এভাবে তৈরি হয়) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পথিকৃতের কোন কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না সেখানে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৩৯ লাইনের মধ্যে ১১ লাইনই মৃত্যু সম্পর্কিত। বাকী লাইনগুলো ব্যয়িত হয়েছে কোন কোন স্কুল কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন এবং কোন কোন পদে ছিলেন সে সম্পর্কে। তিনি "গণতন্ত্রের মানসপুত্র' ছিলেন তা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু কেন তা বোঝার উপায় নেই। রচনাটির ধরন বোঝা যাবে এই ১১ লাইন পাঠ করলে যা অন্য কোন 'পথিকৃত' এর রচনায় নেই।
বর্তমান সংস্করণ ঃ "খুব বেশি পরিশ্রম করায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে দুইবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ডাক্তাররা তাঁকে পরামর্শ দেন বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করার। তিনি বৈরুতে চিকিৎসা করান। একটু সুস্থ হয়ে লন্ডনে যান বিশ্রাম নিতে ও সেখানে উচ্চ শিক্ষারত পুত্র রাশেদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে। ছেলের সঙ্গে ছয় মাস কাটিয়ে আবার বৈরুতে আসেন ও হার্নিয়া অপারেশনের জন্য জুরিখ যাবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল বোধ হয় অন্যরূপ। বৈরুতের হোটেল ইন্টারন্যাশনালে ১৯৬৩ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। হোটেলের টেলিফোনে বন্ধুকে খবর দিতে চেষ্টা করেছিলেন। টেলিফোন অপারেটর দৌড়ে এসে দেখেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে আছেন। ডাক্তার এসে দেখেন তিনি আর জীবিত নেই।"

এদিক থেকে বিচার করলে বরং ৩৯ লাইনের ভাসানীর জীবনটি অনেক উন্নত। ভাসানীর কর্মময় জীবন যেমন উল্লিখিত হয়েছে তেমনি কেন ভাসানী অন্য ধাঁচের নেতা সেটাও বোঝা যায়। এর একটি কারণ হতে পারে হয়ত, বিএনপি জামায়াত জোটে পুরনো ভাসানীপন্থীরা অনেক প্রভাবশালী পদে আছেন। বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মান্নান ভূঁইয়া ভাসানী ন্যাপের প্রাক্তন নেতা।

সোহরাওয়ার্দীর মতোও শেখ মুজিবের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তবে আরো সংক্ষিপ্তভাবে অর্থাৎ ৩১ লাইনে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মুজিব ছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। সে সময়টুকু বর্ণিত হয়েছে মাত্র ১০ লাইনে। কীভাবে?

বর্তমান সংস্করণ

"১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলের সভায় তিনি ৬ দফা পেশ করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আব্দুল মোনায়েম খান মিলে আওয়ামী লীগের ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু করেন।

শুরু হয় দেশব্যাপী আন্দোলন। শেখ মুজিব, অন্য বন্দীদের সহ শুধু মুক্তি পেলেন না, পতন হল আইয়ুব খান ও মোনায়েম চক্রের। সে সময়ে এক জনসভায় ছাত্র নেতারা শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু খেতাব দেয়। ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। নির্বাচনে পূর্ববাংলার দুইটি বাদে সব আসনে জয়ী হন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। নিয়ম অনুযায়ী শেখ মুজিবের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। কিন্তু সামরিক শাসকেরা রাজি ছিল না বাঙালিকে ক্ষমতা দিতে। ফলে শুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। ২৫ শে মার্চের রাতে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।"

এ বিবরণে বাংলাদেশের ইতিহাসের চারটি মাইল ফলক বাদ দেয়া হয়েছে। একটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, অপর দু'টি ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলন এবং ৭ই মার্চের ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন। ৭ই মার্চের পর বাদ গেছে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—২৫ শে মার্চের গণহত্যা ও স্বাধীনতা ঘোষণা।

পূর্ববর্তী সংস্করণ

পূর্ববর্তী সংস্করণে, বঙ্গবন্ধুর প্রাক-৬৬ সালের জীবন কাহিনী বর্ণনার পর লেখা হয়েছিল—

"১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য ছয় দফা দাবি তোলেন। ছয় দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্যদের জড়িত করে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। ১৯৬৯ সালে দেশ ব্যাপী গণঅভ্যুত্থান ঘটলে আগরতলা মামলা বাতিল হয়ে যায় এবং ২২ শে মার্চ তিনি নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করেন। ..."

"১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে। কিন্তু, পাকিস্তানের নতুন শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁকে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ না জানিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স

ময়দানে বিক্ষুব্ধ লক্ষ জনতার সমাবেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।... তাঁর ভাষণ বাঙালি জাতিকে মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে পাকিস্তান সরকার অচল হয়ে পড়ে। একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র অসহায় বাঙালিদের ওপর আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫শে মার্চের গভীর রাতে (অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে) পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হবার আগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নয় মাস ধরে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলে। অবশেষে ১৯৭১এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি শত্রুদের পরাজিত করে বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। এভাবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হয়।"

পূর্বোক্ত সংস্করণে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আছে, বাংলাদেশের ইতিহাসের মাইল ফলকগুলো উল্লিখিত হয়েছে। বাক্য গঠনে প্যাশন আছে (যতটা সম্ভব)। নির্লিপ্ত 'স্টেটম্যান্ট অব ফ্যাক্টস' নয়। এবং তা ঘটনার ব্যাখ্যা কীভাবে বদলে দেয় তার দু' একটি উদাহরণ দিই—

১. ১৯৯৬ সালে তিনি বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানি শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য ছয় দফা দাবি তোলেন (পূর্ববর্তী সংস্করণ)

"১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলের সভায় তিনি ৬ দফা পেশ করেন।" (বর্তমান সংস্করণ)

প্রথমটি লক্ষ্য করুন ছয় দফা কেন উত্থাপন করা হয়েছিল সেটি বোঝা যায় এবং বাক্য গঠনও ৬ দফা ও আন্দোলনের একটি ব্যঞ্জনা তৈরি করে। দ্বিতীয়টিতে ৬ দফার কোন মানে বোঝা যায় না এবং এটির অভিঘাত যে প্রবল হয়েছিল তাও অজানা থেকে যায়।

২. "অবশেষে ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি শত্রুদের পরাজিত করে বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।" (পূর্ববর্তী সংস্করণ)

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।" (বর্তমান সংস্করণ)

এখানে 'পাকিস্তানি শত্রুদের পরাজিত' এ শব্দ ক'টি শিশুদের উদ্দীপ্ত করে। 'বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয়' শব্দ চারটি বাঙালির গৌরবটা তুলে ধরে। নতুন সংস্করণে যে স্টেটমেন্ট তা সঠিক কিন্তু তা উদ্দীপ্ত করে না, গৌরবান্বিতও করে না।

এখানে ইতিহাসের মাইল ফলকগুলো উল্লেখ করা হয় নি এই কারণে যে, এ ঘটনাগুলো মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছে এবং এর কোনটির সঙ্গে জিয়াউর রহমান জড়িত নয়। শেখ মুজিব যখন এসব ঘটনা পেরিয়ে বাঙালির জননেতা তখন জিয়া সাধারণ নিম্নপদস্থ একজন সেনা অফিসার। এ বিষয়টি এড়াবার জন্যই এ কাণ্ডটি করা হয়েছে।

২৫শে মার্চ পাকিস্তানিরা যে হত্যাযজ্ঞ করেছিল, মুক্তিযুদ্ধ যে রক্তক্ষয়ী হয়েছিল, পাকিস্তানিরা যে শত্রু ছিল, এগুলো উল্লেখ না করার কারণ এগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিল গোলাম আজম ও নিজামীদের দল জামায়াত ইসলামী। এ দল এখন সরকারে। ১৯৪৭ এর পর এই প্রথম তারা (পূর্ব বা পশ্চিম) ক্ষমতায় এসেছে। সুতরাং তাদের কলুষ অতীত ঢেকে রাখার জন্যই বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয় নি। শব্দ, বাক্য এভাবে ইতিহাসের ভাব,

ব্যঞ্জনা সব বদলে দিতে পারে। ছাত্রদের এসব দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করতে পারে অথবা তোতাপাখির মতো নিছক কিছু তথ্য শেখাতে পারে।

শেখ মুজিব ফিরে আসেন ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে। এখানে যে প্যারাটি আছে তাতে দু'দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। দু'টি প্যারাগ্রাফেই তথ্য সঠিক কিন্তু পরিবেশনার কারণে দু'ধরনের চিত্র ফুটে ওঠে। এবং কোন সংস্করণেই শিশুদের জন্য এ প্যারাগ্রাফ না রাখলে ক্ষতি হতো না। কিন্তু আগেই বলেছি, প্রতি আমলে চলে সংযোজন বা বিয়োজন। এখন দু'টি সংস্করণের দু'টি প্যারা পড়লেই বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে।

পূর্ববর্তী সংস্করণ

"১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এলেন এবং সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯৭২ সালে বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি' শান্তিপদক প্রদান করে। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কিছু সংখ্যক ক্ষমতালোভী ষড়যন্ত্রকারীর হাতে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবনে তিনি সপরিবারে নিহত হন। তাই ১৫ই আগস্ট আমাদের 'জাতীয় শোক দিবস'। ঐ দিন আমরা জাতির সেবায় এই মহান নেতার ভূমিকার কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।"

বর্তমান সংস্করণ

"পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে আসেন। প্রশাসক হিসেবে তিনি সার্থকতা দেখাতে পারেন নি। ১৯৭৪-৭৫ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। গুপ্তহত্যা চলে, স্বাধীন মতামত প্রচারে বাধা আসে, রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন নেমে আসে এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে পরিস্থিতি হয় শ্বাসরুদ্ধকর। সে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক অভ্যুত্থানে তিনি তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ব্যতীত সপরিবারে নিহত হন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে শেখ মুজিবের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর মরদেহ পৈত্রিক নিবাস টুঙ্গিপাড়ায় সমাহিত আছে।"

এই দু'টি প্যারাগ্রাফ পড়লে আমার পূর্বোক্ত উক্তির যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। চতুর্থ শ্রেণীর জন্য এটিই যথেষ্ট ছিল যে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি ফিরে আসেন। এবং বাংলাদেশকে গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত থাকার সময় ১৯৭৫ সালে তিনি নিহত হন। বর্তমান সংস্করণে যা দেয়া হয়েছে তা গরল ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি শিশুর মনে রাষ্ট্রের স্রষ্টা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির এ ধরনের হীন প্রচেষ্টা আর কখনও গ্রহণ করা হয় নি, এমন কি জিয়ার আমলেও নয়।

এ দু'টি অনুচ্ছেদের শব্দ চয়নেও দেখবেন অনেক কিছু অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। গত সংস্করণে ছিল দেশকে তিনি গড়ে তোলার কাজে যখন ব্যস্ত তখন 'কিছু সংখ্যক

ক্ষমতালোভী ষড়যন্ত্রকারীর হাতে' নিহত হন। শিশুদের জন্য এই ব্যাখ্যাই যথেষ্ট। বর্তমান সংস্করণে আছে, দেশের পরিস্থিতি 'শ্বাসরুদ্ধকর' করে তোলার কারণে 'এক অভ্যুত্থানে' তিনি নিহত হন। চালাক লেখক ভুলে গেছেন এই 'অভ্যুত্থান'-এর পরই ক্ষমতায় আসেন জিয়াউর রহমান, সুতরাং পরোক্ষভাবে দখল বা অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন জিয়াউর রহমান। আগের সংস্করণে কিন্তু এই ইঙ্গিত ছিল না।

এত কিছু করার পরও বর্তমান সংস্করণে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীর ১৯ নাম্বার লাইনে 'বাঙালি' শব্দটি রয়ে গেছে। আশা করি, এ কারণে, আরো কয়েক কোটি টাকা খরচ করে শব্দটি বাদ দেয়া হবে।

'স্বাধীনতার পথিকৃত'-এর সর্বশেষ রচনা শহীদ জিয়াউর রহমান। ৪৪ লাইনে তাঁর পারিবারিক পরিচয় থেকে শুরু করে সারা জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে বোঝা যায়, তাঁর জীবন কাহিনীতে উপাদানের বড় অভাব।

শেখ মুজিবের আগে আছে বঙ্গবন্ধু, মওলানা ভাসানীর নামের আগে মজলুম জননেতা, সোহরাওয়ার্দীর নামের আগে গণতন্ত্রের মানসপুত্র, ফজলুল হকের আগে শেরে বাংলা। এখন জিয়াউর রহমানের নামের আগেও কিছু সংযুক্ত হওয়া উচিত। যে শব্দটি সংযোজন করা হয়েছে সেটি হচ্ছে 'শহীদ'। ইসলামী ঐতিহ্যে শহীদ শব্দটি যে কারণে ব্যবহৃত হয়, জিয়াউর রহমানের আগে যে তা প্রযোজ্য নয় এটি কাউকে বোঝানো যাবে না। কারণ, এখানে জবরদস্তি কাজ করে। যেহেতু জিয়াউর রহমানের নামের আগে তাঁর অনুসারীরা শহীদ শব্দটি ব্যবহার করতে থাকে, সেহেতু এক সময় আওয়ামী লীগের অনুসারীরাও বঙ্গবন্ধুর আগে শহীদ ব্যবহার শুরু করেন। এটি যে তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয় এটি বিচার বিবেচনায় আসে নি।

জিয়াউর রহমানের পরিবারের আমরা এখানে বিস্তারিত পরিচয় পাই যা বাকী 'চার পথিকৃত'-এর বেলায় পাই না। তাঁর মা যে করাচি বেতারে নিয়মিত নজরুল সঙ্গীত গাইতেন তাও জানতে পারি। জিয়াউর রহমান শিক্ষা জীবন শেষ করে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে কর্তব্যরত ছিলেন। ১৯৭১ পর্যন্ত এই ছিল তাঁর জীবন ইতিহাস, আরো অনেক সাধারণ বাঙালি মেজরের মতো। ১৯৭১ সালে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে কী লেখা হয়েছে তা এখন দেখা যাক—

"১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের ওপর আক্রমণ করলে জিয়া তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের, বিশেষত আওয়ামী লীগের কোন কর্মসূচি না থাকায় সবাই বিভ্রান্ত অবস্থায় ছিলেন। সে পরিস্থিতিতে জিয়াউর রহমান এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ২৬শে মার্চ চট্টগ্রামস্থ কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তখন থেকেই হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে ১১ জন সেক্টর প্রধান নিয়োগ করা হয়। জিয়াউর রহমান ছিলেন ১ নং সেক্টরের অধিনায়ক। তাঁর পরিচালিত বাহিনীকে বলা হয় জেড ফোর্স।"

শেষের তিনটি লাইন ছাড়া বাকী সব ক'টি লাইন অসত্য। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রমাণ থাকবে প্রবন্ধের শেষাংশে।

তবে কিছু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করছি এ পরিপ্রেক্ষিতে। প্রতিটি লাইন ধরেই মন্তব্য করছি—

১. পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করলে জিয়া তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান? কী অসম্ভব কথা।
২. আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচি ছিল না? বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ তা হলে কী বলেছিলেন?
৩. জিয়াউর রহমান কীভাবে 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত' নিলেন। কালুরঘাটে বেতার কর্মীরা একজন সামরিক কর্মকর্তাকে খুঁজছিলেন। পেয়ে গেলেন তাঁরা মেজর জিয়াকে। তাঁকে বেতার কেন্দ্রে এনে ঘোষণা দেওয়ালেন। জিয়াউর রহমান ছাড়া অন্য যে কোনো মেজর, ক্যাপ্টেনকে পেলেও তাঁরা তাকেই আনতেন। এখানে জিয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো ব্যাপারই ছিল না। তাঁকে ঘোষণার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল মাত্র।
৪. জিয়ার ঘোষণার ব্যাপারটি সর্বৈব মিথ্যা। জিয়া নিজেও তা দাবি করেন নি। এমন কি বিএনপির পূর্ববর্তী আমলের পাঠ্য বইয়েও তা নেই।
৫. জিয়ার "স্বাধীনতা ঘোষণা'র পরই যুদ্ধ শুরু হয়। এটিও সর্বৈব মিথ্যা।
৬. জিয়া কি সারাটা সময় সেক্টর কমান্ডার ছিলেন?

এরপর বর্ণিত হয়েছে তাঁর প্রেসিডেন্ট হওয়ার কাহিনী।

এর পর লেখা হয়েছে—

"তারপর শুরু হয় দেশ পুনর্গঠনের সুকঠিন দায়িত্ব। তাঁর কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের মর্যাদা সম্পন্ন পরিচিতি অর্জন, যুব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন, নারীদের দেশ গঠনের মূল ধারায় নিয়ে আসা। শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ। জিয়ার প্রবর্তিত দুইটি আদর্শ দেশ গঠনের প্রেরণা হয়ে ওঠে—একটি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, দ্বিতীয়টি স্বনির্ভর বাংলাদেশ। তিনি দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন।"

এই প্যারাটি পড়তে হবে শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর রচিত জীবন কাহিনীর ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের পাশাপাশি। তা'হলেই কর্তৃপক্ষের মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কার হবে। তারা চেয়েছেন শেখ মুজিবকে যতটা সম্ভব হেয় করা যায় তা করার এবং জিয়াউর রহমানকে যতটা মহিমান্বিত করা যায় করার। জিয়ার বিষয়ে যে ছ'টি লাইন রচিত হয়েছে তা জিয়া অনুসারীদের সাধারণ বক্তব্য।

জিয়ার মৃত্যু সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটিও লক্ষণীয়।

"১৯৮১ সালের ৩০ শে মে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিভ্রান্ত সদস্যদের হাতে শহীদ হন। তাঁর জানাজায় কয়েক লক্ষ লোক অংশ নিয়েছিল। ঢাকার শেরে বাংলা নগরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।"

এই অনুচ্ছেদের প্রতিটি বাক্যই সত্য। কিন্তু শব্দ ব্যবহার ও বাক্য গঠন লক্ষ করুন। বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছিলেন সেনাবাহিনীর দ্বারা। যে যত কথাই বলুন দেশের স্রষ্টাকে সেনাবাহিনী হত্যা করল এটা সেনাবাহিনীর জন্য প্রশংসনীয় কোনো ব্যাপার নয়। এ দায় থেকে সেনাবাহিনী কখনও মুক্ত হতে পারবে না। পৃথিবীতে তখন কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা আমাদের কারো অজানা নেই। 'বঙ্গবন্ধু' 'বঙ্গবন্ধু' বলতে বলতে তাঁর অনুসারীরা

অজ্ঞান কিন্তু এ কাজগুলো কেউ করেন নি। ঐ প্রতিক্রিয়া দিয়ে কয়েকশ' পাতার বই হতে পারে। সেখানে, সেনাবাহিনীকে দায়মুক্ত করা হয় নি। সে জন্য সেনাবাহিনী শব্দটি ব্যবহার না করে অভ্যুত্থান ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকে অনেক যুক্তি তর্ক দিতে পারবেন কিন্তু আদর্শগত দিক থেকে সেনাবাহিনীর আদর্শ/ব্যবহার জিয়া অনুসারীদের কাছাকাছি—এর বিপক্ষে প্রমাণ যোগাড় কষ্টকর। এবং সে কারণেই জিয়াউর রহমান-কে হত্যাকারী সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে 'কতিপয় বিভ্রান্ত সদস্য'। ষড়যন্ত্রকারী শব্দটিও ব্যবহৃত হয় নি। কোন পথিকৃতের জানাজায় কত লক্ষ মানুষ হয়েছিল তা কারো জীবনীতে জানান হয় নি। কিন্তু, এখানে হয়েছে এটিই প্রমাণ করতে বাকী চারজনের থেকে জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন অধিক জনপ্রিয়। কেন এত মানুষ হয়েছিল তার ব্যাখ্যাতো দেয়া যায় কিন্তু সে ব্যাখ্যা না দেয়া আমি সমীচীন বোধ করছি।

বর্তমান সংস্করণে আরো উল্লেখ করা হয়েছে—"জিয়াউর রহমানের কয়েকটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত সততা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন কিংবদন্তীর মত শোনায়। দেশের মানুষকে দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি বলতে গেলে সারাদেশে হেঁটে বেড়িয়েছেন। নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ ও মেহনতি মানুষ দিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। যুগযুগান্তরের শেকল ভেঙ্গে মেয়েদের দেশের মূল কর্মকাণ্ডে জড়িত করার পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন। তাঁর প্রিয় গানের মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁর মূল প্রেরণা—

"প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ
জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ।"

জিয়াউর রহমানের 'ব্যক্তিগত সততা ও অনাড়ম্বর জীবন কিংবদন্তীর মতো শোনায়।' বিশেষ কারণে 'কিংবদন্তী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে বাকী চারজনের তুলনায় তাঁকে মহিমান্বিত করা যায়। মেনে নিলাম সে কথা। তবে 'দেশ গঠনে উদ্বুদ্ধ' করার জন্য পায়ে হেঁটে বেড়ালেই চলে এটি জানা ছিল না।

পঞ্চম শ্রেণির 'পরিবেশ-পরিচিতি সমাজ'-এ আছে বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রসঙ্গ।[২৭] সংকলনের প্রথম অধ্যায় : বাংলার ইতিহাস ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়। পরিবর্তন করা হয়েছে শুধু এই অধ্যায়টি। এবং শুধু মুক্তিযুদ্ধের অংশটি।

চতুর্থ শ্রেণিতে ছাত্ররা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে যা পড়ে আসবে এবং পঞ্চম শ্রেণিতে যা পড়বে তার সঙ্গে বেশ পার্থক্য আছে। পঞ্চম শ্রেণীতে যথাযথভাবে ৭০-এর নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন, ৭ই মার্চ বক্তৃতার উল্লেখ আছে। "স্বাধীনতার জন্যে জনগণের প্রতি 'সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ছাত্রটির মনে প্রশ্ন জাগতে পারে চতুর্থ শ্রেণীতে এর কিছুরই উল্লেখ নেই। এখানে আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং স্বাধীনতার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করছেন এবং তার অকাট্য প্রমাণ ৭ই মার্চের জনসভার ছবি। তারপর হঠাৎ মঞ্চে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব। কী ভাবে?

পূর্ববর্তী সংস্করণ

"ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে সেই রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ দিন রাতেই তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয়ে যায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা দেশবাসীকে জানানোর জন্য ২৬ শে মার্চ চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাটি প্রচার করেন। ২৭ শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুর ঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার আর একটি ঘোষণা প্রচার করেন।"

বর্তমান সংস্করণ

"ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে সেই রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ দিন রাতেই তারা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেন। দিক নির্দেশের অভাবে দেশবাসী হতবুদ্ধি ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখন এগিয়ে এলেন মেজর জিয়াউর রহমান। তিনি ২৬শে মার্চ তারিখে চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায় (বর্তমান মুজিবনগর) সত্তরের নির্বাচনে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি সরকার গঠন করেন। ... মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন কর্ণেল এম. এ. জি. ওসমানি।"

অনুচ্ছেদ দু'টিতে পার্থক্য লক্ষণীয়। নতুন সংস্করণে যুক্ত হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত দু'টি লাইন আর পরিত্যক্ত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শব্দটি। ৭ই মার্চের জনসভার ছবির বদলে বঙ্গবন্ধুর একটি প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে। ৭ই মার্চের জনসভার ছবি প্রমাণ করে বাঙালিদের নেতৃত্ব কে দিয়েছিলেন। সে জন্য এটি বাদ দেয়া হয়েছে। চরম সৌজন্যহীনতা প্রদর্শন করে বাদ দেয়া হয়েছে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদের ছবি। জিয়াউর রহমানের ছবি আগেও ছিল এখনও আছে। কিন্তু, ছাত্রটির মনে তো প্রশ্ন জাগতে পারে যিনি 'দিক নির্দেশনা' দিলেন তিনি কেন রাষ্ট্রপতি বাদ দিলাম, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, নিদেন পক্ষে কোনো মন্ত্রী হলেন না? বা মুক্তিবাহিনীর প্রধান? এ প্রশ্নই পুরো বিষয়টি আরোপিত করে তোলে।

এরপরের অংশটুকুতে হানাদার বাহিনীর অত্যাচার, ভারতের সাহায্য, ত্রিশলক্ষ শহীদের কথা আছে। কিন্তু পরিত্যক্ত হয়েছে ৫ লাইন। এবং এটি অমার্জনীয় অপরাধ। সেই পাঁচটি লাইন হলো—"মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদেশীয় কিছু লোক পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। এমনকি তারা অনেক নিরীহ বাঙালিকে নির্যাতন ও হত্যা করে। পাকিস্তানিদের এই দোসররা রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ইত্যাদি নামে পরিচিত। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পূর্বক্ষণে তারা এদেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী ও

সাংবাদিকসহ বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের স্মরণে ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়।"

জামায়াত সদস্যরা ছিল প্রধানত আল-বদর, আল-শামসের সদস্য। যেহেতু তারা এখন সরকারে তাই আল-বদরদের নৃশংসতার কথা বাদ গেছে। বিএনপি এবং জামায়াত যেহেতু মনে করে বুদ্ধিজীবীরা তাদের প্রাধান্য বিস্তারে একটি প্রতিবন্ধক তাই শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের কথা বাদ গেছে। কিন্তু তাতে কি সমস্যার সুরাহা হবে? ১৪ই ডিসেম্বর তো সরকারিভাবেই পালন করতে হবে। তবে, ইন্টারেস্টিং হচ্ছে সবখানে 'বাঙালি' শব্দটি অক্ষুণ্ন থেকে গেছে। এবং এই শব্দের স্পিরিটের সঙ্গে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের (অর্থাৎ জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা) স্পিরিট খাপ খায় না। ফলে, এই রচনায় আরেক ধরনের বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে।

ছয়

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে সাহিত্য বিষয়ক একটি বাংলা সংকলন পাঠ্য করা হয়েছে। ১৬টি 'গদ্য' ও ১৩টি 'কবিতা' নিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য সংকলিত হয়েছে *চারুপাঠ*।[২৮] পূর্ববর্তী সংস্করণে বোর্ডের চেয়ারম্যান তপনকান্তি চৌধুরী 'প্রসঙ্গ কথা'য় লিখেছেন—"আমরা আশা করি, ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক 'চারুপাঠ'-এ বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সম্প্রতি সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংবলিত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় কমিটির সুপারিশক্রমে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কিছু বিষয়বস্তু সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।"

বর্তমান সংস্করণের 'ভূমিকা'র জন্য ডঃ সফিউর রহমানকে ধন্যবাদ। তিনি অন্তত 'মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস-এর বদলে 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' লিখেছেন। কারণ, 'চারুপাঠে' বিয়োজিত হয়েছে একটি গদ্য, আছে অন্য আরেকটি যাতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে, তবে সঠিক ইতিহাস নয়।

সম্পাদক মাহবুবুল হক যার 'গদ্য' বাদ দিয়েছেন, তিনি অতি শ্রদ্ধেয়, পরলোকগত রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭)। তাঁর 'গদ্য' টি একটি গল্প, নাম 'মাল্যদান', মুক্তিযুদ্ধের পরপর লেখা, অসাধারণ ব্যঞ্জনাময়। কিন্তু, এই পরিবর্তন কেন করলেন ডঃ হক? হয়ত এর একটি কারণ, রণেশ দাশগুপ্ত হিন্দু। কারণ, বর্তমান সরকারের একটি এজেন্ডা 'এথনিং ক্লিনসিং'। তবে, সেটি না হলেও, যে কারণে রণেশ দাশগুপ্তের রচনা বাদ গেছে তার কারণ তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। সেটি হলো, বধ্যভূমি। অন্যদিকে সাহিদা বেগমের 'গদ্য' 'রক্ত লেখা মুক্তিযুদ্ধ' নিছক রচনাই। ২৫ শে মার্চ থেকে ২৬শে মার্চ কী ঘটেছিল বাংলাদেশে, তার সাধারণ বিবরণ।

রণেশ দাশগুপ্তের মাল্যদানের বিষয়, অধ্যাপক কামাল ঝালকাঠিতে যাচ্ছেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, সেখানে এক বধ্যভূমিতে গিয়ে তিনি মাল্যদান করলেন। গল্পের প্রথমাংশ ও শেষাংশ থেকে উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যাবে কেন এই গল্পটি বাদ দেয়া হয়েছে।

'মাল্যদান'-এ শুরুটা এ রকম—

"একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের জয়ের পর ঘরে ফিরে এল ঘরছাড়া মানুষ। দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল এক কোটি লোক। আর দেশের ভিতরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেরিয়েছিল আরও এক কোটি। এবার সবার নিজের নিজের ঘরে ফেরার পালা। যারা ঘরে ফিরে এলে তারা দেখল, যাদের রেখে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকে নেই।

হিংস্র পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও স্থানীয় আল-বদর রাজাকাররা গ্রামের পর গ্রামে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধা সমেত অসংখ্য মানুষকে জড়ো করে খুন করেছিল। প্রায় প্রত্যেকটা মহকুমায় কয়েকটা করে বধ্যভূমি তৈরি হয়েছিল।"

"তারপর দেখি মুক্তিযোদ্ধা কামাল চলছেন ঝালকাঠিতে। বধ্যভূমির স্মৃতি বেদিতে দু'টি মালা দিলেন। কিন্তু জোরালো হাওয়া মালা দু'টিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একজন ছাত্র খুঁজে পেতে দু'টি মাথার খুলি নিয়ে এল মালা দু'টি চাপা দেয়ার জন্য। আশ্চর্য হয়ে অধ্যাপক কামাল বললেন—"

"আশ্চর্য! যাদের মালা দেওয়া হচ্ছে তাদেরই হয়ে দু'জন কি তোমার হাতে উঠে এসেছে। কিন্তু এদের নিশ্চয়ই নাম ছিল। কি নাম? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি খুলি দুটো তুলে চিৎকার করে উঠলেন, "এদের একজনের নাম যেন পারুল", আরেকজনের নাম সিতারা। পারুল আর সিতারার জন্য রইল মালা।"

"তারপর অধ্যাপক কামাল ঐ দুটি মালার খুলি দিয়েই মালা দুটি চাপা দিলেন সেই স্মৃতিফলকের ওপর। মালা দুটিকে দেখে মনে হল, মালা গলায় পারুল আর সিতারা বেদির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। অধ্যাপক চলে এলেন মিছিলের মাথায়। কাউকে আর কিছু খুলে বললেন না। বধ্যভূমিতে যাদের প্রাণনাশ করা হয়েছিল, তাদের নিকট আত্মীয়রা দ্বিধায় পড়লেন এই খুলি নিয়ে। তার চেয়ে বরং সকলের তরফ থেকে মালা দিয়ে তাঁদের স্মৃতিপটে বাঁচিয়ে রাখা যায়।"

আগেই উল্লেখ করেছি জামায়াত বাহিনী ছিল আল-বদরের স্রষ্টা। সেই বাহিনীর প্রধান নিজামী এখন কৃষিমন্ত্রী ও কর্মকর্তা মোজাহিদ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী। সেই আল-বদরদের হত্যা যজ্ঞ বর্ণিত হয়েছে এ গল্পে। জোট সরকারের সেটি পছন্দ হবার কথা নয়। কিন্তু, ১৯৭১ সালে সারা বাংলাদেশকেই তো হানাদার বাহিনী ও আল-বদররা পরিণত করেছিল বধ্যভূমিতে যার নিদর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে। সেই নিদর্শন স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলতে হলে তো সব স্মৃতিসৌধ গুড়িয়ে দিতে হবে। রায়ের বাজার, মিরপুর, সাভার-এর সব স্মৃতিসৌধ মিশিয়ে ফেলতে হবে ধুলোয়। সেটি কি সম্ভব? যদি সম্ভব মনে হয়, করুন, আমরা তা দেখতে চাই।

সাহিদা বেগমের সাদামাটা বিবরণের শেষের দিকে চারটি লাইন উল্লেখযোগ্য। সেগুলো হলো—

"২৬শে মার্চ অল্পক্ষণের জন্য চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হল। ২৬ শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান সেই বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। বিশ্ববাসী শুনল, বাঙালি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। শত্রুর অস্ত্রের মোকাবেলা করতে সশস্ত্র যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া জাগাল সর্বত্র। শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ।"

পত্রিকায় এ লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিদা বেগম ফোনে আমাকে জানিয়েছেন ১৯৯৬ সালে যখন 'চারুপাঠ' প্রকাশিত হয় তখন তাঁর লেখায় ছিল—

"২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান সেই বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে দিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা।"

সপ্তম শ্রেণির জন্য পাঠ্য সপ্তবর্ণা যেটি আমি সংগ্রহ করতে পারি নি। তবে জানি যে সেখানে 'জাতীয় চার নেতা' নামে একটি রচনা সংকলিত হয়েছিল। ৩রা নভেম্বর ঢাকা জেলে হত্যা করা হয় তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও এম. কামারুজ্জামানকে। মুক্তিযুদ্ধের এই চার নেতাকে নিয়েই রচিত হয়েছিল রচনাটি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে এই চার নেতার অবদান মুছে দেওয়ার জন্য বর্তমান সংস্করণে তা বাদ দেয়া হয়।

অষ্টম শ্রেণিতে পাঠ্য সাহিত্য কণিকা।[২৯] সাহিত্য কণিকায় পাঁচটি জীবনী সংকলিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। তবুও 'স্বাধীনতার পথে স্মরণীয় যাঁরা' শিরোনামে পাঁচজনের জীবনী সংকলিত হয়েছে। এই পাঁচটি জীবনীর তিনটি লিখেছেন ডঃ সাঈদ-উর-রহমান বাকী দু'টি কাজী সিরাজউদ্দিন। চতুর্থ শ্রেণিতেও স্বাধীনতার পথিকৃত হিসেবে এই পাঁচজনের জীবনী সংকলিত হয়েছে। সেখানে রচয়িতার নাম ছিল না। বর্তমান সংকলনের পাঁচটি রচনা দেখে মনে হচ্ছে ঐ পাঁচটির রচয়িতাও এই দুই জন। সুতরাং, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার খুব একটা অবকাশ নেই। কিন্তু, যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের জীবনী দুটি বিস্তৃত সে কারণে এ দু'টি রচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আলোচনা করব।

প্রথমেই দেখা যাক কার ওপর কত লাইন ব্যয়িত হয়েছে—

আবুল শহীদ ফজলুল হক ৫০
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৩৯
আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৬৮
শেখ মুজিবুর রহমান ১০৮
জিয়াউর রহমান ১৫০

প্রথম তিনটির রচয়িতা ডঃ রহমান। বাকী দু'টির জনাব সিরাজ। এখানে লক্ষণীয়, বাংলাদেশ গঠনে যাঁর অবদান ন্যূনতম তাঁর জন্য বরাদ্দ ১৫০ লাইন। অন্যদিকে যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁর ও তাঁর গুরুর জন্য বরাদ্দ ১০৮ ও ৩৯ লাইন। এই অসঙ্গতি দৃষ্টিকটু। সম্পাদক [ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম] কেন এ বিষয়ে নজর দিলেন না তা বোধগম্য নয়।

ড. সাঈদ-উর-রহমান যেহেতু গবেষক ও অধ্যাপক তাই তাঁর রচনায় একটি কাঠামো আছে। সে কাঠামোর ভিত্তিতে তিনি জীবনী তিনটি রচনা করেছেন ফলে রচনা তিনটিতে এক ধরনের ভারসাম্য আছে। যদিও লাইনের হিসেবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন কার প্রতি তাঁর পক্ষপাত বেশি।

কাজী সিরাজউদ্দিন লিখেছেন বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমানের জীবনী। শেখ মুজিবের জীবনীটি পড়ে গেলে প্রথমে মনে হবে সব তথ্যই ঠিক আছে কোনো ভুল নেই। তারপর

জিয়াউর রহমানের জীবনের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে আসলে তিনি কী বলতে চেয়েছেন শিক্ষার্থীদের। তাঁর মূল বক্তব্য হলো—বাংলাদেশে মহামানব একজনই জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন জিয়াউর রহমান। এছাড়াও কথা থাকে। শেখ মুজিবের যে মূল্যায়ন তিনি এখানে করেছেন তা অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কতটা যুক্তিযুক্ত তাও ভেবে দেখার বিষয়।

শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের জীবনী কীভাবে শুরু করা হয়েছে প্রথমে তা উল্লেখ করেছি কারণ তা'হলেই পর্যালোচনা করে তফাৎটা বোঝা যাবে।

শেখ মুজিবুর রহমান

"ছোট নদী বাইগার এর কূলে টুঙ্গিপাড়া গ্রাম। গোপালগঞ্জ জেলার এই গ্রামেই ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফুর রহমান ও মাতার নাম সায়রা খাতুন। পিতা গোপালগঞ্জ মহকুমা (তৎকালীন) আদালতের কর্মচারি ছিলেন। গ্রামেই বেড়ে ওঠেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ডাক নাম ছিল খোকা। গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক স্কুলে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। পরে তিনি তাঁর পিতার কর্মস্থল গোপালগঞ্জ যান এবং গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে ২২ বছর বয়সে মেট্রিক (বর্তমান এসএসসি) পাশ করেন। এরপর ১৯৪২ সালে শেখ মুজিব কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন।"

জিয়াউর রহমান

"বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলায় সবুজ বনানী ঘেরা ছায়া সুনিবিড় এক গ্রামের নাম বাগবাড়ি। ব্রিটিশ আমল থেকেই গ্রামটিতে নিয়মিত শিল্প সংস্কৃতির চর্চা হতো। আশেপাশের গ্রামের তুলনায় এখানে শিক্ষিতের হারও ছিল বেশি। ১৯৩৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি এই গ্রামেই আজানের ধ্বনিতে ঘোষিত হয় ধরণীর বুকে এক নবজাতকের আগমনী বার্তা। নবজাত শিশুর নাম জিয়াউর রহমান। তাঁর পিতার নাম মনসুর রহমান এবং মাতার নাম জাহানারা খাতুন। বাগবাড়ি গ্রামের মননশীল চিন্তার অধিকারী আদর্শবাদী পুরুষ মৌলভী কামাল উদ্দিন ছিলেন জিয়াউর রহমানের দাদা এবং বেগম মিসিরান্নেসা ছিলেন দাদী।

জিয়াউর রহমানের ডাক নাম ছিল কমল। পিতা মনসুর রহমান ছিলেন একজন কেমিস্ট। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের আগে তিনি কলকাতায় বসবাস করতেন। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি চাকুরিসূত্রে করাচি চলে যান। জিয়াউর রহমানের মাতা জাহানারা খাতুন ছিলেন একজন সঙ্গীত শিল্পী। তিনি ভাল নজরুল গীতি গাইতেন, এক সময় করাচি রেডিওর নিয়মিত শিল্পী ছিলেন।"

বোঝা যায় মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি জিয়ার জীবনী লিখেছেন। জানি না, ইনিই সেই কাজী সিরাজ কিনা যাকে একসময় জিয়াউর রহমান বিএনপি থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। তবে, যেহেতু মনের মাধুরী মিশিয়ে লেখা তাই তাতে অনেক সময় সত্য-মিথ্যা এক হয়ে গেছে।

ভূমিকা দু'টি দেখলে বোঝা যায়, লেখক বলতে চেয়েছেন জিয়াউর রহমানের পরিবার, অভিজাত ও আদর্শবাদী। যেমন, শেখ মুজিবের বাবা ছিলেন—'কর্মচারী'। আর জিয়ার পিতা-মাতা শিক্ষিত, সংস্কৃতি সেবী ছিলেন তো বটেই তাঁর দাদা ছিলেন—'মননশীল চিন্তার অধিকারী আদর্শবাদী পুরুষ মৌলভী।' শুধু তাই নয় জিয়ার জন্মস্থানে 'নিয়মিত শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা হতো', 'শিক্ষিতের হারও ছিল বেশি' এবং সেখানেই 'আজানের ধ্বনিতে ঘোষিত হয় ধরণীর বুকে' একজন জিয়ার অর্থাৎ জন্মের সময়, বঙ্গবন্ধুর পরিবার থেকে শুরু করে কোন কিছুরই জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তুলনা হয় না। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে একমাত্র বাগবাড়ি গ্রামটিই 'সবুজ বনানী ঘেরা ছায়া সুনিবিড়' যেহেতু তা মেজর জিয়ার জন্মস্থান। বাকী গ্রামগুলো বিশেষ করে শেখ মুজিব যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন তা হতশ্রী।

শেখ মুজিবের শিক্ষা জীবনের কথা তেমন উল্লিখিত হয়নি, যদিও জিয়া ছিলেন আই এ পাশ—তাঁরটি বেশ যত্ন সহকারে পরিবেশিত হয়েছে। শেখ মুজিব তরুণ বয়সেই রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবন আলোচনায় ব্যয়িত হয়েছে ১২ লাইন।

জিয়ার কর্মজীবন শুরু ১৯৫৩ সালে। ফলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ (শেখ মুজিবের কর্ম জীবন) সাল পর্যন্ত সময়টুকু পূরণের জন্য দরকার হয়ে পড়ে কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে রচনার।

'সেটি কেমন—

"বাল্যকালে জিয়াউর রহমান খুব লাজুক ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। বলতেন কম, বুঝতে চাইতেন বেশি। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে বসবাস ও অধ্যয়নকালে তিনি আজকের বাংলাদেশের জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বিদ্বেষ, অবজ্ঞা ও দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন। এবং তা থেকে তাঁর নিজের ভেতর অতি অল্প বয়সেই গভীর দেশপ্রেম ও স্বজাত্যবোধ জাগ্রত হয়। পরিণত বয়সে তিনি ছিলেন একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, চিন্তাশীল ও বাস্তববাদী মানুষ। সততা, নিষ্ঠা, নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে জিয়াউর রহমান সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন একজন সফল সৈনিক, সফল রাষ্ট্রনায়ক ও সফল রাজনীতিবিদ। ব্যক্তি হিসেবেও তিনি ছিলেন সজ্জন।"

এত বিশেষণ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় নি। জিয়ার দেশপ্রেম নিয়ে কেউ মন্তব্য করবে না, তবে 'স্বজাত্যবোধ' নিয়ে প্রশ্ন আছে। এ বিষয়ে তিনি বা তাঁর সহকর্মীরা কখনও আলোকপাত করেন নি। এ বিষয়ে এখানেই প্রথম জানা গেল।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন আর জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এ সবের বিবরণ আছে। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, তোফায়েল আহমদ নিজে থেকে নয় জনতার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। বিষয়টির উল্লেখ থাকলে শোভন হতো। কিন্তু সে ভাবে তা বিবৃত হয় নি কারণ তা'হলে বিষয়টা দাঁড়ায় জনগণ ভালোবেসে শেখ মুজিবকে উপাধি দিয়েছিল 'বঙ্গবন্ধু'। ৭ই মার্চের

জনসভার উল্লেখ করা হয়েছে এ ভাবে—"শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসভা ডাকেন এবং বিপুল সংখ্যক জনতার উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ৭ই মার্চ শেখ মুজিব তাঁর ভাষণ শুরু করেন এই বলে যে—"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়।" এটাই কি ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য? এ ক'টি লাইন দেয়া হয়েছে—'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'—লাইনটি বাদ দেয়ার জন্য। তারপর আছে—"২৫ শে মার্চ রাতের অন্ধকারে এ দেশের ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে শুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। ২৫শে মার্চে রাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।"

অন্যদিকে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, আমি তার প্রতিটি লাইন নিজের মন্তব্য সহ উদ্ধৃত করছি—

১. "১৯৭১-এর মার্চের গোড়া থেকে পাকিস্তানিরা তাঁর গতিবিধির ওপর নজরদারি শুরু করে।" জিয়াউর রহমান ও তাঁর সহকর্মীদের কোনো সাক্ষ্যে এ বিষয়টি নেই।

২. "গোয়েন্দারা তাঁর সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করতে থাকে।" ঐ

৩. "কিন্তু কোনো কিছুই জিয়াউর রহমানকে তাঁর কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে নি।" ঐ। কী কাজ করছিলেন যে তাঁকে নিবৃত্ত করার দরকার পড়বে?

৪. "তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তানিরা সত্তরের নির্বাচনী ফলাফল মেনে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এবং যে কোনো সময় সশস্ত্র অভিযান ও হত্যা যজ্ঞ শুরু করতে পারে।"ঐ

৫. তিনিও পাল্টা আঘাত হানার জন্য নিচ্ছিলেন গোপন প্রস্তুতি।"

জিয়াউর রহমানের ভাষ্যে জানা যায়, ২২ শে মার্চ ক্যাপ্টেন রফিক যোগাযোগ করেন এবং তাঁদের কাছে মনে হয় "কিছু একটা হবে।"

এরপরের অনুচ্ছেদটি রচনার জন্যই লেখক ১৫০ লাইন খরচ করেছেন। বা পাঠ্য বই বদলানোর সেটিই ছিল মূল উদ্দেশ্য। সে জন্য এই অংশটি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন মনে করছি—

"১৯৭১ সালের ২৫শে ও ২৬শে মার্চের মধ্য রাতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী অতর্কিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫শে মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ১৯৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিজয়ী সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার বরণ করেন এবং তাঁকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই দলের অন্য নেতারাও কেউ প্রাণভয়ে পালিয়ে যান ভারতে, কেউ আত্মগোপন করেন। অপ্রস্তুত, অসংগঠিত ও নেতৃত্বহীন

অবস্থায় জাতি যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঠিক তখনই কাণ্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সময়ের সাহসী সন্তান মেজর (তৎকালীন) জিয়াউর রহমান। প্রভিশনাল বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণায় জাতি দিক-নির্দেশনা লাভ করে; জনগণ সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত হয়।"

পুরো অনুচ্ছেদের মর্মার্থ হয়, বাঙালির তৎকালীন অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব নন, একটি রাজনৈতিক দলের নেতা মুজিব ইচ্ছাকৃত ভাবে গ্রেফতার 'বরণ' করেন। এই সময় বীর বালকের বেশে এগিয়ে আসেন মেজর জিয়া। তাঁর দিক-নির্দেশে জাতি লড়াই শুরু করে। লেখক ভুলে গেছেন, মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রেই উল্লিখিত আছে ২৫শে মার্চ রাত থেকেই সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় অসংগঠিত প্রতিরোধ শুরু হয়। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে মুক্তিবাহিনী সংগঠিত হয় এবং জিয়াকে করা হয় একটি সেক্টরের কমান্ডার।

লেখক উল্লেখ করেছেন, "যুদ্ধ শুরুর আগে পাকিস্তানি বাহিনী জিয়াউর রহমানকে হত্যার চক্রান্ত করেছিল।" তারপর এক পৃষ্ঠার বর্ণনা—সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের জন্য জিয়ার গমন, প্রত্যাবর্তন, জানজুয়াকে গ্রেফতার ইত্যাদি। তারপর লেখক উপসংহারে পৌঁছেছেন—

"জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন মহান দেশ প্রেমিক ও প্রকৃত বীর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগঠিত করেছেন, সম্মুখ যুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধের সামরিক নেতৃত্বও দিয়েছেন।"

না, শেখ মুজিবুর রহমান এসব কিছুই ছিলেন না। জিয়ার কাছে তিনি নস্যি। কারণ, তিনি দেশে ফিরে "দেশের শাসন স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রশাসক হিসেবে তিনি সার্থকতা দেখাতে পারেন নি। অন্যদিকে জিয়া কী ভাবে উপ-সেনাধ্যক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট হন তাঁর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে—"১৯৮১ সালের ৩০ মে ঘাতকের হাতে শাহাদত বরণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সর্বকালের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও সফল প্রেসিডেন্ট। আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকার ছিলেন তিনি।"

"জিয়াউর রহমান ঘাতকের হাতে শাহাদত বরণ' করেন। অর্থাৎ সেনাবাহিনীর হাতে নয়। অন্যদিকে, "একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থায় জনগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠার এক পর্যায়ে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে। শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল সরকারের পতন হয় ও মুজিব সপরিবারে নিহত হন।" অর্থাৎ জিয়া যে সেনাবাহিনীর উপ-সেনাধ্যক্ষ ছিলেন সে বাহিনী এর সঙ্গে জড়িত নয়।

শেখ মুজিবের শাসনকাল খুব খারাপ ছিল। সিরাজউদ্দিনের লেখা দেখেই তা বোঝা যায়, কী রকম খারাপ ছিল? তাঁর ভাষায়—

"দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, গুপ্ত হত্যা চলে, রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন নেমে আসে, একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হয়,

দেশের পরিস্থিতি হয় শ্বাসরুদ্ধকর। তিনি ১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারি সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন।"

"শেখ মুজিবুর রহমানের রক্ষীবাহিনী গঠন ও বাকশাল গঠনের সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে সমালোচনা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর সমান্তরাল বাহিনীতে পরিণত করায় সেনাবাহিনীতে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের ভূমিকায় জনগণ হয়ে উঠেছিল রুষ্ট। বাকশাল গঠন করে তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে ডিকটেটরিয়াল শাসন পদ্ধতিতে ফিরে যান। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দলের নামকরণ করা হয়—বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ, সংক্ষেপে বাকশাল। এর ফলে দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে যায়, ৪টি দৈনিক পত্রিকা রেখে বাদবাকি সকল পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সরকারি কর্মচারীদের বাকশালে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। সংবিধানে এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা বাতিল করে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি চালু করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রেসিডেন্ট ঘোষিত হন। তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। সে প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনীর এক বিক্ষুব্ধ অংশের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাকশাল সরকারের পতন ঘটে। সে দিন থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি নতুন পথে যাত্রা করে।"

অন্যদিকে জিয়ার আমল ছিল স্বর্ণযুগ। অন্তত কাজী সিরাজের ভাষ্য তাই। জিয়া "দেশ পুনর্গঠনের জন্য" ১৯ দফা ঘোষণা করেন (বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। " তাঁর কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন পরিচিতি অর্জন, দেশের যুব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন, নারীদের দেশ গঠনের মূল ধারায় নিয়ে আসা, শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ। জিয়ার প্রবর্তিত দুটি আদর্শ দেশগঠনের মূল প্রেরণা হয়ে ওঠে—একটি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, দ্বিতীয়টি স্বনির্ভর বাংলাদেশ। প্রথমটি বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট পরিচিতি দেয়, দ্বিতীয়টি বাংলাদেশকে পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ তৈরি করে। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন করেন। জিয়া দেশের হাল ধরে দ্রুত সামরিক শাসন তুলে দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ দেশের জনগণের হৃত অধিকার ফিরিয়ে দেন। তিনি দ্রুত দ্বিধাবিভক্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতির মাধ্যমে হতাশ জনগণের মনে আবার আশার সঞ্চার করেন। তিনি জনগণের হৃদয়ে অবিসংবাদিত জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক নেতার আসন লাভ করেন। তাঁর দেশপ্রেম ও আপসহীনতার জন্য দেশ ও জনগণের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন।"

কাজী সিরাজ তাঁর ভাষ্যে অনেক কিছু উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার কতোটুকু সত্য? এ পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ পাঠকদের ধারণার জন্য কিছু তথ্য উল্লেখ করছি। কারণ, এ বিষয়গুলো পুরনো হয়ে গেছে। নতুন প্রজন্ম কেন পুরনো প্রজন্মেরই অনেকের এ সব কথা

মনে নেই। তা ছাড়া, সব কিছু আমরা সহজে ভুলে যেতে ভালোবাসি। এ তথ্যগুলোর সঙ্গে কাজী সিরাজের ভাষ্য মেলালে বোঝা যাবে কতোটা কল্পনা আর কতোটা সত্য।

১৯৭৭ সালের ১৮ই ও ১৯শে ফেব্রুয়ারি সমাজ কল্যাণ অধিদফতরের উদ্যোগে শেরেবাংলা নগরে প্রথম জাতীয় যুব কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। 'উৎপাদনের রাজনীতি' এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যুবকদের একত্রিত করে কাজ করার পরিকল্পনা ছিল এর উদ্দেশ্য। জিয়াউর রহমান তাঁর বক্তৃতায় বলেন 'সমবায়ই বিপ্লব বিপ্লবই সমবায়।" এ উদ্দেশ্যে 'জাতীয় যুব সংস্থা প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়েছিলো, এ যুব শক্তি গ্রাম সরকার ও অন্যান্য উৎপাদনের রাজনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে এবং স্থানীয় হাটবাজারে তোলা বা স্থানীয় কর সংগ্রহ ও বিবাদ মীমাংসার ভারও তাদের ওপর দেয়া হবে। অচিরেই দেখা গেলো, বিএনপির যুবকরা বিভিন্ন অজুহাতে তোলা আদায় করছে। ফলে, স্থানীয় মানুষজন উত্যক্ত হয়ে উঠলো। তৎকালীন সমবায়মন্ত্রী ঘোষণা করেন, যুব কমপ্লেক্সের আয় ১০ কোটি হলে তাদের শতকরা ২৫ ভাগ কমিশন দেওয়া হবে। এক হিসেবে জানা যায় দুই বছরে তোলা হয়েছে ১২ কোটি টাকা এবং তা থেকে সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে মাত্র ১২ লাখ টাকা। অধ্যাপক সাইয়িদ এক হিসেবে জানাচ্ছেন—"১৯৭৮ এর ৩০ শে নভেম্বর যুব কমপ্লেক্সের কাছে হস্তান্তরের আগে 'তোলা আদায়' বাবদ প্রতি বছর সরকারি তহবিলে প্রায় ৩০ কোটি টাকা জমা হতো। আদায়কৃত টাকার শতকরা ২৫ ভাগ জেলা প্রশাসনের পিএল একাউন্টে জমার বিধান থাকলেও ১২ কোটি টাকা তোলা আদায়ের মধ্যে ৮ কোটি টাকাই বিএনপি এবং যুব কমপ্লেক্স আত্মসাৎ করেছে।"[৩০]

জিয়ার আমলে অস্থিতিশীলতার আরেকটি কারণ দুর্নীতি। অনেকে বলেছেন, জিয়া নিজে কখনও টাকা আত্মসাৎ করেননি। কিন্তু তাতেও কি প্রমাণিত হয় যে, তিনি সৎ যদি সেই তিনিই যদি ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য নিজ সঙ্গীদের কোটি কোটি টাকা অর্জনের সুবিধা করে দেন। তাঁর আমলে, বিরাষ্ট্রীয়করণের ছুতোয় স্বল্প বা প্রায় বিনামূল্যে কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত করা হয়েছে। ঋণ খেলাপীদের কথা তো আগেই বলেছি। এক কথায়, বলা যেতে পারে, দুর্নীতি তিনি জাতীয়করণ করেছিলেন। বরং দক্ষ ছিলেন প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ব্যক্তি কিনে বিপক্ষের রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে দেয়ায়। এভাবে সিভিল সমাজের ভিত্তি তিনি দুর্বল করে দিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক দুর্নীতির ভিত্তি গড়তে সাহায্য করেছিলো ছাত্রদল এবং যুবদল। এসব দলের নেতৃবৃন্দ প্রচুর অর্থনৈতিক সুবিধা নেয়নি এমন কথা বলা যাবে না। তাঁর প্রতিশ্রুত সামাজিক বিপ্লবের বিপরীতে তিনি একটি নৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি করেছিলেন সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকদের নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট করে। এভাবে, সিভিল সমাজ প্রায় ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল জিয়াউর রহমান।

সিভিল সমাজের বিপরীতে সামরিকায়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন জিয়া, পরবর্তীকালে এরশাদ যা বিকশিত করে পূর্ণরূপ দিতে চেয়েছিলেন। বহুদলীয় গণতন্ত্র তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে বারংবার প্রচার করা হয়। কিন্তু এ বহুদলীয় গণতন্ত্রে কী ছিল তা উল্লেখ করছি—

এ পরিপ্রেক্ষিতে খানিকটা দীর্ঘ হলেও অধ্যাপক মুশাররফ হোসেনের একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে চাই—

" ... তিনি ক্ষমতায় এসেই যে সকল ব্যক্তিকে তাঁর সরকারে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, বিচারপতি সাত্তার, সর্বজনাব কাজী আনওয়ারুল হক, হাফিজ উদ্দিন, মীর্জা নুরুল হুদা, মুহাম্মদ শামসুল হক, শফিউল আজম, আজিজুল হক, জহিরুল হক প্রভৃতি। এরা সবাই পাকিস্তান আমলে আইউব/ ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। এঁদের 'সততা' ও 'দক্ষতা' সর্বজনবিদিত। 'পাকিস্তান মডেল' সম্বন্ধে এঁদের জ্ঞান অত্যন্ত গভীর এবং কি করে বাংলাদেশে "পাকিস্তান উন্নয়ন মডেল"-কে বাস্তবায়িত করতে হবে এ ব্যাপারে এদের কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। তবে, মুক্তিযুদ্ধ নামক একটি ঘটনা সম্বন্ধে এঁদের কি ধ্যান-ধারণা এটা বোঝা মুশকিল।"[৩১]

১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল একটি মৌল বৈশিষ্ট্য। পাকিস্তানপন্থীদের কাছে স্বভাবতই তা ছিল উষ্মার বিষয়। তাই দেখি, শেখ মুজিবকে হত্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রেডিও পাকিস্তান ঘোষণা করলো, বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে নীতি হিসেবে বর্জন করা হয়েছে। রেডিও পাকিস্তান এ ঘোষণা দিয়েছিলো কিনা পরে অবশ্য তা বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে এক সামরিক ফরমান অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের ৬৬ ধারার একটি উপধারা ও ১২২ ধারা বিলুপ্ত করা হল যার ফলে পাকিস্তানি দালালরা পেলো ভোটার হওয়ার সুযোগ। আগে এতে আইনগত বাধা ছিল। ৩৮ ধারায় সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক দলসমূহের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। ১৯৭৬ সালের মে মাসে এক সামরিক ফরমান জারি করে তা বাতিল করা হলো। ফলে, বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু হল যার ঝোঁক ছিল পাকিস্তানের দিকে।

জিয়াউর রহমান পাকিস্তানি দালালদের তোষণ করতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নিজের ক্ষমতা সংহত ও বৃদ্ধিই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য, সিভিল সমাজ নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা ছিল না।

তরুণদের তিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন, নতুন সংস্কৃতি নির্মাণ করেছেন বলে তাঁকে সাধুবাদ দেয়া হয়। মতিউর রহমান সম্পাদিত তৎকালীন 'একতা' পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে যা লেখা হয়েছিল তা উদ্ধৃত করছি—

"শেখ মুজিবের বাঙালি পোশাকের পরিবর্তে তিনি চালু করেছিলেন সাফারি স্যুট ও কালো চশমা। ক্রমে বিএনপির কর্মী তো বটেই, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও চালু হয়ে গেলো তা। এ সময়ই জিয়াউর রহমানের যে উক্তিটি সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল তা হল 'মানি ইজ নো প্রব্লেম'। কিন্তু, এই 'মানি' কোত্থেকে আসছে তা কেউ জানতে চায়নি। এই টাকা এসেছে রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও ঋণ খেলাপী এবং বিদেশী সাহায্য থেকে। তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট এবং চমক সৃষ্টির জন্য ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর সময় বিখ্যাত 'হিযুবল বাহার'-এর সমুদ্র যাত্রা শুরু হয়। এ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল, মেধাবী তরুণদের প্রলোভন দেখিয়ে জিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করা। ঐ সময় প্রলোভনে পড়ে বেশ কিছু মেধাবী ছাত্র যোগ দেয় ছাত্রদলে যারা পরে দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে সন্ত্রাসীরূপে। জিয়াউর রহমান যে

আদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে একটি পত্রিকার মন্তব্যে—"রাষ্ট্রপতির, 'উৎপাদনের রাজনীতি' আর ২৪ ঘন্টা কাজের 'বিপ্লবী' আহ্বানে সাড়া দিয়েই হয়তো তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা এ ধরনের ক্লাব, প্রদর্শনী ও মিনাবাজারের কাছে ছুটাছুটি করে এই মাঘ মাসের শীতেও ঘেমে জবজবে হচ্ছেন। আমরাও এসব তুচ্ছ ঘটনা সম্পাদকীয় স্তম্ভে উল্লেখ করতাম না যদি এগুলো আমাদের বর্তমান সরকার ও সমাজে দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের গোটা কর্মকাণ্ডের একটা দিক নির্দেশ না হতো। সে নির্দেশনাটি হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে ধনিক শ্রেণীর জন্য ও ধনিক শ্রেণীর আদর্শে গড়ে তোলা হচ্ছে। কোটি কোটি নিরন্ন মেহনতী মানুষকে শোষণ করে ধনিক শ্রেণীর উৎকট বিলাসের রসদ জোগানো হবে—এটাই ওদের স্বপ্ন। সরকার ও সমাজপতিদের এই নীতিই প্রতিফলিত হচ্ছে ঐ জাতীয় নানা অনুষ্ঠানে এবং রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রে। দেশের মানুষ, দেশের প্রকৃত চিত্র ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ঝলমলে পোশাক পরা সুখী রমণী ও লোমশ বিদেশী কুকুরের ছবির নিচে।"[৩২]

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, জিয়া দর্শন বা বিএনপি দর্শনের মূল কথা। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকার সময় জিয়াউর রহমান বলতেন "বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। তিনি যখন ক্ষমতায় এলেন তখন আরোপ করলেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ যার দর্শনের সঙ্গে তাঁর জীবন চর্যার মিল ছিল। কিন্তু আগে কেন তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিশ্বাস করতেন সে ব্যাখ্যায় আর নাই বা গেলাম। তাঁর এই দর্শন বাঙালি জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করে দিল। তাঁর স্ত্রীর আমলে, অর্থাৎ বর্তমানে তা আরো তীব্র হয়েছে এবং তা আর কখনও নিরসন হবে বলে মনে হয় না। পাঠ্যপুস্তকেও যখন বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে তখন এ প্রসঙ্গে খানিকটা বলতে হয়—

"এই সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন। জেনারেল জিয়া ১৯৭২ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় লিখেছিলেন, যেদিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা, "আমার মতে ঠিক সেই দিনই বাঙালি হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ, জন্ম হয়েছিলো বাঙালি জাতির।"

এর ঠিক পাঁচ বছর পর, জেনারেল জিয়া সংবিধান সংশোধন করে অন্তর্ভুক্ত করলেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। এ তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন পাকিস্তানের সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত খোন্দকার আব্দুল হামিদ। ১৯৭৬ সালে, ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমীর আলোচনা সভায় তিনি বলেন, "আমাদের জাতীয়তাকে 'বাংলাদেশী জাতীয়তা' বলাই এপ্রোপ্রিয়েট বা সংগত। ... এই জাতির রয়েছে গৌরবময় আত্মপরিচয়, নাম-নিশানা, ওয়ারিশী-উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য-ইতিহাস, ঈমান-আমান, যবান-লিসান, শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য, সংগঠন ও সবকিছু। বাংলাদেশী জাতির আছে নিজস্ব জীবনবোধ, জীবনধারা, মনস্তাত্ত্বিক গড়ন-গঠন, ভাবধারা। আছে সমষ্টিগত বিশেষ মনোভঙ্গি, আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ানুভূতির বন্ধন। এদের হৃদয়তন্ত্রীতে বাজে একই সুখ-দুঃখের সুর, একই আবেগ অনুভূতির ঝঙ্কার। এদের জীবনে ও মনোজগতে রয়েছে এমন অসংখ্য বৈশিষ্ট্য, যা সারা পৃথিবী থেকে এদের স্বাতন্ত্র্য দান করেছে—এমনকি অন্যান্য দেশের বা অঞ্চলের বাংলা ভাষী ও ইসলাম অনুসারীদের থেকেও। ইসলামের কথা বললাম এ জন্যে যে, এদেশের ৮৫ শতাংশ লোকই মুসলিম।"

"এই বৈশিষ্ট্যগুলোই 'বাংলাদেশী জাতীয়তা'র উপাদান। এগুলো বাকল নয়, আসল সারাংশ। আর এই সারাংশই আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তার আসল শক্তি, ভিত্তি ও বুনিয়াদ।"৩৩

এই জাতীয়তাবাদে যুক্ত হয়েছিলো ধর্ম আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। মুক্তিযুদ্ধের এবং সংবিধানের মূল নীতির একটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। জিয়াউর রহমান প্রচারিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের মানুষকে স্পষ্টত দু'ভাগ করেছিলো। এই জাতীয়তাবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রচলিত হল এমন কিছু শব্দ যা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শ্লোগানের বিপরীত। যেমন, 'জয়বাংলার' পরিবর্তে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। 'আমার সোনার বাংলা'র বিপরীতে 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ।'

ফিরে আসি পুরনো প্রসঙ্গে। সংকলনের জিয়া রচনায় কাজী সিরাজকে এখানেই থামানো যায় নি। তিনি জিয়ার জানাজার বর্ণনা দিতেও কসুর করেন নি—

"১৯৮১ সালের ৩০ শে মে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে শহীদ হন। শেরে বাংলা নগরে তাঁর জানাজায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। মিসরের জামাল নাসেরের জানাজার পর এত বড় জানাজার নামাজ বিশ্বে অন্য কোনো রাষ্ট্রনায়কের ভাগ্যে জোটেনি। ঢাকার শেরে বাংলা নগরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যু লাভ করে শহীদের মর্যাদা। জনগণের হৃদয়ে সেই থেকে তিনি শহীদ জিয়া।"

না, শেখ মুজিবের জানাজার বর্ণনা লেখক দেন নি। কারণ, তা'হলে তাঁকে উল্লেখ করতে হতো সেনাবাহিনী তাঁর জানাজা হতে দেয় নি। ফজলুল হকের জানাজায় কত লোক হয়েছিল তাও তিনি ভুলে গেছেন।

জিয়া রচনার উপসংহার টেনেছেন তিনি এভাবে—

"জিয়াউর রহমানের কয়েকটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত সততা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন কিংবদন্তীর মত শোনায়। দেশের মানুষকে দেশগঠনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি বলতে গেলে সারা দেশে হেঁটে বেড়িয়েছেন। দেশের নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ ও মেহনতি মানুষ—দুই সম্পদ নিয়ে স্বনির্ভর হবার স্বপ্ন দেখতেন শহীদ জিয়া। তিনি দেশের তরুণ সমাজের মনে এনে দিয়েছেন স্বপ্ন বা আত্মবিশ্বাস। যুগযুগান্তরের শেকল ভেঙে মেয়েদের দেশের মূল কর্মকাণ্ডে জড়িত করার পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন। ইতিহাসে শহীদ জিয়া দু'বার জাতির কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেছেন : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে আর ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর দেশকে বিপর্যয়ের হাত থকে রক্ষা করে।

তাঁর প্রিয় গানের মধ্যে নিহিত রয়েছে তাঁর মূল স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা—

প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ
জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ।"

স্বনির্ভর বাংলাদেশ তিনি গড়েছিলেন? সেটি কেমন? বা এসব কিছুই না হয় মেনে নেয়া যেতো যদি সামগ্রিকভাবে দেশ ও দেশবাসীর উন্নতি হতো। কারণ, শেখ মুজিব ও সিভিল সমাজকে অপসারণের মূল অজুহাতই ছিল দেশবাসীর মঙ্গল। জিয়ার শাসনামলে কয়েকটি বিষয়ে সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব নিলেই তা স্পষ্ট হবে।

১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে "কর্মদক্ষ জনসমষ্টির এক-তৃতীয়াংশই ছিল কর্মহীন।"[৩৪] বাংলাদেশের গ্রামের মানুষ ১৯৭৫-৭৬ সালে ৮০৭ গ্রাম খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করতেন। ১৯৮১-৮২ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৭৬৪ গ্রামে। ১৯৭৫ সালে গড়পড়তা ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ ছিল ২০৯৪, ১৯৮১-৮২ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৯৪৩-এ, যা নিম্নতম প্রয়োজনের চেয়ে ১৫ ভাগ কম। তিন-চতুর্থাংশ মানুষ ১৯৮১-৮২ সালে পুষ্টিহীনতায় ভুগেছেন। ১৯৭৭-৭৯ সালে উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পায় ২১ ভাগ। এবং মানুষের সঙ্গে প্রতারণাটা বোঝা যাবে আরেকটি উদাহরণ দিলে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে জিয়া প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের মূল্যায়নের জন্য একটি বৈঠক হয়। তাতে দেখা যায়, "বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়ক ও জনপথ বিভাগে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয় তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে প্রেসিডেন্টের প্রতিশ্রুত প্রজেক্ট বাস্তবায়নে ৬২ বছর সময় লাগবে।"[৩৫]

জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সিভিল সমাজে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছেন এখনও তা শুকোয়নি। তিনি শুধু আমাদের নয়, আমাদের দেশের জন্মকেই অপমান করেছিলেন। প্রথমদিকে তিনি মানুষের মাঝে প্রচারের কারণে যে মোহ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন ক্রমেই তা দূরীভূত হচ্ছিল এবং সিভিল সমাজে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠছিলো। এ প্রতিরোধের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল আওয়ামী লীগ ও সিভিল সমাজের প্রতি সমর্থকরা। জিয়ার মৃত্যুর ঠিক আগে আগে শেখ হাসিনা ফিরলেন ঢাকায় এবং পরবর্তীতে তাঁকে কেন্দ্র করেই সিভিল সমাজের আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। সিভিল সমাজের পুঞ্জীভূত ক্রোধ দমনের জন্য জিয়া বেশ কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই নির্মমভাবে তিনি নিহত হন। বলা যেতে পারে, তাঁর মৃত্যু তাঁকে বাঁচিয়েছে নয়তো অচিরে তাঁর অবস্থা হতো খোন্দকার মোশতাক বা এরশাদের মতো। তবে, সিভিল সমাজের গণতন্ত্রীমনাদের কাছে সান্ত্বনা এই যে, সামরিক ব্যক্তি বা শাসন রাজনৈতিক স্থিরতা বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথার্থ মাধ্যম নয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান তা প্রমাণ করেছিলেন মাত্র।

জিয়ার আকাশচুম্বি প্রশংসা ও জানাজার বিবরণ দেবার পর কাজী সিরাজের বোধহয় তারপর খেয়াল হয়েছে বঙ্গবন্ধুরও কিছু প্রশংসা করা দরকার। সেটি করেছেন তিন লাইনে—

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে শেখ মুজিবের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি, বিশেষ করে নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অফুরন্ত। তিনি সাহসী ছিলেন। ভয় তাঁকে জয় করতে পারে নি। তিনি বিপুল সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

সাত

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য সামাজিক বিজ্ঞান। মানবিক শাখার নবম-দশম শ্রেণির ছাত্রদের পড়তে হয় ইতিহাস আর বিজ্ঞান শাখার ছাত্রদের সামাজিক বিজ্ঞান। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোন রচনা নেই। আছে অষ্টম ও নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান-এ। এখানে ঐ দুই শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব।

অষ্টম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান[৩৬]-এর সপ্তম অধ্যায়; 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়' আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক। দুই সংস্করণে পৃ. ৬১-৬৪ পর্যন্ত বিবরণ ঠিকই আছে। বদলে গেছে শুধু 'স্বাধীনতার ঘোষণা' অনুচ্ছেদটি। পুরনো সংস্করণে লেখা হয়েছে—

"গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ঢাকায় দলীয় নেতৃবৃন্দের এবং ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দেন। শুরু হয়ে যায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশবাসীকে জানানোর জন্য ২৬শে মার্চ চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি প্রচার করেন। ২৭ শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। ইতোমধ্যে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।"

নতুন সংস্করণে 'স্বাধীনতার ঘোষণা' অনুচ্ছেদটি দু'লাইনে সারা হয়েছে। সেটি হল "২৬শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুর ঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণার পর পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।" কিন্তু এর আগে যে বলা হয়েছে, ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্যে দিয়েই "শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন"—তার কী হবে?

'১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম' উপ-অধ্যায়ের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ লাইন আবার গায়েব করে দেয়া হয়েছে। সে ক'টি লাইন হলো—"মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ দলীয় এ দেশীয় একটি গোষ্ঠি স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানিদের এ দোসররা রাজাকার, আল-বদর, আল শামস নামে বিভিন্ন ঘাতক বাহিনী গড়ে তোলে। তারা এ দেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী ও সাংবাদিকসহ বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের স্মরণে ১৪ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়।"

কেন এ ক'টি লাইন বাদ দেয়া হয়েছে তা আগেই উল্লেখ করেছি।

নবম ও দশম শ্রেণীর *সামাজিক বিজ্ঞান*[৩৭]-এর একটি অধ্যায় আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক। সেটি হল দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ। অধ্যায়ের উপ অধ্যায়গুলো হল রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক অবস্থা, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন, যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা, পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন, জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল, পাকিস্তানি আমলে বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্য, ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, এগার দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, জেনারেল ইয়াহিয়া খান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন, আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ, নির্বাচনের তাৎপর্য, অসহযোগ ও প্রতিরোধ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন, মুক্তি বাহিনী, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, বি এল এফ (মুজিব বাহিনী), অন্যান্য বাহিনী, স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিক আবেদন, শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের অবদান, প্রবাসী বাঙালিদের

ভূমিকা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদান, বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড গঠন, চূড়ান্ত বিজয় ও স্বাধীনতা অর্জন।
যা ঘটেছে তারই ভিত্তিতে এ রচনা (পূর্ব সংস্করণ) তথ্যের কোন বিকৃতি নেই। নতুন সংস্করণে সবই ঠিক রাখা হয়েছে। সম্পাদকরা অনুধাবন করেন নি যে, পুরো রচনার সঙ্গে এ লাইন ক'টি খাপছাড়া এবং আরোপিত মনে হয়। কী বদল করা হয়েছে?

পূর্বতন সংস্করণ

"পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫ শে মার্চ গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সমকর্মীদের করণীয় নির্দেশ দিয়ে যান। ২৬শে মার্চ ওয়ার্লেস যোগে প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান চট্টগ্রাম বেতার থেকে দুপুর বেলায় প্রচার করেন। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বেতারের কিছু কর্মী, শিল্পী, শিক্ষক চট্টগ্রাম কালুর ঘাটে একটি অস্থায়ী বেতারকেন্দ্র চালু করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে মর্মে খবর প্রচার করতে থাকেন। ২৭ শে মার্চ সন্ধ্যা বেলায় উক্ত কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার একটি ঘোষণা প্রচার করেন।"

বর্তমান সংস্করণ

"পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫শে মার্চ গভীর রাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে [বঙ্গবন্ধু শব্দটি বাদ]। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বেতারের কিছু কর্মী, শিল্পী, শিক্ষক চট্টগ্রাম কালুর ঘাটে একটি অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র চালু করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে মর্মে খবর প্রচার করতে থাকেন। [২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু ও এম. এ. হান্নানের ঘোষণা বাদ']। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা বেলায় উক্ত কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।"
১০১ পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের জনসভার ছবি ছিল। তা বাদ দেয়া হয়েছে এবং ঐ আধা পৃষ্ঠা খালি রাখা হয়েছে। এবং ১০৫ পৃষ্ঠায় তিনটি শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে—

পূর্বতন সংস্করণ

"পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসররা বাংলাদেশের শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিকসহ বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।"

বর্তমান সংস্করণ

"পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিকসহ বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে নিমর্মভাবে হত্যা করে।"
এখানে বাদ দেয়া হয়েছে "এ দেশীয় দোসররা" শব্দ তিনটি। কারণ "এ দেশীয় দোসররা" এখন জোট সরকারের অংশীদার।

আট

নবম ও দশম শ্রেণির মানবিক শাখার জন্য পাঠ্য বাংলাদেশ ও প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস। এই গ্রন্থের শেষ বা সপ্তম অধ্যায়—পাকিস্তানি আমল (১৯৪৭-১৯৭১) আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। এই একটি বইয়ের লেখক দুইজন ও সম্পাদক দুইজন শুধু উচ্চ ডিগ্রীধারীই নন, গবেষক হিসেবেও পরিচিত।[৩৮] সুতরাং সিলেবাস অনুযায়ী একটি কাঠামোর মধ্যে বিষয়গুলোকে ব্যক্ত করেছেন।

এই অধ্যায়টি ২২ পৃষ্ঠার। এবং যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। বর্তমান সংস্করণের সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম। সংশোধিত সংস্করণে শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে বঙ্গবন্ধু শব্দটি পরিত্যক্ত হয়েছে। এবং বদলে গেছে 'স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের' শুরু শীর্ষক উপ-অধ্যায়ের কয়েকটি লাইন।

পূর্ববর্তী সংস্করণ

"সেই রাতেই বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই ২৫শে মার্চের মধ্য রাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ঢাকায় দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রেরণের মাধ্যমে তা প্রচারের নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা দেশবাসীকে জানানোর জন্য চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান ২৬শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম বেতার থেকে তা প্রচার করেন। ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের কিছু সংখ্যক বেতার কর্মী, শিল্পী ও শিক্ষক কালুরঘাটে একটি স্বাধীন বাংলা অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র চালু করেন। উক্ত বেতার কেন্দ্র থেকে ২৭ শে মার্চ সন্ধ্যায় মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণা প্রচার করেন।"

নতুন সংস্করণ

"সেই রাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নেয়া হয়। তাঁর ও আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতাদের অবর্তমানে দিশেহারা ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে বাংলার মানুষেরা। সেই প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামে অবস্থিত 'কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্রে' হাজির হয়ে ২৬শে মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। এই ঘোষণা বিদ্যুৎ বেগে সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে ছিল। প্রবল আত্মবিশ্বাসে ও দিক নির্দেশ পেয়ে বাংলাদেশের তরুণরা প্রবল শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রু নিধন করে দেশকে মুক্ত করার আশায়।"

এর পরের বিবরণ ঠিকই আছে। কিন্তু তারপর বদল করা হয়েছে একটি শিরোনাম। পূর্বতন সংস্করণে ছিল—"বাংলাদেশে অস্থায়ী সরকার গঠন।" নতুন সংস্করণে করা হয়েছে—"বাংলাদেশের সরকার গঠন।" শুরুটাও বদল হয়েছে এভাবে—

"পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটেছিল ইংরেজদের কাছে। আরেক আম্রকাননে গঠিত হয় বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার। ১০ই এপ্রিল মুজিব নগরে (মেহেরপুর বৈদ্যনাথতলা) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি এবং অস্থায়ী সরকার গঠনের

ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার' শপথ গ্রহণ করে।" তারপর কারা কারা ছিলেন এবং কবে থেকে স্বাধীনতা কার্যকর তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

নতুন সংস্করণে বদল করা হয়েছে—

"১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐ দিন মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে।"

বোঝা যাচ্ছে জোট সরকারের শিক্ষামন্ত্রীদের কাছে 'আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি' শব্দটি ভাল লাগেনি। কিন্তু, করার কী আছে। তখন তো বিএনপি হয় নি। 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটিও বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে বিষয়টি কর্মকর্তাদের মাথায় আসে নি তা'হলো, স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি। পূর্বতন সংস্করণ অনুযায়ী, "এ ঘোষণা পত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কার্যকর বলে উল্লেখ করা হয়।" নতুন সংস্করণে আছে—"এ ঘোষণা পত্রে স্বাধীনতা ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কার্যকর বলে উল্লেখ করা হয়।"

নতুন সংস্করণে 'বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা অনুযায়ী' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার কথা আছে। কর্তৃপক্ষ ভেবেছে জিয়ার ২৬শে মার্চ ঘোষণার কারণে শিশুরা জানবে জিয়াই স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। কিন্তু মূল স্বাধীনতার ঘোষণা তো বাদ দেয়া যাবে না, সংশোধনও করা যাবে না। সেখানে তো ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাকেই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

'মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা' উপ-অধ্যায়টি নতুনভাবে লেখা হয়েছে। বা পুরনোটির ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে এবং তা থেকে যা লেখকদের মনপূতঃ নয় সে সব অংশগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। পুরনো সংস্করণের ভাষ্যটি ছিল এরকম—

পূর্বতন সংস্করণ

"অস্থায়ী সরকার দায়িত্ব পাওয়ার পরে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে মনোনিবেশ করে। এপ্রিল মাসেই মুক্তিবাহিনী, বি এল এফ (মুজিব বাহিনী) নৌ কমান্ডো গঠন এবং নিয়মিত বাহিনী পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। এ সময় বিমান বাহিনী এবং স্থল বাহিনীকেও পুনর্গঠিত করা হয়। সুষ্ঠুভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে মুক্তিবাহিনী এবং মুজিব বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আক্রমণ পরিচালনা করে।

ছাত্রনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী এবং শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে বি এল এফ (বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট) নামে একটি রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে ওঠে। বি এল এফ পরে মুজিব বাহিনী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও স্বৈরশাসক বিরোধী আন্দোলনের সময়ই বি এল এফ নামে একটি গোপন

সংগঠন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে চারটি যুদ্ধাঞ্চলে বিভক্ত করে মুজিব বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে। শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ অঞ্চল প্রধান হিসেবে মুজিব বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করেন। মুজিব বাহিনীর সদস্যদের মূলত গেরিলা যুদ্ধের উপর বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা দেশের অভ্যন্তরে পাক হানাদারদের যাতায়াত ও রসদ সরবরাহ বন্ধ করাসহ ঘাঁটিগুলোর ওপর গেরিলা কায়দায় আক্রমণ চালিয়ে তাদের বিপর্যস্ত করে তোলে।"

"দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুবক, নারী, পুলিশ, আনসার, ই.পি. আর., ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। সরকার বিভিন্ন ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। একথা ঠিক যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব ছিল না। তবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা জীবনের মায়া ত্যাগ করেই দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তাই মাত্র কয়েক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তারা পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল।"

"সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে একেকজন সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী আক্রমণ শুরু করে। বিভিন্ন জেলায় পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে থাকে। পাশাপাশি গোপন ও অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী পাকবাহিনীকে জলে স্থলে মারাত্মকভাবে ঘায়েল করতে সক্ষম হয়। এভাবে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

"মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। নৌ-কমান্ডোরা চট্টগ্রাম, মংলাসহ বিভিন্ন নৌ-বন্দরে তৎপরতা চালায়। নানা রকম প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনী দেশের ভিতরে অবরুদ্ধ গণমানুষের সহায়তায় পাকবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়। দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং তাদের সহযোগিতায় পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ পরিচালনা করে। ১৯৭১ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এভাবে মুক্তিবাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকবাহিনীকে আক্রমণ চালায় এবং বিপুলসংখ্যক পাক সেনাকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের অধীনেও কতকগুলো বাহিনী গড়ে ওঠে। এসব বাহিনী ছিল মূলত মুক্তিযোদ্ধাদেরই অংশ। টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে 'কাদেরিয়া বাহিনী' ছিল তাদের অন্যতম।"

নতুন সংস্করণের ভাষ্যটি এরকম—

নতুন সংস্করণ

"বাংলাদেশ সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে সংগঠন ও পরিচালনায় মনোনিবেশ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছিল অপরিকল্পিত ও অবিন্যস্তভাবে।"

'তৎকালীন ই পি আর-এর বাঙালি সদস্য এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিক ও অফিসারদের সমন্বয়ে নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়। ই পি আর, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে 'সেক্টর ট্রুপস' নামে আরেকটি বাহিনী গঠন করা হয়। নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ন নিয়ে পরে কে-ফোর্স, এস-ফোর্স ও জেড-ফোর্স নামে তিনটি ব্রিগেড গঠিত হয়। সরকারিভাবে এই দুই বাহিনী নিয়মিত বাহিনী হিসেবে গণ্য হত। এরা মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিফৌজ উভয় নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিকসহ নানা পেশার লোকদের নিয়ে গঠিত হয় অনিয়মিত বাহিনী—'ফ্রিডম ফাইটার্স' বা গণবাহিনী। গেরিলা নামেও এরা পরিচয় লাভ করে। এই বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের গোয়েন্দা শাখা পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি ও নানা কর্মকাণ্ডের সংবাদ মুক্তিবাহিনীকে সরবরাহ করত। গেরিলাদের মধ্যে ছাত্র ও কৃষকদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।"

"সরকারের অধীনস্থ এইসব নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী ছাড়া আরও কয়েকটি বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই সব বাহিনীর মধ্যে বি এল এফ (মুজিব বাহিনী) ছাড়াও দেশের ভেতরে গড়ে-ওঠা টাঙ্গাইলের কাদের বাহিনী, ভালুকার আফসার বাহিনীর নাম উল্লেখযোগ্য। বি এল এফ (বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স) একটি রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী। ছাত্রনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী এবং শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে এই বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই বাহিনী পরে মুজিব বাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে। মুজিব বাহিনীর সদস্যদের মূলত গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর গেরিলা কায়দায় আক্রমণ পরিচালনা করেন।"

"সরকার রণকৌশল হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশকে এগারটি সেক্টরে বিভক্ত করে এবং প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্ব একেক জন কমান্ডারের হাতে ন্যস্ত করে। সেক্টর কমান্ডারের অধীনে নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি অনিয়মিত গেরিলা যোদ্ধারা নিয়োজিত ছিল। উল্লেখ্য যে, দশ নম্বর সেক্টরের কোনো আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। এটি গঠিত হয়েছিল নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে। প্রচলিত কায়দায় যুদ্ধের পাশাপাশি গেরিলাযুদ্ধের রণকৌশল গ্রহণ করে মুক্তিবাহিনী হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। ক্রমাগত যুদ্ধে জনবিচ্ছিন্ন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ক্রমশ হীনবল ও হতাশ হয়ে পড়ে। ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ আক্রমণে তারা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত ও কোণঠাসা হয়ে যায়। এবং ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্সের ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে।"

"ছাত্র-শিক্ষক, উকিল-চিকিৎসক, কৃষক-শ্রমিক, লেখক-শিল্পী, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, নারী বুদ্ধিজীবীসহ দেশের সকল স্তরের মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে।"

পুরনো সংস্করণে, মুজিব বাহিনী, মুক্তিবাহিনী ও ১১টি সেক্টর গঠনের কথা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন সংস্করণে পাকিস্তানি বাহিনী ত্যাগকারি সামরিক কর্মকর্তাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমরা জানতে পারি সামরিক বাহিনীর সেনাদের নিয়ে 'সেক্টর ট্রুপস' গঠন করা হয়েছিল। ১৯৭৫ এর পর থেকে এ বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেনা কর্মকর্তারা মুক্তিযুদ্ধের যে সব বিবরণ লিখেছেন, সেখানেও প্রায় ক্ষেত্রেই এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এটিকে মুক্তিযুদ্ধের সামরিকায়ন প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। এর একটি কারণ হতে পারে, নির্বাচনে সেনাবাহিনীর বিতর্কিত ভূমিকা যা জোট সরকারকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করে।

এখানে কিছু শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যেতে পারে। পুরনো সংস্করণে আছে— "মুক্তিবাহিনী পাক বাহিনীকে জলেস্থলে মারাত্মকভাবে ঘায়েল করতে সক্ষম হয়।" নতুন সংস্করণে আছে, "ক্রমাগত যুদ্ধে জনবিচ্ছিন্ন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ক্রমশ হীনবল ও হতাশ হয়ে পড়ে।" 'ঘায়েল' ও 'হীনবল এবং হতাশ' এর মধ্যে পার্থক্য বোঝা দুষ্কর নয়। আরো আছে, পুরনো সংস্করণে উল্লেখ করা হয়েছে "দেশের ভিতরে অবরুদ্ধ গণ-মানুষের সহায়তায়" মুক্তিবাহিনী পাক-বাহিনীকে "পর্যদুস্ত করতে সক্ষম হয়।" নতুন সংস্করণে জনগণের সহায়তার বিষয়টি অনুপস্থিত। আরো অনুপস্থিত "বিপুল সংখ্যক পাক সেনাকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়।"

বিভিন্ন দল ও পেশাজীবীদের ভূমিকা' উপ অধ্যায়ে ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ লাইন বাদ দেয়া হয়েছে। কথাটি ছিল অবরুদ্ধ পেশাজীবীরা নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করলেও অনেকে করে নি। তারা কারা?

"পাকিস্তানপন্থী এদেশীয় কিছু গোষ্ঠি—জামায়াত ইসলামী, মুসলিম লীগসহ কতিপয় রাজনৈতিক দল বাঙালিদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানি শাসকদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এজন্য তারা পরিকল্পিতভাবে দেশের কৃতি সন্তানদের হত্যা ও পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগিতা করার জন্য কুখ্যাত রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস নামে ঘাতক বাহিনী ও তথাকথিত শান্তি কমিটি গঠন করেছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সহায়তা প্রদান করা ছাড়াও এসব বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আস্তানার খবর দেওয়া ও নিরস্ত্র বাঙালিদের হয়রানি, ধনসম্পদ লুটপাট এবং নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত ছিল।"

মাদ্রাসার বই আমার এ আলোচনায় আনিনি। শুধুমাত্র চতুর্থ শ্রেণীর একটি বই পেলাম।[৩৯] এ সংকলনে 'দুজন বীর শ্রেষ্ঠ : মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ও মতিউর রহমান' আমাদের আলোচনার প্রাসঙ্গিক। দু'টির রচনার ভূমিকায় স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি এসেছে, সেখানে লেখা হয়েছে—

"শেখ মুজিবুর রহমানকে ২৫শে মার্চ রাতে গ্রেফতার করা হল। পরের দিন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে দেশের মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।"

অনুমান করে নিচ্ছি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে যে ধরনের বদল হয়েছে মাদরাসার বইগুলোও তেমনি সংশোধিত হয়েছে।

নয়

প্রাক ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিএনপি সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, নতুন শতকে পাঠ্য পুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সে রকমই আছে। আগে বিএনপি খানিকটা সংযম দেখিয়েছে কারণ, বিরোধীদল হিসেবে সংসদে আওয়ামী লীগও ছিল শক্তিশালী। সে জন্য মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান আড়াল করতে চাইলেও তা আড়াল করা যায় নি। এবং লিখতে হয়েছে জিয়াউর রহমান ২৭শে মার্চ 'স্বাধীনতার ঘোষণা' দিয়েছিলেন। এবার জামায়াত বিএনপি সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে। ফলে, পাঠ্য পুস্তকে তাদের মতাদর্শ প্রচারে আর রাখঢাক রাখা হয়নি। তারা যা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাই করা হয়েছে। এর ভিত্তি মিথ্যা না সত্য তাতে কোন গুরুত্ব দেয়া হয় নি।

জোট সরকার পরিবর্তন এনেছে যেখানে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু স্বাধীনতার নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও সে ঘোষণার তারিখ। এবং বিতর্ক সেখানেই। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত একটি কথাই বার বার ফিরে এসেছে। জিয়াউর রহমান, হ্যাঁ, সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন এবং তারিখটা ২৭শে মার্চ নয়, ২৬ শে মার্চ। গত শতক পর্যন্ত ছিল ঘোষক/ পাঠক জিয়াউর রহমান এবং তারিখ ২৭ শে মার্চ। মনে হচ্ছে, পুরো জাতির ইতিহাস আটকে আছে একটি তারিখের হেরফেরের মধ্যে। এ জাতি এগুবে কী ভাবে?

এ ছাড়া শেখ মুজিবুর রহমানের আগে বাঙালির ভালোবেসে দেয়া উপাধি 'বঙ্গবন্ধু' সব জায়গা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁকে যতটা সম্ভব তুচ্ছ করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। আমরা অনেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে অপছন্দ করতে পারি। সমালোচনা করতে পারি, কিন্তু তাঁকে তুচ্ছ করার দরকার কী? বাংলাদেশের ইতিহাস কি তাঁকে বাদ দিয়ে লেখা সম্ভব হবে? এবং লিখলেও কি তা স্বীকৃত হবে?

যেহেতু জোট সরকারের অংশীদার জামায়াত ইসলাম সেহেতু, যেখানে আল-বদর, আলশামস, তাদের গণহত্যা বা বুদ্ধিজীবী হত্যার কথা আছে সে সব অনুচ্ছেদগুলো বাদ দেয়া হয়েছে।

পাঠ্য বইয়ে জোট সরকার ঘোষণা করেছে "প্রভিশনাল বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

হ্যাঁ মেজর জিয়া 'প্রভিশনাল কমান্ডার ইন চীফ অব দি বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' নাম নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে, তা ২৭শে মার্চ, স্বাধীনতার দলিলপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ১৫ খণ্ডের এই দলিলপত্র প্রকাশিত হয়েছিল জেনারেল জিয়ার আমলে।

জোট সরকারের সমর্থক, জিয়ার সহযোদ্ধা, বিএনপি নেতা মেজর জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী দলিলপত্র-এর তৃতীয় খণ্ডে জানিয়েছেন—"আমার জানামতে সবচাইতে প্রথমেই বোধ হয় চট্টগ্রাম বেতার থেকে হান্নান ভাইয়ের কণ্ঠেই লোকে প্রথম শুনেছিলেন। এটা ২৬শে মার্চ, '৭১ অপরাহ্ন দুটার দিকে হতে পারে। ... কাজেই যদি

বলা হয়, প্রথম বেতারে কার বিদ্রোহী কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা উচ্চারিত হয়েছিল। তা হলে আমি বলব যে, চট্টগ্রামের হান্নান ভাইর ঘোষণা শুনে।"

এম এ হান্নান জানাচ্ছেন, "২৭ শে মার্চ বেতারে মেজর জিয়াউর রহমানও রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

প্রয়াত ঐতিহাসিক আজিজুর রহমান মল্লিক জানান, "২৭ শে মার্চ বেতারে মেজর জিয়ার প্রথম ঘোষণা প্রচারিত হয়। তা শুনেই আমি হান্নান সাহেবকে টেলিফোনে বলি যে, ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর নাম যোগ করা আবশ্যক। নইলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয় বিবেচিত হবে না। মেজর জিয়া পরবর্তী ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধুর নাম করে, তাঁর পক্ষ থেকে।"

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১৪.৪.১৯৭১ তারিখে দেশবাসীর প্রতি বেতারে ভাষণ দেন, তাতে বলেন—"২৫ শে মার্চ মাঝরাতে ইয়াহিয়া খান তার রক্ত লোলুপ সাঁজোয়া বাহিনীকে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে নরহত্যাযজ্ঞের শুরু করেন, তা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গববন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।"

তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? স্বাধীনতার ড্রাম তত্ত্বের উদ্ভাবক জেনারেল শওকত ও অন্যান্য, এমনকি ইয়াহিয়া খান নিজেও বলেছেন, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ। এমনকি জেনারেল জিয়াও স্বীকার করেছেন স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তিনি ২৭ মার্চ। আর ২৭শে মার্চ হতে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত জিয়াউর রহমান যদি কার্যত বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধানই হন তা'হলে দেশ বিদেশের সংবাদপত্র, রাষ্ট্রনায়করা কেন বারবার খোঁজ করে বলেছিলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়?" তারপর ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন কোন বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে জেনারেলের কথা নেই?

১৯৭৭ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর জেনারেল জিয়া এক বক্তৃতায় বলেন, "এই পবিত্র মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে ২৭ শে মার্চের কথা যেদিন চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আমার বলার সুযোগ হয়েছিল। সেই একই জাতীয়তাবাদী চেতনা, সাহস ও প্রত্যয় নিয়ে আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।"

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী বলেছিলেন, ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে ঘোষিত ও জারিকৃত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। এই বীজমন্ত্র অস্বীকার করার অর্থ স্বাধীনতা অস্বীকার করা যা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। সংবিধানে সঙ্কলিত এই বীজমন্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে—"যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান ... " এবং "আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণা পত্র ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।"

পাঠ্য বইয়ে তথ্য বিকৃতকারী কাজী সিরাজউদ্দিনকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁর এই তথ্যের ভিত্তি কী?

তিনি সদুত্তর দিতে পারেন নি। তবে, বলেছেন, সৈয়দ আলী আহসানের একটি লেখা তাঁর তথ্যের ভিত্তি।

কী লিখেছেন সৈয়দ আলী আহসান? তিনি লিখেছেন, ২৬ শে মার্চ ছিল তাঁর জন্মদিন। সে দিন "কালুরঘাট ট্রান্সমিশন স্টেশন থেকে জিয়ার কণ্ঠে আমরা স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে পেয়েছিলাম।"

"সেই মুহূর্তটি আমাদের জীবনের আশা এবং উদ্দীপনার একটি তীব্রতম মুহূর্ত ছিল"। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিল্পী রশীদ চৌধুরী ও দেবদাস চক্রবর্তী।

অধ্যপক আনিসুজ্জামানকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সহকর্মী ছিলেন সৈয়দ আলী আহসানের। তিনি বলেন, ২৬ তারিখ তাঁর জন্মদিনে কাউকে ডাকলে আমাকে ডাকতেনই। অন্তত রশীদ চৌধুরী বা দেবদাসের আগে। কিন্তু সেদিন তাঁর জন্মদিনে আমাকে ডাকে নি। আর দেবদাস চক্রবর্তী ঐ সময় ঢাকায় ছিলেন শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর বাসায়।

অধ্যাপক মনসুর মুসা এখন মতাদর্শের দিক থেকে বিএনপির কাছাকাছি। কিন্তু তিনিও বলেছেন, "সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের স্মৃতিচারণ ঠিক নাও হতে পারে। ২৬শে মার্চ ছিল কড়া কারফিউ। ঘরের দরজা জানালা পর্যন্ত কেউ খোলেন নি। তাই অনেকে ২৬শে মার্চকে পূর্ণাঙ্গ দিবস হিসেবে দেখার সুযোগ পান নি। যে কারণে, ২৭শে মার্চের সঙ্গে ২৬শে মার্চকে গুলিয়ে ফেলার এবং স্মৃতিবিভ্রম ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।"

উল্লেখ্য, সৈয়দ আলী আহসানকে সম্প্রতি বেগম জিয়া শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক দিয়েছেন। সামান্য সুযোগ সুবিধার জন্য আমরা অনেকে যে আত্মা বিক্রি করে দিতে কসুর করি না উপযুক্ত ঘটনাগুলো তার উদাহরণ।

সুতরাং পাঠ্য বইয়ে ২৬ শে মার্চ জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বলে যা সংযোজিত হয়েছে তা মিথ্যা এবং অবৈধ। এ অংশটুকু যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা অন্যায় করেছেন মিথ্যা তথ্য সংযোজন করে। ফলে কোনো শিক্ষক ও ছাত্র এ তথ্য গ্রহণে বাধ্য নয়। একজন শিক্ষক তিনি যে মতাবলম্বীই হোন না কেন, ক্লাসরুমে সৎ শিক্ষক হিসেবে এমন তথ্য ছাত্রদের দিতে পারেন না যা সংবিধান বিরোধী ও অসত্য। এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য আমি শিক্ষকদের অনুরোধ জানাব।

জোট সরকারের এই মিথ্যা তথ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ছাত্ররা। পরীক্ষার খাতায় এই মিথ্যা উত্তর ভুল বলে বিবেচিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা যে কোনো একাডেমিক পর্যায়ে এই তথ্য গ্রাহ্য হবে না। এরা সবাই জামায়াত ও বিএনপির ক্রীতদাস—এটা ভাবা ঠিক হবে না। যাঁরা গবেষণা করবেন, ইতিহাস লিখবেন দলিলপত্রের ভিত্তিতে তাঁদেরও কোনো উপায় থাকবে না এ তথ্য ব্যবহারের। যেমন, এক সময়ের আওয়ামী লীগার, তারপর জিয়া ভক্ত, এরপর এরশাদের অনুসারী, বর্তমানে আবার বেগম জিয়ার দক্ষিণহস্ত মওদুদ

আহমদ পর্যন্ত যখন শেখ মুজিবের সময়কাল শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থটি লেখেন, তখন বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন এভাবে—"শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর সমাধি রচিত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখ মুজিবের চেয়েও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তাঁর চেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।"[৪০] গবেষক হিসেবে তিনি বুঝেছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন করা যায় না।

কয়েকটি প্রজন্মকে কীভাবে বিভ্রান্ত করবে এই সংযোজন, তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমার বন্ধুপুত্র দীপ ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হবে। তাঁর বাবা-মা তাকে শিখিয়েছেন, স্বাধীনতা ঘোষণা করেন শেখ মুজিবুর রহমান। ভর্তি পরীক্ষার ঠিক আগে কাগজে এ সম্পর্কিত বিতর্ক দেখে, তাকে আবার শেখানো হলো, স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন জিয়াউর রহমান। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় বন্ধু তাঁর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, যদি জিজ্ঞাসা করে স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছেন, তখন কী বলবে? ত্রিশ সেকেন্ড চুপ করে থেকে গম্ভীরভাবে সে উত্তর দিল—"আগে করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এখন করেছেন জিয়াউর রহমান।"

শুধু তাই নয়, একটি সরকার একটি প্রজন্মকে মিথ্যা শেখাবে। শিক্ষকরা যদি বিবেক বন্ধক রেখে এই পাঠ্য বই অনুসরণ করেন তা হলে তারাও পরিণত হবেন মিথ্যাবাদীতে। ছাত্রদের বক্তিত্ব দ্বিখণ্ডিত হবে। জাতিতো হবেই। রাজনৈতিক বিতর্ক বৃদ্ধি পাবে, সমাজে সৃষ্টি হবে টেনশনের। স্বাধীনতার ঘোষণাই যদি অস্বীকার করা হয় তা'হলে স্বাধীনতার বীজ মন্ত্রকেই অস্বীকার করা হবে। যে কারণে জাতি স্বাধীন হয়েছিল সে কারণটি অস্বীকার করা হবে। তা'হলে জাতির গৌরব বোধ, সম্মান এ সব কিছুই থাকবে না। ইংরেজিতে যাকে বলে 'অবমাননা' করা তাই করা হবে পুরো জাতিকে। জাতি যখন হীনম্মন্যতায় ডোবে, সম্মান বোধ থাকে না তখন তাকে শাসন করা সহজ। কারণ সে জাতির আর তখন কোনো আত্মা থাকে না।

দুঃখের বিষয় সংশোধিত সংস্করণে লেখক/সম্পাদক হিসেবে যাঁদের নাম আছে তাঁরা বলেছেন, এ ব্যাপারটি তাঁরা জানেন না। কিন্তু, এখন জানলেন, কিন্তু প্রতিবাদ করলেন কই? কারণ, এখন ও ভবিষ্যতে এসব বইয়ের রচয়িতা হিসেবে তাঁদের নামই থাকবে, অন্য কারো নয়। এসব ভুল তথ্য প্রদানের দায়-দায়িত্ব তাঁদেরও। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে ইতিহাসের শিক্ষক আছেন কয়েক হাজার। ইতিহাস বিষয়ক সমিতি আছে দু'টি—ইতিহাস সমিতি ও পরিষদ। আছে এশিয়াটিক সোসাইটিও। কেউ কোনো প্রতিবাদ করে নি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে অনেকে মনে করেন এগুলো নিয়ে কথা বললে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হবে। এগুলো রাজনৈতিক বিষয়। হায়! এসব নিয়ে জাতি এগুবে? অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমদ লিখেছিলেন, "আমাদের জীবিতকালে আমাদের চোখের সামনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের যে বিকৃতি ঘটছে বা ঘটান হচ্ছে সেটাকে রোধ করার দায়িত্ব কেবল দেশের ইতিহাসবিদদের নয়, এ দায়িত্ব গোটা বাঙালি জাতির।"[৪১]

ইতিহাস জাতীয় উন্নয়নে হাতিয়ার হতে পারে। ইতিহাস বিকৃতি স্থবির করে দিতে পারে জাতিকে। পাকিস্তানের অধ্যাপক ওয়াসিম বলেছেন, পাকিস্তানে, ইতিহাস বিকৃতি সৃষ্টি করেছে 'ফসিলাইজ মাইন্ডসেট'। বর্তমানে, আমাদের দেশে ইতিহাস নিয়ে যা চলছে তাতে মনে হচ্ছে সেই পাকিস্তানিকরণের দিকে রওয়ানা হয়েছি আমরা।

তথ্য নির্দেশ

১. Nisid Hajari, 'At war with History' : তিনি উল্লেখ করেছেন, "The vast gaps and distortions in memory raise the obvious question of whether there is some wilful cultural forgetfulness at work in the region—whether Asians in particular cannot look squarely at the Past." *News Week,* 27. 8. 2001.

২. ঐ

৩. আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার, 'পাকিস্তানি পাঠ্যপুস্তক এবং ভারত বিরোধী ঘৃণা' (অনূদিত), *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, ১/১, জানুয়ারি, ২০০১।

৪. হরবংশ মুখিয়া, 'মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা' বিপিনচন্দ্র দাস মন্তব্য করেছিলেন যে, "আজকের দিনে এ কথাটা মানবেন যে গত একশো বছরের সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের জন্য ভারতের ইতিহাস শিক্ষা অনেকটাই দায়ী।" 'ভারতের ঐতিহাসিক ও সাম্প্রদায়িকতা'। দুটি প্রবন্ধই সংকলিত হয়েছে, রোমিলা থাপার ও অন্যান্য, *সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা*, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৪৭, ৫৩।

৫. রোমিলা থাপার, '*সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*', ঐ, পৃ. ১৭।

৬. ঐ, পৃ. ১৪।

৭. দেখুন, অঞ্জন গোস্বামী, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান, কলকাতা, ১৯৯৫; লাডলী মোহন রায় চৌধুরী, 'ইতিহাস চর্চা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নানা ভাষ্য', লাডলী মোহন রায় চৌধুরী, ইতিহাস নানাবিধ, কলকাতা, ১৯৯৩।

৮. হরবংশ মুখিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩। আরো দেখুন, রোমিলা থাপার, পূর্বকাল ও পূর্বধারণা, নয়াদিল্লী, ১৯৭৭; অশীন দাশগুপ্ত,'সাম্প্রদায়িকতা ও ইতিহাস চেতনা', গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, *ইতিহাস চর্চা; জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা*, কলকাতা, ১৯৮৬; গৌতম নিয়োগী, *ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা*।

৯. রোজিনা কাদের 'ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ', *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, ১/১, জানুয়ারি, ২০০০।

১০. মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারি, 'বাংলাদেশে স্কুলে ও মাদরাসার মাধ্যমিক স্তরে মুক্তিযুদ্ধের পঠন-পাঠন', *মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, ১/৩, জুলাই, ২০০০।

১১. রোমিলা থাপারের প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।

১২. শরিফুজ্জামান পিন্টু, 'পাঠ্য বইয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা পাল্টে অহেতুক বিতর্কের সৃষ্টি, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৮/১/২০০২, ২৯. ১. ২০০২।

১৩. মুনতাসীর মামুন, 'পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ', মুনতাসীর মামুন, *যে সব হত্যার বিচার হয় নি*, ঢাকা, ২০০০।

১৪. এ পাঠ্য বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন ড. বদরুল মিল্লাত, ড. নুরুল হক, মিসেস নুরুন্নাহার, ড. এম আমিনুল ইসলাম, ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, ড. শরিফা খাতুন ও আবদুল মতিন চৌধুরী।

১৫. এ পাঠ্য বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন, সুশান্ত ঘোষাল, এম শফীউল্লাহ, মু. আবদুল ওয়াহাব, মোহাম্মদ সাজিদুল ইসলাম, আনোয়ারা বেগম, এস.এ.রব, মোঃ তোবারক আলী ও প্রফেসর হামিদ লতিফ।

১৬. এ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন মুহাম্মদ নুরুল করিম, মুহাম্মদ রমজান, ড. আর এস জাকির হোসেন, ড. মফিজুল্লাহ কবীর ও ড. এম এম হাসান।

১৭. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারি, *স্কুল পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংশোধন ও পরিবর্তন ; একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা*, ঢাকা, ২০০২।

১৮. 'বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস', ভোরের কাগজ, ৯.১.২০০২।

১৯. *প্রথম আলো*, ২০.১.২০০২।

২০. মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারি , প্রাগুক্ত, পৃ.৪।

২১. মমতাজউদ্দিন আহমদ, শামসুল কবীর, রাশিদা খানম, শফিউল আলম সম্পাদিত/রচিত, আমার বই, প্রথম ভাগ, পুনঃমুদ্রণ, নভেম্বর ২০০১।

২২. মমতাজউদ্দিন আহমদ, শামসুল কবীর, রাশিদা জামান রচিত/সম্পাদিত, *আমার বই*, দ্বিতীয় ভাগ, নভেম্বর ২০০১।।

২৩. আবদার রশীদ, ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরি, শওকত আলী, কাজী নুরুল হক, শামসুল কবীর, শফিউল আলম রচিত/স্পাদিত, *আমার বই*, তৃতীয় ভাগ, নভেম্বর ২০০১।

২৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য পাটোয়ারির পূর্বোক্ত পুস্তিকা।

২৫. রাশিদা বেগম, ড. হাসানউজ্জামান চৌধুরী, মোঃ তোবারক আলী, মমতাজ জাহান ও আবদুল মালেক রচিত ও সম্পাদিত, *পরিবেশ পরিচিতি*, ডিসেম্বর ২০০১।

২৬. ড. মোঃ আজহার আলী, কাজী গুলশান নাহার, মোঃ তোবারক আলী, ড. আবদুল লতিফ, মাসুম ও আবদুল মালেক রচিত ও সম্পাদিত, *পরিবেশ পরিচিতি*, নভেম্বর ২০০১। ১৯৯৪ সালে প্রথম মুদ্রণ। সংশোধন করা হয় ১৯৯৬ সালে।

২৭. ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মোঃ লুৎফর রহমান, মুহাম্মদ আবুল ফয়েজ ও মোঃ তোবারক আলী (আগের সংস্করণে তোবারক আলীর বদলে আব্দুল মালেকের নাম ছিল) *পরিবেশ পরিচিতি*, ডিসেম্বর ২০০১।

২৮. সংকলন ও রচনা : মাহবুবুল হক, *চারুপাঠ*, ২০০১।

২৯. শামসুল কবীর ও মাহবুবুল আলম (সংকলিত ও রচনা) সম্পাদনা : ড. মোঃ আবদুল কাইউম, *সাহিত্য কণিকা*, নভেম্বর ২০০১।

৩০. আবু সাইয়িদ, *জেনারেল জিয়ার রাজত্ব*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ, ১৫৩।

৩১. মুশাররফ হোসেন , *বাংলাদেশের সমাজ ও সামরিক শাসন*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫১।

৩২. একতা, ৩০.০১.১৯৮১।

৩৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, খোন্দকার আবদুল হামিদ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, *জাতীয়তাবাদ বিতর্ক*, ঢাকা, ১৯৮৭।

৩৪. U.P.Pushkov, *Political Development of Bangladesh*, Delhi, 1989।

৩৫. আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*।

৩৬. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, মুহাম্মদ আনসার আলী, লুৎফর রহমান ও নাজনীন বেগম রচিত। মোঃ শামসুল হক, ড. সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মাদ জুনাইদ ও ড. এ.বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, *সামাজিক বিজ্ঞান*, নভেম্বর ২০০১।

৩৭. রওশন আরা বেগম, আবদুল হাই শিকদার ও ড. ক্ষণদা মোহন দাস, *সামাজিক বিজ্ঞান*, নভেম্বর ২০০১।

৩৮. ড. রতন লাল চক্রবর্তী ও ড. এ. কে .এম. শাহনেওয়াজ, *বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস*, সম্পাদনা ড. সিরাজুল ইসলাম ও ড. এ বি এম শামসুদ্দীন আহমদ, নভেম্বর ২০০১ (এ সংস্করণের সম্পাদক শুধু ড. সিরাজুল ইসলাম)।

৩৯. ড. কাজী মুহাম্মদ, ড. আবুল হাসান শামসুদ্দীন, মাহবুবুল আলম, শহীদ আখন্দ, জসীমউদ্দিন আহমদ রচিত, সম্পাদনা : ড. গোলাম সাকলায়েন। পরিমার্জন ও সম্পাদনা : আনিসুজ্জামান, মফিদুল হক, সফিউল আলম, বাংলা সহজ পাঠ (ইবতেদায়ী ৪র্থ শ্রেণী) ২০০২।

৪০. মওদুদ আহমদ, *শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল*, ঢাকা, ১৯৮৭।

৪১. সালাহউদ্দীন আহমদ, ইতিহাসের বিকৃতি, সালাহউদ্দীন আহমদ, *ইতিহাসের সন্ধানে*, ঢাকা, ১৯৯৫।

২০০২

পাকিস্তান কেন ভেঙেছে বাঙালিদের তা নতুন করে বোঝাবার কিছু নেই। আমরা যারা বড় হয়েছি পাকিস্তানি আমলে তারা সেটি হাড়ে হাড়ে জানি, হয়ত জানে না এ প্রজন্ম। কিন্তু পাকিস্তানিরা কি জানে পাকিস্তান কেন ভেঙেছে? কারা এর জন্য দায়ী? না, তেমনভাবে তারা জানে না। তাদের ধারণা এ বিষয়ে তেমন স্বচ্ছ নয়। এটি মনে হয়েছে সম্প্রতি পাকিস্তান সফর করে। প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমদ ও আমি সম্প্রতি দিন বিশেক পাকিস্তান সফর করেছি। কথা বলেছি রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন সামরিক-বেসামরিক আমলা, অধ্যাপক, সাংবাদিক, ছাত্রদের সঙ্গে। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এটাও মনে হয়েছে, এ নিয়ে তাদের যে পূর্বের ধারণা ছিল, সেটি এখন ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। এর কারণ, পাকিস্তানের বর্তমান জাতিগত সমস্যা। তাছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালি-পাকিস্তানিদের আলোচনা হচ্ছে। প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে পাকিস্তানিরা অনেক তথ্য জানছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের মন্তব্য এতে নতুন করে ইন্ধন যুগিয়েছে। বাঙালিদের কাছে পাকিস্তানের মাফ চাওয়া উচিত—এ বিষয়ে পত্রপত্রিকায় যে-বিতর্ক হচ্ছে তাতেও বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে পাকিস্তান ভাঙার কারণগুলো। আমাদের সঙ্গে আলাপে বিভিন্ন জন এ বিষয়গুলো নিজেরাই তুলে ধরছেন এবং অনেক কথা স্বীকার করছেন বা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে পাকিস্তান ভাঙার কারণগুলো মোটামুটি কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

১. দুই প্রদেশের মধ্যে পার্থক্য
২. শাসকচক্রের দৃষ্টিভঙ্গি
৩. তাৎক্ষণিক কারণ

এখানে উল্লেখ্য যে, এই প্রতিটি বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমাদের কাছে বিষয়গুলো নতুন নয়, কিন্তু পাকিস্তানিদের কাছে বিষয়গুলো নতুন। রাষ্ট্র এমনভাবে সাধারণের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল যে, এ-বিষয়ে তারা ভাবেনি। সেই আধিপত্য এখন প্রশ্নের সম্মুখীন এবং বিস্মিত হয়ে তারা দেখছে যে, বাঙালি বা শেখ মুজিবুর রহমান নয়, তারাই পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী। এ বিষয়টি তাদের বিব্রত করে তুলছে। ১৯৭১ সালে যা ঘটেছে তার জন্যও মনে অপরাধবোধ জাগছে। হয়ত এ কারণেই আমাদের সঙ্গে অনেকে খোলাখুলি কথা বলেছেন, পত্রপত্রিকায়ও বিষয়গুলো আলোচিত হচ্ছে।

কেন্দ্রে যারা শাসন করেছে তারা কি পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানকে নিজেদের অংশ বলে মনে করেছে? না, করেনি। করলে হয়ত দু'প্রদেশের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হতো না। মনোভঙ্গিও অন্যরকম হতো। শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা করেছে সরকারি প্রচারণা এবং সংবাদপত্র। সাংবাদিকরা বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের 'উর্দু প্রেস' ডানপন্থী এবং সরকারমুখী। ফলে সাধারণের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে কিছু ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছিল।

এ পূর্ব ধারণা কী? পূর্ব ধারণা হলো, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু-প্রভাবান্বিত। তাই বাঙালিরা সমপর্যায়ের হতে পারে না। সমপর্যায়ের যেহেতু নয় সেহেতু তাদের প্রতি সমপর্যায়ের ব্যবহারও চলে না।

মেজর জেনারেল তোজাম্মেল হোসেন মালিক (অব:) পঞ্চাশ ও ষাট দশকে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে। সম্প্রতি তার আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন—নিরপেক্ষ যে কোনো পর্যবেক্ষকের চোখেই ধরা পড়ত যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদের নিগার হিসেবে মনে করত। বিশেষ করে সেনাবাহিনী। একটি ঘটনার তিনি উল্লেখ করেছেন। একবার এক সেনা অফিসার কুলাউড়া স্টেশনে চল্লিশ মিনিট ট্রেন থামিয়ে রেখেছিলেন। কারণ তিনি একটি মিটিংয়ে ছিলেন, কিন্তু তাকে যেতে হবে সেই ট্রেনে। আমি যখন বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের ওপর গবেষণা করেছিলাম তখন এক উচ্চপদস্থ আমলা আমাকে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। গুরমানি ছিলেন পাঞ্জাবের গভর্নর । তিনি একবার একজন উচ্চপদস্থ বাঙালি আমলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা, পূর্ব পাকিস্তানে যে সব রাজনীতিবিদ ও আমলা শাসন করেছেন তারা সমাজের কোন স্তর থেকে এসেছেন?' ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন, 'সাধারণ স্তর থেকে।' গুরমানি তখন বলেছিলেন, 'ইফ উই হ্যাভ টু লিভ উইদ পিপল অফ ডাস্ট ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান, তাহলে তো চলবে না।'

বেনজির ভুট্টোও কথাচ্ছলে আমাদের বলছিলেন, আসলেই বাঙালিদের সমভাবে দেখা হতো না। তারা তখন বাস করতেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয়মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের বাসার কাছে। দু'পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ছিল। বেনজির বলেছেন, তারাও তখন বলতেন, তাদের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করা হয় না।

খালিদ মাহমুদ করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক। ১৯৬৩-৬৪-এর সময় ঢাকায় ছিলেন। তাদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল এখানে। তিনি জানিয়েছেন, বাঙালিদের নিচু চোখে দেখা হতো। তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হতো।

এ বছর প্রথমবারের মতো পাকিস্তানে বাংলাদেশ হাইকমিশনে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালিত হয়েছিল। সেখানে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আহমেদ হাসান দানি। গত পনেরো বছর ধরে আমি তাঁকে চিনি। কখনও তাঁকে ক্রুদ্ধ হতে দেখিনি। এই প্রথমবার দেখলাম আবেগ তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে। তিনি অভিযোগের সুরে বলছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা সবসময় বাঙালিদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। আমি তার সাক্ষী। যেহেতু আমি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম, আমার প্রতিও খারাপ ব্যবহার করেছে। বাঙালিরা স্বাধীনতা চাইবে তাতে অবাক হওয়ার কী আছে? যেহেতু, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বাঙালি, সুতরাং তারা হিন্দু-ভাবাপন্ন। বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য দায়ী রাও ফরমান আলি লিখেছেন এবং বলেছেন, হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। মে. জেনারেল উমর, যিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের সচিব ছিলেন, তাঁরও সেই মত। হিন্দু-ভাবাপন্ন বলতে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছে, ভারত দ্বারা প্রভাবান্বিত। পাকিস্তানের প্রচারমাধ্যম সবসময় ভারতকে প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে। সুতরাং লজিকটি হলো এই যে, বাঙালিরা যেহেতু হিন্দু-প্রভাবান্বিত সেহেতু তারা ভারতে বিশ্বাসী অর্থাৎ কম পাকিস্তানি, সেহেতু তারা শত্রু এবং এ ধারণা এমনভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে

যে, অনেক স্বচ্ছ-চিন্তার মানুষও এ প্রশ্নে দ্বিধান্বিত। বিষয়টি কেমন 'ইন-বিল্ট' তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

আমি আর মহিউদ্দিন আহমদ গিয়েছি জেনারেল নিয়াজির বাসায় তাঁর সাক্ষাতকার নিতে। নিয়াজির দুই মেয়েও ছিলেন সেখানে। তাঁরা একপর্যায়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা মুসলমান কি না? মহিউদ্দিন ভাই একটু চটে উত্তর দিলেন 'আমার নাম মহিউদ্দিন আহমদ।' খানিক পর আমাকে দেখিয়ে নিয়াজির ছোটমেয়ে মহিউদ্দিন ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন 'উনি কি হিন্দু?' মহিউদ্দিন ভাই উত্তর দিলেন, 'তার নাম মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন'।

'ওহ, তিনি পাঠান!'

'না', গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন মহিউদ্দিন ভাই, 'তিনি মুঘল'। মর্যাদার দিক থেকে মুঘলরা ওপরে। এ-উত্তরে তারা খানিকটা চুপসে গেলেন।

এ-তাচ্ছিল্যের প্রতি ইঙ্গিত করে ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী একটি মন্তব্য করেছেন। 'পাকিস্তান হওয়ার পর কায়েদে আজম প্রথম ঢাকা না গিয়ে করাচি এলেন কেন? তাঁর তো ঢাকা যাওয়া উচিত ছিল। কারণ পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ মানুষ সেখানে বাস করতেন।' মহিউদ্দিন আহমদ এবং আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, আচ্ছা, বাঙালিরা যদি হিন্দু-ভাবাপন্ন, ভারতীয় প্রভাবান্বিত হয় তাহলে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন—মুসলিম লীগ হয়েছিল ঢাকায়; এ কে ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাব করেছিলেন যার স্মরণে নির্মিত হয়েছে 'মিনার-ই পাকিস্তান'। বাঙালিদের ভোটে পাকিস্তান এসেছে। তাহলে তারা হিন্দু/ভারত-ভাবাপন্ন হয় কিভাবে? বলা বাহুল্য, এর উত্তর তাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। এর উত্তরে তারা আমতা-আমতা করেন। জেনারেল উমর বলেন (বা এখন তারা বলেছেন), বাঙালিরা 'বহুত পেয়ারে, সাচ্চা মুসলমান।' রাও ফরমান আলী ও নিয়াজির মতো লোকও বললেন, বাঙালিদের মুসলমানত্ব বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে ধর্মে তারা বেশি মনোযোগী। নিয়াজি ও তার দুই মেয়েকে আমি সিরিয়াসভাবে বললাম, 'আপনাদের এখানে এসে আমার খুব খারাপ লাগছে। আপনারা এত প্রো-হিন্দু ও প্রো-ইন্ডিয়ান, ডিসগাসটিং।' মহিউদ্দিন ভাই অনেক কষ্টে গম্ভীর থাকলেন। তারা সিরিয়াসলি বললেন, 'কীভাবে?' 'যেখানে যাই' বললাম আমি ভারতীয় গান, কাজল, পূজা ভাট—এদের পোস্টার, হিন্দি ভিডিও।'

দুই মেয়ে তখন সমস্বরে বললেন, 'না, না, সেটি তো অন্য ব্যাপার' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু নিয়াজি গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি পাকিস্তানি গান শুনি না, হিন্দিও শুনি না, আমি ইংরেজি গান শুনি।'

জামাতে ইসলামের সহ-সভাপতি আবদুল গফুর বরং আমাদের প্রশ্নেরই প্রতিধ্বনি করেছেন অন্য অর্থে। তিনি বলেছেন, 'শেখ মুজিব মুসলমান, বাঙালিরাও মুসলমান। না হলে তারা পাকিস্তান চেয়েছিলেন কেন ? আর মুজিব তো ভারতের এজেন্ট ছিলেন না।'

১৯৭১ সাল একদিনে হয়নি। এর পেছনে পুঞ্জীভূত অনেক কারণ ছিল—এ কথা কম-বেশি অনেকে বলেছেন এবং লিখছেন। এম এইচ আসকারি পত্রিকায় প্রকাশিত এক

প্রবন্ধে লিখেছেন—এটি ছিল দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়া। ১৯৪৭ থেকে পাকিস্তানের প্রভাবশালী গোষ্ঠীরা এমন নীতি কার্যকর করেছে যা দুই অংশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পার্থক্য না ঘুচিয়ে বরং দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি সরকারের রুলিং এলিটস'রা এ-ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে, Not much different from the murder plot—in Agatha Christies Murder in the Orient Express. পাকিস্তান মানবাধিকার কমিশনের প্রধান সাংবাদিক আই এ রেহমানও একই মন্তব্য করেছেন। তিনি বলছেন, 'এই পার্থক্য ক্রমেই বাড়ছিল এবং শাসকরা ধর্মের ধুয়া তুলে এ পার্থক্য ঢাকতে চেয়েছিল।'

ভুট্টোর একসময়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, প্রাক্তন ফেডারেল মন্ত্রী ড. মুবাশ্বির হাসান বলেছেন, এককথায় বলা যেতে পারে পাকিস্তানে ছিল একটি 'ইন্টার্নাল কলোনিয়াল সিস্টেম'। পূর্ব পাকিস্তান ছিল কলোনি যার টাকাতে আমরা চলেছি। অধ্যাপক খালিদ মাহমুদ বললেন, শেখ মুজিব একবার ইসলামাবাদে এসেছিলেন। সেখানে বক্তৃতা দেয়ার সময় নিঃশ্বাস টেনে বলেছিলেন, পাটের গন্ধ পাচ্ছি! অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন, ইসলামাবাদ তৈরি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের পাটের টাকায়। জেনারেল তোজাম্মেল লিখেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে গ্রাম-শহরের মানুষরা ছিল গরিব। যে-কোনো উন্নয়নই হোক-না-কেন টাকা-সম্পদ জমা হচ্ছিল কয়েক জনের হাতে। এদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানিরাও ছিল, যাদের ব্যবসা ছিল এখানে। পূর্ব পাকিস্তানে যা হয়েছে তার জন্য হিন্দুরা দায়ী এ কথা বলার অর্থ নিজেদের ফাঁকি দেয়া।

এম এ নকভি পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক, ১৯৭১ সালের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি সে সময় 'ডন' পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছিলেন। 'ডন' ছাপে নি। তখন তিনি 'ডন'-এ লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পঞ্চাশের দশকে বিদেশী অর্থনীতিবিদরা দুই প্রদেশে এক সমীক্ষা চালিয়ে বলেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিখাতের সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষিতে ও পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পে বিনিয়োগ করা হোক। এ নীতি গ্রহণ করা হয়নি। চৌধুরী মোহাম্মাদ আলি আমার বন্ধু নাজিউল্লাহকে বলেছিল, পূর্ব পাকিস্তানে কেন শিল্প স্থাপন করবে? এগুলো চলে যাবে।

দু'দেশের মধ্যে পার্থক্য কেমন ছিল সাক্ষাৎকার যাঁরা দিয়েছেন তাঁরা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাঁরা একসময় পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। তারা এখন বলতে চাচ্ছেন, এই পার্থক্য নিরসনে তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

প্রতিরক্ষার কথা ধরা যাক। জেনারেল উমর বলেছেন, ষাটের দশকে তিনি ছিলেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের কোনো গোলন্দাজবাহিনী ছিল না। বিমানবহরে ছিল মাত্র ছয়টি এয়ারক্রাফট, একটি মর্টার ব্যাটারি। ছিল না কোনো ট্যাংক রেজিমেন্ট। তখন বলা হতো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানে ন্যস্ত। এটি ছিল একটি বোগাস থিউরি। জেনারেল তোজাম্মেলও একই কথা বলেছেন।

আলতাফ গওহর তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানি বা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিল না। তারা কেন্দ্রের কিছু নীতির বিরুদ্ধে ছিল, যা ছিল যুক্তিযুক্ত। আইয়ুব খান বাঙালিদের দাবির 'মেরিট' বোঝেন নি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,

কেন বাঙালিদের সেনাবাহিনীতে নেয়া হচ্ছে না। উত্তরে তিনি বললেন, ব্রিটিশরা এই নীতি করেছে। আমি বললাম, গুর্খাদের তাহলে তারা সেনাবাহিনীতে কেন নিয়েছিল?' অর্থাৎ আকৃতির দিক থেকে তো গুর্খারাও খর্বকায় ছিল।

আলতাফ গওহর আরও বলেছেন, 'বাঙালি অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো পোস্টিং দেয়া হয়নি। কেন্দ্রে এ কে খান, হাফিজুর রহমান, জাস্টিস ইব্রাহিম জোরালোভাবে বাঙালিদের দাবি তুলে ধরেছিলেন। অন্যদিকে আইয়ুব খান যা শুনতে ভালোবাসতেন মোনেম খান, সবুর খান তা-ই বলতেন। যে তিন জন পূর্ব পাকিস্তানিদের দাবি তুলে ধরেছিলেন ১৯৬৩ সালে আইয়ুব খান তাদের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেন।'

আলতাফ গওহর আরও জানাচ্ছেন, কেন্দ্র প্রদেশগুলোর অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছিল। পাটের আয় কেন্দ্রকে দেয়া হয়েছিল। নূরুল আমীন পর্যন্ত বলেছিলেন, এ কী, আমাদের ফকির করে দিচ্ছ। তোমাদের ওপর নির্ভর করে তুলছ। তাঁর মতে, Unfair distribution of national resources was at the root of this." কামারউল ইসলাম আইসিএস অফিসার ছিলেন। পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের সচিব ও ডেপুটি চেয়ারম্যান। তিনি বলেন 'দু'প্রদেশের মধ্যে পার্থক্য ছিল। বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না কেন্দ্রে। এর যে চরম প্রতিক্রিয়া হবে তা বুঝতে পারিনি। পূর্ব পাকিস্তান কখনও তার 'শেয়ার' পায়নি।' এ-নীতি কারা প্রয়োগ করেছিলেন? এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খান বলেছেন, শাসকচক্র ক্ষমতা চেয়েছিল, আমরা নিয়ন্ত্রিত হই সামন্ত শ্রেণী দ্বারা। মধ্যশ্রেণী ক্ষমতায় আসুক তা তারা চায়নি।

এম এ নকভি বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ বজ্রপাতের মতো কাজ করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের মনে হয়েছে, এরা সব বিপ্লবী। জমিদারদের হটিয়ে দিয়েছে। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানের সংসদসদস্যরা ছিল ভূস্বামী, নিজ জমিদারিতে যাদের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত।

এদের সহযোগী ছিল সামরিক ও বেসামরিক আমলাবৃন্দ যাদের অনেকে আবার ছিলেন সামন্ত-পরিবারের অংশ। এই তিন গোষ্ঠী মিলে সৃষ্টি করেছিল পশ্চিম পাকিস্তান তথা কেন্দ্রীয় শাসকচক্র।

মেরাজ মোহাম্মদ ১৯৭১ সালে ছিলেন পিপিপি'র প্রভাবশালী তরুণ নেতা। তিনি বললেন, রুলিং এলিট ও আর্মি, সেক্যুলারিজম, অ্যান্টি ফিউডালিজম ও ডিভ্যুলিশন অব পাওয়ার বরদাশতে রাজি ছিল না। জেনারেল ইয়াহিয়া যখন বলেছিলেন শেখ মুজিব পাকিস্তানের পিএম হবেন তখন ভুট্টো বলেছিলেন, তা হতে পারে না। এর অর্থ যে-ক'টি উপাদানকে শাসকচক্র ভয় করে মুজিব তো তাদের পক্ষে। ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী বলেছেন, 'আর্মি সহানুভূতিশীল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি আর ভুট্টো ছিলেন তাদের মুখপাত্র।'

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ লেঘারি সামন্ত-পরিবারের এবং ছিলেন সিএসপি। বাংলাদেশে তিনি এসডিও এবং এডিসি হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বললেন, 'আমি তখন নিম্নপদের কর্মকর্তা ছিলাম। কিন্তু পাঞ্জাবি ও পশ্চিম পাকিস্তানি সিনিয়র ব্যুরোক্রাটদের দেখেছি বাঙালিদের হেয় চোখে দেখতেন। এমন ভাব করতেন যেন, পূর্ব পাকিস্তানকে দয়া করে তারা কিছু দিচ্ছেন এবং বাঙালিদের অসন্তোষের মূল

কারণ ছিল এটি। রেহমান সোবহান ও অন্য অনেকের ফিলিং ছিল 'ইস্ট পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ডিসক্রিমেনেট করা হচ্ছে।' লেঘারি মনে করেন, এর সবটাই ঠিক নয় কিছুটা অতিরঞ্জন ছিল। সিএসপি অফিসার মাসুদ মুফতি ১৯৭১ সালে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব। যুদ্ধবন্দি হিসেবে ছিলেন ভারতে। পাকিস্তানের প্রাক্তন সচিব ও মন্ত্রী রোয়েদাদ খানের বাসায় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত এবং কলামিস্ট—লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আলাপ চলাকালে তিনি বলেছিলেন, 'আর্মি ফিউডাল এক্সিস যে-কোনো উপায়ে আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে তারা হুমকি মনে করেছিল। কারণ, বাঙালিরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও উচ্চকণ্ঠ।'

'পশ্চিম পাকিস্তানিরা ঐতিহ্যগতভাবে সামন্তপ্রথার কারণে নমিত ও নির্যাতিত। সেনাবাহিনীকে বাঙালিরা বিচার করেছে "অবজেকটিভ সিটিজেন" হিসেবে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা ঐতিহ্যগতভাবে সেনাবাহিনীকে দেখেছে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে হিসেবে।'

এই ভয় বা হুমকির কথা প্রায় সবাই বলেছেন বিভিন্নভাবে। জামাতের আবদুল গফুর বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানিরা ছিল অধিক গণতন্ত্রমনা। পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভেবেছে এদের নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল হবে।

জেনারেল উমর বলেছেন, '১৯৭১ সালে পলিসি ডিকটেট করেছে কয়েকজন, সাধারণ মুসলমান নয়। পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, ১৯৫৮ সালের মার্শাল ল' দিয়ে আমরা সে প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ করলাম, যার পরিণামে পাকিস্তান ভেঙে গেল। এ ছাড়া, পূর্ব পাকিস্তানের লোকজন ছিল শিক্ষিত, রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তারা ভেবেছে এভাবে দেশ চলতে পারে না। আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল সামন্তসংস্কৃতি। সুতরাং মার্শাল ল'তে তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি।'

আসগর খানের মতে, পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা যারা নিয়ন্ত্রণ করতেন তারা ভেবেছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে ফিউডালিজম থাকবে না, সুতরাং ক্ষমতায় তাদের আসতে দেয়া যায় না। আহমদ সেলিম ইসলামাবাদে আমার সঙ্গে আলাপ করার সময় বলেছিলেন, ৭০-এর নির্বাচনের পর পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত-প্রভুদের কয়েকজন প্রতিনিধি মুজিবের সঙ্গে দেখা করে এ আশ্বাস চেয়েছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদারদের বিরুদ্ধে কিছু করা হবে না। কিন্তু মুজিবের সঙ্গে তারা আলোচনা করতে পারেননি।

বাঙালিরা সচেতন, শিক্ষিত, গণতন্ত্রমনা। তারা জমিদারদের মানে না। তারা আইয়ুব খানকে গদিচ্যুত করেছে। জিন্নাহ থাকাকালীন ভাষা আন্দোলন করেছে। তারা ক্ষমতায় এলে কী হবে! অধ্যাপক মাহমুদ বলেছেন, 'ব্যাপারটা ছিল এ রকম। বাংলাদেশ ১৭ বছর ধরে 'এক্সপ্লয়েটেড' হয়েছে। কিন্তু, এবার তারা ক্ষমতায় এলে আমরা (প. পাক) এক্সপ্লয়েটেড হব। অর্থাৎ ক্ষমতা থেকে তাদের সরানো যাবে না। সুতরাং তাদের আটকাও।'

শাসকচক্র প্রকাশ্যে এসব কথা বলতে পারছিল না। তখন তারা নতুন এক তত্ত্বের উদ্ভব করে যা আমরা খুব একটা জানি না। সেটি হচ্ছে 'লায়াবিলিটি তত্ত্ব'। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান

কোনো সম্পদ নয়, সেটি না থাকলেই পাকিস্তান অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নতি হবে। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কাঁধে বোঝাস্বরূপ। এ কথা প্রায় সবাই বলেছেন। এ তত্ত্বের উদ্ভব ষাটের দশকে।

কামারউল ইসলাম বলেছেন, 'আইয়ুব খান কালাবাগের আমির, পরিকল্পনা কমিশনের এমএম আহমেদের মত ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের আর দরকার নেই।' এমএম আহমদ এ কারণে হিসাবনিকাশ করে দেখিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাড়াও পাকিস্তান চলবে। এটি এখন লায়াবিলিটি। সুতরাং তাদের আর কোনো পলিটিক্যাল কনসেশন দেয়ার দরকার নেই। আব্দুল গফুরও প্রায় একই কথা বলেছেন। এম এ নকভি স্পষ্টভাবে বলেছেন, ১৯৬৫-এর দিকে পরিকল্পনা কমিশনের পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্য এবং ব্যুরোক্রেটরা বলেছিল পূর্ব পাকিস্তান লায়াবিলিটি। "উই শুড ডিচ ইস্ট পাকিস্তান।" কারণ, এদের জনসংখ্যা বেশি, সম্পদ কম। এরা ক্ষমতার প্রতি নতজানু নয়। এরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে তা হতে পারে না।

১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতনের পর এই তত্ত্ব পশ্চিম পাকিস্তানি এলিটদের প্রভাবিত করেছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল তাদের বিমূঢ় করে দিয়েছিল এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয়েছিল ১৯৭১ সালের পটভূমি যাকে বলা যেতে পারে তাৎক্ষণিক কারণ।

আই.এ.রেহমান আলোচনাকালে আমাদের যা বলেছিলেন প্রবন্ধাকারেও তা লিখেছেন। তাঁর মতে, ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ধারণা হয়েছিল, ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে, বাঙালিরা জাতীয় ঐক্যের ধারণা বোঝে না, কারণ তারা তা চায় না। এখন যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যাতে মনে করা যেতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানকে তারা আর পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখতে চাচ্ছিল না, যুদ্ধ ছিল অজুহাত। বা যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তারা তাদের উদ্দেশ্য আড়াল করতে চাইছিল। তাঁর ভাষায় "Sufficient evidence is now available to show that the event of 1971 were the consequence of the states ruling coterie's decision to write of the eastern half of the country as a war loss thus betraying the people of both the wings in different ways and in different measure."

মুফতি মাসুদ আমাকে কয়েকদিন আগে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন। সেখানেও তিনি অনেক কারণ দেখিয়ে একই কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে দু'টি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে ১. হামুদুর রহমান কমিশন কেন প্রকাশ করা হলো না? ২. যারা এ ঘটনার জন্য দায়ী তাদের কেন শাস্তি হলো না? তাঁর মতে, পূর্ব পাকিস্তান গেল কিন্তু অজুহাতটি ছিল, শক্তিশালী শত্রুর হাতে পরাজিত হয়েছে পাকিস্তান। তাহেরা মাজহার আলি বলেছেন, সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র চেয়েছিল, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের অংশ হিসেবে না থাকুক। বড় গোলমেলে জায়গা। ১৯৭১ সালে তাদের ইচ্ছা পূরণ হলো।

আরেকটি বিকল্পও ছিল। আকারে ইঙ্গিতে এ কথা অনেকে বলতে চেয়েছেন, কিন্তু রফি রাজা তা স্পষ্ট করে বলেছেন। রফি রাজা ছিলেন ভুট্টোর অন্যতম সহযোগী। তাঁর মতে,

পিপিপির সবাই ও আরও অনেকে ভেবেছিল, আর্মি অ্যাকশন হলে পূর্ব পাকিস্তান ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। 'বেঙ্গলিজ কুড বি শর্টেড আউট।' আর একবার ঠাণ্ডা হলে আরও কয়েক যুগ তাদের দমিয়ে রাখা যাবে।

তাহলে কে দায়ী পাকিস্তান ভাঙার জন্য? এসব বিস্তারিত কারণ বা পটভূমিকার কথা না তুলে যদি প্রশ্ন করা যায় তা হলে দু'ধরনের উত্তর পাওয়া যাবে। আমরা যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তারাও দু'ধরনের উত্তর দিয়েছেন। উত্তর হলো—১. দু'পক্ষই দায়ী; ২. ইয়াহিয়া-ভুট্টো-মুজিব বা ভুট্টো-ইয়াহিয়া-মুজিব দায়ী।

যাঁরা বলছেন, 'দু'পক্ষই দায়ী, তাঁদের মতে, পশ্চিম পাকিস্তান হয়ত বেশি দায়ী, তবে পূর্ব পাকিস্তান এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও পারত।

দ্বিতীয় উত্তরটির পক্ষে অধিকাংশ মানুষ। সবাই ভুট্টো-ইয়াহিয়াকে এক-দুই নম্বরে স্থান দিয়েছেন। রফি রাজা বলেছেন, ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার একধরনের সমঝোতা ছিল যা হয়ত অন্য কেউ জানত না। আবদুল গফুরও তিনজনকে দায়ী করেছেন। ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকির উত্তরটা একটু আলাদা। তিনি বলছেন, বাংলাদেশ আলাদা হতে চায়নি। মেরাজ মোহাম্মদ বলেছেন, পাকিস্তান ভাঙার জন্য ভুট্টো দায়ী। নিজেদের ফিউডাল সিস্টেমকে বাঁচাবার জন্য তিনি পাকিস্তান ভেঙেছিলেন। আলমদার রাজা যে রিট পিটিশন করেছেন তাতেও তিন জনকে দায়ী করেছেন।

এঁদের অধিকাংশকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম। সম্প্রতি পাকিস্তানে একটি নির্বাচন হয়েছে? হ্যাঁ। নওয়াজ শরীফ জিতেছেন? হ্যাঁ। তাহলে বেনজির ভুট্টো পার্লামেন্টে কেন গেলেন? তিনি কেন বলছেন না পার্লামেন্টে যাওয়ার আগে রেস্তরাঁয় বসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে? উত্তর, না তা কী করে হয়! ঠিক আছে, বলি আমি! ১৯৭০ সালে সারা পাকিস্তানে একটা নির্বাচন হয়েছিল? হ্যাঁ। আওয়ামী লীগ জিতেছিল? হ্যাঁ। তাহলে ক্ষমতা তাকে হস্তান্তর করতে হবে? হ্যাঁ। তবে আ. লীগ ৬ দফা চেয়েছিল যা পাকিস্তান ভাঙার সামিল। ঠিক আছে, বলি আমি, নির্বাচন হয়েছিল মার্শাল ল' এবং এলএফও-এর অধীন? হ্যাঁ। শাসকরা এটি জেনেও তো আ. লীগকে বাধা দেয়নি। কোনো উত্তর নেই। থাকার কথাও নয়। বুঝতে পারি, সম্পূর্ণ দায় নিজের ওপর নিতে অস্বস্তি লাগে তাই এ-উত্তর। বা ঐ যে সরকার প্রচারণা চালিয়েছিল তা-ই মাথায় গেঁথে গেছে।

আর থাকে ভারত। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অনেকের কাছে তো ভারত সবসময়ই সবকিছুর জন্য দায়ী। এ ক্ষেত্রে মূল থিসিস হলো, ভারত সবসময় পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছে। ইয়াহিয়া ভুট্টো সে-সুযোগ করে দিয়েছে। সাংবাদিক জেড এ সুলেরি লিখেছেন—'নবনির্বাচিত গণপরিষদ পিপিপি বর্জন করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ভারত তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে। পিপিপি চেয়েছে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে মুক্ত হয়ে একাই সব ক্ষমতা ভোগ করতে, আর ভারত চেয়েছে পাকিস্তানের অঙ্গহানি ঘটাতে একটা বিশাল আঘাতের প্রস্তুতি নিতে যাতে করে মুসলমান জাতীয়তার কেন্দ্রবিন্দুটি গুড়িয়ে দেয়া যায়। তারপরে যা ঘটেছে তা ছিল ভীষণ চক্রান্তমূলক। যে ব্যক্তিটি পাকিস্তানের ভাঙনের জন্য প্রধানত দায়ী তাকেই অবশিষ্ট পাকিস্তানের প্রশাসনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর ব্যাপার হলো এই যে, সেই ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডিকে

আমাদের জাতীয় বিস্মৃতির অতলে কবর দেয়া হয়েছে, যেন-বা আমাদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের কখনোই কোনো সম্পর্ক ছিল না।'

করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খালিদ মাহমুদ কথাটাকে ঘুরিয়ে একটু অন্যভাবে বলেছেন। তাঁর মতে, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, ভারতের মধ্যে হয়ত এক ধরনের সমঝোতা ছিল যে, যুদ্ধটা হবে সীমিত আকারে এবং বাংলাদেশও মুক্তি পাবে। অনেকেই বলেছেন জাতিসংঘে পাকিস্তান কিন্তু বেশ দেরিতে গেছে এবং প্রস্তাব পেশ করতেও দেরি করেছে। তারা মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়নি।

কিন্তু পাকিস্তানিদের অনেকে আবার যে বক্তব্য দিচ্ছেন বা লিখেছেন তাতে অজান্তেই একটি কথা বলেছেন, যা ভারতকে দায়ী করার ব্যাপারটি নাকচ করে দেয়। আমাদের অনেকে প্রশ্ন করেছে, ১৯৭১ না হলে কি বাংলাদেশ থাকত পাকিস্তানের সঙ্গে। আমরা উত্তর দিয়েছি—না। তাঁরা সেটি মেনে নিয়েছেন কারণ তাঁরা সেটি জানতেন। জেনারেল তোজাম্মেল লিখেছেন, পঞ্চাশের দশকে তিনি যখন ঢাকায় তখন সদরি ইস্পাহানি তাঁকে বলেছিলেন, পাকিস্তানি শাসকদের ব্যবহারের প্যাটার্ন না বদলালে পাকিস্তান এক থাকবে না। তাঁর ভাষায়, "I still remember he often used to say that unless there was a greater social contact and fair dealings between East and West Pakistan, their union would not survive for long. West Pakistan should not treat East Pakistan as a colony. They must treat this part as a home land." অধ্যাপক দানি বলেছেন, ১৯৬২ সালে তিনি যখন ঢাকা ত্যাগ করেন তখন উপাচার্য তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন আপনি চলে যাচ্ছেন? দানি বলেছেন, তিনি উপাচার্যকে জানিয়েছিলেন এখানকার অবস্থা দুঃসহ করে তোলা হচ্ছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পাকিস্তান ভেঙে যাবে। ড. মুবাশ্বির হাসান বলেছেন, বাংলাদেশের জন্ম ছিল অবশ্যম্ভাবী।

অর্থাৎ পাকিস্তানিরা জানত, বাংলাদেশ হবে এবং এর কারণ তারা নিজেরাই। যে কদিন থাকে তার থেকে যা পার লুটপাট করে নাও এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সে কাজটিই তারা করে গেছে। আর আমরা নিতান্ত মূর্খের মতো পাকিস্তানি আদর্শের কথা ভেবেছি এবং এখনও অনেকে তা ভাবে। কিন্তু পাকিস্তানের অনেকে আমাকে বলেছেন, যা আমাদের দেশের পাকিস্তানিদের বলতে চাই—'তোমরা স্বাধীন হয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। ভাল করেছ। এখন এগিয়ে যাও।'

১৯৯৮

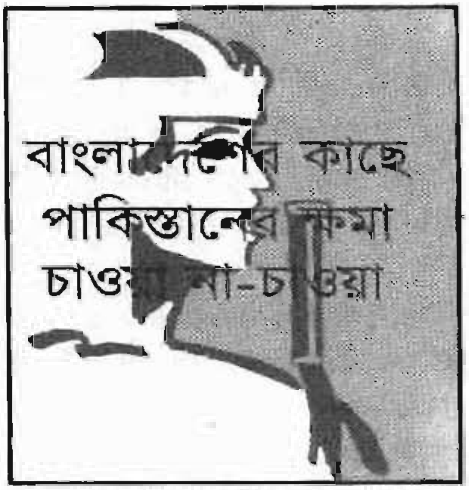

ঢাকায়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা বাংলাদেশে তো বটেই, পাকিস্তানেও প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ঢাকায় তিনি শুধু বলেছিলেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের রায় মেনে যদি আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতো তাহলে পাকিস্তানের ইতিহাস অন্যরকম হতো। অর্থাৎ, রায় মানাটা উচিত ছিল। করাচিতে তিনি আরো একধাপ এগিয়ে বলেছেন, যারা অপরাধী তাদের শাস্তি পেতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর শাসন করতে না পারে সে জন্যই তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকবর্গ যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছিল।

বাংলাদেশে অনেকে লিখেছেন, এ মন্তব্যই যথেষ্ট নয়, ক্ষমা চাইতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কিন্তু, এটি আমরা ভেবে দেখিনি যে, নওয়াজ শরিফই একমাত্র পাকিস্তানি শাসক যিনি গত ২৮ বছরে ১৯৭১ সাল সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। ভুল স্বীকার করলেন। পাকিস্তানে এ-বিষয়ে জনমত সৃষ্টির সূচনা করলেন।

সম্প্রতি পাকিস্তান সফরকালে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছি। আমি করাচি, লাহোর, ইসলামাবাদ গেছি এবং সেখানে প্রায় চল্লিশ জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাদের মধ্যে প্রাক্তন জেনারেল, মন্ত্রী, সচিব, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, অধ্যাপক, ছাত্র সবাই আছেন। এই প্রথম, বহুদিন পর দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানে ১৯৭০-৭১ সালের ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে এলিট মহলে। নওয়াজ শরিফের মন্তব্যের পর পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়েছে। পাঠকরা চিঠি লিখে পত্রিকায় তাদের মতামত জানাচ্ছেন। তবে, জন প্রতিক্রিয়া বহুধাবিভক্ত।

অনেকে যে নওয়াজ শরিফের বক্তব্যের মধ্যে রাজনীতি খুঁজে পাচ্ছেন তা নয়। শরীফ যদি এ বিষয়ে তদন্তের আদেশ দেন বা এ নিয়ে খোঁচাখুঁচি করেন তাহলে অবশ্যই পাকিস্তান ভাঙার দায় আরো অনেকের সঙ্গে ভুট্টোর ওপরও বর্তাবে। তাহলে বেনজির বিব্রত বোধ করবেন, পিপলস পার্টির ওপরও একচোট নেয়া যাবে। উল্লেখ্য, এই বিতর্ক সম্পর্কে বেনজিরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছেন। কথা উঠেছিল হামুদুর রহমান কমিশন নিয়েও যার উল্লেখ শরিফও করেছেন। অনেকের ধারণা, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে অনেক কিছু জানা যেত। কিন্তু, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি এবং পাকিস্তানে একটি প্রচলিত ধারণা যে, রিপোর্টের কপি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। বেনজির ভুট্টো বললেন, "আমার বাবার কাছে একটি রিপোর্ট ছিল। তাতে পরিষ্কারভাবে তাঁকে দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সামরিক শাসকরা যখন তাঁকে গ্রেফতার করে তখন কপিটিও নিয়ে যায়।" তিনি আরো বললেন, এখন যখন আবার তা নিয়ে কথা উঠছে তখন তা প্রকাশ করা উচিত।

"আপনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন করলেন না কেন?" জিজ্ঞেস করি আমি।

"বাধা ছিল।"

বেনজির ভুট্টো অবশ্য এটি বললেন না যে, তাঁর যেমন বাধা ছিল কমিশন রিপোর্ট প্রকাশে, শরিফেরও তেমন বাধা থাকতে পারে। সে বাধাটি হলো সেনাবাহিনী। বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ পাকিস্তান সৃষ্টি করেছেন। পাকিস্তানের ওপরে আল্লাহ, নিচে মিলিটারী। এ ছাড়া আছে সামন্ত জমিদার ও আমলারা। তাই বলতে দ্বিধা নেই, নওয়াজ শরিফ যতটুকু বলেছেন, পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে তাতে সাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন।

নওয়াজ দু'টি বিষয় তুলে ধরেছেন। যে শাসকচক্র (অর্থাৎ সামন্ত, সামরিক-বেসামরিক আমলা) ১৯৭১ সালের সঙ্গে জড়িত ছিল এবং যাদের অনুসারিরা এখনও আছে তাদের তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন। তারা, এ অধ্যায়টি পাকিস্তানের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চান। দ্বিতীয়, সাধারণ মানুষ এখন বুঝতে পারছে ১৯৭১ সালে কিছু একটা হয়েছিল। বলে রাখা ভালো, পাকিস্তানে ব্যাপক আলোচনা করে মনে হয়েছে, অল্প কিছু ব্যক্তি ছাড়া বাংলাদেশে কী হয়েছে কেউই তা জানত না। এটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু পুরোটা অসত্য নয়। পাকিস্তান গেলে, মানুষজনের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায়, রাষ্ট্র কীভাবে মানুষকে দাস করে রাখতে পারে। শাসকরা যা বলে (অন্তত তখন), বোঝায় তাই তারা মেনে নেয়। ১৯৭১ সালে তাদের বলা হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে তা একটি ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু-চক্রান্ত যার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মুসলমানরা লড়ছে। এটি তারা বিশ্বাস করেছিল এবং এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তারা করেনি।

একদল বলেছেন, যা আগেই উল্লেখ করেছি, শরিফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে মন্তব্য করেছেন। হুসেইন হাক্কানি 'দি নেশন' পত্রিকায় লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী বিচ্ছিন্নভাবে ইতিহাসের ঘটনাবলি বিচার করছেন। তিনি এ কথা বলছেন, কারণ, তাকে তার ম্যান্ডেট রক্ষা করতে হবে যা এখন বৈধতার সম্মুখীন। এ বৈধতা এখন ক্রমাগত প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে। হ্যাঁ, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অত্যাচার হয়েছিল কিন্তু তার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সমগ্র রাজনৈতিক নেতৃত্ব দায়ী যার মধ্যে মুসলিম লীগও অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, শরিফ মুসলিম লীগের নেতা। হাক্কানি অবশ্য স্বীকার করছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত তখন দৃঢ়ভাবে সামরিক ব্যবস্থা সমর্থন করেছে। তার ভাষায়—"It can be argued that the application of force in Bengal was merely an extension of the dominant political way of thinking in West Pakistan. True excess in the course of military action are, of course the responsibility of the military leaders."

অর্থাৎ তিনি আবার ভুট্টোকে আড়াল করে সামরিক চক্রকে দায়ী করছেন। হাক্কানি আরো লিখেছেন, ভারতের ভূমিকার কথা শরিফ কেন ভুলে যাচ্ছেন? সমস্ত কাণ্ডটার জন্য তো ভারতই দায়ী। সুতরাং ক্ষমা চাওয়ার আগে এসব বিষয়ও বিবেচনা করতে হবে। এ তত্ত্ব অনেকে স্বীকার করেন যে, অন্যায় করা হয়েছিল, সামরিকবাহিনী বাড়াবাড়ি করেছে—সবই ঠিক, কিন্তু দায়ী হচ্ছে ভারত।

সামরিকবাহিনীর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই তারা এখন আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত। সুতরাং তারাও এখন যোগ দিচ্ছেন বিতর্কে। পাকিস্তান সরকারের কাশ্মীরবিষয়ক মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত লে.জে. আবদুল মজিদ মানিক বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

বক্তব্যে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন, এর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য, এ কথাও বলছেন, তিনি এ বক্তব্য রাখছেন সরকারি মন্ত্রী হিসেবে নয়, ব্যক্তি হিসেবে।
ভারতের আগ্রাসনের কথা তিনিও উল্লেখ করেছেন। বলছেন, ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যারা জেহাদ করেছেন তাদের 'গণহত্যা'র জন্য অভিযুক্ত করা তাদের দেশাত্মবোধের প্রতিই অপমান। বলেছেন তিনি, "I would request Dhaka not to touch this issue because it would not do any good to the relation between the two countries."
এ ভাষ্যের আরেকটি উপ-ভাষ্য আছে, সেটিও প্রতিফলিত হচ্ছে জনমতে। ড. এম. এ. সুফির লেখা "বাংলাদেশ : মেরা দেশ" নামে গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে ১৮ই মার্চ বলেছেন সিন্ধুর গভর্নর মঈনউদ্দিন হায়দার, সত্য জানা দরকার। বাংলাদেশ ছিল একটি স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র ("was a sovereign muslim state") যা ভারতের উপনিবেশে পরিণত হয়নি। এটি দ্বিজাতি তত্ত্বের অভ্রান্ততা প্রমাণ করে। এখনও, তার মতে, বাংলাদেশের মানুষ হিন্দু-ভারত থেকে মুসলিম-পাকিস্তানকে কাছের মনে করে [এর প্রমাণ, তিনি বলেন নি, কিন্তু বলেছেন ঢাকায় ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলার সময় পাকিস্তানি খেলোয়াড় ও দলকে নিয়ে উচ্ছ্বাসের কথা]। সুতরাং, তার ভাষায়—" If we (Pakistan) set out house in order, learn a lesson from the past mistakes, keep the present right and make positive head way in the future, the possibility of Islamabad and Dhaka getting closer to each other cannot be ruled out."
এ তত্ত্ব এগিয়ে নেয়া পছন্দ করছেন অনেকে। কারণ, এর মধ্যে সূক্ষ্মভাবে থাকছে, পাকিস্তান যে ভুল করেছে তা স্বীকার করা এবং এ বক্তব্য তুলে ধরা যে, বাংলাদেশ মুসলিম দেশ, সুতরাং হিন্দু-ভারতের বিরুদ্ধে মুসলমান পাকিস্তান-বাংলাদেশ এক হতে পারে।
সাংবাদিক জেড এ সুলেরি যিনি সব সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার জন্য বিখ্যাত, ক্ষমাপ্রার্থনা সম্পর্কে লিখেছেন, "১৯৭১ সালের ট্র্যাজেডি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের স্মরণ তাই ইতিহাসের প্রতি সর্বপ্রথম একটি সরকারি বোঝাপড়া, যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অতিরঞ্জিত করার জো নেই।" তিনি আরো লিখেছেন 'দি নিউজ ইন্টারন্যাশনাল' পত্রিকায়—"এই অনুসন্ধানের কেন্দ্রীয় কথা হলো, আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করে এবং সেগুলো শুধরে নিয়ে আমরা আমাদের বাংলাদেশের ভাইদেরকে আরো কাছে টানব। ভারত আমাদের চারপাশে যে বলয় শক্ত করে চেপে আনছে তা ভেঙে ফেলতে আমাদেরকে সাহায্য করবে আমাদের এই সৌহার্দ্য।" বেনজির ভুট্টোও আমাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন। সুলেরি আরো বলেছেন, সুতরাং, "ভারতীয় হুমকির মুখে আমাদের জাতীয় সংহতির বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া অতি সামান্য ব্যাপার।"
সাধারণ পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানার মাপকাঠি হয় যদি চিঠিপত্র, তাহলে বলব, সংবাদপত্রে এ বিষয় যে কটি চিঠি দেখেছি সেগুলোর লেখকরা একবাক্যে বলেছেন, মাফ চাওয়ার

কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এর একটি কারণ হতে পারে, ১৯৭১ সাল সম্পর্কে তারা জানে না। যারা জানেন বা এখন জানছেন তারা মনেমনে স্বীকার করে নিচ্ছেন, আত্মগ্লানিতে হয়ত ভুগছেনও কিন্তু প্রকাশ্যে মাফ চাওয়ার ব্যাপারে নীরব। শুনেছি, যারা এখানে পাকিস্তানের পক্ষে লড়াই করেছিল পরবর্তীকালে তাদের অনেকে মানসিক বৈকল্য বা তীব্র ডিপ্রেশনের স্বীকার হয়েছে। বামপন্থিরাও পুরো বিষয়টির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নে নীরব। হয়ত সমগ্র দেশে এ নিয়ে বিতর্ক জোরদার হলে তারা মুখ খুলবেন। যারা ক্ষমা চাওয়ার বিরুদ্ধে এবং যারা সমবেদনা প্রকাশ করেছেন আমাদের কাছে তারা কিন্তু আরেকটি বিষয়ও যোগ করেছেন। তা হলো, পাকিস্তান ১৯৭১ সালের জন্য দায়ী, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানও খানিকটা দায়ী। কেন, কীভাবে তা তারা বিশ্লেষণ করেন না কিন্তু বলেন, ভারত এর জন্য দায়ী।

আসলে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি আত্মসমর্পণ করেছিল এটা মেনে নেওয়া পাকিস্তানের এলিটদের পক্ষে কষ্টকর। লাহোরের 'ফ্রাইডে নিউজের' বাম-ঘেঁষা সাংবাদিক খালেদ আহমদ বলছিলেন, বাংলাদেশ পাকিস্তানের সম্পর্কে ভালো হতে পারে না কারণ পাকিস্তান এখনও সেই পরাজয়ের সঙ্গে 'reconcile' করতে পারেনি।

ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিক ১৯৭১ সালে ছিলেন সেনাবাহিনীর জনসংযোগ অফিসার। তিনি এখন এ বিষয়ে বেশ লেখালেখি করছেন। "পাকিস্তানের মানুষদের এখন শান্তভাবে, "বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা উচিত।" লিখেছেন তিনি।

Are we pleading to something simple by refusing to fach it? If Bangladesh demands an apology from us, we might as well turn around and suggest a corporate basis for the consideration of such a demand."

কারণ, সত্য হলো এ সংকটের জন্য দু'পক্ষই দায়ী। পশ্চিম পাকিস্তানের হয়ত একটু বেশি।

পাকিস্তানের প্রাক্তন কেবিনেট সেক্রেটারি, ১৯৭১ সালে ঢাকায় সচিব হিসেবে যিনি কর্মরত ছিলেন সেই হাসান জহির এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছেন, "আমরা যথাযথ ব্যবহার করিনি, বাড়াবাড়ি হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক আছে। কিন্তু, It too early to start this controversy."

এ সূত্র ধরেই অনেকে এখনই ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো একটি 'ট্রুথ কমিশন' করার পক্ষপাতী। এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন, আইয়ুব খানের ঘনিষ্ঠ আমলা আলতাফ গওহর। ৮ই ফেব্রুয়ারি 'দি নেশন'-এ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন এ বিষয়ে। আমাদের সঙ্গে আলোচনাকালেও তিনি এ বিষয়ে জোর দিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনজীবী এস এম জাফরও তা সমর্থন করেছেন। এস এম জাফরের মতে, তাহলে সবসময়ের জন্য ১৯৭১ সালের পটভূমিকা জানা যাবে। আলতাফ গওহর বলছেন, এটা না করলে আমরা আমাদের বর্তমান বুঝতে পারব না এবং আমাদের জনমানুষের ভবিষ্যতকে যথার্থভাবে রূপ দিতে পারব না। 'নেশন' পত্রিকায়ই তিনি লিখেছেন, "Truth never hurts, it enables the nation by identifying those who acted against

the people. The humiliating ceremony of surrender of the Pakistan Army in Dhaka shattered our national interests..."
পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ড. নাসিম হাসান শাহ্ এবং সিন্ধুর গভর্নরও ট্রুথ কমিশন স্থাপনের কথা বলেছেন। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও অনেকে এর যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন।
প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার পক্ষে প্রকাশ্যে বলাবলির করেছেন হাতে গোনা কয়েকজন। এরও আবার দু'টি দিক আছে। কিছু বলেছেন, যারা এর জন্য দায়ী তাদের শাস্তি হবে। অন্যরা বলছেন, ক্ষমা চাইতে হবে। দু'টি বিষয় কিন্তু ভিন্ন। এদের কয়েকজন হলেন এয়ার মার্শাল আসগর খান, তাহেরা মাজহার আলি, আই এ রহমান এবং আহমদ সেলিম। ১৯৭১ সালেই এরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আমরা যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তারা সবাই একবাক্যে বলেছেন, আসগর খানই একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি ঐ সময় প্রকাশ্যে জনসভা করে সামরিক জান্তার কার্যকলাপকে নিন্দা করেছেন। এ কারণে, তাঁকে ঢিল ছোঁড়া হয়েছে; তাঁর জনসভা ভেঙে দেয়া হয়েছে। তাঁকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর বক্তব্য থেকে একচুলও সরেননি। নওয়াজ শরিফের বক্তব্য এবং জেনারেল নিয়াজির গ্রন্থটির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন, "It is apparent that even after 27 years it will be a national mistake to gloss over the events of 1971 tragedy as had been done by General 'Tiger' Niazi..." আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও তিনি একই কথা বলেছেন এবং দাবি তুলেছেন ১৯৭১ সালের হোতাদের শাস্তি দিতে হবে।
আলমদার রাজা আবেগপ্রবণ মানুষ। ১৯৭১ সালে তিনি ঢাকার কমিশনার। আমরা রাও ফরমান আলির সাক্ষাৎকার নিয়েছি শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। এখন তিনি আইনব্যবসা করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি লাহোর হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন করেন। রিটে তিনি দাবি তুলেছিলেন ওয়ার কমিশন বা হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য। তাঁর দাবি, ২৫ বছর পর সরকারি নথিপত্র জাতীয় অভিলেখগারে পাঠানোর নিয়ম কিন্তু এ সংক্রান্ত নথিপত্র এখনও পাঠানো হয়নি। যারা দোষী তাদের শাস্তি দেয়া হয়নি। সুতরাং যারা দোষী তাদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। তাঁর আরজিটির কয়েকটি বয়ানের উদ্ধৃতি দিচ্ছি যেখানে প্রকাশ্যে হত্যা, ধর্ষণের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এধরনের নজিরও পাকিস্তানে কম।

"g. That large scale extra judicial and custodial killings, looting, raping was not stopped and the culprits were not punished.

j. That the persons guilty of major crimes of vivisection of the country surrender of the Eastern command, killing, raping and looting were protected and no action was taken against them.

n. That there has been no accountability of those who have indulged in heinous crimes in 1971 and even the latest Ehtesab ordinance does not apply to these people although their crimes

are much greater in magnitude than the people whose Ehtesab is being done since 1985 under the Ehtesab ordinance.

o. That on an average about half a million people have lost their lives and Pakistans basic concept has been eroded. The wave of crimes let loose in East Pakistan still continues in Pakistan."

আলমদার রাজা বলছিলেন, তিনি যখন আদালতে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলির বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন বিচারপতি বারবার বলছিলেন, 'এটা কি সত্যি?' তারপর পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক এক তরুণী ধর্ষণের ঘটনা যখন তিনি বর্ণনা করছেন তখন বিচারকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তিনি রিট পিটিশন গ্রহণ করেন। কিন্তু, রাজা জানালেন, এক বছর হয়ে গেল, এর শুনানি আর হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

ভুট্টোর অন্যতম সহযোগী, একসময়ের ফেডারেল মন্ত্রী ড. মুবাশ্বির হাসান আমাদের বলেছেন, হ্যাঁ, পাকিস্তানের ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত। এ ব্যাপারে সবসময় সোচ্চার সমাজকর্মী তাহেরা মাজহার আলি। ১৯৭১ সালে মার্চে মাত্র কয়েকজন মহিলা নিয়ে রাজপথে তিনি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। আমাদের তিনি বলেছিলেন, এসব মহিলারা তথাকথিত উচ্চবর্গ বা মধ্যবিত্তের নয়। নিম্নবর্গের। ইউপিএল-এর মহিউদ্দিন আহমদ বলছিলেন, বছর দুয়েক আগে পাকিস্তানে তারা একটি সাহিত্য সম্মেলনে এসেছিলেন। তখন তিনি, ড. সুলতানা জামান, কবীর চৌধুরী, এনায়েতুল্লাহ খান মিলে সভাপতিকে একটি স্মারকলিপি দিয়ে জানান, ১৯৭১ সালের ঘটনার জন্য পাকিস্তানের ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত—এ রকম একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক। সভাপতি রাজি নন। তখন তাহেরা মাজহার আলি জোর করে মঞ্চে উঠে নিজের ও পাকিস্তানের তরফ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তাহেরা বললেন, ১৯৭১ সালের ঘটনার প্রতিবাদ করায় ঐ সময় অনেকেই আমাকে দেশদ্রোহী বলেছে।

পাকিস্তান মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি আই এ রেহমান পাকিস্তানের ক্ষমাপ্রার্থনার ব্যাপারে সোচ্চার। ১৯৭১ সালের ঘটনার প্রতিবাদে তিনি চাকরি ত্যাগ করেন ও লাহোর থেকে নিজেরা পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। নিউজলাইন পত্রিকায় তাঁর একটি বিরাট প্রবন্ধ বেরিয়েছে এ সম্পর্কে। লাহোরে তাঁর অফিস-কক্ষে যখন আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করছি তখন এক মহিলা এলেন, বখতিয়ারি নাম। থাকেন করাচিতে। তিনি রেহমানকে তাঁর প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জানাতে এসেছেন। আমাদের বললেন, ১৯৭১ সালে আমি ছিলাম সুখি এক গৃহবধূ। কিন্তু, যখন আমি এ-ঘটনা জানতে পারলাম তখন আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। আমি নিম্নবর্গের মধ্যে কাজ শুরু করলাম ও একই সঙ্গে পড়াশোনা শুরু করলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেয়ার পর তিনি এখন সমাজকর্মী। ঢাকা ঘুরে গেছেন। আই এ রেহমান দ্ব্যর্থহীনভাবে আমাদের জানালেন, পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত। বাঙালিদের জানমালের আক্রমণের কোনো যৌক্তিকতা নেই। যুদ্ধের নীতির মধ্যে তা পড়ে না। যদি অল্প কয়েকজন মানুষও নিহত হয়ে থাকে বিনা কারণে, যদি একজন নারী ধর্ষিতা হয়ে থাকে, হত্যা করা হয়ে থাকে কয়েকজন শিশুকে (যার কোনো কারণ নেই) তাহলেও পাকিস্তানের ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত। তিনি খুব সুন্দর

একটি মন্তব্য করেছেন এ পরিপ্রেক্ষিতে যা মূল ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করছি—"If we sincerely believe that in 1971 a great befell us, then a catharsis of the same order is necessary for the restoration of our mental health and our perception of justice and equity. So long as we believe, and continue to teach our children that we were not responsible for killing our innocent people in Bengal we will never be able to understand what actually happened."

আহমদ সেলিমের নাম আমাদের কাছে পরিচিত। তাঁর সঙ্গেও দেখা হলো এবার ইসলামাবাদে। ১৯৭১ সালে ন্যাপের কর্মী হিসেবে তিনি প্রতিবাদ করে জেল খেটেছেন। পাকিস্তানের ক্ষমাপ্রার্থনার দাবিও তিনি করে আসছেন। এবার মনে হলো তিনি একটু ক্ষুব্ধ। কারণ, বাংলাদেশে কয়েকবার আসায় বাংলাদেশের কয়েকজন নাকি সন্দেহপোষণ করেছে। তিনি বলছেন, বাংলাদেশের অনেকে পাকিস্তানের ক্ষমাপ্রার্থনার দাবি ও যারা দোষী তাদের শাস্তি দাবি করেছেন। এটি যৌক্তিক। কিন্তু, যদি প্রশ্ন করি, বাংলাদেশে যারা কোলাবরেটর বা যুদ্ধাপরাধী তাদের বিষয়ে বাংলাদেশ কী করেছে?

এ প্রশ্ন আমাকে আরো কয়েকজন করেছেন। বলা বাহুল্য, আমি তার উত্তর দিতে পারিনি।

১৯৯৮

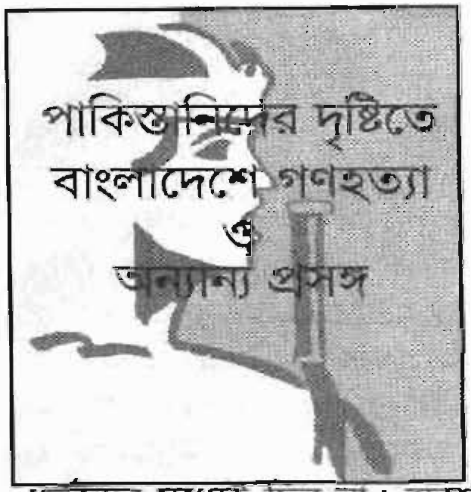

১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কী ঘটেছিল বাংলাদেশে? যারা চল্লিশোর্ধ বা তার কাছাকাছি তারা তা জানেন। ১৯৭১ সালে সমগ্র বিশ্বও তা জানত। সে-সময় এমন কোনো দেশ খুব কমই ছিল যেখানে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার ও মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ওঠে নি। কিন্তু মনে হয় জানত না একটি দেশ এবং এর অধিবাসীরা। সে-দেশটির নাম পাকিস্তান। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু যদি এ ধারণা সত্যি হয় তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে কী দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বিচার করত বাঙালিদের। অর্থাৎ বাঙালিরা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। অবশ্য, আক্ষরিক অর্থে, এ-বক্তব্য গ্রহণ না করাই ভালো। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান দখলে রাখার চেষ্টা করেছে এবং এ-জন্য যা যা করা দরকার তা-ই করেছে। কারণ, তাদের ভাষায়, তাদের দরকার ছিল মাটি, মানুষ নয়। আর এ-বিষয়টি তাদের দেশের কেউ জানে না, তা হতে পারে না। এ-প্রসঙ্গে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি নীতিনির্ধারকদের অনেকের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। এর সহজ সরল উত্তর পাওয়া যায় নি। উত্তরগুলোর ধরন এ রকম—১. জানতাম কী হচ্ছে ২. কী ঘটছে তার কিছু কিছু জানতাম, সবটা নয় ৩. [জানতেন কিন্তু এখন বলছেন] কিছুই জানতাম না।

সাম্প্রতিক পাকিস্তান সফরে যাঁদের সঙ্গে আলাপ করেছি তাঁদের অধিকাংশ অবশ্য বলেছেন, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জানতো না ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে কী ঘটেছে। নিতান্ত 'দায়িত্ববান' ব্যক্তিরাও তা বলেছেন। এর কারণ কী? উত্তর হচ্ছে—১. রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রচার ২. সম্পূর্ণ সেন্সরশিপ।

পাকিস্তানের উর্দু পত্র-পত্রিকাগুলো সবসময় বাঙালিদের বিরুদ্ধে ছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকাংশ সময় তারা বাঙালিদের নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরেছে। বাঙালি এবং বঙ্গবন্ধুকে চিত্রায়িত করা হয়েছে একটি জাতি এবং একজন নেতা হিসেবে যারা পাকিস্তান ভাঙতে চায়। এবং পাকিস্তান ভাঙার জন্য তারা হিন্দু-ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। পাকিস্তানে এ-ভাবনা ব্ল্যাশফেমির মতো। সুতরাং [১৯১৭ সালে] সদরে আলা ইয়াহিয়া খান যা করেছেন ঠিকই করেছেন। কারণ, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ বেড়ে উঠেছে সামন্ত পরিবেশে, মনের গড়ন তাদের একমুখী; রাষ্ট্র যা বলছে, তাদের ধারণা, তা-তাই ঠিক। ২৫ শে মার্চের পর গণমাধ্যম পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত নির্মম ঘটনাবলি ব্ল্যাক আউট করে দেয়। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণের চিত্র টেলিভিশনে দেখার পর তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। আল্লাহর পর পাকিস্তানে যাদের দেখা হয়, সেই পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী কিনা বাঙালি ও ভারতীয়দের কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছে। তাদের মনোজগতে এ-সংবাদ ও চিত্র প্রবল আঘাত হানে। দেশ জুড়ে এর তীব্র প্রতিক্রিয়ার পর এ-চিত্র আর পাকিস্তানে কখনো দেখানো হয় নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে [১৯৭১ সালে] মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কি পাকিস্তানে 'মধ্যবিত্তে'র কাছে রেডিও বা ট্রানজিস্টার ছিল না। ছিল। তবে, পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনো রেডিও'তে তারা আগ্রহী ছিল না। আমাদের আরো মনে রাখা দরকার, পাকিস্তান কওম নিয়ে বাঙালিরা যত চিন্তিত ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানীরা কখনই তত চিন্তিত ছিল না। পাকিস্তান বলতে তারা পশ্চিম পাকিস্তানকেই বুঝত। পূর্ব পাকিস্তানকে নয়। এ-বিষয়ে তাদের কোনো দ্বিধা ছিল না দেখে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তাদের নীতির কখনও পরিবর্তন হয় নি এবং ১৯৭১ সালে এ-দেশে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালাতেও তাদের বাধে নি। আমরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম দেখে আমাদের ভুগতে হয়েছে, মাসুল দিতে হয়েছে। তৎকালীন হানাদারবাহিনীর জনসংযোগ পরিচালক ব্রিগেডিয়ার (অব) এ আর সিদ্দিকির সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল করাচিতে। তিনি বলছিলেন, সরকার পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক তা প্রচারে ব্যগ্র ছিল এবং নিয়ত তা প্রচার করছিলও। ২৫শে মার্চের ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী যে এত তীব্র হবে তা শাসকরা অনুধাবন করেননি। সরকার একদিকে বলছিল সব স্বাভাবিক এবং এ-খবরও দিচ্ছিল 'দুষ্কৃতকারী'দের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে; [বা হয়েছে] এবং তাদের দমন করা হচ্ছে। এ-প্রচারে যে-স্ববিরোধিতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। গড়পড়তা পশ্চিম পাকিস্তানি বিশ্বাস করেছে; সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে খাসা কাজ করেছে এবং এ-কারণে নিয়ত তারা প্রশংসার যোগ্য। সদ্য প্রকাশিত তাঁর বইয়ে সিদ্দিকি এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন—"Most People in the west wing sang hosannas to him and wished him all the luck and success in his mission.

সিদ্দিকি ঐ গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেছেন, এভাবে ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর ইমেজ হয়ে ওঠে দ্বিধাবিভক্ত। পাকিস্তানের এক অংশে সে বীর, অন্য অংশে নিপীড়নের হাতিয়ার। তাঁর ভাষায়, "Psychologically the soldier acquired a kind of schizophrenia by fighting against the people he was supposed to stand by and defend. Professionally, he suffered from doubt about his own ability to fight a counter insurgency operation for which he had never been trained. In propaganda alone did he feel secure and vendicated."

প্রচারের এ-লাইনটি জেনারেল ইয়াহিয়া নিজেই শুরু করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতায়, বাঙালি স্বাধীনতাকামীদের তিনি উল্লেখ করেছেন কাফের বলে। এর অর্থ পাকিস্তানি সেনা যুদ্ধ করছে ইসলামবিরোধী অর্থাৎ কাফেরদের সঙ্গে। পাকবাহিনী হচ্ছে মুজাহিদ। মুজাহিদ হলো সে, যে জিহাদে লিপ্ত। সুতরাং এ সব মুজাহিদকে বন্দনা ছাড়া আর কী করা যাবে?

যারা শিক্ষিত, সরকারের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত তারা কী বলেন? গণহত্যা শব্দটি কি তারা শুনেছেন? না, ... হ্যাঁ, পূর্ব পাকিস্তানে সে-সময় কিছু একটা হচ্ছিল, হয়ত মারাও গেছে কিছু। কিন্তু বিহারি ও পাকিস্তানিদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তান থেকে সে-সময় প্রকাশিত শ্বেতপত্রেও এ-বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ঘটনাবলির ব্যাপারে পাকিস্তানে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন নীতিনির্ধারণে তারা এ লাইনটি গ্রহণ করেছেন। সেটি হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানে মার্চ মাস

থেকেই নির্বিচারে বিহারি এবং পাকিস্তানিদের হত্যা চলছিল। ফলে, পাকিস্তানি সৈন্যদের মাথা ঠিক ছিল না। তাদের ধারণা হচ্ছিল, তারা শত্রুপুরিতে বাস করছে। সুতরাং ২৫শে মার্চ তারা হয়ত এক-আধটু বাড়াবাড়ি করেছে। আমরা তাদের অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, এই নির্মম হত্যাকাণ্ড যদি চলেই থাকে তাহলে বিদেশী কোনো পত্রিকায় কেন তা ছাপা হলো না? তখন তো বাংলাদেশ সরকার হয় নি। এ-প্রশ্নের জবাব তাঁরা দিতে পারেন নি। কারণ, দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু গণহত্যার বিষয়টি আড়াল করার জন্য এ-লাইনেই প্রচার চলেছে এবং এখনও চলছে।

এদের অধিকাংশ যে-মিথ্যা বলছেন তা প্রমাণিত হচ্ছে অন্যভাবে। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তাঁরা বই লিখছেন, সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন এবং সেখানে নানা কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে যার দু'একটি বিবরণ দিচ্ছি।

সুহায়েল লারি ও ইয়াসমিনি লারি করাচিতে থাকেন। উচ্চবিত্ত পরিবার, লারি একজন গবেষক, বিদেশে পড়াশোনা করেছেন। করাচিতে এখন তারা হেরিটেজ ফাউন্ডেশন গঠন করে সিন্ধুর ঐতিহ্য রক্ষায় ব্রত। লারি বলছিলেন, "আসলে মনোভাবটা তখন কী রকম ছিল বলি। ড. মুবাশ্বির হাসান ছিলেন ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ, ফেডারেল মন্ত্রী হয়েছিলেন তাঁর সময়ে। ২৫শে মার্চ ভুট্টোর সঙ্গে ছিলেন তিনি ঢাকায়। ঢাকা থেকে ফেরার পর পর তার সঙ্গে আমার দেখা। জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী কী হচ্ছে সেখানে? তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, '৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্য লাখখানেক মরেছে এখনও না হয় মরবে, তাতে কী?"

ড. মুবাশ্বির হাসানের সঙ্গে দেখা লাহোরে। তিনি ঐ-সময়কাল সম্পর্কে বললেন, "২৫শে মার্চ কিছু একটা হবে বুঝতে পারছিলাম। ভোর চারটায় হোটেল ইন্টারকন থেকে দেখলাম সেনাবাহিনী রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। আমি ভুট্টোকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হচ্ছে? তিনিও জানালা দিয়ে দেখলেন। পিপিপি'র আবদুল রহিম ছাড়া আমরা আর কেউ চাইনি আর্মি অ্যাকশন হোক"। [রহিম এখন মৃত]। তিনি আরো বলেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে যে-অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে দীর্ঘদিন তা জানতাম না। আমাদের মতো লোকেরা কিছুই জানত না।" উল্লেখ্য ড. মুবাশ্বির ছিলেন পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী।

সুহায়েলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "১৯৭১ সালের ঘটনাবলি সম্পর্কে এখানে সাধারণ মানুষের কী ধারণা?"

"সাধারণ মানুষ কিছুই জানত না।"

"তারা কি বিবিসি বা ভোয়া শুনত না।"

"খুব সম্ভব কেয়ার করত না। যা শুনত তা-ও বিশ্বাস করত না। ভাবত বিবিসি মিথ্যা বলছে। পিপল হ্যাড টোটালি ক্লোজড মাইন্ড।"

"আপনি জানতেন না?"

"হ্যাঁ, রেডিও শুনে কিছু কিছু আন্দাজ করছিলাম।" তারপর অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, "বিস্তারিত জানতাম না।"

শিক্ষিত মানুষরা এ-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চান। কারণ, তারপরই প্রশ্ন করি, প্রতিবাদ হয় নি কেন? সুতরাং এ-প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। আমি সুহায়েলকেও জিজ্ঞেস করলাম, "কেউ কিছু বলল না?"

"না" উত্তর দিলেন সুহায়েল, "কেউ কিছু বলে নি। একমাত্র এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খান ও আহমেদ রাজা কাসুরিই প্রকাশ্যে যা কিছু বলেছেন।"
জামাতের দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল গফুর কী বলেন? "২৫শে মার্চ কী ঘটেছে তা আমরা শুনেছি। ভারত এবং অমুসলমানরা এ ঘটনায় একটি ভূমিকা পালন করেছিল। ইন্ডিয়া বলেছিল, হাজারে হাজারে মরেছে। এটি বিশ্বাসযোগ্য হয় নি।" তাঁর বক্তব্যটি কেমন গোলমেলে দেখুন। তাঁর বক্তব্য ধরলে বলতে হয়, ২৫শে মার্চ ঘটনার জন্য মুজিব বা আ. লীগ কোনো ফ্যাক্টর নয়। ইন্ডিয়াই হচ্ছে প্রধান। তা হলে কি শেখ মুজিব প্রক্সি দিচ্ছিলেন ইন্ডিয়ার হয়ে? জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে, "শেখ সাহেব কি তা'হলে ইন্ডিয়ান এজেন্ট?" এর দৃঢ় উত্তর—"না।" তাহলে আবদুল গফুরের প্রথম বক্তব্যের সঙ্গে তো আর দ্বিতীয় বক্তব্য মেলে না।
"১৪ ডিসেম্বরের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তো জামাত জড়িত" বলি তাঁকে।
"যদি বলেন" গফুর উত্তর দেন, "সেনাবাহিনীর সঙ্গে জামাত সহযোগিতা করেছে তা বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু জামাত হত্যা করেছে তা বিশ্বাস করা যায় না।"
করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খালেদ মাহমুদ কি জানতেন ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ কী ঘটেছিল?
"জানি", তাঁর সোজাসাপ্টা উত্তর। "মেহের ইন্ডাস্ট্রির অর্ধেক মালিকানা ছিল আমাদের। ঢাকায় আমাদের যেসব আত্মীয়স্বজন ব্যবসা দেখাশোনা করতেন তাঁরা পালিয়ে এসেছিলেন। কারখানাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।"
একই বিভাগের চেয়ারপার্সন তালাত নাজারিয়াত যিনি ১৯৭১ সালে যোগ দিয়েছিলেন বিভাগে, বললেন, "পত্রিকায় ২৫শে মার্চের পুরো খবর পাওয়া যায় নি। দেখলাম, আ. লীগ নেতারা অ্যারেস্টেড। এটা আমাকে ক্ষুব্ধ করেছে। কিন্তু, রক্তপাতের বিষয়টি তখনও আমরা জানতে পারি নি। পরে বিভিন্ন রেডিও স্টেশন শুনে জোড়াতালি দিয়ে যতটুকু জানা যায় তা জেনেছি।"
সত্তর দশকের ছাত্রনেতা পরবর্তীকালে পিপলস পার্টির নেতা, মেরাজ মোহাম্মদ খান বলেন, "২৬শে মার্চ ফিরেছেন ভুট্টো। এয়ারপোর্ট গেলাম রিসিভ করতে। প্লেন থেকে নেমে তিনি বললেন, থ্যাংক গড, পাকিস্তান ইজ সেভড। আমি মনেমনে বললাম, আল্লা মিয়ানে পাকিস্তানকো মার দিয়া। গেলাম ভুট্টোর সঙ্গে ক্লিফটনে তাঁর বাসায়। বেগম ভুট্টো ওপর থেকে নামছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বললেন, "পাকিস্তান থাকবে না। এরপর আর কীভাবে পাকিস্তান থাকবে?" মেরাজ বললেন, "পাঞ্জাব ছাড়া, সব অঞ্চলে এর প্রতিক্রিয়া খারাপ হয়েছে। পার্টির সম্পাদক জে. রহিম এ-বিষয়ে একটি পেপার তৈরি করেছিলেন যাতে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর কাণ্ডকারখানার সমালোচনা ছিল। ড. মুবাশ্বির হাসানের বাসায় বসেছিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক। সবার অগোচরে আমি রহিমের পেপারটি ফটোকপি করে বিতরণের ব্যবস্থা করি। ভুট্টো এতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন।"
মুবাশ্বির বলেছেন, পার্টির মধ্যে রহিমই একমাত্র সেনাবাহিনীর পক্ষে ছিলেন। হয়ত এরপরই পার্টিতে রহিমের ভাগ্যচক্রে শনি দেখা দেয়।

২৫শে মার্চ ও তার পরবর্তী ঘটনাবলির সঙ্গে যে ক'জন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, যাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবার তাদের প্রতিক্রিয়া বলি। এরা হলেন, জে. উমর, জে. রাও ফরমান আলি, জে. নিয়াজি, ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক ও রোয়েদাদ খান।

জে. উমর ছিলেন নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব। ২৫শে মার্চ ঢাকায় ছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কয়েকবার এসেছেন ঢাকায়। করাচিতে তাঁর বাসভবনে গেলাম দেখা করতে। আমাদের দেখে তিনি এমনভাবে অভ্যর্থনা জানালেন যাতে মনে হলো—তিনি হারানো স্বজনদের খুঁজে পেয়েছেন। বললেন এই বাঙালি ভাইদের জন্য তিনি এতক্ষণ কোরান শরীফ পড়ছিলেন এবং কাঁদছিলেন। কী থেকে যে কী হয়ে গেল!

জিজ্ঞেস করলাম, "২৫শে মার্চ সম্পর্কে কিছু জানেন?"

নিষ্পাপ ভঙ্গিতে বললেন, "না"।

"২৫শে পরবর্তী ঘটনাবলি সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"না।"

"আপনি নিরাপত্তা কাউন্সিলের সচিব ছিলেন। এবং আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে বলছেন যে, কিছুই জানেন না।"

"আমি কাউন্সিলের সামান্য সদস্যসচিব ছিলাম। কাউন্সিলের কোনো মিটিং-ই ডাকা হতো না, কোনো ক্ষমতাও ছিল না।"

রফি রাজা পিপিপি করতেন এবং ঘনিষ্ঠ ছিলেন ভুট্টোর। ২৫শে মার্চ ভুট্টোর সঙ্গে ছিলেন ঢাকায়। করচিতে তাঁর বাসায় আলাপকালে এ-প্রসঙ্গ এল। তিনি বললেন, "উমর জানে না মানে? ঢাকা থেকে আমরা রওয়ানা হয়েছি। প্লেনে ঢুকল সে একটা ভাব নিয়ে। ভুট্টো বা আমাকে চেনে বলে মনে হলো না। কাউকে দেখেও দেখল না। ঢাকায় কী হয়েছে সে জানে না?"

আলতাফ গওহর ইসলামাবাদে তাঁর বাসায় চা খেতে খেতে বললেন, "শোনেন, রোয়েদাদ এবং উমর প্রায় যেত ঢাকায়। ফিরে এসে, বিকেলে আমার বাসায় আড্ডা দিত। কী ঘটছে ঢাকায় তার বর্ণনা দিত। আপনারা রোয়েদাদকে আমার রেফারেন্স দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন এ-কথা সত্য কি না?"

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকিও একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। ২৫শে মার্চের আগে এবং পরে জেনারেল উমরের সঙ্গে তার যোগাযোগ রাখতে হয়েছে। লিখেছেন তিনি, এবং বলেছেনও যে, উমর ছিলেন ইয়াহিয়ার প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা। ২৫শে মার্চের ঠিক আগে, ঢাকার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে সিদ্দিকিকে বলেছিলেন, তুমি কী ধরনের পাবলিক রিলেশনস ডিরেক্টর যে "Can't even control these bastards."

জে. ফরমান আলী আত্মপক্ষ সমর্থন করে বই লিখেছেন [ঢাকার ইউপিএল এর অনুবাদ প্রকাশ করেছে] তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতকারে তাঁকে গণহত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, "গণ্যহত্যা? না, গণ্যহত্যা হয় নি।"

"আচ্ছা, মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মানুষ মারা গেছে?"

"গেছে।"

"কত জন মারা যেতে পারে বলে আপনার ধারণা, ত্রিশ-চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার?"
"হ্যাঁ, তা হবে।" বলেই তিনি বুঝলেন ভুল হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।
"জেনারেল," বললাম আমি, "পঞ্চাশ হাজার লোক হত্যা গণহত্যা নয়?"
কোনো উত্তর নেই। জিজ্ঞেস করলাম, "১৪ই ডিসেম্বরের ঘটনার জন্য তো আপনিই দায়ী?"
"এ-সম্পর্কে আমি আমার বইতে লিখেছি", জানালেন তিনি।
"সে বই আমি দেখেছি", বলি আমি, "লিখেছেন, আপনি কিছুই জানেন না। কিন্তু ঢাকার পতনের পর গভর্নর হাউসে আপনার অফিসের টেবিলে বুদ্ধিজীবীদের তালিকা পাওয়া গেছে।"
"আমার কাছে অনেকেই আসতেন। বলতেন, অমুকে এটা করছে তমুকে ওটা করছে। তা আমি নাম টুকে রাখতাম। এইসব নামের তালিকা ছিল সেটি।"
আলতাফ গওহরের সঙ্গে যখন এ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি তখন তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন। তাঁর এক বন্ধু এসে তাঁকে খবর দিয়েছিল, বাঙালি-হত্যার জন্য একটি তালিকা হয়েছে। তাঁর এক বন্ধুর নামও সেখানে আছে। আলতাফ গওহর কি কিছু করতে পারবে? গওহর জানালেন, আমার এক পরিচিত যিনি ফরমানেরও পরিচিত তাকে বিষয়টা জানালাম এবং ফরমানের সঙ্গে দেখা করতে বললাম। সে ফরমানের সঙ্গে দেখা করে তালিকা থেকে নামটি বাদ দেয়ার অনুরোধ জানাল। "ফরমান ড্রয়ার থেকে একটি তালিকা বের করে নামটি কেটে দিলেন। সেই নামটি ছিল সানাউল হকের।"
ইসলামাবাদে এয়ার মার্শাল আসগর খানের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলাম। বললাম, ফরমান আলী বলছেন, ১৯৭১ সালে ঢাকায় কী হয়েছিল তা তিনি জানেন না। বলেই হেসে ফেললাম। আসগর খানও হেসে ফেললেন। তারপর মৃদুভাবে বললেন, "দ্যাট ইল ফেডম ম্যান। এখন সব ফিলোসফিক্যাল ও হাই আইডিয়ালের কথা বলছে।"
নিয়াজির সঙ্গে কথা বলে মনে হলো তিনি গণহত্যা বিষয়টিই বুঝছেন না। মানুষ মারা গেছে কি না সে-সম্পর্কেও জানেন না। খুব সম্ভব এ-ভাবটি লোক দেখানো। কারণ, তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি ২৫শে মার্চের ঢাকা অভিযানকে হালাকু খানের অভিযানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১৫ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে নিয়াজি ডিভিশনাল কমান্ডারদের একটি গোপনীয় চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল, সৈন্যরা বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি করছে। ধর্ষণ, লুট ও হত্যায় তারা ব্যস্ত। এ-অবস্থা চলতে থাকলে, তিনি জানিয়েছেন তাদের [অর্থাৎ পাকিস্তান] মহিলারাও আক্রান্ত হবে। এবং তাঁর ভাষায় "It is not uncommon in history when a battle has been lost because troops were over indulgent in loot and rape." নিয়াজির মেমোর প্রথম অংশটি অনুবাদ না করে মূল ভাষায়ই উদ্ধৃত করতে চাই। "Since my arrival, I have heard numerous reports of troops indulging in loot and arson, killing people at random and without reason in areas cleared of the anti

state elements; of late there have been reports of rape and even the west pakistanis are not being spared; on 12 Apr. two west pakistani women were raped. and an attempt was made on two others." নিয়াজি বোধহয় এই মেমোর কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

রোয়েদাদ খান ছিলেন তখন তথ্য সচিব এবং প্রভাবশালী। পরে মন্ত্রীও হয়েছিলেন। বাংলাদেশে কী ঘটেছে তা বহির্বিশ্বে জানাবার ভার ছিল তার ওপর। ২৫শে মার্চ তিনি ছিলেন ঢাকায়।

ইসলামাবাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। না। তিনি কিছুই জানেন না। "না, আমি জানি না কী হয়েছে। অন্তত রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত আমি কোনো বন্দুকের আওয়াজ শুনি নি।"

"আপনি যেখানে ছিলেন," বলি আমি, "সেই হোটেল ইন্টারকনের উল্টোদিকে 'দি পিপল' তখন জ্বলছিল।"

কোনো উত্তর নেই শুধু বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া। "জেনারেল উমর বলছিলেন," আবারও যোগ করি, "রেডিওতে প্রথম ঘোষণাটা দিয়েছিলেন আপনি।"

"জেনারেল উমর ঠিক বলেন নি।"

ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকি ২৫শে মার্চের ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন, বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার করা হয় এবং ধরে নেয়া হয় পাকিস্তানের খারাপ ইজেম তারাই সৃষ্টি করেছে এ-কারণে। কিন্তু, একদিক থেকে লিখেছেন তিনি, বহিষ্কার করে ভালোই হয়েছিল। কারণ, "Dacca, On March 26 and for several day to come, was virtually a media men's paradise. It was the picture of death and desolation. Every dead body by the road side, every bombed out building, every barricade, every tank, truck and Jeep, was a story for the avaricious TV man and news photographer : and they missed nearly all that."

এরি মাঝে, জানাচ্ছেন তিনি, রোয়েদাদ খান ও তাঁর লোকজন পাকিস্তানের ইমেজ সৃষ্টি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রোয়েদাদ 'দি গ্রেট বিট্রেয়াল' নামে একটি ডকুমেন্টারিও তৈরি করে ফেললেন। এতে খরচ হয়েছিল সে-আমলে প্রায় দশ লক্ষ টাকা। আরবি, ফারসি, উর্দু এবং ইংরেজি—এই চারটি ভাষায় ওটি ডাব করা হয়েছিল এবং প্রসেস করা হয়েছিল ব্রাসেলসে।

এর মূল বক্তব্য ছিল—আওয়ামী লীগ-কর্তৃক অবাঙালিদের ওপর অত্যাচারের বিবরণ। মহাসমারোহে ইয়াহিয়া খানকে তা দেখানো হলো। কিন্তু ইয়াহিয়া তা রিলিজ করতে রাজি হলেন না। রোয়েদাদ বারবার ইয়াহিয়াকে এ-কথাই বোঝাতে চাইলেন যে, এই ফিল্মের উদ্দেশ্য—"Was to create 'guilt complex' in the mind of the Bengalis. It was time they were faced with the grim evidence of their crimes."

ঢাকার শেষ পাকিস্তানি কমিশনার আলমদার রাজা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন করেছেন হামুদুর রহমান কমিশন প্রকাশের জন্য যাতে যারা দায়ী তাদের শাস্তি

দেয়া যায়। আরজির ৫২ নং অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন যারা বড় ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের শাস্তি না দেয়াতে পাকিস্তান এখন বিশ্বের কাছে হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে। এবং এর ফল কী হয়েছে, "The internal effect of this has been such that the extra judicial and custodial killing have become a part of national tradition," শেষোক্ত মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

আলমদার রাজা বলছিলেন, তাঁর রিট গ্রহণে গড়িমসি করা হচ্ছিল। তারপর আরজি পেশের সুযোগ পেলেন। এবং আরজির একপর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার উদাহরণ দিলেন। কয়েকজন সৈন্য একটি বাড়ি আক্রমণ করে কয়েকজনকে হত্যা করে। পরিবারের তরুণীটিকে বাঁচিয়ে রাখে ধর্ষণের জন্য। তরুণী মিনতি করে জানায়, সেও তো পাকিস্তানি। তারপর বলে, সৈন্যরাও মুসলমান সেও মুসলমান। একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমান নারীকে কীভাবে ধর্ষণ করে? সবশেষে সে কোরান শরিফটি নামিয়ে বিছানায় রেখে বলে, তাঁকে যদি কেউ ধর্ষণ করতে চায় তা হলে এই কোরান শরীফ সরিয়ে ধর্ষণ করতে হবে। সৈন্যরা তাই করেছিল। আলমদার বললেন, এই বিবরণ শুনে বিচারক অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি।

বেনজির ভুট্টোকে এ-প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে কোনো সদুত্তর পাই নি। এবং জানলেও তাঁর পক্ষে বলা যে সম্ভব নয় তা বুঝি।

সুতরাং যারা নীতিনির্ধারণের সঙ্গে বা অন্যভাবে জড়িত ছিলেন ১৯৭১ সালের সঙ্গে, তারা মোটামুটি জানতেন পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটেছে। কিন্তু, তারা যদি বলেন, জানতেন, তা হলে তাদের আর অন্য কাঠগড়ায় না হোক সভ্যজগতের বা সভ্যতার মাপকাঠির সামনে দাঁড়াতে হয়। সঙ্গত কারণেই তারা তা চান না। যারা মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত তারাও যে একেবারে জানতেন না তা নয়। জানতেন। তবে, এর বিস্তৃতি বা ভয়াবহতাটা হয়ত তারা জানতেন না। রফি রাজা এ প্রসঙ্গে যে উক্তি করেছেন তা অনেক যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে আমার কাছে। তিনি বলেছেন—"We didn't know or we didn't want to know, আপনি যেভাবেই নেন।" এম এ নকভি বললেন, "টিক্কা খান বলেছিলেন মাত্র তিন হাজার ধর্ষিতা হয়েছে। আর এখন একে অন্যের ওপর দোষ চাপাচ্ছে।"

এ-প্রসঙ্গে তিনি আরেকটি কথা বলেছেন যা আমাদেরও মনে আসে নি। সাধারণ মানুষ কতটুকু জানত ১৯৭১-এর প্রসঙ্গে? তিনি বললেন "বলা হয়ে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা জানত না। এটা মিথ্যা সরকারি প্রচারণা। সে-সময় কি ট্রানজিস্টর ছিল না? পাঞ্জাবি সৈন্যরা আগে কর্মস্থল থেকে পরিবার-পরিজনদের মাসে পাঠাত দুই-তিন শ' টাকা। কিন্তু, ১৯৭১ সালে পাঠিয়েছে পাঁচ-ছয়শ' টাকা। এ-বাড়তি টাকা এল কোত্থেকে?"

নিয়াজি এপ্রিলে তাঁর এক গোপন মেমোতে উল্লেখ করেছিলেন, শোনা যাচ্ছে ফেরত যাওয়া পরিবারগুলোর সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের লুটের মাল ফেরত যাচ্ছে। শুধু তাই নয়,—"I gather that even officers have been suspected of indulging in this shameful activity and what is worse, that in spite of repeated instructions, comdos, have so far failed to curb this

alarming state of indiscipline. I suspect that cos ans osc units/sub-units are protecting and shielding such criminals." তবে, মূল কথা হলো, গণহত্যা শব্দটি পাকিস্তানে কেউ উচ্চারণ করতে চায় না। কোনো লিবারেলও না। স্বীকার করতেও চায় না। কারণ গণহত্যার অর্থ দায়দায়িত্ব, অপরাধ এবং শাস্তি।

কিন্তু, ১৯৭১ সালের যুদ্ধের প্রকৃতি কী ছিল? কীভাবে দেখা হয়েছিল এটিকে?

করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিভাগের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হলো—যাদের জন্ম ১৯৭১ সালের পর। স্বাভাবিকভাবেই তারা অনেক কিছু জানে না কিন্তু জানতে আগ্রহী। তারা জানাল, পাঠ্যবইয়ে যা লেখা আছে এখন সে-সম্পর্কে তাদের মনে প্রশ্ন জাগছে। এবং তাদের মনে হয়েছে, যা লেখা হয়েছে তা সঠিক নয়। পাঠ্যবইয়ের মূল বক্তব্য, পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী শেখ মুজিব, ছয় দফা ও বাঙালি। হত্যাকাণ্ডের বিবরণ অবশ্য তারা তেমন জানে না।

রাজা কাজেম লাহোরের খুবই সফল ধনী আইনজীবী, কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ওঠাবসা আছে। তিনি বললেন, "আমি বিশ্বাস করেছি শেখ মুজিব, মুক্তিবাহিনী ভুল পথে এগোচ্ছে। এটি পেটি বুর্জোয়া উত্থান, জনগণের বিপ্লব নয়।" তিনি জোর দিয়ে বললেন, "আমি পাকিস্তানের ব্রিফ নিয়ে বলছি না। কারণ, এরা আমাকে চারবার জেলে পাঠিয়েছে। আমি নিজের কথাই বলছি। তারপর যখন হত্যা, লুট, ধর্ষণের কাহিনী শুনলাম তখন I felt disturbed. I certainly did not support army but I was to remain in darkness. যুদ্ধবন্দি ও অন্যান্যরা যখন ফিরে এল তখন আরো বিস্তারিত শুনলাম। কিন্তু তখন, There was no room for opinion"

জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল গফুরও বললেন, "এটি জনগণের কোনো উত্থান ছিল না।"

ছয় দফাকেও অধিকাংশ মনে করেন, এটি ছিল পাকিস্তান বিভক্তির ম্যানিফেস্টো। আবার এ-কথাও বলেন, ভুট্টো বলেছিলেন, ৬ দফার মধ্যে সাড়ে পাঁচ দফা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বাকি অগ্রহণযোগ্য আধা দফা কী সে সম্পর্কে সবাই নিশ্চুপ।

তবে, ছয় দফা সম্পর্কে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে অঞ্চল ভেদে ধারণা বদলাচ্ছে। মোহাজেররা, যারা এতদিন পাকিস্তান পাকিস্তান করে চেঁচিয়েছে তাঁরা বলছেন, এ-পাকিস্তান কোন পাকিস্তান? কারণ, এ-পাকিস্তান তাদের বিশ্বাস করে নি। এখনও করে না। বিশ্বব্যাংকের কনসালট্যান্ট একজন বিদুষী মহিলা এক পার্টিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "এরা বলেছেন ১৯৭১ সম্পর্কে তাঁরা জানতেন না। করাচিতে সৈন্যরা যে হত্যা করেছে তাও তারা বিশ্বাস করে না।"

তিনি যে-পরিপ্রেক্ষিতে এ-মন্তব্য করছিলেন তা ইন্টাররেস্টিং। এ পার্টিতেই স্থিতধি এক গবেষকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। তিনি মোহাজের নন। এবং তাঁরা দু'জন বান্ধবী। মোহাজের নন সেই ভদ্রমহিলা বলছিলেন, "১৯৭১ সালে নিহত সৈন্যদের লাশ ফেরত আসছিল। এবং তখন আমরা অনুমান করছিলাম পূর্ব পাকিস্তানে একটা ঝামেলা হচ্ছে। কিন্তু এর বিস্তৃতি বুঝতে পারি নি।"

সদ্য সিভিল সার্ভিস পাস করা এক সিন্ধি যুবক আলাপকালে বলছিলেন, "সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় এসেছিল—৬ দফা কী আলোচনা কর। আমি জানি ৬ দফা কী—কিন্তু সেই

প্রশ্নের উত্তর আমি দিই নি। কারণ, তা যদি পাঞ্জাবি পরীক্ষকের হাতে পড়ে তাহলে আমার উত্তর তার মনঃপূত না-ও হতে পারে।" সময়, স্থান এখন ৬ দফার তাৎপর্য বদলে দিচ্ছে। তবে, রাজনীতিবিদরা ৬ দফা সম্পর্কে যে স্টান্ডার্ড টেক্সট পেশ করেন তা বলেছেন বেনজির ভুট্টো। তিনি বলেন, "ছয় দফা গ্রহণের অর্থ ছিল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে বিভক্তি। এটি শুধু বাংলাদেশেরই নয়, ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশেরও স্বাধীনতার নামান্তর। সে-জন্য আমরা ছয় দফা প্রতিরোধ করেছি। I feel that if the six points had been into place, Pakistan would not have existed as a state to-day."

মুক্তিযুদ্ধ শব্দটিকে এড়িয়ে চলে পাকিস্তানিরা। মুক্তিবাহিনী শব্দটিও। কারণ, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে তারা মনে করে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ। পাকিস্তানিদের জন্য এটি স্বাভাবিক। কারণ, বাঙালিদের কাছে তারা পরাজিত হয়েছে এটি মেনে নেয়া তাদের কাছে কষ্টকর। ব্যাপারটাকে, তারা বোধ হয় এভাবে দেখে। ভারত-পাকিস্তান পরস্পরের শত্রু। বেশ ক'টি যুদ্ধ তারা করেছে। এসব যুদ্ধে হারজিত আছে। সুতরাং ১৯৭১ সালে পাকিস্তান না-হয় ভারতীয়দের কাছেই পরাজিত হয়েছে।

তবে, সামরিকজান্তার নীতির কারণে যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ হবে এবং যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে তা তারা জানত। মানসিকভাবেও প্রস্তুত ছিল। না হলে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে জেনারেল ইয়াকুব অপারেশন ব্লিৎজ পরিকল্পনা কেন করবেন? এবং সেটিইবা কেন ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রূপান্তরিত হবে অপারেশন সার্চ লাইটে। মার্চের পর-ই তারা পূর্ব পাকিস্তানের আশা ত্যাগ করে, অন্তত সদর দফতর। ধারণাটা এমন ছিল, অপারেশন সার্চ লাইটে বাঙালিদের জারিজুরি সব থেমে যাবে। বাঙালি দমিত হলে তো ব্যাপারটা চুকেই গেল। আর যদি না থাকে তাহলে সেই অঞ্চলকে বাগে রাখা যাবে না। সুতরাং সে-পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করাই হবে শ্রেয়। ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকি এ-বিষয়ে একটি প্রশ্ন করেছেন যা যুক্তিযুক্ত। তা হলো, পূর্ব পাকিস্তানকে যদি ভারতের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হয় তা হলে পূর্ব পাকিস্তানে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হলো না কেন? জেনারেল নিয়াজিও এ-প্রশ্ন তুলেছেন।

এ-পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের তৎকালীন চিফ অফ জেনারেল স্টাফ লে.জে. গুলহাসানের একটি মেমোর কথা উল্লেখ করা যায়—

> "The main battle would be fought in the west (the Punjab). It was envisaged that the fate of East Pakistan would hinge upon whatever operation were undertaken in the west."

গুলহাসান লিখেছেন তাঁর আত্মকাহিনীতে যে, পূর্ব পাকিস্তানের কোনো আশা নেই এবং সেখানে সময় অপচয় করে বাঙালিদের তোষামোদ করার মানে হয় না। সে-সময় পেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে নজর দেয়াই শ্রেয়। আলমদার রাজার সঙ্গে আলাপকালেও তিনি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কথাই বলেছেন। কিন্তু তার রিট পিটিশনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজিত হবার আসল কারণটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়—

The fact of the matter is that Pakistan Army lost to the peoples war. No army in world has ever won fighting against the people."

আলমদার রাজা বলেছেন, "আমাদের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো এত বড় বিপর্যয় থেকেও আমরা কোনো শিক্ষা নেই নি। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছি যারা এ জন্য দায়ী তাদের রক্ষা করতে। পুরো সামরিক সম্মানে ইয়াহিয়া খানকে দাফন করা হয়েছে। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি। ১৯৫ জন, যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে তাদের শাস্তি দেয়া হয় নি।"

১৯৭১ সালে যারা বাংলাদেশে হানাদার বাহিনী সংঘটিত কার্যাবলির প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কয়েকজনের কথা তো আগেই বলেছি।

সাহিত্যিক আহমদ সেলিম ইসলামাবাদে আমাকে বলেছিলেন, ২৭শে মার্চ লাহোরে সূফি লাল হুসেইনের মাজারে মিছিল করে যাওয়ার সময় তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আহমদ সেলিম লিখেছিলেন, কবিতা—

"হে লাল হুসেইন! লালনের ভাই
জেগে ওঠ! বাংলায় হত্যা হচ্ছে তোমার মধুদের
বারবার তারা গুলিবিদ্ধ করেছে লালনের গান
আটচল্লিশে, বায়ান্নতে এবং তারপরেও
আর আজ প্রজ্বলন্ত
রবি ঠাকুর ও নজরুলের গান
জেগে ওঠ লাল হুসেইন, মধু আজ নিঃসঙ্গ,
আলিঙ্গন করো তাকে
তার দিকে আসা বুলেটের মোকাবিলা করো
তোমার গান দিয়ে
জেগে ওঠ লাল হুসেইন
বাংলার দুলাভাইরা এগিয়ে আসছে
জেগে ওঠ কবি, কোথায় তোমার বন্দুক?
[মফিদুল হক অনূদিত]

আহমদ সেলিম ও তাঁর বেশ কিছু সাথীদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেলিম জানিয়েছেন, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তানে অনেকে কবিতা/গান লিখে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছেন যার সংকলন করলে বেশ মোটাসোটা একটি বই হবে। কিন্তু কেউ এর খবর জানে না। বিখ্যাত কবি হাবিব জালেবি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় তাকে জেলে পোরা হয়।

লাহোরের তাহেরা মজহার ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী মিলে মিছিল করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত প্রতিবাদও কিছু হয়েছে যা আমাদের জানা নেই। যেমন ড. তারিক রহমান। ১৯৭১ সালে ছিলেন সেনাবাহিনীর ক্যাডেট। তিনি কমিশন পাওয়ার পরপরই পদত্যাগ করেন। কোর্ট মার্শাল হতো তাঁর। কিন্তু বাবা ব্রিগেডিয়ার হওয়ায় বেঁচে যান। এখন ইসলামাবাদের কায়দে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তার সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল ইসলামাবাদে। শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, এতে সাহসের কোনো ব্যাপার

নেই। মানবিকতার বাইরে আমি যেতে পারি না। তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তাই সংহতভাবে লিখেছেন আহমদ সেলিমের একটি বইয়ের ভূমিকায় উপসংহারে—"আসুন আমরা সবাই মিলে লিখি, কথা বলি, ছবি আঁকি—স্মরণ করি ১৯৭১ সালকে এর সকল নির্মম বাস্তবতাসমেত। আসুন আমরা ক্ষমা চাই মৃতদের কাছে, আসুন আমরা সচেষ্ট হই সমঝোতা ও ক্ষমা অর্জনে। এতে করে অতীত পাল্টে যাবে না তবে হয়ত ভবিষ্যৎ বদলাতে পারে। এটা সহায়তা করবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড় বন্ধন গড়তে এবং আরো যা গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের সাহায্য করবে আরেকটি বাংলাদেশ সৃষ্টি পরিহারে।" বর্তমান পাকিস্তানে যে-সহিংসা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি এ-মন্তব্য করেছেন।

সাংবাদিক আই এ রেহমানের কথা আগে বলেছি। এ সময় যেমন, এখনও তিনিই কঠোর ভাষায় তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন হিন্দু ও বৃটিশরা যে-পরিমাণ মুসলমান হত্যা করেছে আমরা মুসলমান হিসেবে তার থেকে বেশি মুসলমান হত্যা করেছি। কথাটি সত্য। কিন্তু এই সত্য বলার সাহস আছে কয়জনের?

আই এ রেহমান বলেন, "অনেকে বলেন ১৯৭১-এ কী হয়েছে এখানকার বাসিন্দারা তা জানত না। এগুলো খোড়া যুক্তি। কমবেশি তারা জানত। কারণ তারা Supported the massacre of their compatriots in the eastern wing. With a very few honourable exceptions, the West Pakistan population, led by politicians, academics, bureaucrats, and opinion makers, choose to back the senseless carnage, and there were many who fought over the spoils."

তিনি আরো বলেছেন, ১৯৭১ সালের যুদ্ধের যৌক্তিকতা দাঁড় করানো অসম্ভব। ইসলামাবাদের একটি চক্র এ-যুদ্ধ করেছে এটি জেনে যে, তারা হারবে। আসলে হারাটাই ছিল উদ্দেশ্য। "It was a betrayal of the officers and men of the Pakistan army in that they were deceived into giving their lives for an issue, of which the adverse out come had already been determined by their supreme commander. And no justification could be advanced for the people. The rules of combat do not apply in this case."

এর সূত্র ধরে দুয়েকজন বলেছেন, এ-সংঘর্ষের দরকার ছিল না। বললেই হতো, আমাদের বনাবনি হচ্ছে না। আমরা আপোসে আলাদা হয়ে যাই। আজ অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরোনোর পর এই চিন্তা হচ্ছে কিন্তু ২৫ বছর আগে এই চিন্তা করাও হয়নি।

বাকি থাকে মুক্তিযুদ্ধের নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কথা। পাকিস্তানিরা তাকে কীভাবে দেখে? ১৯৭১ সালে দেখেছে গাদ্দার হিসেবে। একটি উদাহরণ দিই, যে রোয়েদাদ খান এখন নিষ্পাপ মুখে বললেন কিছুই জানেন না এবং শেখ মুজিবকে তিনি শ্রদ্ধা করেন; ১৯৭১-এ তিনি কী বলেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকি ঘটনাটি আমাকে বলেছিলেন এবং লিখেছেনও তাঁর বইতে। ইয়াহিয়া তার পরামর্শকদের সভায় প্রত্যেককে জিজ্ঞেস

করেছিলেন, মুজিবকে বিনাবিচারে না বিচার করে লটকানো হবে। রোয়েদাদ বিনাবিচারে লটকানোর পক্ষপাতী ছিলেন। তারও আগে, শেখ মুজিবকে যখন পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে আসা হয় বন্দি হিসেবে তখন রোয়েদাদ প্রবলভাবে এ মত তুলে ধরেছিলেন যে, বন্দি মুজিবের ছবি তুলে পত্র-পত্রিকায় দেয়া হোক। রোয়েদাদের ভাষায়—"Let the world know that the bastards is in our hands."

আজ ২৫ বছর পর ধারণা খানিকটা বদলেছে। 'গাদ্দার' এখন কেউ তাকে আমাদের সামনে বলেন নি, তবে পাকিস্তান ভাঙার জন্য তারা যে তিন জনকে দায়ী করেন তার মধ্যে তিনি একজন। তবে তার স্থান দেয়া হয় তিন নম্বরে। এক-দুই নম্বর ভাগাভাগি করে নেন ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া। বেনজির ভুট্টো পর্যন্ত জানালেন, বঙ্গবন্ধু তাঁকে স্নেহ করতেন। এবং কোনোরকম দ্বিধা না করেই তিনি বললেন, নীতির জন্য শেখ মুজিব মরতেও প্রস্তুত ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যু (হত্যা) আমাদের নাড়া দিয়েছিল গভীরভাবে। সবশেষে আই এ রেহমানের একটি মন্তব্য দিয়েই শেষ করি। উপমহাদেশের তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে মনান্তর ও বৈরী সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে-মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে এর তাৎপর্য অধিকাংশ মানুষ এখনও অনুভব করতে অক্ষম। তিনি বলেছিলেন—"আমরা হিমালয়ের পুত্র। হিমালয় থাকবে না। আমরাও থাকব না। এ-কথা মনে রেখেই আমাদের আচরণ করা উচিত।"

১৯৯৮

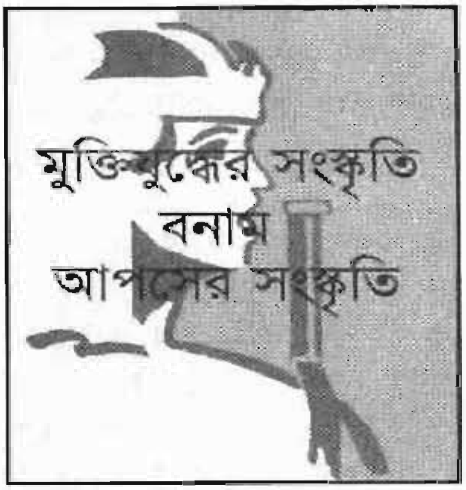

পাকিস্তান কেন ভেঙেছে বাঙালিদের তা নতুন করে বোঝাবার কিছু নেই। আমরা যারা বড় হয়েছি পাকিস্তানি আমলে তারা সেটি হাড়ে হাড়ে জানি, হয়ত জানে না এ প্রজন্ম। কিন্তু পাকিস্তানিরা কি জানে পাকিস্তান কেন ভেঙেছে? কারা এর জন্য দায়ী? না, তেমনভাবে তারা জানে না। আমার বন্ধু বলেছিল ঘটনাটি। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের কয়েকদিন পর তাঁর পিতা ও তাঁর তিন ভাইকে হানাদার বাহিনী ও তার সহযোগিরা চট্টগ্রামের পাহাড়তলির একটি ক্যাম্পে আটকে রেখেছিল। প্রতিদিন তারা কিছু মানুষকে নিয়ে হত্যা করত। একদিন আমার বন্ধু, তাঁর পিতাসহ আরো অনেককে দিয়ে তারা গর্ত খোঁড়াল এবং তারপর কিছু লোককে হত্যা করে সেই গর্তে তাদের দিয়েই মাটি চাপা দেওয়াল। সেই বধ্যভূমির পাশে ছিল পানির একটি চৌবাচ্চা, তাঁদের পানি তেষ্টা পেয়েছিল। আঁজলা ভরে পানি খেতে গিয়ে দেখে তাঁদের রক্তে লাল হয়ে গেছে চৌবাচ্চার পানি। না, তেষ্টা মেটানো সম্ভব হয়নি। একদিন আমার বন্ধুর পিতাকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর এক কাপ্তান বলল, তুমি তো বেশ নামায-টামাজ পড়। তাই তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি তোমার যে কোনো একজন সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে পার। এরকম অজস্র ঘটনা ঘটেছে তখন যার অধিকাংশ আমরা লিপিবদ্ধ করিনি বা মনে রাখিনি। ১৯৭১-এর বিজয়ের পর বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের এ ধরনের কোনো না কোনো কাহিনী বলার ছিল। এতসব নির্মম ঘটনা সত্ত্বেও পুত্র পিতার লাশ ফেলে রেখে যুদ্ধে গেছে, ভাই ধর্ষিতা বোনকে রেখে রাইফেল তুলে নিয়েছে, কারণ তাঁরা একটি লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছে, অপশাসনের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে এবং হ্যাঁ তাঁরা লক্ষ্যে পৌঁছেছিল, অপশাসনের প্রতিশোধ নিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ মানে যদি আমরা শুধু মনে করি যে নিছক নয় মাসের যুদ্ধ, তাহলে আমরা ভুল করব। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব। মুক্তিযুদ্ধের একটি পটভূমি ছিল এবং তাই সংকীর্ণ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা চলে না।

মুক্তিযুদ্ধ একটি প্রত্যয়। মুক্তিযুদ্ধের অর্থ নির্ভয়ে পথ চলা। লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং আপসকে বিসর্জন দেয়া। অন্যকথায় নির্ভয়ের সংস্কৃতি, এই নির্ভয়ের সংস্কৃতিচর্চা চলছিল অনেকদিন ধরে। সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশই এ চর্চা করছিল। এক অর্থে বলা যেতে পারে তা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠের ধারা। ১৯৬৯ সাল থেকে সে ধারা বেগবান হতে হতে ১৯৭১ সালে সেটিই হয়ে ওঠে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধারা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারা নিজ লক্ষ্যে পৌঁছানোর সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। অনেকেই তখন বিশ্বাস করেনি মুক্তিযুদ্ধ সফল হবে। কিন্তু তা হয়েছিল এবং অল্প সময়েই। এদিক থেকে বিচার করলে মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসেই শুধু অসাধারণ ঘটনা।

মুক্তিযুদ্ধ ছিল ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময়, ভ্রাতৃত্ববোধের সময়। দ্বন্দ্ব ছিল, লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথও ছিল, হয়তো অনেকের কাছে ছিল ভিন্ন রকমের। কিন্তু মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর

ব্যাপারে কোনো আপস হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শুদ্ধ মানুষ করেছিল। আজ যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধ চেতনার পুনরুজ্জীবনের কথা বলি তখন এ গোটা প্রত্যয়টির কথাই বলি।

বাংলাদেশ ছিল আমাদের স্বপ্ন। আমাদের ওপর যত অন্যায় আচরণ করা হয়েছিল তা ন্যায্যে পরিণত করার স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ। আমাদের যত অপমান করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ ছিল বাংলাদেশ। আমাদের প্রজন্মের সে সময়ের স্বপ্নের দু'টি দিক ছিল বাংলাদেশ ও সোনার বাংলা। সোনার বাংলা তো মীথ কিন্তু জাতীয়তাবাদের ভিত্তির জন্য প্রয়োজন কোনো না কোনো প্রতীক বা মীথের। কিন্তু মীথ বাদ দিয়েও সোনার বাংলার অন্য অর্থ ছিল যার মূল কথা হল—শান্তি সুখ আর দু'মুঠো খাবার। কথাটা খুব সাদামাটা। স্বপ্নটা সাদামাটা। আমাদের স্বপ্নের একটি দিক পূরণ করতে পেরেছিলাম। দ্বিতীয়টি পারিনি। আমাদের প্রজন্মের সেটিই ব্যর্থতা।

অগণিত মানুষ কেন শহীদ হয়েছিলেন বাংলাদেশের জন্য? কারণ, তারা কয়েকটি আদর্শের জন্য লড়েছিলেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কর্মক্ষেত্রে। সেগুলি বিধৃত হয়েছিল ১৯৭২ সালের সংবিধানে। ঐ আদর্শগুলো ছিল গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের অর্থ করা যেতে পারে ন্যায়বিচার আর ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ অসাম্প্রদায়িকতা। অন্য কথায় সিভিল সমাজ যা ছিল আমাদের সংবিধানের ভিত্তি। না, আমরা পারিনি এইসব উপাদান সংরক্ষণ করতে। আমাদের অগণিত শহীদদের যে স্বপ্ন তা আমরা পূরণ করতে পরিনি। আমরা ঘাতকদের বিচার করিনি, জেনারেলদের দীর্ঘদিন ধরে শাসন করতে দিয়েছি, সমর্থন করেছি, এই ধরনের প্রতিটি ঘটনা ছিল অগণিত মূক মানুষের স্বপ্নের ওপর একটি আঘাত। একেকটি অপমান। মনে হয় নিজ দেশেই আমরা উদ্বাস্তু যারা এখনো লালন করি মুক্তিযুদ্ধের সেসব স্বপ্ন।

শহীদরা আমাদের ভবিষ্যৎ তৈরি করে দিয়েছিলেন। যে কারণে আমি আজ শিক্ষক আমাদের শিক্ষকের জায়গায়, আমাদের বন্ধু ও অগ্রজরা সচিব, জেনারেল বা কোটিপতি নিজেদের বর্তমান বিসর্জন দিতে রাজি না হওয়ায় আমরা মেনে নিয়েছি সেসব অপমান, অংশগ্রহণ করেছি অপমানকারীদের কর্মকাণ্ডে। বেশ কিছুদিন আগে, একটি সভায় রাজনীতিবিদ হাসানুল হক ইনু একটি মন্তব্য করেছিলেন যা মনে হয়েছে অনেকটা যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেছিলেন, আজকের মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা, কৃতিত্বের সময় বারবার বলা হয় সেক্টর কমান্ডারদের কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের কথা। হ্যাঁ, তাঁদের অবদান অস্বীকার করার নয়। কিন্তু মূল কথা হল, মুক্তিযুদ্ধ হবে—এটি ছিল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং সে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন একজন রাজনীতিবিদ, যার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। আমরা মনে করি, মুক্তিযুদ্ধের পর আবার আমাদের যে অপমান করা হয়েছে সে সব অপমানের প্রতিশোধ নিতে হয়, সেটিও হবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যদি নিতে পারে একাট্টা হয়ে সেইসব দল যাদের আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল বলি, তাহলেই আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ তৈরি করে যেতে পারব, যা করে গেছেন আমাদের পূর্বসূরিরা।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেখানেই। মুক্তিযুদ্ধের পরপর মানুষ হিসেবে আমাদের চরিত্রটি বদলে যায়। আমরা যার যার ভবিষ্যৎ সংরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। লুটে অংশ নিতে শুরু করি। সমঝোতা শুরু করি, ভয় করতে শুরু করি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়ি। ফলে রাজনীতি হয়ে ওঠে আপসের রাজনীতি, পরাজিতের রাজনীতি, ভয় পাওয়া মানুষের রাজনীতি। মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি চর্চা রুদ্ধ হতে থাকে। শুরু হয় আপস, অসহিষ্ণুতা, ধর্মান্ধতা, আধিপত্য বিস্তারে রাজনীতি এবং এর প্রতিটি উপাদান বর্তমান রাজনীতিতে হয়ে উঠেছে মহীরূহ। এখন মনে হয়, মুক্তিযুদ্ধ করাটা যত সহজ, মুক্তিযোদ্ধা থাকাটা তত কঠিন। সে কারণে, পার্লামেন্টে আল-বদর বাহিনীর নেতা মতিউর রহমান নিজামীর সঙ্গে বসতে আমাদের ঘৃণা বোধ হয় না, ১৭ জন জামাতীকে সংসদে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে লজ্জা হয় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, যে ১৭টি এলাকা থেকে জামাতীরা নির্বাচিত হয়েছে সেখানে কি মুক্তিযুদ্ধ হয়নি? যে কারণে আজ অনেকে বাঙালি জাতি হিসেবে কৃতজ্ঞ এমন কথা বলতে দ্বিধা বোধ করেন। কেন করবেন না?

স্বাধীনতার সময় শত শত প্রবাসী বাঙালি বিশ্ব সমর্থন আর অর্থ যুগিয়ে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করেছেন, অগণিত বিদেশী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন। শিল্পী সাহিত্যিকরা এগিয়ে এসেছেন, দেশে কয়েক লাখ রমণী লাঞ্ছিত হয়েছেন, শহীদ হয়েছেন অগণিত—বাংলাদেশ তাদের মনে রাখেনি। শহীদ সন্তানের দিকে, লাঞ্ছিত রমণীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়নি, প্রবাসী বা বিদেশী বন্ধুদের একবারও বলেনি—ধন্যবাদ। যে জাতি তার বিপদের দিনের উপকারিদের উপেক্ষা করে সে জাতির ভাগ্যের যে ভবিষ্যতে উপেক্ষা অপেক্ষা করে তা বলাই বাহুল্য। যে জাতি শহীদদের আত্মত্যাগের কথা শুধু কথায় পরিণত করে অনুভব করে না, সে জাতির পক্ষে মর্যাদাবান জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ানো কষ্টকর। আজকের স্বাস্থ্যবান রাজনীতিবিদের যারা পাকিস্তানি আমলে ছিলেন নির্যাতিত, অপমানিত, তাঁদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, মনে কি পড়ে সেসব দিনের কথা? আজকের জাঁদরেল আমলাদের মনে কি পড়ে সেসব দিনের কথা যখন পাকিস্তানি 'মোছুয়া'দের তোষণ করে ওঠা যেত উপসচিব বা মেজর পর্যন্ত। যদি মনে পড়ে, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ধারা কেন আবার প্রধান ধারায় পরিণত হয় না?

আমি আমার প্রজন্মের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিচ্ছি। আজ পঁচিশ বছর পর দেখছি ১৯৭১ সালের আমাদের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ধারা পরিণত হয়েছে প্রায় সংখ্যালঘিষ্ঠ ধারায়। তাই, সেই ব্যর্থ আমি আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানাব, আমাদের ব্যর্থতার কারণগুলি থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে যেন তারা এই সংখ্যালঘিষ্ঠ ধারাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধারায় পরিণত করে। কারণ, শুদ্ধ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকাই জীবনের সার্থকতা। নয়তো এ বেঁচে থাকা আর বেন্নোর বেঁচে থাকার মধ্যে তফাৎ খুব কম। এখন হয়তো বর্তমান প্রজন্ম অপমানের মাত্রা তেমন অনুভব করছে না, কারণ তাদের জন্মতো স্বাধীন দেশেই। কিন্তু যেভাবে প্রতিপক্ষরা অগ্রসর হচ্ছে এখনো রুখে না দাঁড়ালে তখন তা অনেক দেরি হয়ে যাবে।

তাই আজ পঁচিশ বছর পর আবার শ্লোগান হওয়া উচিত মুক্তিযুদ্ধের সংস্কৃতি চর্চা হোক জীবনের অঙ্গ, রাজনীতির অঙ্গ। এবং তাই যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের সহায়তা করে,

যেসব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘাতকদের সহায়তা করে, যেসব তথ্যমন্ত্রী সজ্ঞানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করে, যেসব রাজনীতিবিদ ঘাতকদের সঙ্গে ওঠাবসা করে তাদের প্রতিরোধ করুন, প্রয়োজনে সক্রিয়ভাবে। এরা হচ্ছে সেসব লোক যারা পিতার হত্যাকারিদের বন্ধু মনে করে, মাতার অপহরণকারীকে বরণ বরে, ভগ্নীর ধর্ষণকারীর সঙ্গে করমর্দন করে, ভ্রাতার হত্যাকারীকে বুকে জড়িয়ে ধরে, বন্ধুর হত্যাকারীকে মাল্যভূষিত করে। এরা যদি সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে, আগাছার মতো বাড়তে থাকে, তাহলে বর্তমান প্রজন্মকে আমাদের সময় চেয়েও অপমানিত হতে হবে। দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা পড়তে হবে। বেছে নেয়ার সময় হয়েছে এখন অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, দাসত্ব-শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে বিপর্যয়কে। সমঝোতার সংস্কৃতির বদলে নির্ভয়ের সংস্কৃতি বরণকে। যে জাতির অপমানবোধ নেই সেই জাতির জাতি হিসেবে টিকে থাকার আর কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ, সে জাতির মানসিক উন্নতি হয় না, দাস হয়ে থাকে, আগাছার মধ্যে ডুবে আগাছা হয়ে যায়। আজকের আমরা মুক্তিযুদ্ধ চর্চার যে ধারার কথা বলছি তা হয়তো সংখ্যালঘিষ্ঠ ধারা। ১৯৭১ সালের আগেও তা ছিল। কিন্তু আমরা ধৈর্য্য ধরেছি, স্বপ্ন দেখেছি ও স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে অগ্রসর হয়েছি, লক্ষ্যে থেকে বিচ্যুত না হয়ে। সুতরাং আজকের এই ধারাও যে বেগবান হয়ে উঠবে আবার ১৯৭১ সালের মতো সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বাধা কোথায়? সৈয়দ শামসুল হকের ভাষায় বলতে পারি (নুরুলদীনের সারাজীবন)—

"ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধরি কর আন্দোলন—লাগে না লাগুক, বাহে, এক দুই তিন কিংবা কয়েকটি জীবন।"

১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫

একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্ন, বাংলাদেশে বসবাসকারী অনেকে দেখেছে বহুদিন। অতীতে অনেকে সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছেন যদিও তারা বাঙালি ছিলেন না। এ শতকের গত চল্লিশ বছরেও অনেকে সে ভূখণ্ডের কথা বলেছেন, ভারত ভাগ হওয়ার সময় সে পরিকল্পনাও একবার হয়েছিল।

ষাটের দশকে মওলানা ভাসানীও বাঙালিদের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ডের কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে সেই স্বপ্নের রূপ কেউ দিতে পারেনি। সেই স্বপ্ন, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাস্তবে রূপ পেয়েছিল একেবারে একজন খাঁটি বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। তিনিই পেরেছিলেন বাঙালিদের জন্য নির্মাণ করে দিতে একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রের সীমানা। বঙ্গবন্ধু বলি, জাতির জনক বলি, বা শেখ মুজিব বলি—যে নামেই সম্বোধন করি না কেন, বাংলাদেশের কথা বললেই ভেসে ওঠে তাঁর অবয়ব এবং সে কারণেই তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে ইতিহাসে এবং সে কারণেই আমরা তাঁকে স্মরণ করি বারবার।

বাংলাদেশের স্বপ্নের দাবিদার অনেকে। স্বপ্ন অনেকে দেখে থাকতে পারেন, অনেকে আকারে-ইঙ্গিতে বাংলাদেশের কথাও বলেছেন; কিন্তু শেখ মুজিব স্থপতি হিসেবে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। আরো অনেকের মতো, তিনিও ভেবেছেন বাংলাদেশের কথা, কিন্তু ১৯৭১ পর্যন্ত গেছে প্রস্তুতিপর্ব। মওলানা ভাসানীও প্রকাশ্য বক্তৃতায় বাংলাদেশের কথা বলেছেন।

কিন্তু তাঁর ভূমিকা সেক্ষেত্রে খুবই কম। তবে এসব স্বপ্ন বক্তৃতা সবই মানুষকে প্রস্তুত করেছে। সাংবাদিক আবদুল মতিন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে, একদিন দুপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা শেখ মুজিবের। "শেখ সাহেব বললেন, তিনি আইয়ুবকে পরোয়া করেন না। জনগণের মনের কথা তিনি জানেন। এরপর কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি আইয়ুববিরোধী সংগ্রামে আগরতলাকে ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করেন।" এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পুরোটা সাজানো হয়তো নাও হতে পারে।

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি ঘোষণা করেন যে, এ অঞ্চলের নাম হবে বাংলাদেশ। এর দুবছর পর, জানাচ্ছেন তাঁর জামাতা ড. ওয়াজিদ মিয়া, একদিন রাতে সপরিবারে খাবার খেতে খেতে শেখ মুজিব বলেছিলেন—"দেশটা যদি কোনোদিন স্বাধীন হয়, তাহলে কবিগুরুর 'আমরা সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করো।"

'বঙ্গবন্ধু' উপাধিটি শেখ মুজিবুর রহমানকে ভালোবেসে দিয়েছিলেন শহুরে নাগরিকরা। এ উপাধিটি পরিচিত হয়ে উঠেছে বিশেষভাবে ১৯৭৫ সালের পর। অবশ্য, তিনি ক্ষমতায় থাকার সময়ও যে উপাধিটি ব্যবহৃত হতো না তা নয়। তবে ১৯৭৫ সালের পর আওয়ামী লীগের কর্মীরা এই উপাধিটি বারংবার উচ্চারণ করেছেন। এর পেছনে শ্রদ্ধাতো আছে

নিশ্চয়ই; কিন্তু অবচেতনে কি এই ধারণাও ছিল যে, এত বড় একটি মানুষকে সবার সামনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করল না। কয়েক দিন পর হয়তো তাঁর আর কোনো নাম-নিশানাই থাকবে না। তিনি যে ছিলেন বাংলার বন্ধু সেই ধারণাটিও বদলে দেওয়া হবে।

হ্যাঁ, সেই ধারণাটি যে একেবারে ভুল তা বলি কি করে? কিন্তু বঙ্গবন্ধু শব্দটিকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কৃতিত্ব অনেকটা আওয়ামী লীগের শহরাঞ্চলীয় কর্মীদের। শহরাঞ্চলে যতটা না ভালোবেসে বা শ্রদ্ধায় তার চেয়েও বেশি ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার বা স্বার্থের কারণে বারবার কারণে অকারণে উচ্চারিত হয়েছে "আমার পিতা" "জাতির পিতা" "জাতির জনক" "বঙ্গবন্ধু"—এত বেশি যে অনেক সময় তা মনে হয়েছে আরোপিত। নামের আগে এ শব্দগুলো উচ্চারণ না করলে আওয়ামী নেতা-কর্মীরা ভেবেছেন বঙ্গবন্ধুর অসম্মান করা হলো, এমনটি এ কারণে অনেককে আওয়ামী লীগ তথা বাংলাদেশবিরোধী বলতেও বাধেনি। এ কারণেই অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন এবং এভাবে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন একেবারে আওয়ামী সম্পত্তি এবং তাতে তাঁর মর্যাদা বাড়েনি; কিন্তু এই ভঙ্গি অনেককে অসন্তুষ্ট করেছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, একবার একটি বক্তৃতায় শেখ হাসিনা যথার্থই বলেছিলেন যে, ১৯৭৫ সালের পর আওয়ামী কর্মীরাই মার খেয়েছে, মাটি কামড়ে থেকেছে এবং বারবার 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি উচ্চারণ করেছে। আওয়ামী লীগ থেকে তো বঙ্গবন্ধুকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু এটি ভাবা ভুল যে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুকে দলীয়করণ করেছে। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের নন, তিনি সবার।

আসলে, একটা সময় আমরা বিভিন্ন বিশেষণে, বিভিন্ন উপাধির আড়ালে মানুষটিকে ঢেকে দিয়েছি যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি আওয়ামী লীগের ছিলেন, আওয়ামী লীগের হয়ে দেশ শাসনও করেছেন; কিন্তু একটা সময় কেউ তাঁকে আওয়ামী লীগ নেতা মনে করেননি। তিনি বাঙালি জাতিকে রাষ্ট্র নির্মাণে সহায়তা করেছেন। তাই তিনি জাতিরও জনক। তিনি বাংলাদেশকে, বাঙালিকে ভালবাসতেন, তাই তিনি বঙ্গবন্ধু। এগুলো বারবার বলার দরকার পড়ে না তোতাপাখির মতো। লক্ষণীয় যে, যে শহরের মানুষরা এগুলো নিয়ে বেশি মাতামাতি করেছিল তারাই তাঁকে খুন করেছিল এবং এ শহুরে মানুষরাই কারণে-অকারণে তাঁর সমালোচনা ও কটুক্তি করে বেশি। ভোটের সংখ্যা এর প্রমাণ।

গ্রামাঞ্চলে মানুষ "জাতির জনক" বা বিভিন্ন উপাধির ধার ধারে না তোয়াক্কা করে না অবচেতন-সচেতনতার। তারা বলে 'শেখ সাব' বা 'শেখ মুজিব' যে নামের শ্লোগানে এক সময় প্রকম্পিত হয়েছে বাংলাদেশ। এর একটি কারণ বোধহয় এই যে, তারা তাদের সুখ-দুঃখের সাথী শেখ সাহেবকে দেখেছে কাছ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে। যেন তাদের প্রতিবেশী। গ্রামের মানুষরা তাদের পুরনো সূত্রসমূহ, আত্মীয়তার বন্ধনটুকু ধরে রাখতে চায়। তাই গ্রামে, সম্প্রদায় বা কমিউনিটির বন্ধনটুকু এখনো প্রবল। যে কারণে এখনো গ্রামে আওয়ামী লীগ ভোট পেয়েছে বেশি।

যে কথাটি বলতে চাই, অথচ স্পষ্ট করতে পারছিনা বোধহয় তা হলো—একেবারে গ্রামীণ ধান্য সংস্কৃতি থেকে উঠে এসেছিলেন এ শ্যামলবরণ পুরুষ। প্রকৃতির উদারতার মতো

ছিল তাঁর হৃদয়, তাই দিয়ে তিনি ঢেকে দিতে চেয়েছিলেন বাঙালিকে। সমস্ত বাংলাদেশকে। বেঁচেছিলেন যতোদিন, বাঙালি তার প্রতিদানও দিয়েছিল ততোদিন।
একদিন, হঠাৎ ২৭ মার্চ ১৯৭১ সালে একজন মেজর বাঙালিদের বললেন, স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে এবং বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ল—এমন পদার্থ বাঙালি নয়। তাকে জাগাতে সময় লেগেছে বহুদিন এবং সেই কাজটি করতে পেরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সুতরাং ভালো লাগুক না লাগুক তাঁকে স্বাধীনতার স্থপতি বলা ছাড়া উপায় কি? আর শেখ মুজিব কি ১৯৭০ সালে হঠাৎ 'বঙ্গবন্ধু' এবং ১৯৭২ সালে 'জাতির জনক' হয়ে গেলেন। তাও নয়। বঙ্গবন্ধু হতে সময় লেগেছে তাঁর তিন দশক। সেই চল্লিশ দশক থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়টুকু যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখব শেখ মুজিব, শেখ মুজিব বা বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন কয়েকটি কারণে—তা হলো হৃদয়ের ব্যাপ্তি, মানবতা এবং সহিষ্ণুতা। তাঁর চলাফেরা, পোশাক-আশাক, কথাবার্তা সবকিছুর মধ্যে ছিল সেই বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধন অটুট রাখার ইচ্ছা। তাঁকে হত্যার আগে দেখি, শহরের মানুষরা ঘিরে আছে তাঁকে এমনভাবে যে তিনি আর বেরুতে পারেননি তাদের ব্যূহ ভেদ করে। সে কারণেই কি অভিমানে নিশ্চুপ ছিল বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে?
অবশ্য সেই নিশ্চুপ থাকার আরো অনেক কারণ আছে। কিন্তু দীর্ঘ দেড় যুগ পর আবার বাঙালি সেই শালপ্রাংশু মানুষটির কথা ভাবছে, সোচ্চার হচ্ছে, পুনর্মূল্যায়ন করছে এবং দেখছে, সমস্ত সীমাবদ্ধতা, সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও তিনিই ছিলেন তাদের কাছের মানুষ। বিশেষ ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসা কেউ নয়। গত ১৫ আগস্ট টুঙ্গিপাড়ায় বিভিন্ন মত ও পথের মানুষের সম্মিলন তার প্রমাণ। আসলে আমরা যদি একটি বিশেষ সময়ের ফ্রেমে, আমাদের মতো দোষগুণে একজন বাঙালি হিসেবে তাঁকে বিচার করি তাহলে প্রমাণিত হবে তাঁর মহত্ত্ব। আর আমরা যদি উপাধির আড়ালে ঢেকে, দূরের মানুষ হিসেবে বিচার করি তাহলে খুঁজে পাবো সমালোচনা করার মতো অজস্র বিষয়। বিষয়টি একবার এভাবে ভাবুন যে—একেবারে একটি গণ্ডগ্রাম থেকে, সাধারণ একটি পরিবারের একজন মানুষ সৃষ্টি করেছে একটি দেশ—তাহলেই বোধহয় স্পষ্ট হয়ে যাবে তাঁর এবং আমাদের অবস্থান এবং বিচারটি সেভাবে করাই বোধহয় শ্রেয়।

দুই

পঞ্চাশের দশক থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক কারকদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম। ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে তিনিই হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের রাজনীতির মুখ্যকারক। সেই সময় থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের ঘটনাবলি এবং তাঁর মৃত্যুর প্রায় দু-দশক পরও তিনি রয়ে গেছেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির সময়টি আমাদের অনেকের বেড়ে ওঠার সময়। এ সময় এত দ্রুত এত ঘটনা ঘটেছে যে তার অনেক কিছুই আজ আমাদের মনে নেই। যার ফলে, বর্তমানে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অনেক ঘটনার নতুন বিন্যাস, বিকৃতায়ন এবং যেহেতু আমরা অনেকেই বিস্মৃত সে সব ঘটনাবলি সম্পর্কে বা বর্ণিত হয়নি সেসব তেমনভাবে কোনো গ্রন্থে, তাই সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ইতিহাস। এখানে তারই কয়েকটি উদাহরণ দেব।

১৯৭৫ সালের খলনায়করা সে ক্ষমতা দখলের একটি পাঁয়তারা করেছিলেন অনেকদিন ধরে তারও কিছুটা তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন খোন্দকার মোশতাক। আমাদের ইতিহাসের অন্যতম এই খলনায়কের ষড়যন্ত্রমূলক মনোভাবের পরিচয় পাই মুক্তিযুদ্ধের আগ থেকে। ২৫ মার্চ আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতারা এসে ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুকে বলে গিয়েছিলেন সাবধানে থাকতে। সেদিন এইমাত্র খোন্দকার মোশতাককে সেখানে দেখা যায়নি। স্বাধীনতার পর তিনি ওয়াজেদ মিয়ার কাছে তদবির করেছিলেন এই বলে যে, তাঁকে জ্যেষ্ঠতাসহ যেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়। আরো পরে, ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে একদিন ড. ওয়াজেদ মিয়া খোন্দকার মোশতাকের বাসায় গিয়ে দেখেন, রশীদ নামের এক মেজর তার সঙ্গে গোপন আলাপ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ চট্টগ্রামে জনাব হান্নান কর্তৃক প্রচারিত শেখ মুজিবের ভাষণটি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে। ড. ওয়াজেদ মিয়া লিখেছেন—"বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি ছিল টেপকৃত। ঢাকার বলধা গার্ডেন থেকে ঐ টেপকৃত বার্তাটি সম্প্রচারের পর ইপিআর-এর ঐ বীর সদস্যটি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোনে যোগাযোগ করে পরবর্তী নির্দেশ জানতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু জনাব গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে ইপিআর এর ঐ সদস্যটিকে সম্প্রচার যন্ত্রটি বলধা গার্ডেনের পুকুরে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন।"

তথ্যটি ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত সে নিয়ে বিতর্কে যাব না। ইতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবে আমি বুঝি, ১৯৭১ সালের মার্চের শুরুতেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির পত্তন হয়েছিল এবং তা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে। সম্প্রতি অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর "রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্তভাবে তা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে ৩৫টি নির্দেশ শেখ মুজিব জারি করেন তা "কর্তৃত্ব প্রতিরোধ এবং অস্বীকার করার মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতা এবং বিপরীত জনমুখী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বাঙালি জনসাধারণের সঙ্গে প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতার ভিত্তি তৈরি করে।..

বাঙালি জনসাধারণ একটি স্বতন্ত্র, বিকল্প, স্বাধীন রাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়ার বোধ যুদ্ধের পূর্ব থেকেই বুকের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, বুদ্ধির মধ্যে লালন করতে থাকে।"

ড. জাহাঙ্গীর আরো লিখেছেন যে, এই সব নির্দেশের মধ্য শেখ মুজিবুর রহমান "বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের ভিত্তি তৈরি করে দেন।"

এটা কি সম্ভব, যে একজন মেজরের একটি ঘোষণা পাঠে একটি দেশ স্বাধীন হয়ে যায়? সেই মেজর জিয়া পরে জেনারেল হয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করে প্রেসিডেন্টও হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছেন, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের পুনর্বাসন করেছেন—এসবই সত্যি। কিন্তু এটাও সত্যি যে, তিনি কখনই বলেননি, স্বাধীনতার ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গেও ড. জাহাঙ্গীরের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিতে চাই, খানিকটা দীর্ঘ হলেও—

"কোন রাষ্ট্রের উদ্ভব কি আকস্মিক? বোধহয় নয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে একটি ধারাবাহিকতা আছে। এই ধারাবাহিকতা তৈরি করেছে একটি মুহূর্তের অনিবার্যতা। সৃষ্টি

করেছে ঘটনাবলির অপ্রতিরোধ্যতা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা আছে। এই ধারাবাহিকতা থেকে তৈরি হয়েছে ১৯৭১-এর মার্চ মাসের অসহযোগ-প্রতিরোধ উদ্ভূত অনিবার্যতা, যে অনিবার্যতা তৈরি করেছে মুক্তিযুদ্ধের অপ্রতিরোধ্য এবং একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কার্যক্রম।" এরপর নাবালক, উন্মাদ ও মূর্খের-ই একথা বলা সাজে যে,. একটি ঘোষণাতেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যেতে পারে, শেখ সাহেব বার্তা প্রেরণ করেছিলেন কি করেননি বা মেজর জিয়া ২৭শে মার্চ "স্বাধীনতা ঘোষণা" করেছিলেন কি করেননি, এগুলো নিয়ে বিতর্ক করাও এক ধরনের বালখিল্যতা। কারণ, ইতিহাস যখন লেখা হবে একশ, বা পঞ্চাশ বছর পর, তখন স্বাধীনতার স্থপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামই উল্লিখিত হবে, বাকিরা ফুটনোটে থাকলেও থাকতে পারেন। এ নিয়ে তর্ক সময়ের অপচয় মাত্র।

তিন

১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত শেখ মুজিবের রাজনীতি যতটা না বিতর্কিত, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত তাঁর শাসনকাল তারচেয়েও বেশি বিতর্কিত। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত তিনি যে রাজনীতি করেছেন তা যে সব সময় আপসহীন ছিল তা নয় এবং দলীয় স্বার্থে যে অনেক সময় সিভিল সমাজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন তাও মিথ্যা নয়। আবার এও ঠিক, সব সময় সিভিল সমাজ গড়ে তুলতেও চেয়েছেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে তাঁর চিন্তা বা রাজনীতিতে এ ধরনের পরস্পরবিরোধিতা থাকতে পারে কিন্তু তারপর আর এ ধরনের পরস্পর বিরোধিতা ছিল না। তাঁর দুটি লক্ষ্য ছিল—একটি স্পষ্ট ও আরেকটি অস্পষ্ট বা স্বপ্ন। স্পষ্ট লক্ষ্যটি ছিল আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা, দেশব্যাপী সংগঠন বিস্তৃত করা এবং আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা। আওয়ামী লীগে অন্তর্বিরোধ ছিল, দল ব্যাপক হলে যা হয় তাই হয়েছিল কিন্তু শেখ মুজিবের সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অনন্য। একটি দল বড় করতে হলে যে দুটি গুণের প্রয়োজণ—সহিষ্ণুতা ও নমনীয়তা, তা তাঁর ছিল। আমি সুদূর গণ্ডগ্রামে এমন বৃদ্ধও দেখেছি, যার সম্বল মাত্র ছোট একটি চায়ের দোকান, কিছুই পাননি কখনো দল থেকে, কিন্তু ঐ যে শেখ মুজিবের ডাকে আওয়ামী লীগে এসেছিলেন আর নড়েননি। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এরকম বহু আত্মত্যাগী আওয়ামী লীগার আছেন, যারা দল করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন কিন্তু এখনো দল করছেন। নেতারা অবশ্য তাদের খবর রাখেন না। এ ছাড়া শেখ মুজিব তাঁর সাথী হিসেবে এমন ব্যক্তিদের পেয়েছেন যাঁদের সাহায্য ছাড়া তিনি হয়তো ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছতেও পারতেন না। ফলে, আওয়ামী লীগ বড় হয়েছে, ছয় দফার পর তা আরো বিস্তৃত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবও অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠেছেন।

আত্মবিশ্বাস আর সাহসও ছিল তাঁর। দলের ব্যাপ্তি, মানুষের প্রতি ও নিজের প্রতি আস্থা তা আরো বাড়িয়েছিল। সে কারণে ছয় দফায় পরিণত করতে পেরেছিলেন। আর এটিই ছিল তাঁর অস্পষ্ট ছবি বা স্বপ্ন। এ লক্ষ্যে যে তিনি অবিচল ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে যে তাঁর সাহস ও আত্মবিশ্বাস ছিল তা ফুটে ওঠে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময়।

সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ মামলা চলাকালীন সময়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। প্রধান আসামী শেখ মুজিবের পাশে তিনি বসা। আদালতে কথা বলা নিষেধ।

শেখ মুজিব কয়েক বার ফয়েজ আহমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন কিছু একটা বলার জন্য।

ফয়েজ আহমদ বললেন, "মুজিব ভাই, কথা বলতে মানা। মাথা ঘোরাতে পারছি না। বের করে দেবে।" তক্ষুণি উত্তর আসলো যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে, "ফয়েজ, বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে হবে।" ... তখন তিনি [বিচারক] জানতেন না যে, শেখ মুজিবের এই প্রতীকী উচ্চারণ একজনের জন্যে নয়, সমগ্র দেশের জনগণের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের বাণী স্বরূপ।

১৯৭২ সালে, পাকিস্তান থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশে ফিরলেন শেখ মুজিব। এখন তাঁর ভূমিকা আর আন্দোলনকারীর নয়। এখন তাঁর ভূমিকা যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, 'সোনার বাংলা'র তা পূরণ করার। তাঁর সোনার বাংলা তখন একেবারে বিধ্বস্ত। আওয়ামী লীগ প্রধান হিসেবেই তিনি ক্ষমতা নিলেন। অনেকে ভেবেছিলেন, চীনের মাও-সে-তুঙের মতো তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার ভার নেবেন না, কারণ তিনি তো তখন আর দলীয় নেতা নন, তিনি বাংলাদেশের। চৌ-এন লাইয়ের মতো তাজউদ্দীন দেশ চালাবেন এবং তাজউদ্দীনের সেই প্রশাসনিক স্থিরতা ছিল। কিন্তু তা হয়নি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই। হলে হয়তো ইতিহাস অন্যরকম হতো।

প্রশাসনিক ভার নেওয়ার পর যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো তার প্রতিটাই সমালোচিত হতে লাগল। কারণ, আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধী অনেক দল ছিল। তারা দল হিসেবেই আওয়ামী লীগের সমালোচনা করেছে এবং তা বর্তেছে দলীয় প্রধান হিসেবে শেখ মুজিবের ওপর।

একজন প্রশাসককে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং তাতে দৃঢ় থাকতে হয়। অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রশাসনের ভার গ্রহণ করে তিনি অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যক্তিকে সামনে রেখে, মুক্তিযুদ্ধের সময় সন্দেহভাজন বা পাকিস্তানপন্থী হিসেবে কথিত অনেককে তিনি প্রশাসনে বসিয়েছেন যা না বসালেও চলত। যেমন বিচারপতি মকসুমুল হাকিম। আগরতলা মামলা ট্রাইব্যুনালের তিনি ছিলেন অন্যতম বিচারপতি, তাঁকে তিনি করলেন ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত। শেখ মুজিবের হত্যার পর বিচারপতি হাকিম যোগ দিয়েছেন বিএনপিতে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় তাঁর অনুপস্থিতি অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। ফলে ঐ সময় তিনি ও তাঁর সরকার যে সব ইতিবাচক কাজ করেছিলেন তা ঢাকা পড়ে গেছে এবং তিনি যে সব নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন না তার প্রমাণ এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বিভক্তি। এটা ভেবে দেখার বিষয় যে, যাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল এত প্রবল, ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত যাঁর কথাই ছিল আইন, মাত্র এক বছরের ব্যবধানে কেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মপন্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। হতে পারে মুক্তিযুদ্ধের ন'টি মাস বাংলাদেশের মানুষের মনে এমন গভীরভাবে দাগ কেটেছিল যে তার মনের গড়নই বদলে গিয়েছিল। অন্তত একটি জেনারেশন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে

অনুপস্থিত থাকার কারণে হয়তো শেখ মুজিব তা অনুধাবন করতে পারেননি। শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের কারণ হিসেবে সমালোচকরা নানা বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। এর মধ্যে আমরা কয়েকটি বিষয় নিয়ে মাত্র আলোচনা করব।

চার

বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং আওয়ামী লীগের অহংবোধ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে। সরকার অস্ত্র জমা দিতে বাধ্য করেছিলেন অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা ও অস্ত্রধারীকে। এটি এক বড় ধরনের সাফল্য। কিন্তু এটাও ঠিক অস্ত্র সবাই জমা দেয়নি, এমনকি আওয়ামী লীগেরও। ভারতীয় বাহিনীকে শেখ মুজিব স্বল্প সময়ের মধ্যে ফেরত পাঠাতে পেরেছিলেন। এটিও বড় ধরনের সাফল্য কিন্তু ভারতীয় বাহিনী ফেরার সময় শোনা যায় নিয়ে গিয়েছিল অনেক ক্যাপিটাল গুডস। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সহায়তাকারী হওয়া সত্ত্বেও ভারতের প্রতি বিরূপ ধারণা জন্ম নেয়। পরে ভারত ও স্বাধীনতাবিরোধীরা এই সেন্টিমেন্টকে সফলভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে অবৈধ অস্ত্র আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত অভাব, অনটন, অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা সবই ছিল। কিন্তু এসবের মধ্যেও তীব্র হয়ে বেজেছিল যেটি, সেটি হচ্ছে নতুন এক অপমান। হঠাৎ দেখি সাড়ে সাত কোটির মধ্যে দেড় লাখ মাত্র মুক্তিযোদ্ধা। বাকি সব? কেউ বলেননি তেমন করে কিন্তু এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের মধ্যে যারা ছিলাম দেশে। নিমিষেই মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই বিস্মৃত হলেন যে আমরা না থাকলে গেরিলা যুদ্ধ হতো না। বিষয়টি আরো বেদনাদায়ক হয়ে উঠল যখন দেখা গেল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সনদপত্র, বিশেষ পুরস্কার (যে ফর্মেই হোক) বরাদ্দ হচ্ছে। সাত কোটি মানুষ যেন অপাংক্তেয় হয়ে গেল মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কাছে। এ টেনশন পরবর্তীকালে সৃষ্টি করেছে সিভিল সমাজে বিরোধের। উচিত ছিল রাজাকারদের তালিকা প্রণয়ন এবং তারা ছাড়া বাকি সবাইকে এক কাতারভুক্ত করা। এক হিসাবে জানা যায়, মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা করা হয় তাতে প্রতি বারো জনে একজন ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। সমালোচকদের মতে, এভাবে আওয়ামী লীগ তার দলীয় স্বার্থ রক্ষা করতে চেয়েছে। এই জাল সনদপত্র এবং সরকারি দলের চাপে আওয়ামী লীগ সমর্থক অনেকে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের ভালো চাকরিগুলো পেলেন। অন্য কথা আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ও দল সমার্থক করে ফেলল যা সিভিল সমাজে সৃষ্টি করল টেনশনের।

রাজাকার, রাজাকারবাদ ও রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও বিরোধিতা বর্তমান রাজনীতির অন্যতম বিষয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ যা অহরহ বিএনপি-র মুখপাত্ররা করে আসছেন তা হলো দালালদের পুনর্বাসন করা হয়েছিল মুজিব আমলে। এ বক্তব্যে মিশ্রণ ঘটেছে সত্য-মিথ্যার।

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৩৪,৬০০ পাকিস্তানি দালাল বা স্বাধীনতাবিরোধীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এর জন্য পাকিস্তান ও তার মিত্র মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহের যথেষ্ট চাপ

ছিল। এখনই বাংলাদেশের পক্ষে বহিঃস্থ কোন চাপ রোধ করা সম্ভব হয় না আর সে সময়তো দেশটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও বিধ্বস্ত। এছাড়া তৎকালীন বামপন্থী রাজনীতিবিদ মওলানা ভাসানী, আলিম আল রাজী প্রমুখ, এমনকি বুদ্ধিজীবী আবুল ফজল, বামপন্থীদের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত 'হলিডে'—সবাই বিচারের বিরোধিতা করেছিলেন। মওলানা ভাসানী ১৯৭৩ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে দালাল আইন বাতিল করার আলটিমেটামও দিয়েছিলেন।

তাছাড়া স্বাধীনতার ঠিক পর পর প্রশাসন যেখানে বিধ্বস্ত সেখানে এত লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করাও ছিল দুরূহ। এসবকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় অজুহাত হিসেবে। তারপরও সত্য থাকে। তাহলো শেখ মুজিব ঘাতক, ধর্ষণকারী, খুনী, লুণ্ঠনকারী রাজাকার বা আল-বদরদের অব্যাহতি দেননি।

এ সাধারণ ক্ষমা সমাজে এমন অভিঘাত হানবে বা বাংলাদেশকে বিভক্ত করে দেবে তা যদি ঐ সময় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতেন তাহলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার আগে তাঁদের চিন্তা করতে হতো। এখন বাঙালি জাতিকে ঐ সাধারণ ক্ষমা নিয়ে তর্ক করতে হচ্ছে। শেখ মুজিব ও তাঁর সরকার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তিনি বা তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি এবং মানুষকে কি যাতনার মধ্যে থাকতে হয়েছে তাও তাঁরা অনুধাবন করেননি। করলে তাঁদের পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব হতো না। যেমনটি বলেছেন শহীদ সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার—"আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোনো নেতা যুদ্ধে আপনজন হারাননি। ফলে স্বজন হারানোর ব্যথা তাদের জানা ছিল না। ঘাতকদের তারা সহজেই ক্ষমা করে দিতে পেরেছিলেন।" অন্যদিকে, ঐ পরিপ্রেক্ষিতেই আওয়ামী লীগের বক্তব্য যা শেখ হাসিনা বলেছিলেন জাতীয় সংসদে—"সেই সময় প্রায় চার লাখ বাঙালি পাকিস্তানে বন্দী অবস্থায় ছিল। তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্যে রাস্তায় নেমেছিল। বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিল। আমাদের কাছে এসেও তাদের আত্মীয়স্বজন অনেক কান্নাকাটি করেছেন। এই রকম একটা অবস্থায় সেই বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্য ক্লেমেন্সি দেয়া হয়েছিল। ...

[মুক্তিযুদ্ধ] অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বাড়ির একজনকে কোনো একটা পদে রেখে সেই বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং এই ধরনের যে সমস্ত কেস ছিল, যারা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে তাদেরকেই বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু যারা সত্যিকার যুদ্ধ অপরাধী বিশেষ করে যারা গণহত্যা চালিয়েছে, যারা লুটতরাজ করেছে, যারা নারী ধর্ষণ করেছে, যারা অগ্নিসংযোগ করেছে তাদেরকে কিন্তু ক্ষমা করা হয়নি।" কিন্তু ক্ষমা সত্ত্বেও এরা বাংলাদেশে টিকে থাকতে পারত কি না সন্দেহ যদি না ১৯৭৫ সালের পর জেনারেলরা সম্মানের সঙ্গে এ কাজটি করতেন এবং সব করা হয়েছিল সামরিক আইন জারি করে।

তবুও এ অভিযোগ একেবারে নাকচ করা যায় না যে, সাধারণ ক্ষমা ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত। কারণ এ অধ্যাদেশ ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ যার সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং আইডেনটিটি। এ ঘোষণা পরবর্তীকালে নিয়ন্ত্রণ করেছে সংসদীয় গণতন্ত্র তো বটেই, অন্যান্য ঘটনাবলীও।

জাতীয় নীতিও তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। পাশ্চাত্যও যে এ কারণে অখুশি হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

এ বিষয়টি বিতর্কের যে, ঐ সময় জাতীয়করণের যে নীতি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও তাদের অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ও গভীর ধারণা ছিল কি না। মুক্তিযুদ্ধের একটি কারণ ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ থেকে মুক্ত হওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধে যারা যোগ দিয়েছিলেন তাদের অনেকে এবং যাদের ছিল বামপন্থী ঝোঁক তারা শোষণহীন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যুদ্ধের সময় শহরের অনেক সচ্ছল পরিবার আশ্রয় নিয়েছিলেন গ্রামে এবং তখন তারা আবার পুনরাবিষ্কার করেছিলেন সিভিল সমাজকে। কারণ সে সমাজ সহায়তা করেছে তাদের। ফলে এরকম একটা ধারণা জন্মেছিল যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়করণের নীতি গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এই নীতি করার সময় রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদরা বাস্তববোধ ও দূরদর্শিতা দেখাতে পেরেছেন এমন কথা বলা যায় না।

অর্থনীতিবিদদের এই নীতি বুদ্ধিবৃত্তিক কনফিউশন হতে পারে, হতে পারে তা মতাদর্শগত অন্ধতা। কিন্তু তা আওয়ামী নেতৃবর্গ, কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত করেছিল দুর্নীতির। শিল্প-কারখানাগুলোতে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছিল আওয়ামী লীগের সমর্থকদের যাদের শিল্প প্রশাসন সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। পুরনো প্রশাসকদের ব্যবস্থাপনার ভার দিয়ে আওয়ামী প্রশাসকদের যদি শুধু পদমর্যাদা ও বেতন দেওয়া হতো তাহলেও হয়তো অর্থনীতির এত ক্ষতি হতো না। আর পারমিট কালোবাজারীরা তো ছিল। সুতরাং, সিভিল সমাজ টেনশন ও ভুল বোঝাবুঝিতে যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

এসব কারণে স্বাধীনতার দু'তিন মাসের মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল দুশো থেকে তিনশো গুণ। দৈনন্দিন জীবনযাপনই হয়ে উঠল দুঃসহ। সাধারণ মানুষ ও বিরোধীরা অভিযুক্ত করল আওয়ামী লীগ প্রকারান্তরে শেখ মুজিবকেই।

স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশের সিভিল সমাজের চরিত্র এতই জটিল হয়ে উঠল যে, খুনী ও রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী শাখার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করাও হয়ে উঠল কষ্টকর। সব ধরনের লুটেরা সমন্বয়ে বিকশিত হলো এ ধরনের লুটেরা সংস্কৃতির যা হীনবল করে দিতে লাগল বাংলাদেশের সিভিল সমাজকে। ঐ সময় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, রাইফেলস, পুলিশবাহিনী ছিল অসংহত এবং একই সঙ্গে কালোবাজারী, চোরাকারবারী ও সন্ত্রাসী রাজনৈতিক গ্রুপের মোকাবিলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সরকার রক্ষীবাহিনী নামে নতুন একটি সশস্ত্র সংস্থা গঠন করল ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে।

শেখ মুজিবের নৃশংস হত্যার একটি কারণ হিসেবে রক্ষীবাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়। রক্ষীবাহিনী অত্যাচার করেনি এ কথা বলা সত্যের অপলাপ হবে। এ অত্যাচার নিয়ে এখনো যথেষ্ট হৈ চৈ করা হয়। কিন্তু কয়েকদিন আগে নৌবাহিনীর কিছু সদস্য চট্টগ্রামের একটি অঞ্চল বিরান করে দিয়েছে। এ অত্যাচারের মাত্রা ও আর্থিক ক্ষতি রক্ষীবাহিনীর কৃত অত্যাচার থেকে কম? কিন্তু এ প্রসঙ্গ আলোচনায় আসে না। কারণ, সেনাবাহিনীর ক্ষমতাকে সবাই ভয় পায়। তবে শেখ সাহেবের "অপরাধ" হিসেবে যে বিষয়টিকে গণ্য

করা হয় তা হলো, তিনি রক্ষীবাহিনী করেছিলেন সেনাবাহিনীর বিপরীত শক্তি হিসেবে এবং নিজেকে রক্ষার জন্যে।

কিন্তু আসল বিষয়টি কি। রক্ষীবাহিনী গঠিত হয় ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ড. মিয়ার বই থেকে জানা যায়—"মস্কো থেকে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিডিআর এবং রক্ষীবাহিনীকে একীভূত করার। কারণ এই দুই বাহিনীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব প্রায় একই ধরনের। কিন্তু ঐ ইস্যুকে কেন্দ্র করে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে এই দুই বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয় পিলখানার চত্বরে। এদের সংঘর্ষ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ওদের গোলাগুলি বন্ধ করানোর জন্য বঙ্গবন্ধু স্বয়ং পিলখানায় যেতে বাধ্য হন।" এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর দু'টি বাহিনীকে আলাদা করে দেওয়া হয়।

রক্ষীবাহিনীর উদ্ধত আচরণ, নিপীড়ন আড়াল করার কিছু নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, রক্ষীবাহিনী প্রচুর অবৈধ অস্ত্র ও কালোবাজারী পণ্য উদ্ধার করেছিল এবং কালোবাজারী ও মজুতদাররা রক্ষীবাহিনীর ভয়েও তটস্থ থাকত। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যকলাপের ফলে এসব ইতিবাচক দিক ঢাকা পড়ে গেছে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে রক্ষীবাহিনী। অবৈধ অস্ত্রধারীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মীর যোগ ছিল এ কথা অস্বীকার করা যাবে না এবং রক্ষীবাহিনীও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পেরেছে বলেও জানা যায়নি। এভাবে আওয়ামী লীগ নিজের সাফল্য নিজেই বিনষ্ট করেছে।

শেখ মুজিবুর রহমান বা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল দেশকে একটি শাসনতন্ত্র প্রদান। আর কোনো দেশে এরকম একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এত দ্রুত একটি শাসনতন্ত্র প্রদান সম্ভব হয়েছে বলে জানা নেই। এ শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছিল, তৎকালীন পরিস্থিতিতে তা খানিকটা র‍্যাডিক্যালও বলা যেতে পারে। শাসনতন্ত্রের মূলনীতি সমূহ ছিল—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। মূলত মুক্তিযুদ্ধ যে ক'টি কারণে হয়েছিল শাসনতন্ত্রের মূল নীতিতে তাই বিধৃত হয়েছিল বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতা। যে কারণে, সামরিক বাহিনীর জেনারেলরা প্রথমেই মূলনীতিসমূহ বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর আঘাত হেনেছিলেন। এ ছাড়া শাসনতন্ত্রে বিধৃত হয়েছিল একজন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ, রাষ্ট্রের দর্শন। অন্য কথায় এভাবে বিষয়টি দেখা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সামরিক সমাজের বিপরীতে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। আর ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রে বিধৃত হয়েছিল সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ বা এককথায় এই শাসনতন্ত্র বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে পত্তন করতে চেয়েছিল সিভিল সমাজের ভিত্তি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—

"... আমি জানি না রক্তাক্ত বিপ্লবের পর পৃথিবীর আর কোনো দেশে সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন চালু হয়েছে কিনা। ... নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে। ভোট দেওয়ার বয়স একুশের বদলে আঠারো বছর করে ভোটাধিকারের সীমা বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের নিজস্ব বিমান

উড়ছে দেশ-বিদেশের আকাশে, তৈরি হয়েছে নিজস্ব বাণিজ্য জাহাজ বহর। বিডিআর সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত। স্থল বাহিনী মাতৃভূমির ওপর যে কোনো হামলা প্রতিরোধে প্রস্তুত। গড়ে উঠেছে আমাদের নিজস্ব নৌ ও বিমান বাহিনী। থানা ও পুলিশ সংগঠনের যে ৭০ ভাগ পাকিস্তানিরা নষ্ট করেছিল, এখন আবার তা গড়ে উঠেছে। জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছে। ... কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৬০% ভাগ মালিক আপনারা। ... পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা তুলে নেওয়া হয়েছে। ... আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই মুক্তিযুদ্ধের শত্রুতা করে যারা দালাল আইনে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন তাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে।" কিন্তু দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য মানুষ শাসনতন্ত্র, এর নীতিমালা বা শেখ মুজিব উল্লিখিত সফলতাসমূহকে বুঝতে চায়নি।

একাধিপত্য বজায় রাখার জন্য শ্রমিক ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে যা অন্তিমে সংসদীয় গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এর মূল বিষয় ছিল রাষ্ট্র ও শাসকদলকে এক করে ফেলা এবং এই বোধটি সিভিল সমাজকে তছনছ করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। স্বাধীনতার আগেও অনেক শ্রমিক সংগঠন ও নেতা দেশের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে শেখ মুজিবকেই বিবেচনা করতেন এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও মেনে নিতেন শেখ মুজিবকে। স্বাধীনতার পরপরও তার খুব একটা হেরফের হয়নি। কিন্তু শেখ মুজিব নিজেই যখন গঠন করলেন শ্রমিক লীগ এবং শ্রমিক লীগ আবার প্রতিটি শিল্পাঞ্চলে শাখা সৃষ্টি করতে লাগল তখন তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কারণ অন্তিমে শ্রমিক লীগের নেতা হিসেবে যারা আবির্ভূত হলেন তাদের কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিগত সততার ব্যাপারে কোনো সুনাম ছিল না। শুধু তাই নয়, অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা প্রবল টেনশনের সৃষ্টি করল, শিল্পক্ষেত্রে যার বলি হলো নিরীহ শ্রমিকরা। এ সময় শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'লালবাহিনী' যা অচিরেই হয়ে ওঠে নির্যাতনের প্রতীক। 'লালবাহিনীর' সৃষ্টি শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও লুটের সৃষ্টি করল। পরিণামে প্রচুরসংখ্যক শ্রমিক হয়ে উঠলেন আওয়ামী লীগ বিরোধী। শ্রমিক নেতা বা লালবাহিনীর ঔদ্ধত্য কী পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার একটি উদাহরণ দিই। ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৩ সালে, লালবাহিনী শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী আহমদ ফজলুর রহমানকে অপহরণ করে। তাঁর স্ত্রী ছুটে যান শেখ মুজিবের কাছে। তাঁর হস্তক্ষেপে মুক্তি পান ফজলুর রহমান। কিন্তু প্রকাশ্য জনসভায় আবদুল মান্নান ফজলুর রহমানের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ কারণে ফজলুর রহমান অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে শেখ মুজিবকে অভিযুক্ত করেছিলেন যাতে স্তম্ভিত হয়েছিলেন শেখ মুজিব। বেগম হাসিনা রহমানের জবানীতে তখনকার পরিস্থিতি খানিকটা আঁচ করা যাবে। তিনি বলছেন, শেখ মুজিব এ ঘটনার বিন্দু বিসর্গ জানতেন না। কিন্তু নানারকম গুজব এ ধারণার সৃষ্টি করে যে তাঁর ইঙ্গিতেই ঘটনাটি ঘটেছে। ফজলুর রহমানও তাই বিশ্বাস করেছিলেন।

"... কিন্তু ঐ সময়ের অবস্থা বিচার করলে দেখা যাবে, বঙ্গবন্ধুর ক্ষমতারও সীমা ছিল। ... এসব ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে হঠাৎ করে লালবাহিনীর নেতার গায়ে হাত দেওয়ার

মতো ক্ষমতা তখন বঙ্গবন্ধুরও ছিল না। ... রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন এমনই ছিল যে লালবাহিনীর নেতাকে তখন কারারুদ্ধ করলে নানাপ্রকার রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দিতে পারত যা দেশের মঙ্গলের পক্ষে সহায়ক হত না।" সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী সামরিক শাসনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে, সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করে। কিন্তু আওয়ামী লীগের দাম্ভিকতার কারণে শ্রমিকরা সে কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি।

আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন, ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব দুর্বল করে তুলছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি এবং সামরিক শাসনের পথ উন্মুক্ত করছিল। ১৯৭২ সালের শুরুতেই এ অন্তর্দ্বন্দ্বের শুরু। ছাত্রলীগের দু'নেতা আ.স.ম. আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-এর পক্ষে ছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকারের পদক্ষেপ যথেষ্ট ও সঠিক নয়। অন্য গ্রুপের নেতা আবদুল কুদ্দুস মাখন ও নূরে আলম সিদ্দিকী বললেন, না, বাংলাদেশের জন্য মুজিববাদই উপযুক্ত।

মুজিববাদ আদৌ কোনো দর্শন হতে পারে কি না সন্দেহ। কিন্তু তখন শেখ মুজিবকে খুশি করার জন্য শুধু আওয়ামী লীগ নয়, সর্বস্তরেই চলছিল চরম প্রতিযোগিতা। মুজিববাদ ছিল তারই অভিব্যক্তি। তোফায়েল আহমদের ১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি "মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করব" ঘোষণার মাধ্যমে মুজিববাদের উদ্ভব। এর তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে এগিয়ে এলেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস। তোফায়েল আহমদ মুজিববাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করেন এভাবে—

"বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ হচ্ছে মুজিববাদ। মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আসবে আমাদের পূর্ণ সাফল্য। আর এর স্তম্ভ হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা। ... পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করা হবে।" মুজিববাদ দিয়ে মুজিব ভক্তদের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির প্রচেষ্টা ছিল; কিন্তু আদর্শ হিসেবে মুজিববাদ প্রচার একটি বিব্রতকর প্রচেষ্টার সৃষ্টি করেছিল। শেখ মুজিব মুজিববাদের পক্ষে কখনো কিছু বলেননি। কিন্তু এর প্রচারেও কখনো মানা করেননি।

৬ জুন, ১৯৭২ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন—"বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। খাঁটি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে বাংলাদেশে, অন্য কিছু নয়।" কিন্তু পরে, তাঁর ভাগ্নে শেখ মণির কারণে তিনি সমর্থন করলেন মাখন-সিদ্দিকী গ্রুপকে। পরিণামে, ছাত্রলীগ বিভক্ত হয়ে গেল। এর প্রতিফলন ঘটল আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোতে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক ঘোষণা দিলেন ৭ জুন থেকে শুরু হবে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ১৬ জুলাই ছাত্রলীগ (মুজিববাদী) ঘোষণা করল—"মাওবাদী বিভ্রান্ত নেতৃত্বে সিআইএ'র এজেন্ট দল ও ছাত্রলীগ নামধারী বিভ্রান্ত নেতৃত্ব, পলাতক আল-বদর, আল-শামস, রাজাকার, শান্তি কমিটি, তিন মুসলিম লীগ, জামায়াত, নেজাম, জমিয়তে ওলামায়ে, পিডিপিসহ প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বানচাল করতে চায়।" কিন্তু বক্তব্যে মুজিববাদবিরোধীদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলেও

বাস্তবে এ আক্রমণ ছিল মুজিববাদবিরোধী সবার বিরুদ্ধে, বিশেষ করে জাসদের বিরুদ্ধে, এই যে অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ, ঔদ্ধত্য, শেখ মুজিব তা দেখেও দেখেননি এবং মানুষ তা পছন্দ করেননি।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ শাসনামলের সবচেয়ে বড় ঘটনা। প্রতিপক্ষ এই দুর্ভিক্ষকে এখনো আওয়ামী বিরোধী প্রচারণার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনেও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছিল এ বলে যে আওয়ামী লীগ এলে দেশে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। এ প্রচারণায় ভীত হয়ে মহিলারা আওয়ামী লীগে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন।

মওদুদ আহমদ লিখেছেন, "অনশনকে যদি দুর্ভিক্ষের একটি পর্যায় বলে মনে করা হয়, তাহলে ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তখন থেকেই সোনার বাংলার মাটিতেই অসংখ্য লোক অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে পায়ে পায়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছিল।"

প্রমাণিত হয়েছে যে, এ দুর্ভিক্ষের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল আমেরিকা। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রায় ৪০০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ তার মোকাবিলা করতে পারেনি। কিন্তু সারা দেশে যখন হাহাকার তখন চরম ডান ও বামপন্থী দলগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে নানা গুজব ছড়াতে থাকে। ডানপন্থী বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও জামায়াতপন্থীরা বলতে থাকে, পাকিস্তান ভাঙার কারণেই আজ এই অবস্থা। চীনপন্থীরা বলা শুরু করে, বাংলাদেশ সংশোধনবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করার কারণে আজ এই দুর্বিষহ অবস্থা। শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে লাভবান একমাত্র পত্রিকা 'দৈনিক ইত্তেফাক' দুর্ভিক্ষের একটি ছবি ছেপে সারা দেশে আলোড়নের সৃষ্টি করে। ছবিটি ছিল জালপরা বাসন্তী নামের এক দরিদ্র মহিলা আহার খুঁজছে। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে ছবিটি বানানো।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিল ২৭,০০০। বেরসকারি হিসাবে এক লাখ। এই দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি—সর্বক্ষেত্রে প্রবল অভিঘাত হেনেছে। যে দল এবং যে দলের নেতা সুদীর্ঘ তিন দশক লড়াই করেছেন সিভিল সমাজের জন্য, এখন সিভিল সমাজ তাঁর বিরুদ্ধেই চলে গেল। এটিই ছিল ট্র্যাজেডি। সিভিল সমাজের সেই ক্রোধ তখন বোঝা যাবে কবি রফিক আজাদের একটি কবিতায়—"ভাত দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাবো।" সেই ক্রোধ, সেই বিরূপতা, সেই আশাভঙ্গের বেদনা এখনো সিভিল সমাজ থেকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারেনি আওয়ামী লীগ। দুর্ভিক্ষ রোধ করা যেত যদি খাদ্য মন্ত্রণালয় ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করত, বিশেষ করে রংপুরে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, খাদ্য সচিব আবদুল মোমেন খানের ব্যর্থতা খানিকটা দুর্বোধ্য। এ দুর্বোধ্যতা বিশ্লেষণ করতে হলে, আবারও সেই দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রের নকশার ইঙ্গিত করতে হয়। কারণ শেখ মুজিব হত্যার পর দেখি, আবদুল মোমেন খান জিয়াউর রহমানের খাদ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। এখন কেউ যদি বলেন, আবদুল মোমেন খানের স্থবিরতা দুর্ভিক্ষ ডেকে আনতে সাহায্য করেছিল, পতন ঘটেছিল সরকারের এবং তারই পুরস্কার মন্ত্রিত্ব—সেই লজিক নাকচ করা কষ্টকর।

এ দুর্ভিক্ষ যে এড়ানো যেত না তা নয়। এড়ানো না গেলেও তীব্রতা হ্রাস করা যেত, যদি শহরাঞ্চলে রেশন হ্রাস করে গ্রামাঞ্চলে ব্যবস্থা নেওয়া হতো, মজুত খাদ্যশস্য উদ্ধার করা যেত। তার কিছুই হয়নি। এর প্রধান কারণ প্রাথমিক রাজনৈতিক কারকরা ঐক্যবদ্ধভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেননি, বরং দেখি, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরে অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের মতে, এই দুর্ভিক্ষ ছিল কৃত্রিম। "শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন সরকারের অযোগ্যতা, অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতিই নয়, সরকার এবং ক্ষমতাসীন এলিট গোষ্ঠীর অবহেলা ও উদাসীনতাও ছিল এই দুর্ভিক্ষের জন্য বহুলাংশে দায়ী।" সরকারের মন্ত্রীবর্গ, আমলারাও জানতেন যে দুর্ভিক্ষ আসন্ন, খাদ্য মন্ত্রণালয়তো তা ভালোভাবেই জানত। কিন্তু "সরকার যে শুধু অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃসূত্র হতে পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থই হয়েছেন তাই নয়, সরবরাহ ও বিতরণেও তার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।" রাজনৈতিক কারকদের এই ব্যর্থতার মাশুল গুনতে হয়েছে সিভিল সমাজকে।

১৯৭৩-৭৪ সাল থেকেই শেখ মুজিবের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে পল্লবিত হতে থাকে নানা ধরনের গুজব। একমাত্র তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ছাড়া তাঁর পরিবারভুক্ত সব সদস্যের ব্যাপারেই কিছু না কিছু রটনা হয়েছিল। সব রটনার ভিত্তি ছিল এমন ভাবার কোনো কারণ নেই এবং এর অধিকাংশই পরবর্তীকালে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ঐ সময়ের ফ্রেমে মানুষ এগুলো বিশ্বাস করেছিল, নাগরিক সমাজকে আহত করেছিল। রটনা ছিল প্রধানত দু'ধরনের—ক্ষমতা করায়ত্তকরণ ও দুর্নীতি।

অর্থ-দুর্নীতি সংক্রান্ত রটনাসমূহ পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়নি এবং শেষ মুজিব তখন যে পর্যায়ে ছিলেন সে পর্যায়ে অর্থের বিষয়টি ছিল নিতান্ত গৌণ। তবে তাঁর আত্মীয় শেখ মণি, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ নাসের, সেরনিয়াবাত পুত্র আবুল হাসনাত সম্পর্কে এ ধরনের রটনা ছিল; কিন্তু তা কতটুকু সত্য তা নির্ণয় করা যাবে না। তবে দুর্ভিক্ষের সময় শেখ কামালের বিয়েতে আড়ম্বর এবং সোনার মুকুট পরানো কনের ছবি দারুণ আহত করেছিল সিভিল সমাজকে। কারণ শেখ মুজিবই এর কিছুদিন আগে মেয়েদের পরামর্শ দিয়েছিলেন বেলি ফুলের মালা পরে বিয়ে করতে। কিন্তু পুত্রের জন্য পিতার স্বাভাবিক স্নেহ প্রদর্শনও চলে গিয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। কারণ তখন ছিল বৈরী সময়।

রটনার অন্য বিষয়টি হলো ক্ষমতা করায়ত্ত ও পরিবারভুক্তকরণ। শেখ মুজিব নিজেই ছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্র, ফলে এটা স্বাভাবিক যে তাঁর নিকট আত্মীয় ও কাছেরজনরাও ক্ষমতাবান হবেন। এ ক্ষেত্রে যে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন ছিল তা তিনি বিবেচনা করেন নি। তাঁর ভগ্নিপতি সৈয়দ হোসেন ছিলেন সেকশন অফিসার; কিন্তু দুবছরের মধ্যে হয়ে যান সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং আত্মীয়তাবলে সচিবালয়ের অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। ক্ষমতার অপব্যবহার যে তিনি করেননি এমন কথা বলা যাবে না। তাঁর সেই দাপট আমলাতন্ত্র পছন্দ করেনি। শেখ কামাল ছিলেন ছাত্রলীগের নেতা এবং বিরোধী ছাত্র সংগঠন, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে তার আচরণ সব সময় যথাযথ ছিল এমন বলা যাবে না। যদি তিনি শেখ মুজিবের পুত্র না হতেন তাহলে হয়তো এ ধরনের সমস্যা হতো না। কিন্তু তার অনেক আচরণ সে সময়

বিবেচিত হয়েছে ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। শেখ জামাল স্যান্ডহার্স্ট-এ ভর্তি হয়েছিলেন; কিন্তু এ অস্বাভাবিক গুজব রটে যে ভবিষ্যতে সেনাপ্রধান হিসেবে তাকে তৈরি করা হচ্ছে। শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ শহীদ ছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি। তাঁর আরেক ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত ছিলেন মন্ত্রী যদিও তিনি একজন আঞ্চলিক আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে উঠে এসেছিলেন। যুবলীগ প্রধান ছিলেন তাঁর আরেক ভাগ্নে শেখ মণি। তাঁর জামাতা ড. মিয়াকেও যুবলীগের প্রধান হিসেবে যুক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তাতে বাধা দিয়েছেন বেগম মুজিব ও ড. মিয়া নিজে। এদের মধ্যে শেখ মণি হয়ে উঠেছিলেন আরেকটি ক্ষমতার বিন্দু এবং এলিট সমাজ তার উত্থানে ছিল ভীত। শেখ মণি সে সময় সাপ্তাহিক বিচিত্রার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিনি ভায়োলেন্সে বিশ্বাসী। শেখ মুজিবের চেয়ে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ হয়ে উঠেছিল তীব্র। এ ক্ষেত্রে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করলে হয়তো তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন বিশিষ্ট লেখক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। বিভাগীয় কোনো অধ্যাপকের সঙ্গে মতান্তরের জের হিসেবে ছাত্রলীগ কর্মীদের ব্যবহার করা হয়। তাদের কয়েকজন অধ্যাপক জাহাঙ্গীরের কক্ষে ঢুকে তাঁকে রিভলবার দেখিয়ে বিভাগ থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। হুমকি দেওয়া হয় হত্যার। এ পর্যায়ে শেখ মণির কাছে বহু দেন দরবার করার পর এই খড়গ নামানো সম্ভব হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বার্থে' তাঁকে বদলি করা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। এ ধরনের ঘটনা তখন অনেক ঘটেছে। তখন এবং এখন অনেকে মনে করেন যে, বেঁচে থাকলে ক্ষমতার জন্য শেখ মণি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যেতে দ্বিধা করতেন না।

আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় যে ধ্বস নেমেছে তা শেখ মুজিবের হয়তো অজানা ছিল না। তিনি এ কারণে অন্যদের দোষারোপও করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ যখন তাজউদ্দীন আহমেদকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারিত করা হলো তখন সচেতন মানুষ ও বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। অনেকে একথাও তখন বলেছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তাজউদ্দীনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে যদিও শেখ মুজিবের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিলেন না সে সময় এবং তা ভাবা অবাস্তব। আর তাজউদ্দীন সবসময় ছায়া হিসেবেই থাকতে চেয়েছেন। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে তাঁরই নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, সফলতা অর্জন করেছিল। তাই এ ঘটনা যথেষ্ট ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং সিভিল সমাজের জন্য তা ছিল একটি আঘাতও বটে।

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ১৯৭৪ সালের জরুরি অবস্থা ঘোষণা ও চতুর্থ সংশোধনী। ১৯৭৪ সালের জরুরি অবস্থা ঘোষণার পটভূমিকায় হয়তো যৌক্তিকতা ছিল। কিন্তু যৌক্তিকতা যাই থাকুক না এ ঘোষণা চরম আঘাত হেনেছিল সিভিল সমাজে। কারণ, তার মাত্র দু-বছর আগে সংবিধানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল মৌলিক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর। জরুরি অবস্থার অন্তিম লক্ষ্য ছিল একদলীয় শাসন যা আবার ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর আঘাত। এই যে প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা গ্রহণ তার কোনোটিই সিভিল সমাজ মেনে নেয়নি। হয়েছিল ক্ষুব্ধ। শুধু তাই নয়, যে দলটি গত দু-দশক কিছু আদর্শের জন্য লড়াই করেছে, যে নেতার পেছনে ঐ সব লক্ষ্য অর্জনে সারা জাতি

আত্মত্যাগ করেছে, দু-বছরের মধ্যে সে দল ও নেতার ঠিক বিপরীত অবস্থা গ্রহণ সিভিল সমাজকে দারুণভাবে বিস্মিত করেছিল। কারণ ধরনটি ছিল পাকিস্তান আমলের মতো। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।

দুর্ভিক্ষ, চরমপন্থীদের কার্যকলাপ, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, রাজনৈতিক বিরোধীদের অতিরঞ্জিত প্রচারণা—সব কিছু মিলেমিশে এক বিস্ফোরণমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এ ধরনের পরিস্থিতি সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে বা স্বৈরাচারী আচরণ দিয়ে ঠেকানো যায় না। অন্তিমে এ পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করার জন্য শেখ মুজিব যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাকে মোটেই গণতান্ত্রিক বলা যায় না। এ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল জরুরি অবস্থা ঘোষণা। তারপর চতুর্থ সংশোধনী পাস। কোনো আলোচনা ব্যতিরেকে এবং ন্যূনতম সময়ে গৃহীত হয় চতুর্থ সংশোধনী। দেশে একদলীয় সরকার কায়েম করে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয় রাষ্ট্রপতির হাতে এবং শেখ মুজিব তখন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহকে সরিয়ে শপথ নেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে। এখানে উল্লেখ্য যে, এর আগে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী অব্যাহতি নেন রাষ্ট্রপতির পদ থেকে, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল সিভিল সমাজে বা রাষ্ট্রে একজন রাষ্ট্রপতিকে যে শিষ্টাচার দেখানো উচিত তা হচ্ছে না। মোহাম্মদউল্লাহকে সরিয়ে আবার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য করা মোটেই বিবেচনাপ্রসূত হয়নি। কারণ এতে সিভিল সমাজ বা রাষ্ট্রে পদসমূহ কীভাবে বিবেচিত হবে তা নির্ণয় করা হয় না এবং তা হলে এক ব্যক্তিই প্রধান হয়ে উঠেন। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তা ঠিক নয়।

সংসদে চতুর্থ সংশোধনীর ওপর ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ মুজিব বলেন—"আজকের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই। ... যে নতুন সিস্টেমে যাচ্ছি তাও গণতন্ত্র। এখানে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই ... এক নম্বর কাজ হবে, দুর্নীতিবাজদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করা ... সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য।"

কিন্তু, এই যে এত ব্যাপক পরিবর্তন সে বিষয়ে জোরালোভাবে কেউ প্রতিবাদ করেননি। ১৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে শেখ মুজিব বলেন—শতাব্দীর জীর্ণ ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা পাল্টে দিয়ে প্রশাসন যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতন্ত্রীকরণ এবং একটি মাত্র রাজনৈতিক প্লাটফরমের পতাকাতলে সমগ্র জাতিকে সমবেত করে সুসংহত ও সংঘবদ্ধ জাতীয় প্রয়াস ছাড়া সংকট থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। খণ্ডিত, বিক্ষিপ্ত এবং অসংলগ্ন পরস্পরবিরোধী কর্মতৎপরতা নয়—আজ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সকল দেশপ্রেমিক শক্তির নিবিড় একাত্মতা এবং ঐক্যবদ্ধ ও গঠনমূলক সর্বাধিক কর্মপ্রয়াস। কেবল একটি শক্তিশালী ও বৈপ্লবিক ব্যবস্থার অধীনেই তা সম্ভবপর। সভায় তারপর এই শক্তিশালী ও বৈপ্লবিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন এর বিরোধিতা করেন। এম. এ. জি. ওসমানী এক পর্যায়ে বলেন—"আমরা আইয়ুব খানকে দেখেছি, ইয়াহিয়া খানকে দেখেছি, আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুজিবুর রহমান খান হিসেবে দেখতে চাই না।" শেখ মুজিব ওসমানীকে ডেকে বলেছিলেন—"Don't be excited my old friend, people are fed up with

fiery speeches. They want some revolutionary changes in the social, political and economic system." বিরোধিতা না করার একটি কারণ হচ্ছে, তাঁর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাবান মানুষের সামনে কেউ সাহস করে কথা বলতে যায়নি। আওয়ামী লীগ কর্মীদের মনোভাব কেমন ছিল তা উল্লিখিত হয়েছে ওয়াজেদ মিয়ার গ্রন্থে। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যা রাফিয়া আখতার ডলিকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন—"আপনারা এটা কি করলেন?" উত্তরে তিনি জানালেন—"আমরা বঙ্গবন্ধুর অনুগত ও বিশ্বস্ত অনুসারী হিসেবে তাঁর পেশকৃত প্রস্তাব অনুমোদন করেছি। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত মতামত, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করার প্রশ্নই ওঠে না।"

সিভিল সমাজের অভিঘাত বোঝা যাবে এ বিষয়ে বেগম মুজিব ও তাঁর জামাতা ওয়াজেদ মিয়ার মন্তব্যে। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁরা ছিলেন বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষটির সবচেয়ে কাছের লোক। বেগম মুজিব ঐ দিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং এক পর্যায়ে স্বামীকে তিনি বলেন—"এক্ষুণি সংসদ কক্ষেই দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? দু-চারদিন দেরী করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? ... আমি এ বাড়ি ছেড়ে তোমার সরকারি রাষ্ট্রপতি ভবনে যাচ্ছি না।" ওয়াজেদ মিয়া তাঁর স্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলেছিলেন—"... দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা কোনোমতেই সমীচীন, যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত হবে না। কাজেই সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর উচিত হবে দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আদেশ জারি না করা।"

শেখ মুজিব হয়তো স্বল্পকালের জন্য এ ব্যবস্থা করেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবেন। কারণ শেখ হাসিনা যখন পরদিন তাঁর পিতাকে তাঁর জামাতার মন্তব্য শোনালেন তখন তিনি "সবকিছু চুপচাপ শুনলেন এবং কিছুক্ষণ গভীর চিন্তাভাবনা করে তাকে জানানোর জন্য বললেন যে, দেশের এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা শুধু স্বল্পকালের জন্য। আব্বা আরো বলেছেন যে, তুমি যেন এ ব্যাপারে অযথা উত্তেজিত না হও এবং দুশ্চিন্তা না করো। আব্বার এই কথাগুলো যেন কারো কাছে জানাজানি না হয়ে যায় সে জন্য তিনি তোমাকে সর্বদা সংযত ও হুঁশিয়ার থাকতে বলেছেন অন্যের সঙ্গে তোমার কথাবার্তায়।"

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষায় 'দ্বিতীয় বিপ্লব' শুরু করতে যাচ্ছিলেন। এ 'দ্বিতীয় বিপ্লবে'র প্রথম পর্যায়ে ছিল ১৯৭৫ সালের ৭ জুন জাতীয় দল হিসেবে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা 'বাকশাল'-এর কাঠামো ঘোষণা করা। এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সৈনিক, আমলা—বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিদের নেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় বাকশালে যোগ দেওয়ার হিড়িক। রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে দীর্ঘ লাইন দিয়ে বুদ্ধিজীবী, আমলা, সরকারি কর্মচারী, সাংবাদিক—সবাই শেখ মুজিব বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে বাকশালে যোগ দেওয়ার আবেদন করতে থাকেন। এর পুরোটাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবলে ভুল হবে। কারণ, যদি স্বতঃস্ফূর্তই হয় তা হলে ১৫ আগস্টের পর রাজপথে জনতার ঢল নামত। আমাদের প্রধান রাজনৈতিক কারকরা একটি ভুল বারংবার করেছেন সেটি হলো ক্ষমতায় থাকা ও ক্ষমতায় না থাকার পার্থক্য নিরূপণ করতে না পারা। ক্ষমতায় থাকলে

যে জনসমর্থন, তার রূপ বা সিভিল সমাজের চেপে রাখা ক্ষোভ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। শেখ মুজিবের মতো ব্যক্তিও এর ব্যতিক্রম নয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বাকশালে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে এক ধরনের চাপ ছিল যা প্রত্যক্ষ করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ছাড়া সবাই বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। তবে এটাও ঠিক, অনেকে 'দ্বিতীয় বিপ্লবে' বিশ্বাস করে যোগ দিয়েছিলেন। অনেকে ক্ষমতার ক্ষুদকুঁড়োর জন্য যোগ দিয়েছিলেন।

১৯ জুন বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটিতে দীর্ঘ এক ভাষণে বাকশালের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পটভূমিকা বর্ণনা করেন। আসলে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এ পথেই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন দেশকে। সে বিশ্বাসে কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু, যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেননি তা হলো গত তিন দশক তিনি যার জন্য লড়াই করে এসেছেন এবং যার ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে বাকশালের কনসেপ্ট তার বিপরীত। এই বৈপরীত্য সিভিল সমাজে অভিঘাত হেনেছে এবং আবারও রাজনৈতিক কারকদের সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। শেখ মুজিবের দীর্ঘ বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে পরিষ্কার হবে আসলে কী বিশ্বাসে তিনি কী করতে চেয়েছিলেন—"... আর একটা জিনিস আমি মার্ক করলাম। সেটা হলো এই যে একদল বলেন, আমরা পলিটিশিয়ান, একদল বলেন, আমরা ব্যুরোক্রেট। তাদের মন-মানসিকতা ও চিন্তাচেতনা হলো রাজনীতিবিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকা। এই নিয়ে সমস্ত দেশ একটা ভাগ ভাগ অবস্থার মধ্যে থাকত। এই সন্দেহটা দূর করা দরকার এবং দূর করে সকলেই যে এক এবং সকলেই যে দেশকে ভালোবাসে এবং মঙ্গল চায়—এটা প্রমাণ করতে হবে। আমার সমাজে যে সমস্ত গুণী-জ্ঞানী লোক আছেন ও অন্য ধরনের যত লোক আছেন, তাদের নিয়ে আমার একটা পুল করা দরকার। এই পুল আমি করতে পারি, যদি আমি নতুন একটা সিস্টেম চালু করি এবং একটা নতুন দল সৃষ্টি করি—'জাতীয় দল' যার মধ্যে একমত, একপথ, একভাব, এক হয়ে দেশকে ভালবাসা যায়। যাঁরা বাংলাদেশকে ভালবাসেন, তাঁরা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে পারেন। এ জন্য আজকে এটা করতে হয়েছে।"

তিনি আরো বলেন—

"আমি ফেরেস্তা নই। শয়তানও নই। আমি মানুষ, আমি ভুল করবই। আমি ভুল করলে আমার মনে রাখতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ। আমি যদি রেকটিফাই করতে পারি, সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গোঁ ধরে বসে থাকি যে না আমি যেটা করেছি সেটাই ভালো—দ্যাট কানট বি হিউম্যান বিইং। ফেরেস্তা হইনি যে সবকিছু ভালো হবে। এই সিস্টেম ইনট্রোডিউস করে যদি দেখা যায় যে খারাপ হচ্ছে, অলরাইট রেকটিফাই ইট। কেননা আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। ...

ফান্ডামেন্টালি আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই, আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে চাই। ... উই ডু নট লাইক টু ইমপোর্ট ইট ফ্রম এনিহোয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।

এটা আমার মত, মাটির মত।"

তবে, নতুন কর্মসূচি গ্রহণের পর পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার লক্ষণ ফুটে ওঠে। চালের দাম আট টাকা থেকে সাড়ে পাঁচ টাকায় নেমে আসে, আলু দুই টাকা পাঁচ পয়সা থেকে দেড় টাকায় নেমে আসে। ঢাকা শহরে মধ্যবিত্তের ব্যয়সূচক ৪৫৮.৫ (জানুয়ারি) থেকে ৪১৬.৯ (এপ্রিল) এবং খাদ্যমূল্যসূচক একই সময়ে ৫৪৬.৩ থেকে ৪৫১.০তে হ্রাস পায়। আগস্ট মাসে অবস্থার আরো উন্নতি হয় ভালো আবহাওয়া ও ফসল ভালো হওয়ার কারণে। দ্রব্যমূল্য নামতে থাকে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই ১৫ আগস্ট সপরিবারে নিহত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ মুজিব শুধু সপরিবারেই নিহত হননি, তাঁর সঙ্গে হত্যা করা হয় তার বোনের স্বামী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও পরিবারকে, ভাগ্নে শেখ মণি ও পরিবারকে। বোঝা যায় প্রচণ্ড জিঘাংসা কাজ করেছিল, না হলে এরকম ঠাণ্ডা মাথায় এ ধরনের বর্বর কাজ করা যায় না এবং এ ধারণাও ছিল যে, ঐ পরিবারের কেউ বেঁচে থাকলে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসবেন। সে ধারণা যে ভুল ছিল না তা পরে প্রমাণিত হয়েছে। বিদেশে থাকায় শেখ মুজিবের দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শেখ হাসিনাই হয়ে ওঠেন আওয়ামী লীগের নেতা এবং এখন আবার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন সিভিল সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠায়।

পাঁচ

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড নিয়ে লেখালেখি হয়েছে প্রচুর। ১৫ আগস্ট থেকে জিয়াউর রহমানের উত্থান পর্যন্ত সময়কাল নিয়ে প্রবন্ধও কম লেখা হয়নি। অধিকাংশ গ্রন্থেই মূল উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাসের গ্রন্থ। এসব বই ও প্রবন্ধে পরপর বিরোধিতা প্রচুর, তবে মূল ঘটনাবলী একইভাবে বিবৃত হয়েছে। শেখ মুজিবের হত্যার জন্য তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়েছে মেজর ডালিমের স্ত্রীকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার অনুচরদের বিবাদকে, যার সুষ্ঠু বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন শেখ মুজিব। কিন্তু একটি বচসা কি এতবড়ো ঘটনার জন্ম দিতে পারে?

যেভাবে শেখ পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে তাতে এটি স্পষ্ট যে, এটি একটি দেশী ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র যার পরিকল্পনায় দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং সে ঝুঁকি সফল হয়েছিল। আওয়ামী লীগের একাংশ খোন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে এর সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রমাণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ৩ নভেম্বরে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক চারজন আওয়ামী ও জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হয় মোশতাকের আমলেই। মোশতাক ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সৌদি আরব, চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হয়। ফলে, এ হত্যাকাণ্ডে যে বিদেশী শক্তির হাত ছিল—এ তত্ত্ব একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শেখ মুজিবের পতনের জন্য 'বাকশাল' গঠনকে বেশি দায়ী করা হয়। কারণ, এর অভিঘাত ছিল প্রচণ্ড। এই অভিঘাতের পটভূমিকা বর্ণিত হয়েছে, তবু সংক্ষেপে বলা যায়, মওদুদের ভাষায়, যা অনেকটা যুক্তিযুক্ত—"শেখ মুজিবের গৃহীত পরিকল্পনা সাধারণ লোকের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী একটা অংশ এতে আতঙ্কিত বোধ করে। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবের ব্যাপক কর্মসূচিতে সমাজের প্রতিটি প্রভাবশালী শ্রেণীরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। গ্রামীণ নেতৃত্বের ধ্বজাধারী গ্রামীণ এলিট শ্রেণী, সমবায় ব্যবস্থাধীনে জমির মালিকানা হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, আমলারাও তাদের ওপর স্থাপিত একক রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিতে পারেননি। সেনাবাহিনীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাতীয় কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা হয় [এটি ঠিক মূল্যায়ন নয়]। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের অধঃস্তন করে তোলায় তা বিচারক এবং আইনজীবীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। সর্বোপরি আওয়ামী লীগ ও সেই দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও সাবেক দলীয় প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু ঘটায় নিদারুণ অস্বস্তির শিকার হন।"

সমাজের এই অংশ ক্রমেই চলে গিয়েছিল তাঁর বিপক্ষে এবং হত্যা পটভূমিকায় যুগিয়েছিল ইন্ধন। এ ছাড়া, 'বাকশাল' গঠিত হওয়ায় জনমানসে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করার জন্য যথেষ্ট সময়ও পাননি।

শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ করেছেন, দলটিকে গড়েছেন, কিন্তু দলীয় সংকীর্ণতার আলোকে সবসময় সবকিছু বিচার করেননি। করলে দূরদৃষ্টি থাকে না। দলে তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা কিন্তু কর্তৃত্ববাদ প্রবল হয়ে ওঠেনি তেমনভাবে। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের মধ্যে কর্তৃত্ববাদ প্রবল হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে অসহিষ্ণুতা, যে অসহিষ্ণুতার রেশ থেকে আওয়ামী লীগ এখনও পুরোপুরি মুক্তি পায়নি। বাঙালি কর্তৃত্ববাদ পছন্দ করেনি। এখনও করে না। বিএনপি শাসনামলে যা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিএনপি বা আওয়ামী লীগ থেকে এই কর্তৃত্ববাদ ও অসহিষ্ণুতার সংস্কৃতির বিনাশ না হলে রাজনীতি বা নেতা নেত্রীরা একটি পর্যায়ের ওপর আর উঠতে পারবেন না। কিন্তু ১৯৭২-৭৩-এর পূর্বে শেখ মুজিব এই অসহিষ্ণুতার সংস্কৃতি বিনাশ করতে পেরেছিলেন দেখেই তিনি দলকে এগিয়ে নিতে পেরেছেন, ইতিহাসে করে নিতে পেরেছেন নিজের স্থান।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, ষাটের দশকে শেখ মুজিব তরুণদের মন জয় করতে পেরেছেন। কারণ, তিনি তাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু, সেই তরুণদের তিনি আর '৭২ সালের পর ধরে রাখতে পারেননি। কেন পারছেন না সেটি তলিয়ে দেখার সময়ও ছিল না। বর্তমান আওয়ামী লীগও তরুণদের তেমন আকর্ষণ করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কারণ পূর্ব ইতিহাসের ওপর তাদের বেশি গুরুত্ব আরোপ। কি করেছি নয়, কি করব সেটিই এখন বিবেচ্য। তরুণদের স্বপ্ন দেখানো হয়তো তখনই সম্ভব যখন তাদের এবং বর্তমান সমস্যার সমাধান দেয়া হবে, নির্বাচনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রাখা হবে, দোদুল্যমানতা পরিহার করা হবে, সহিষ্ণুতার রাজনীতি বিকাশে সচেষ্ট থাকবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বিএনপি তরুণদের স্বপ্ন দেখাতে পেরেছে। গত দেড় দশকে গণমাধ্যমে, পাঠ্যপুস্তকে

মিথ্যাচারের মাঝে এবং পেশীশক্তির মাঝে তারা বড় হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের 'বোধ' নিয়ে আশা করা দুরাশা।

শেখ মুজিবের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বুঝেছিলেন যা তাঁর সোনার বাংলা গড়ার জন্য ছিল প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠান হতে পারে সংবিধান, নির্বাচন, ভোট, আমলাতন্ত্র, পার্লামেন্ট। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি এসবের কিছু সূচনা করেছিলেন যা সৃষ্টি করতে পারত সিভিল সমাজ আর বাংলাদেশতো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি সিভিল সমাজ গঠনের জন্যই। এই সিভিল সমাজ ভাঙার কাজটি শুরু করেছিলেন জে. জিয়া, যাতে সমাজে অস্ত্রধারীদের প্রভাব থাকে, জে. এরশাদ সে কাজটি করেছিলেন সম্পন্ন এবং এখনো তা থেকে আমরা মুক্ত নই এবং সে কারণেই আবার ফিরে আসছেন আলোচনায় বারবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আওয়ামী লীগ শাসনের অভিঘাত এখনও লোকে ভুলতে পারেনি দু'টি কারণে। প্রথমত, তখন সদ্য স্বাধীন দেশ, মানুষ দেশের জন্য কিছু করতে পাগল। অধিকাংশ মানুষের তখন সোনার বাংলা গড়ার আকাঙ্ক্ষা। ফলে ছোট কোনো ঘটনা, কোনো ভুল, বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল মানুষের মনে। রটনা হয়েছে যথেষ্ট; কিন্তু আওয়ামী লীগ তা মোকাবিলা করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের ছিল দেশজোড়া সংগঠন। তৃণমূল পর্যায়ে। ফলে মাস্তানি বলি আর কর্তৃত্বের অপব্যবহারের কথা বলি, তা পৌঁছেছিল গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত। যদি তা নাই হয় তাহলে মানুষ কেন নামেনি রাস্তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেদিন সপরিবারে নিহত হলেন শেখ মুজিব? এ হত্যাকাণ্ড তো একমাত্র তুলনীয় হতে পারে হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে শেখ মুজিবের হত্যার প্রায় দু-দশক পর মানুষ আবার অনুভব করেছে শেখ মুজিব কি ছিলেন। কেন তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পেয়েছিলেন। মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে, তিনি বাঙালিকে বড় করতে চেয়েছিলেন, আর মানুষকে বড় করার একটি পথ নিরস্ত্র মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া। তাঁর হত্যার পর কতদল ও কতজন শাসন করলো বাংলাদেশ কিন্তু মানুষের মন থেকেতো তাঁকে মোছা গেল না, যে চেষ্টা এখনো অব্যাহত। কারণ, আজ আমরা দেখছি, আমরা একবারই সে মর্যাদা পেয়েছিলাম, সে পথ একবারই উন্মুক্ত হয়েছিল আমাদের জন্য ১৯৭১ সালে, যখন শেখ মুজিবুর রহমান নামে একজন নিরস্ত্র বাঙালির নেতৃত্বে আমরা সব ধরনের সশস্ত্রদের হটিয়ে দিয়েছিলাম।

শেখ মুজিবের শত ত্রুটি, শত সমালোচনা সত্ত্বেও আমাদের বলতে হবে, যা লিখেছেন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিরোধী মওদুদ আহমদ—"শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচাইতে বড় ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর সমাধি রচিত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখ মুজিবের চাইতেও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তাঁর চাইতে বেশি অবদান রেখেছেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।" আজীবন তিনি বাঙালির স্বার্থে কাজ করেছেন এবং লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপস করেননি, যে কারণে বাঙালি ভালবেসে তাঁর নাম দিয়েছে 'বঙ্গবন্ধু', আবেগে 'জাতির পিতা' যদিও জাতির কোনো

জনক হয় না। আবহমান সাধারণ বাঙালির মতোই ছিল তাঁর জীবনচর্যা, যে কারণে সব সময় তাঁর যোগ ছিল প্রবল সাধারণ মানুষ, সম্প্রদায়ের সঙ্গে। যতই তিনি পরিবৃত হয়েছেন চাটুকার ও স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা, ততই এই সূত্র ছিন্ন হয়ে পড়ছিল এবং পরিস্থিতি অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। সাধারণ বাঙালির সব বৈশিষ্ট্যই তিনি ধারণ করেছিলেন, কিন্তু অসাধারণ ছিল তার মানুষ ও দেশের প্রতি ভালবাসা, যা ছিল অন্ধ। বলতেন তিনি, "আমার শক্তি এই যে, আমি মানুষকে ভালবাসি। আমার দুর্বলতা এই যে, আমি তাদের খুব ভালবাসি।"
যখন তিনি রাষ্ট্রপতি হন, 'বাকশাল' গঠন করেন, তখনও কিন্তু এই ধারণাই তাঁর মনে কাজ করেছে যে তিনি দেশের স্বার্থে, জনের স্বার্থে কাজ করছেন। এটি শুধু অনুধাবন করতে পারেননি যে, এক যুদ্ধ বাংলাদেশকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে, মন মানসিকতাকে পাল্টে দিয়েছে যা পাল্টাতে হয়তো লাগত দীর্ঘ সময়। হয়তো মুক্তিযুদ্ধের সময়টাতে তাঁর অনুপস্থিতিই এর কারণ। প্রাক—১৯৭১ এবং ১৯৭১-৭৫-এর ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলাদেশের সিভিল সমাজে শেখ মুজিবের অবস্থান কোথায় আর অন্যান্য কারকদের অবস্থান কোথায়। তাঁকে বাদ দিয়ে প্রাক ও উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা অসম্ভব। এ শতাব্দীতে দু-জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম বাঙালির জনমানসে ভাস্বর হয়ে থাকবে। একজন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন বাংলাভাষাকে রূপ দিয়েছিলেন, যাঁর গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত; অন্যজন বাঙালির অনেক বছরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন, সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন এ জাতির জন্য স্বাধীন এক ভূখণ্ডের, যার নাম বাংলাদেশ। এ জন্য আমি গর্বিত, আমার উত্তরসূরিও হবে গর্বিত। বাঙালি ও বাংলাদেশ নামটিই বেঁচে থাকবে সে জন্য। আর এ কারণেই অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন—

"যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরি যমুনা বহমান।
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

১৭ মার্চ ১৯৯৪

মার্চ এলেই স্বপ্নেরা হানা দেয়। আমি, আমার বন্ধুরা প্রতি বছর এ মাসেই ১৯৭১-এর মার্চে ফিরে যাই। ১৯৭১-এর পর আমাদের বয়সের সঙ্গে যোগ হয়েছে আরো পঁচিশ বছর, তরুণ যুবা পরিণত হয়েছি মধ্যবয়সীতে, কিন্তু মার্চ এলেই মনে হয় ফিরে গেলাম ১৯৭১-এর সেই মার্চে। মার্চ এলেই আমি স্মৃতি জাগরুক করতে চাই, যে স্মৃতিকে গত দুদশক শাসকরা মুছে দিতে চেয়েছে। দুশাসনের মূল স্ট্র্যাটেজিই হলো স্মৃতি মুছে দেয়া।

মার্চ আমাদের জন্য স্বপ্ন দেখারও মাস। এ মাসেই আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম ভবিষ্যতের, ভবিষ্যত জয়ের। আর এই মার্চের অনেক ঘটনাবলি থেকেই শক্তি আহরণের চেষ্টা করি বর্তমানকে বুঝবার জন্য। স্মৃতি জাগরুক রাখি আর দেখি, বর্তমানের প্রতিবন্ধকতা কিছুই নয়, আমরা এগোচ্ছি জয়ের দিকে।

১ লা মার্চ ১৯৭১। ঢাকা স্টেডিয়ামে খেলা চলছে বি.সি.সি.পি ও আন্তর্জাতিক একাদশের। ক্রিকেট খেলা। স্টেডিয়াম প্রায় ভর্তি। চাপা টেনশান থাকলেও শহর শান্ত। বেলা একটার সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতার ভাষণ দিলেন যার মূল কথা ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত। বেতার ভাষণটি শেষ হতে না হতেই পুরো শহরটি বদলে যেতে লাগলো। যেন আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠছে শহর। 'ইত্তেফাক' থেকে আমরা কয়জন বেরিয়েছি রাস্তায়। এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে ছোট ছোট মিছিল, যাচ্ছে গুলিস্তান, পল্টন। পূর্বাণী হোটেলের সামনে মিছিল আর শ্লোগান 'জয় বাংলা', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'জয় বাংলা' ... ।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ পণ্ড। খেলোয়াড়রা দৌড়ে আশ্রয় নিয়েছে ড্রেসিং রুমে। স্টেডিয়ামের কোথাও কোথাও জ্বলছে আগুন। সব মানুষ যেন রাস্তায়। হোটেল পূর্বাণীর সামনে লোকে লোকারণ্য। বিকেল তিনটায় সেখানে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক। বঙ্গবন্ধু, ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত হতে বলে দুদিনের কর্মসূচি দিলেন আর বললেন ৭ই মার্চ হবে জনসভা। সেখানে তিনি তাঁর বক্তব্য দেবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বি.এন.পি-এর স্থপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, "১লা মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন।"

১লা থেকে ৭ই মার্চ প্রতিদিন কিছু না কিছু ঘটতে থাকে ঢাকা শহরে, সারা দেশে। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ২রা মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-জনতার সামনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ আর গগনবিদারী শ্লোগান—'জয় বাংলা', 'জ ... য় ... বা ... ং ... লা'। সন্ধ্যায় জারি করা হয় কার্ফু। মানুষ বলে 'জয় বাংলা' আর রাস্তায় নামে, মানুষ বলে, 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা-যমুনা', আর কার্ফু ভাঙ্গে, মানুষ বলে 'জয় বাংলা' আর গুলি খায় আবারও বলে 'জয় বাংলা', আবারও গুলি খায়। হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে আর গভীর রাতে শেখ

মুজিব এক বিবৃতিতে বলেন, "বাংলাদেশে আগুন জ্বালাবেন না। যদি জ্বালান, সে দাবানল হতে আপনারাও রেহাই পাবেন না। ... সাবধান, শক্তি দিয়ে জনগণের মোকাবেলা করবেন না।"

একাত্তরের তেসরা মার্চ, আগের রাতের শহীদদের নিয়ে মিছিল বের হয়। পল্টনে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, "গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রণীত এক শাসনতন্ত্র যদি না চান তাহলে আপনাদের শাসনতন্ত্র আপনারা রচনা করুন। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আমরাই রচনা করবো।" "জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'জয় বাংলা', ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে পল্টনের চারদিক।

শেখ মুজিব বললেন, "বাংলার মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয় রাষ্ট্র চালানোর জন্য, গুলি খাওয়ার জন্য নয়। গরিব বাঙালির টাকায় কেনা বুলেটের ঘায়ে কাপুরুষের মতো গণহত্যার বদলে অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিন। ... ২৩ বছর ধরে রক্ত দিয়ে আসছি। প্রয়োজনে আবার বুকের রক্ত দেবো। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বীর শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করবো না।" বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন—"ভায়েরা আবার আমি বলছি, আমি থাকি আর না থাকি, আমার সহকর্মীরা আছেন। তাঁরাই নেতৃত্ব দেবেন। আর যদি কেউ না থাকে, তবু আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি বাঙালিকে নেতা হয়ে নির্ভয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।" চারদিক থেকে গগনবিদারী গর্জন শোনা যায় 'জয় বাংলা', 'জয় বাংলা'।

রাতে সারা দেশে মানুষ কার্ফু ভেঙে নেমে আসে রাস্তায় আর বলে 'জয় বাংলা', খালি বলে 'জয় বাংলা'। ৭৫ জন লাশ হয়ে পড়ে থাকে রাস্তায়, অগণিত কাতরাতে থাকে গুলি খেয়ে—তবুও বলে 'জয় বাংলা'।

৭ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ শুধু চিৎকার করে বলছে 'জয় বাংলা'। তার বদলে পেয়েছে গুলি। আমরা ভাবছি কি বলবেন শেখ মুজিব? তিনি কি বলবেন, বাংলাদেশ হয়ে গেছে স্বাধীন? কিন্তু বলার আর বাকি কি? বরং তিনি যদি না বলেন, তাঁকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে মানুষ। ইতোমধ্যে উত্তোলিত হয়েছে স্বাধীন বাংলার পতাকা আর বাংলাদেশ ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে সেই গগনবিদারী আওয়াজে—'জয় বাংলা! জয় বাংলা'!

ড. কামাল হোসেন লিখেছেন, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কি বলবেন তা ঠিক করার জন্য ৬ই মার্চ বসলো আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সভা।

"সারা দেশে প্রত্যাশা দেখা দিয়েছিল যে, ৭ই মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। বস্তুত ছাত্র ও যুব সমাজ এ ধরনের ঘোষণার প্রবল পক্ষপাতী ছিল। ৭ই মার্চ নাগাদ দলীয় সদস্যদের মধ্যে সামান্যই সন্দেহ ছিল যে, ছাত্র সমাজ, যুব সম্প্রদায় এবং রাজনীতি সচেতন ব্যাপক জনগণের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে কম কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না।"

সুতরাং দল ও দলীয় নেতা শেখ মুজিবের ওপর দায়িত্ব এসে পড়েছিল এমন কিছু না বলা, যা পাকিস্তানি পক্ষকে তখনই অজুহাত দেবে অপ্রস্তুত জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। আবার একই সঙ্গে চাঙ্গা রাখতে হবে আন্দোলন ও জনগণকে। এ ভারসাম্য বজায় রাখা নিতান্ত সহজ ছিল না। এ ছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে তখনও তাঁকে কাজ করতে

হচ্ছিলো পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে যেখানে তাঁর অবস্থান ছিল সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। এখন আমাদের কাছে ব্যাপারটি যত সহজ মনে হচ্ছে তখন নিশ্চয় তা ছিল না। এ ছাড়া ছিল তরুণ বিশেষ করে ছাত্রদের প্রবল চাপ। তারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে ফেলেছেন। আন্দোলনের তারাই ছিল মূল চালিকা শক্তি। তাদের বিরূপ করা সম্ভব ছিল না।

৬ই মার্চ আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটিতে আলোচনার পর, লিখেছেন, ড. কামাল হোসেন, "বিবেচনা করে দেখা হলো যে, যদি আন্দোলনের জোয়ার ধরে রাখা এবং জনগণের ঐক্য জোরদার করা যায়, তাহলে ইয়াহিয়া ও সামরিক জান্তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবেই যে, পর দিন খোলাখুলি স্বাধীনতা ঘোষণার অবস্থান নেয়া হবে না। ইয়াহিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরা হবে এবং ঐ সব দাবির সমর্থনে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।"

৭ই মার্চ দুপুর থেকে ঢাকা শহর এগুতে থাকে রমনা রেসকোর্সের দিকে। মনে আছে, রেসকোর্সের এক কোণে আমি, কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা ও রফিক নওশাদ বিক্রি করছি সারা রাত ধরে ছাপা লেখকদের মুখপত্র 'প্রতিরোধ' যার হেডলাইন আপোষের প্রস্তাব আগুনে জ্বালিয়ে দাও এরকম একটা কিছু। পরে ৭ মার্চ সম্পর্কিত বি.বি.সির ভিডিও দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এত মানুষ! যেন পুরো ঢাকা শহর জমায়েত হয়েছে রেসকোর্সে। রেসকোর্সের একদিকে শ্লোগান—'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', তো অন্য দিকে—'পাঞ্জাব না বাংলা—বাংলা, বাংলা। হয়তো মাঝখানে 'তোমার আমার ঠিকানা—পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। তো অন্য কোথাও—'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।' মঞ্চের সামনে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' কিন্তু যখনই কেউ বলে ওঠে, 'জয় বাংলা' তখনই নদীর ঢেউয়ের মতো সেই ধ্বনি ছড়িয়ে যেতে থাকে আর চারদিক কাঁপিয়ে সেই অমোঘ শব্দটি উচ্চারিত হয়—'জয় বাংলা'।

দুপুর তিনটার মধ্যে লোকে লোকারণ্য। রেডিও পাকিস্তান ও পাকিস্তান টেলিভিশন এখনকার মত তখনও ছিল সরকারি। শেখ মুজিব জেনেশুনেই বলেছিলেন—"মনে রাখবে রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনেন তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না।"

রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচারের বন্দোবস্ত করলো। পাকিস্তানি সেনা অফিসার সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, "রেডিওর ঘোষকরা আগে থেকেই রেসকোর্স থেকে ইস্পাত দৃঢ় লক্ষ দর্শকের নজির বিহীন উদ্দীপনার কথা প্রচার করতে শুরু করলো।" সালিক আরো লিখেছেন, এই ব্যাপারে সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর হস্তক্ষেপ করে এই বাজে ব্যাপারটি বন্ধের নির্দেশ দিল। সালিকও তা রেডিও কর্তৃপক্ষকে জানালেন। আদেশটি শুনে টেলিফোনের অপর প্রান্তে বাঙালি অফিসারটি বললেন, "আমরা যদি সাড়ে সাত কোটি জনগণের কণ্ঠ প্রচার করতে না পারি তাহলে আমরা কাজই করবো না। এই কথার সাথে সাথে বেতার কেন্দ্র নীরব হয়ে গেল।" বাঙালি সে সময় এ ধরনের সাহস দেখানোর ক্ষমতা দেখিয়েছিল। কারণ, তারা শেখ মুজিবের ওপর এই বিশ্বাস স্থাপন

করেছিল যে তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না। রেডিওতে ভাষণটি অবশেষে প্রচারিত হয়েছিল।

শেখ মুজিব এসে মঞ্চে উঠলেন। সারা রেসকোর্স কাঁপিয়ে ঝড়ো হাওয়ার মত সেই শব্দটি বয়ে গেলো—'জয় বাংলা!'

মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম বীরোত্তম লিখেছেন, "কি যে মধুমাখা ছিল এই শ্লোগানে! এর ইন্দ্রজালিক শক্তির পরিধি নিরূপণের ক্ষমতা বুঝি কারো নেই" গণ অভ্যুত্থানের সময় এবং যুদ্ধকালে এ শ্লোগান বাঙালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। জীবন বাজি রেখে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এই উক্তি যে উদ্দীপনা যোগাতো তার তুলনা নেই। তাই 'জয় বাংলা' জয় ধ্বনি আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ঐ দিনের রেসকোর্সের জনসভার একটি চিত্র ও মানুষের আবেগের পরিচয় পাওয়া যায় রশীদ হায়দারের একটি বিবরণে। বিবরণটি খানিকটা দীর্ঘ কিন্তু যারা ৭ই মার্চ দেখেনি তাদের বোঝার জন্য এটি প্রয়োজন।

"লাল সূর্যের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত গাঢ় সবুজ রঙের পতাকা হাতে হাতে উড়ছে হাজারে হাজারে, বড় পতাকাটি উড়ছে বঙ্গবন্ধু যেখানে ভাষণ দেবেন ঠিক তার ওপরে ...।

এই সভায় অসংখ্য মহিলা এসেছেন বাঁশের লাঠি নিয়ে, বহুলোক এসেছেন তীর ধনুক নিয়ে, যেন যুদ্ধ আসন্ন। মানুষ কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে—সে সময়ে প্ল্যান্ট প্রটেকশনের একটি বিমান জনসভার বেশ ওপর দিয়ে উড়ে যায়; লোক ওটাতেই শত্রু সৈন্য আছে ভেবে কেউ কেউ লাঠি ছুঁড়ে মারে; কারও কারও অনুমান ওটাতে টিক্কা খান আছেন। ...

দেখা গেল মেয়েদের ভিড়ে একজন অশিক্ষিত মেয়ে মনোয়ারা বিবি নিজের রচিত গান গাইছে ঃ 'মরি, হায়রে হায়। দুঃখের সীমা নাই। সোনার বাংলা শ্মশান হইল পরান ফাইডা যায়।' দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালি গানও শোনায় মনোয়ারা বিবি, দেখা যায় গত কয়েক দিনের দুঃখজনক ঘটনা সম্বলিত হাতে লেখা পত্রিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলেজের ছাত্র সৈয়দ আজিজুল হক, দেখা গেল বাপের কাঁধে দুই-তিন বছরের শিশু বিশাল জনসমাবেশ দেখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।"

বঙ্গবন্ধু মঞ্চে ওঠেন। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর কালো মুজিব কোট পরনে। আমরা যারা টি.এস.সির মোড়ে তারা দূর থেকে ঝাপসা একটি অবয়ব দেখি। সভায় কোন আনুষ্ঠানিকতা নেই। কালো ভারি ফ্রেমের চশমাটি খুলে রাখলেন ঢালু টেবিলের ওপর। শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "ভায়েরা আমার! আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন, সবই বোঝেন।"

উনিশ মিনিটের ভাষণ, লিখিত নয়। কিন্তু একবারও যমকাতে হয়নি। পরে বি.বি.সির ভিডিওতে ক্লোজ আপে দেখেছি আবেগে কাঁপছে তাঁর মুখ, কিন্তু সমস্ত অবয়বে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। বোঝা যায় তিনি পিছোবেন না।

৭ই মার্চ যিনি রেসকোর্সে ছিলেন না, তাঁকে বোঝানো যাবে না ৭ই মার্চ কি ছিল বাংলাদেশের জন্য। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ বাঙালি মাত্র-ই জানেন। এই ভাষণের প্রতিটি উক্তিই উদ্ধৃতিযোগ্য। কিন্তু, মূল বক্তব্যটি ছিল—"আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো

না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। সবশেষে বললেন, যা শোনার জন্য উন্মুখ ছিল বাংলাদেশ—"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

কঠিন সংকটে এত ভারসাম্যপূর্ণ অথচ আবেগময় বক্তৃতার সংখ্যা বিরল। কি ভাবে তিনি তা পেরেছিলেন আজ ভাবলে অবাক লাগে। পাকিস্তানি সৈনিক সিদ্দিক সালিক লিখেছেন—

"বক্তৃতার শেষ দিকে তিনি জনতাকে শান্ত এবং অহিংস থাকার উপদেশ দিলেন। যে জনতা সাগরের ঢেউয়ের মতো প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে রেসকোর্সে ভেঙে পড়েছিল—ভাটার টান ধরা জোয়ারের মত তারা ঘরে ফিরে চললো। তাদেরকে ধর্মীয় কোন জনসমাবেশে তথা মসজিদ কিংবা গির্জা থেকে ফিরে আসা জনতার ঢলের মতই দেখাচ্ছিল এবং ফিরে আসছে তারা সন্তুষ্টচিত্তে—ঐশীবাণী বুকে ধরে। তাদের ভেতরকার সেই আগুন যেন থিতিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে সেই আগুনকে ধাবিত করা যেত। আমাদের অনেকেরই আশঙ্কা ছিল এরকমই। এই বক্তৃতা সামরিক আইন সদর দফতরে স্বস্তির বাতাস বইয়ে দিল। সদর দফতর থেকে টেলিফোনে কথোপকথনকালে একজন উর্ধ্বপদস্থ কর্মকর্তা জানান যে, এখন সামরিক আইন প্রশাসক বলেছেন, এই পরিস্থিতিতে এটাই সবচেয়ে উত্তম ভাষণ।"

অনেকে হতাশও হয়েছিলেন। যেমন, তৎকালীন কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির সদস্য রাশেদ খান মেনন, ড. মোহাম্মদ হান্নানকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আন্ডার গ্রাউন্ড অবস্থায় থেকেও আমরা এদিন রেসকোর্সের জনসভায় শেখ মুজিবের ভাষণ শুনতে গিয়েছিলাম। সারা শহরে রটে গিয়েছিল যে, শেখ মুজিব আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন এবং বড় ধরনের একটা ঘটনা আজ ঘটবে। কিন্তু আমরা হতাশ হয়ে ফিরে আসি।"

তবে, এ ধরনের হতাশ হওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল কম। কম বেশি সবাই খুশি হয়েছিলেন। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এরকম—সামরিক জান্তা যদি দাবি মেনে নেয় ভাল। না হলে, আমরা স্বাধীন হয়ে যাবো। এর কোন বিকল্প নেই। মানসিকভাবে স্বাধীনতার জন্য মানুষ প্রস্তুত হওয়ার সময় পেয়েছিল। চারদিকে প্রস্তুতিমূলক তৎপরতা শুরু হয়েছিল। আন্দোলনে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি এবং এই ভাষণ বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বি.এন.পির স্বপ্ন দ্রষ্টা জিয়াউর রহমান লিখেছিলেন "৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক 'গ্রীন সিগন্যাল' বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালি ও পাকিস্তানি সৈনিকদের মাঝে উত্তেজনা ক্রমেই চরমে ওঠেছিল।"

মঈদুল হাসান লিখেছেন, "সম্ভবত তিন সপ্তাহাধিক কালের অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে বাংলার সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনায় এমন এক মৌল রূপান্তর ঘটে যে পাকিস্তানীদের নৃশংস গণহত্যা শুরুর সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতাই তাদের জন্য অভিন্ন ও একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। পাকিস্তানী আক্রমণের সাথে সাথে অধিকাংশ মানুষের কাছে শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ঘোষণা হয়ে ওঠে এক অভ্রান্ত পথনির্দেশ।"

এ ভাষণের পর শুধু ঢাকা শহর নয়, পুরো দেশটি বদলে যায়। বাষ্পেভরা পাত্রের মতো টগবগ করতে থাকে ৭ কোটি মানুষ। জোরদার হয়ে ওঠে অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। শেখ মুজিবের নির্দেশই হয়ে ওঠে সরকারি নির্দেশ। মানুষ তা মানতে থাকে। এমনকি সরকারি প্রশাসনও। লিখেছেন ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, "১৯৭১-এর মার্চ মাসের অসহযোগ প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো প্রত্যাখান। পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিরোধের সূত্রপাত। শেখ মুজিবুর রহমান একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিরোধকে একটি রাষ্ট্র গঠনে বদলে দেন। একপক্ষে অসহযোগের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো প্রত্যাখ্যান। অন্যপক্ষে অসহযোগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রবর্তনের সম্ভাবনা জনমনে সত্য করে তোলা, এই রণকৌশল শেখ মুজিবুর রহমান ৩৫টি নির্দেশের মধ্যে দিয়ে বাস্তব করে তোলেন।" তিনি আরো লিখেছেন—"এই বিভিন্ন নির্দেশের মধ্যে দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রের উদ্ভবের ভিত্তি তৈরি করে দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নীতিমালার নির্দেশ দেন। এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে জনসাধারণ, এই কর্তৃত্বের স্বরূপ সিভিল এবং সিভিল কর্তৃত্বের অন্তর্গত পুলিশ এবং মিলিটারি। শেখ মুজিবুর রহমান এভাবেই বঙ্গবন্ধু এবং জাতির জনকে রূপান্তরিত হয়ে যান। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা এ ক্ষেত্রেই।"

এ ভাবেই সৃষ্টি হয় একটি সমান্তরাল রাষ্ট্রের। সেদিক বিচার করলে ২৫ই মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল একটি ফর্মাল ডিক্লারেশন মাত্র। আসলে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের পত্তন হয় ৭ই মার্চ। মহাত্মা গান্ধীও এতো স্বল্প সময়ে এতো পরিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন করতে পারেন নি। যারা পিছিয়ে ছিল এতোদিন, ভুগছিলো দোদুল্যময়তায়, তারাও এগিয়ে আসতে থাকে। কি জানি কাঁরাভা যদি তাদের ফেলে এগিয়ে যায়। এভাবেই বাংলাদেশ এগুতে থাকে ২৫শে মার্চের দিকে। ঐ যে সেদিন শেখ মুজিব আঙ্গুল তুলে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বাঙালি তা মেনে চলে গিয়েছিল। পরাধীন পাকিস্তানে আর তারা ফিরে আসে নি।

১৯৯৬

চব্বিশে মার্চ ভাবিনি এমন ভয়ানক কিছু একটা হবে। আমরা নিশ্চিত যে, আমরা স্বাধীন হবো। শুধু সময়ের ব্যাপার। তবে, এ কারণে হয়ত কিছু হাঙ্গামা হতে পারে, মৃত্যুও হতে পারে দু এক জনের। কিন্তু এ কারণে, অগণিত লোক প্রাণ হারাবে এ কথা কল্পনা করিনি।

আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পঁচিশে মার্চের আগে একটা বছর, একটা বছর বলি কেন, ১৯৬৯ থেকেই অধিকাংশ সময় কেটেছে মিটিং মিছিলে। সাতই মার্চে রেসকোর্সের জনসভায় আমাদের উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। মনে আছে, ঐ দিন কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা ও আমি লেখকদের মুখপত্র হিসেবে একটি পত্রিকা বিক্রি করছিলাম, যার মূল কথা ছিল স্বাধীনতা। সাতই মার্চ শেখ সাহেব যেন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, সেজন্য তাঁর ওপর প্রচণ্ড চাপ ছিল। তাঁর বক্তৃতা শুনে আমরা খুশি হয়েছিলাম। কারণ, তাঁর বক্তৃতা একই সঙ্গে ছিল স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান। আজ সাতই মার্চ নিয়ে কতো বিতর্ক! তখন কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে, এখন তা শুধু কার্যকর করা বাকি। এ বক্তৃতাকে আমরা তখন লিংকনের গেটিসবার্গ বক্তৃতার সঙ্গে তুলনা করেছি। উল্লেখ্য যে, আমাদের অনেকেই ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না।

সাতই মার্চ থেকে চব্বিশে মার্চ কি গেছে তা এখন আর মনে নেই। মনে আছে চব্বিশে মার্চ, আমি আর শাহরিয়ার কবির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি সারাদিন। সারা শহরে উত্তেজনা। সন্ধ্যার দিকে বাসে করে রওয়ানা হয়েছি বাসার দিকে। আমি তখন থাকতাম আমার বড় চাচা ড. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের সঙ্গে পল্লবীতে। মিরপুরের পল্লবী তখন ঢাকা ছাড়িয়ে বহুদূরে, নির্জন সুন্দর এক এলাকা। গভীর রাতে ঘুম ভাঙলো টেলিফোনের আওয়াজে। চাচা এসে বললেন, আহমদ ছফা টেলিফোন করেছিলেন। শহরে প্রচণ্ড গণ্ডগোল হচ্ছে। গুলি চলছে। ফোনের লাইন কেটে গেছে তাই বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। ছফা ভাই ছিলেন চাচার ছাত্র। তখন লেখক শিল্পীদের একত্রিত করার কাজে প্রচুর সময় দিচ্ছেন। থাকতেন সেগুন বাগিচার তৎকালীন লেখক সংঘের অফিসে। আমরা ছাদে উঠলাম। পূর্ব ও পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে গেছে আগুনের আভায়। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে গোলাগুলির আওয়াজ। আগুনের লেলিহান শিখা শুধু পূর্বে পশ্চিমে নয়, দূরে বিভিন্ন জায়গায় লকলক করে উঠছে। কিন্তু, ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা তখনও আঁচ করতে পারিনি।

আমাদের পাড়াটি ছিল বিহারি ও বাঙালিদের মিশ্র পাড়া। সকালে, বিভিন্ন জনের কাছ থেকে জানা গেল যে, ঢাকায় গণ্ডগোল হচ্ছে, কার্ফু জারি করা হয়েছে। আমরা আসলে ঢাকার খবর থেকে তখন ব্যস্ত মিরপুরের খবরে। কারণ, খবর পাওয়া গেল বিহারিরা দাঙ্গা শুরু করেছে।

বিহারি বাঙালি টেনশন যে মিরপুরে পঁচিশে মার্চের আগে ছিল না তা নয়, ছিল তবে চাপা। বিহারিরা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। এ ছাড়া একাত্তরের আগে দুদশকে বিহারিরা-বাঙালি কাউকে বন্ধু হিসেবেও মেনে নেয় নি। পল্লবীর সামনে সদর রাস্তার ওপর তখন ফাঁকা। সেখানে ছিল থানা। ছাব্বিশে মার্চ সকালে দেখলাম, কয়েকজন পুলিশ গুলি করার ভঙ্গিতে মাঠে ছড়িয়ে আছেন। উল্টোদিকে বিহারিদের একটি দল। দাঙ্গা শুরু হয়েছে। পুলিশ তাদের হটানোর চেষ্টা করছে।

পল্লবী তখনও নিরাপদ। দুপুরের মধ্যে পুলিশরা হঠাৎ নাই হয় গেল। আমরা পল্লবীতে আটক, টেলিফোন লাইন অচল, ফলে কোন খোঁজ পাচ্ছি না। দুপুরে রেডিওতে কলকাতা ধরলাম। ঢাকার খানিকটা খবর পাওয়া গেল। খুব সম্ভব বলা হয়েছিলো, পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কিন্তু এ খবরে কিছুই স্পষ্ট হলো না। খবর শেষে রেডিওতে শোনা গেল—"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ... '। মনে আছে, বহুদিন পর সেদিন প্রথমবারের মতো চোখ ভরে উঠেছিলো পানিতে। বিকেলে দেখলাম, দু একজন ভীত সন্ত্রস্ত বাঙালি, একা বা পরিবার নিয়ে পল্লবীর ভেতর দিয়ে পিছনের গ্রামে চলে যাচ্ছেন। সেখান থেকে তুরাগ নদী ধরে এ এলাকার বাইরে চলে যাবেন। টুকরো টুকরো খবর জোড়া দিয়ে যা জানা গেলো তা হলো—বিহারিরা মিরপুরে বাঙালিদের ঘর-বাড়ি আক্রমণ করছে, লুট করছে, হত্যা করছে। একটি সাত আট বছরের ছেলে নিস্পৃহভাবে বললো, তার বাবা-মাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে। ঘটনার প্রচণ্ডতায় তার বোধ হয় আর কোন বোধ ছিল না। বিকেল মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় আমাদের ঘিরে ধরলো।

খুব সম্ভব উনত্রিশে মার্চ পর্যন্ত আমরা পল্লবীতে আটকে ছিলাম। ঢাকা, বাংলাদেশের কোন খবরই আমরা পাইনি। বিহারিরা বাঙালিদের একেকটি পাড়া লুট করে এগোচ্ছে। রাতে মিলিটারি টহল দিচ্ছে। কয়েকটি বাঙালি পরিবার তখন একত্র হয়ে ঠিক করলো পাড়ার তিন তলা বাড়িটা (বাঙালির) নিরাপদ। বাড়ির মালিকের পরামর্শে আশেপাশের বাসার মহিলা ও শিশুরা রাতে সেখানে চলে যেতেন। পুরুষরা থাকতেন বাসায়। রাতে আমি আর আমার চাচা ছাদে ওঠে চারদিকে বিপদ আঁচ করার চেষ্টা করতাম। প্রায় প্রতিরাতেই দেখতাম, এখানে সেখানে আগুনের শিখা লক লক করে উঠছে। রাস্তায় বুটের আওয়াজ পেলেই আমরা ছাদে শুয়ে পড়তাম।

সাতাশ তারিখের দিকে খুব সম্ভব বিহারী দাঙ্গাবাজরা এলো পল্লবীতে। আশপাশের প্রতিবেশীরা কিছু বাঙালিকে বাঁচালেন। মাথায় আমরা রুমাল বেঁধে নিলাম। এটি ছিল বিহারিত্বের চিহ্ন। যে যে বাড়ি আক্রমণ করা হবে না সেগুলোতে এক দল 'X' চিহ্ন দিয়ে গেলো। পাশের বাড়ির বিহারি ভদ্রলোক আমাদের আশ্রয় দিলেন। একজন বাঙালিকে দেখলাম চার পাঁচ জন বিহারী পল্লবীর ভেতরে নিয়ে এলো। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো। একজন লোহার শিক দিয়ে তার চোখ দুটি গেলে ফেললো। তারপর তার মৃতদেহ ম্যানহোলে ফেলে দেয়া হলো। স্বাধীনতার পর সেখানে জুতো পরা একটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিলো।

খাদ্যাভাব দেখা দিলো পল্লবীতে। কিন্তু অহরহ উদ্যত ছুরির মুখে থাকা যে কি ভয়ানক তা এখন আর বোঝানো সম্ভব নয়। পরদিন দঙ্গলে দঙ্গলে বিহারিরা ঘিরে ফেললো পল্লবী।

বিহারী প্রতিবেশীর বাড়িতে আমরা সাত আটটি পরিবার আশ্রয় নিয়েছি। দু তিনজন বিহারী ভদ্রলোক মাথায় রুমাল বেঁধে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন আর বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে। তাদের দাবি এখানে বাঙালি আছে তাদের বের করে দিতে হবে। এরা বলছেন কেউ নেই। একটি ঘরে আশ্রয় নেয়া আমাদের জন বিশেকের মুখে কথা নেই। একটি শিশু কেঁদে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মা মুখে চেপে ধরলেন। ঠিক যেন জহির রায়হানের 'লেট দেয়ার বি লাইটে'র দৃশ্য।

দুপুরের পর দাঙ্গাকারীরা চলে গেলো। যে কয়জন বিহারী প্রতিবেশী আশ্রয় দিয়েছিলেন তারা বললেন, আর বোধ হয় আমাদের রক্ষা করা যাবে না। কয়েকটি পরিবার বিকেলেই পেছনের গ্রামের দিকে চলে গেলেন।

উনত্রিশ কি ত্রিশে মার্চ সকালে বাঙালি সেনাঅফিসার গাড়ি নিয়ে এলেন তার বোনের খোঁজ নিতে পল্লবীতে। ইউনিফর্ম পরা ছিল তার। জানা গেল, ঐ দিনই মিরপুরের রাস্তা খোলা হয়েছে। তিনি তার বোনকে নিতে এসেছেন। যে কয়টি পরিবারের গাড়ি ছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে নিলো। বাড়ি-ঘর তালাবদ্ধ করে সেই ভদ্রলোকের গাড়ির পিছু পিছু আমরা রওয়ানা হলাম।

আমার চাচার ছিল ছোট একটি ফিয়াট গাড়ি। তাতে আমরা নিত্য ব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে রওয়ানা হলাম। এগারো থেকে এক নম্বর পর্যন্ত, অনেক বাড়ি-ঘর, দরজা-জানালা খোলা, ভাঙ্গা, মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে পড়ে আছে লাশ, রাস্তায় দু একজন লোক। আমরা উদ্বিগ্ন, আটকে দেবে না তো গাড়ি? মিরপুর ছাড়িয়ে কল্যাণপুর পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এরপর দশ বছর আমি আর মিরপুর যাইনি।

কল্যাণপুর থেকে যতই ঢাকার দিকে এগোতে লাগলাম ততোই ঘটনার ভয়াবহতা অনুধাবন করলাম। লোকজন ভয়ার্ত মুখে ছোটাছুটি করছে। এক মহিলা প্রায় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে গাড়ি থামালেন। সন্তান সম্ভবা, চুল এলোমেলো, গালে অশ্রুর দাগ। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তার স্বামীর খোঁজ পাচ্ছেন না কয়েকদিন। আমরা কি গাড়িতে তাকে খানিকটা এগিয়ে দেবো শহরের দিকে কারণ তিনি হাঁটতে পারছেন না। গাড়িতে জায়গা নেই। তবুও কোলে করে প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় তাকে আমরা এগিয়ে দিলাম। আমরা আশ্রয় নিলাম সোবহানবাগে এক আত্মীয়ের বাসায়।

এর দু দিন পরই শাহরিয়ার ঠিকানা খুঁজে হাজির। কিভাবে সে ঠিকানা পেয়েছিলো জানিনা। জানালো, আমরা যেদিন মিরপুর ছাড়লাম সেদিনই সে আমার খোঁজে গিয়েছিলো মিরপুর। সশস্ত্র বিহারিরা তখনও সেখানে ঘুরছে। পল্লবীর অধিকাংশ বাড়ি পরিত্যক্ত। অনেক বাড়িতে এখনও বাগান ভরা ফুল। তার কাছ থেকে পঁচিশে মার্চ থেকে ত্রিশে মার্চ কি হয়েছিলো জানলাম। তারপর আমরা দুজন বেরুলাম। নিউমার্কেট, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘুরে, বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ করার চেষ্টা করলাম। কারোই হদিশ পাওয়া গেল না। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আমি ছিলাম ঢাকা শহরে। সে সময়কার অবরুদ্ধ শহরের চিত্র অনেকেই তুলে ধরেছেন। আজ এতো বছর পরও যখন ঐ সময়ের কথা ভাবি তখন অবাক হয়ে যাই। কিভাবে আমরা বেঁচেছিলাম তখন! রাস্তায় রাস্তায় হিংস্র হানাদার বাহিনীর টহল। হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো মিলিশিয়া যাদের পরনে থাকতো ঢোলা

পাজামা, কামিজ বা ফুলহাতা শার্ট। আজও অনেক বাঙালি যখন ঐ পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায় তখন মনে হয় ৭১ ফিরে এলো নাকি? ছিল অবাঙালিরা আর হানাদার বাহিনীর দোসর বাঙালিরা। মনে হত পদে পদে শত্রু। এরা ছাড়া বাকি সবাই ছিল স্বাধীনতার পক্ষে।

ঐ সময় আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে স্বাধীন বাংলা বেতার, জয়বাংলা ধ্বনি ও গেরিলারা। মনে আছে, লোক মুখে আমরা শুনলাম, স্বাধীনবাংলা বেতার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ট্রানজিস্টরে তা ধরা যায়। আমরা যে বাসায় আশ্রয় নিলাম সে বাসার গৃহকর্তা ভয় পেতেন ট্রানজিস্টর ধরতে। আমি এবং আমার চাচা রাতে প্রায় শূন্য রাস্তা দিয়ে লুকিয়ে চুড়িয়ে মাইল আধেক হেঁটে যেতাম স্বাধীনবাংলা বেতার শুনতে। শুধু স্বাধীনবাংলা নয়, অধিকাংশ মানুষ বিকেলের পর সারাটা সময় ব্যয় করতেন রেডিও শোনায়। আকাশবাণী, বি.বি.সি, রেডিও অস্ট্রেলিয়া। মুক্তিযুদ্ধ যখন তুমুল পর্যায়ে তখন একদিন গভীররাতে বি.বি.সিতে শুনলাম, বাংলাদেশের এক গ্রাম থেকে একজন অনুরোধ জানিয়েছেন—জোন-বেজের উইশ্যাল ওভারকাম গানটি শোনাতে। নিস্তব্ধরাত, খালি গলায় জোন বেজ গাইছেন—উইশ্যাল ওভারকাম—এ অনুভূতি এখনও ভুলিনি।

ধানমণ্ডিতে একটি বাসায় গিয়ে আমরা থিতু হলাম। পকেটে একটি 'ডাণ্ডি কার্ড' বা আইডেনটিটি কার্ড থাকতো। আমার ছিল ইলেকট্রিশিয়ানের। কারণ, রাস্তায় ধরে হানাদাররা 'ডাণ্ডি কার্ড' চাইতো। তরুণ দেখলে হাতের কনুই আর হাঁটু পরীক্ষা করতো।

এরই মধ্যে শাহরিয়ার জানালো সে সীমান্ত পেরুচ্ছে। আমিও যেতে চাইলাম। আমার চাচা রাজি হলেন না। কারণ, আমি তাঁর দায়িত্বে, আমার বাবা-মা চাঁটগায়, যোগাযোগ হয়নি তখনও। মনে আছে ভারী মুষড়ে পড়েছিলাম তখন। তিনি বলেছিলেন, সবাইকে চলে যেতে হবে এমন কোন মানে নেই। এখান থেকেই কাজ করার সুযোগ পাবে।

এপ্রিলের শেষের দিকে ঢাকায় প্রতিরোধের ভিত্তিগুলো গড়ে উঠতে লাগলো। আমার চাচা, অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন, অধ্যাপক জয়নুল আবেদীন এদের এবং আরো অনেকের চেষ্টায় একটি গ্রুপ হলো যাদের মূল কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের এবং শহীদ পরিবারদের সাহায্য করা। মাঝে মাঝে রাত গাঢ় হলে গিয়াস স্যার বা জয়নুল স্যার আসতেন ধানমণ্ডির বাসায়। মাঝে মাঝে আমাকে দেয়া হতো ইংরেজি সংবাদ অনুবাদের ভার বা ইংরেজি রিপোর্ট বিদেশী সাংবাদিক বা তাদের কনট্যাক্ট পার্সনকে পৌঁছে দেয়ার জন্য। বেবী মওদুদ থাকতেন আমার কাছাকাছি। তিনিও সাহায্য করতেন এসব কাজে। বস্তুত তখন বেঁচে আছি এটি আশ্চর্য মনে হতো। প্রতিরাতে অপেক্ষা করতাম গেরিলাদের গ্রেনেড বা স্টেনের আওয়াজ শোনার জন্য। তাদের একটি গ্রেনেডের আওয়াজ আমাদের আরো একদিন বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগাত।

একদিনের কথা মনে আছে। ধানমণ্ডির একটি এলাকায় গেরিলারা রাতে অপারেশন করেছিলেন। পরদিন আমাদের এলাকাটি ঘিরে ফেলা হলো। আমাদের ফ্ল্যাটে যতো তরুণ ছিল তাদের সবাইকে ঘর থেকে বের করে এনে রাস্তায় দাঁড় করানো হলো। ক্রুর চোখে বেয়নেট হাতে একজন হানাদার সৈনিক আমাদের সবার 'ডাণ্ডি কার্ড' পরীক্ষা করে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতো লাগলো। আমাদের সেগুলো কুড়িয়ে দিতে হচ্ছিলো। বেছে বেছে

তারা ঠিক আমার পাশের যুবকটিকে ধরে নিয়ে গেলো। এ ঘটনার পরপরই আমার চাচী রিকশা করে সেনাবাহিনীর কর্ডন এড়িয়ে আমাকে পৌঁছে দিলেন পুরনো ঢাকায় আমার ফুফুর বাড়ি। অবরুদ্ধ দেশে এ ধরনের ঘটনা প্রতিদিনই ঘটতো। এরই মাঝে আমরা বেঁচে থেকেছি, যে যেভাবে পেরেছে সাহায্য করেছি মুক্তিযোদ্ধাদের, দেখেছি অনেক ক্ষুদ্রতা; মহানুভবতাও। কিন্তু একটি বিষয়ে হাজার বছরে আমরা ঐক্যমত্যে পৌঁছেছিলাম এবং তা হলো স্বাধীনতা। আর চেয়েছিলাম স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার।

বিজয়ের মুহূর্তে আমি ছিলাম চাটগাঁয়। আমাদের বাসা ছিল সল্টগোলায় বন্দর আবাসিক এলাকায়। ঘরের বারান্দা থেকে দেখা যায় জাহাজের মাস্তুল। ভারতীয় বিমান বাহিনী যখন চট্টগ্রাম বন্দরে আক্রমণ শুরু করে সেদিন থেকেই অনুভব করি মুক্তি আসন্ন। চট্টগ্রাম বন্দরের চারপাশে ও ভেতরে তখন সেনাবাহিনী, রাজাকার ও আলবদরদের উপস্থিতি প্রবল। আমরা এরকম বন্দী জীবনই যাপন করি। বিমান হামলার দিন থেকে শুনতে পাই, রাজাকার, আলবদরদের উপস্থিতি বাড়ছে, হত্যাকাণ্ড শুরু হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। কলোনির সবাই আস্তে আস্তে বাসা ছেড়ে চলে যেতে লাগলো। এর মধ্যে বিমান আক্রমণ জোরদার করা হয়েছে। বারান্দা থেকে দেখি বিমানের বোমাবর্ষণ আর বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলায় ফুলঝুরি। আমরা ও আমাদের দু'প্রতিবেশী ঠিক করি, আমাদেরও চলে যেতে হবে।

কর্ণফুলির তীরে, অভয়মিত্র ঘাটের কাছে বন্দরের আরেকটি আবাসিক এলাকা আছে যার কয়েকটি বাড়ি ছিল খালি। আমরা তিন পরিবার সেখানে আশ্রয় নিলাম। ঠিক সামনে কর্ণফুলী, ওপারে গ্রাম। আবাসিক এলাকাটি সদর রাস্তা থেকে সোয়া মাইল ভেতরে। একেবারে নির্জন। নদীর তীরে বসলে অবশ্য একেবারে স্টিল মিল পর্যন্ত দৃষ্টি মেলে দেওয়া যায়।

আমরা সারাদিন রেডিওর সামনে বসে থাকি। রাতে প্ল্যানচেট করি। স্বাধীনতা আসবে কবে? শেখ মুজিব ফিরবেন কবে? বেতারে পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হচ্ছে। তারা মানছে না। অস্থির বোধ করি। সারা দেশের কোন খবর জানি না। রাতে বা দিনে বিমান আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করি। প্রথম দিন, সবাই ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিয়েছিলাম। পর দেখি, এ আক্রমণের নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু আছে। তখন আমরা নদীর তীরে বসে বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিমান হামলা দেখি। এভাবে নিরাপদে এতো কাছ থেকে যুদ্ধ দেখা বোধহয় আর সম্ভব হবে না। বঙ্গোপসাগরের মাঝ থেকে উড়ে আসে দুটি কি তিনটি বিমান। নিচু হয়ে লক্ষ্য বস্তুর ওপর বোমা ফেলে। পাকিস্তানিরা বিমান বিধ্বংসী কামান ছুঁড়ে। মিত্রবাহিনীর বিমান তার ফাঁক গলে বেরিয়ে যায়। একরাতে রিফাইনারির মজুদ তেল গুদামে বোমা পড়ল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো, পশ্চিমের আকাশ হয়ে উঠলো রক্তিম। চেয়ে থাকি আর বলি, শেষ হয়ে যাক, একেবারে সব গুড়িয়ে যাক।

ঐ ক্রোধের কারণ অবরুদ্ধ দেশে নয়মাসের ক্রীতদাসের জীবনযাপন।

১৬ই ডিসেম্বর প্রায় সন্ধ্যায় জানতে পারলাম পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। স্বাধীন— এই বোধটি তখনো নির্বস্তুক ঠেকে আমাদের কাছে। আরো সংবাদের আশায় বসে থাকি। ঘর ছেড়ে বেরুই না, কোথায় যাবো? নির্দিষ্ট ঠিকানায় তো নেই কেউ। সন্ধ্যার মুখোমুখি

গেটে জীপের শব্দ। সবাই চমকে উঠি। কেউ সাড়া দিই না। জীপ থেকে নেমে আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে কে যেন নাম ধরে ডাকে। বেরিয়ে দেখি জাহাঙ্গীর চৌধুরী। আমাদের পারিবারিক বন্ধু। ছিলেন নৌ-কমান্ডো। রাজাকার-আলবদরদের হাতে ছিলেন বন্দী। সিলিংয়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে অত্যাচার চালাতো। জিভে সুঁই বিঁধিয়ে দিতো। আজ দুপুরে ছাড়া পেয়ে খুঁজে বের করেছেন আমাদের।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকি। জড়িয়ে ধরি নিঃশব্দে। ঘর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে আসেন। 'আজ আমরা স্বাধীন' কে যেন বলে ওঠে। জাহাঙ্গীর চৌধুরীর সঙ্গে বেরিয়ে আসি রাস্তায়। শূন্যে কারা যেন গুলি ছুঁড়ছে। আগুন জ্বেলেছে, কেউ টায়ার জড়ো করে। দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে—'জয় বাংলা'। আমাদের এই নির্জন এলাকায় সে শব্দ অস্পষ্ট হয়ে ভেসে আসে। আমি চিৎকার করতে চাই। স্বাধীনতার আনন্দে নয়মাস ভেসে যায়। হাত তুলি আকাশের দিকে কিন্তু অতি আবেগে গলা দিয়ে শব্দ বের হয় না। কয়েকবার চেষ্টা করে বলি—'জয় বাংলা'। বহুদিন পর চোখ ভরে ওঠে পানিতে।

অবরুদ্ধ জীবনের অনেক ডিটেলস মনে নেই, আগেই বলেছি। কিন্তু এখনো মনে আছে, হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের হিংস্রতা। প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের অপমানিত ও পদদলিত হতে হয়েছে। তাই আজ যখন একটি প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধকে ভুলে গিয়ে বিভ্রান্তিকর কথা বলে তখন তাদের জন্য করুণা হয়। কারণ যে প্রজন্ম অতীত গৌরবকে গৌরব মনে করে না তাদের ভবিষ্যৎ নেই। অপমানিত বোধ করি, ক্রোধে সব ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় যখন একদল রাজনীতিবিদ জামাত ও স্বাধীনতা বিরোধীদের কোল পেতে দেয়। তিনশো বছর আগে এ ধরনের বাঙালিদের সম্পর্কে এ অঞ্চলের কবি আবদুল হাকিম লিখেছিলেন—'সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'। আমি কবি নই, তাই এ ধরনের উক্তির স্পর্ধাও নেই। আমি শুধু বলতে পারি, যে দেশে ত্রিশ লাখ লোকের আত্মদানের কোন মর্যাদা নেই সে দেশে মৃত্যুও আর কোন গৌরবের বিষয় নয়।

১৯৯৩

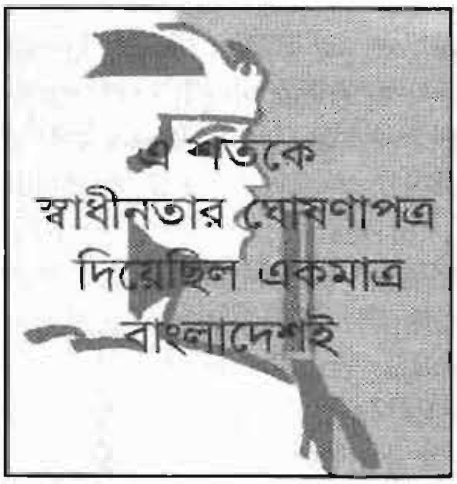

পৃথিবীতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে এমন দেশের সংখ্যা হাতে গোনা। কিন্তু বাঙালিরা বলতে পারে এ শতকে তারাই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতার লড়াই শুরু করেছিল। কথাটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু ঠিক পঁচিশ বছর আগে মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সরকার একটি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল এবং সেই সরকারই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংক্রান্ত রচনাবলিতে মুজিবনগর প্রায় অস্পষ্ট, নির্বস্তুক বস্তু। এ রজত জয়ন্তীতেও তার ব্যতিক্রম নয়। মুক্তিযুদ্ধ যেমন, এখনও তেমন আমাদের জাতীয় জীবন থেকে এর সংশ্লিষ্টতা খাটো করে দেখার উপায় নেই।

মুজিবনগর সরকার ছিল ধারাবাহিকতার ফসল, একথা বলেছেন মুজিবনগর সংশ্লিষ্ট অনেকে। ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম বলেছেন, মুক্তাঞ্চলে আমরা প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলাম। তারপর মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে আমরা তার অন্তর্গত হয়ে যাই।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বলেছেন, তিনি এবং তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তাঞ্চল দিয়ে ভ্রমণ করে সীমান্তে পৌছান এবং ওপারে খবর পাঠানো হয় তাঁদের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে নিয়ে গেলে তারা যাবেন, নয়ত নয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তা করে এবং তার পরের ইতিহাস মোটামুটি সবার জানা।

ডঃ চৌধুরী ছিলেন তখন মেহেরপুরের এসডিও। তিনি মেহেরপুরে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তাজউদ্দীন ও আমিরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি জানালেন, একটি সরকার গঠিত না হলে সমস্ত তালগোল পাকিয়ে যাবে। দেশ-বিদেশের অনেকেই এ সরকার বিষয় জানতে চাইছে। 'কার জন্য, কার অধীনে তোমরা যুদ্ধ করছ?'—এ ছিল প্রশ্ন। ড. চৌধুরী বললেন, "আমি তাদের বললাম, অতি শীঘ্র যেন তাঁরা এর ফয়সালা করেন।" এরপর তাঁরা বর্ডার ক্রস করেন।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে। সে সময় এ ধরনের একটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল মানুষের মনোবল অটুট রাখা ও প্রবাসী সরকারের অস্তিত্ব জ্ঞাপনের জন্য। প্রথম বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৭ই এপ্রিল পালিত হচ্ছে মুজিবনগর দিবস।

১৭ই এপ্রিলের এক সপ্তাহ আগে, ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে ১৭ থেকে ১০ই এপ্রিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকার-এর পত্তন থেকে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর কাছে কিছু জানতে চেয়েছিলাম।

তিনি জানালেন, ৪ঠা এপ্রিল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদও তাঁর সাক্ষাৎকারের পর সরকার গঠনের কথা তাঁরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। "কেননা ভারত সরকারের সাথে একটি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কথা বলা উচিত।" এদিকে সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে চাপ আসা অব্যাহত রয়েছে। সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাজউদ্দীন ভাইকে খুবই চিন্তিত মনে হয়। অস্ফুট স্বরে তিনি বলে ফেলেন, বঙ্গবন্ধু আমাকে কি বিপদে ফেলে গেলেন। আমি বিরক্তির সাথে জানতে চাইলাম সরকার গঠনের ব্যাপারে তাজউদ্দীন ভাই দ্বিধাগ্রস্ত কেন? জবাবে তাজউদ্দীন ভাই বলেন, "আপনি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি জানেন না। সরকার গঠন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝি। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তা প্রয়োজন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ও অন্য নেতাদের অনুপস্থিতিতে সরকার গঠন করে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।"

এসব অন্তর্দ্বন্দ্ব, মনোমালিন্যের কথা আমরা পরবর্তীকালে শুনেছিলাম। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমদ সঠিক কাজটিই করেছিলেন। ব্যারিস্টার ইসলামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনারা কি আগে থেকে এমন কোন ধারণা করেছিলেন যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হবে।" তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ ধরনের চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। কতটা সুনির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল তা আমরা জানি না, তবে এটা ঠিক কিছু চিন্তাভাবনা ছিল। না হলে এত দ্রুত কোন সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ঠিক হয়েছিল বঙ্গবন্ধু যে পাঁচজনকে নিয়ে হাইকমান্ড গঠন করেছিলেন, প্রথম মন্ত্রিসভায় তারাই থাকবেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। এ নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু ১০ই এপ্রিল ঘোষণার পর এসব বিষয় নিয়ে আর উচ্চবাচ্য হয়নি।

কিন্তু এটি হচ্ছে পরের ঘটনা। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাজউদ্দীন আহমদের মনে এ ধারণা দৃঢ় হয় যে, সরকার একটি গঠন করতে হবে এবং তাড়াতাড়ি না করলে স্বাধীনতার কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। ঐ দু'এক দিনের কথা জানেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম; কারণ তিনিই তখন ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে। সে সময়ের ঘটনা তিনি বিবৃত করেছেন তাঁর বই 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি'তে। লিখেছেন তিনি—

"তারপর কথা উঠলো দেশের নাম কি হবে? আমি বললাম, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।' তাজউদ্দীন ভাই-এর পছন্দ হলো। নামটি ঠিক করার সময় আমাদের মাথায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কথা মনে হচ্ছিল। এ সময় সরকারি কাগজপত্রে ব্যবহারের জন্য একটি মনোগ্রাম ঠিক করা দরকার। মনোগ্রাম আমাদেরই ঠিক করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে মনোগ্রাম সরকারি কাগজপত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা আমার হাতে আঁকা। চারপাশে গোলাকৃতি লাল-এর মাঝখানে সোনালি রং-এর মানচিত্র। মনোগ্রাম দেখে তাজউদ্দীন ভাই পছন্দ করলেন। শুধু তাই নয়, সাথে সাথে তিনি তা অনুমোদনও করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি তার প্রথম সরকারি অনুমোদন।"

এরপর তাজউদ্দীনের বক্তৃতা। ইংরেজি খসড়াটি করেন রেহমান সোবহান। লিখেছেন ব্যারিস্টার ইসলাম—"তাঁর ইংরেজি খসড়ার একটা অংশ আমাদের খুব ভাল লেগেছিল।

সেটা ছিল "Pakistan is dead and buried under mountain of corpese," বাংলায় এর অনুবাদ করি পর্বত প্রমাণ লাশের নিচে পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে।"
এ পর্বের পর টেপকৃত বক্তৃতা প্রচারের প্রসঙ্গ। টেপে তাজউদ্দীনের বক্তৃতা টেপ হলো, ঠিক হলো ১০ তারিখ শিলিগুড়ির জঙ্গল থেকে প্রচারিত হবে। টেপ দিয়ে দেয়া হলো বি.এস.এফ-এর গোলক মজুমদারকে। ১০ তারিখে তা প্রচারিত হবে। ইতোমধ্যে সরকার গঠন নিয়ে আরো আলোচনা চলছে। দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তাজউদ্দীন জানালেন আমিরুল ইসলামকে যে, বক্তৃতা প্রচার ঠিক হবে না। গোলক মজুমদারকে যেন তা জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু টেপ হাত ছাড়া হয়ে গেছে তখন।
এই দিন ছিল দশই এপ্রিল। "রেডিও অন করে খেতে বসেছি"। লিখেছেন, ব্যারিস্টার ইসলাম, "খাওয়ার টেবিলে তাজউদ্দীন ভাই ও শেখ মণি আছেন। রাত তখন সাড়ে নয়টা। সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত আসলো। প্রথম আমার কণ্ঠ ভেসে আসলো। ঘোষণায় আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বক্তৃতা দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা প্রচারিত হলো। সারা বিশ্ববাসী শুনলো স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা। আমাদের সংগ্রামের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো।"
১০ই এপ্রিল স্বাধীনতা ঘোষণার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে আরও দুবার স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। ২৬শে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়, যার প্রথম লাইন ছিল—"This may be my last message, from today Bangladesh is independent."
২৭শে মার্চ, অর্থাৎ পরদিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেন—"Major Zia, Provisional Commander-in Chief of Bangladesh Liberation Army, hereby Proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh." এখানে উল্লেখযোগ্য বাক্যটি হলো, শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে। এর দুসপ্তাহ পর দেয়া হয় মুজিবনগর ঘোষণা। এখানে আরও উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ক তিনটি ঘোষণাই ইংরেজিতে। যদিও এরা সবই ছিলেন বাঙালি।
মুজিবনগর ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, একটি সরকার এ ঘোষণা দিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ সেই সরকারের কর্তৃত্বেই পরিচালিত হয়েছে। ঘোষণাটি ২৪ অনুচ্ছেদের। ঘোষণায় মূলত যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল, তা হলো—১৯৭০ সালের যুক্ত নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছিলেন দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য। ১৬৯ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ছিল ১৬৭। এ কারণে, জেনারেল ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন; কিন্তু পরে বেআইনি ও একতরফাভাবে তা স্থগিত রাখা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের সম্মান ও সংহতি রক্ষার আহ্বান জানান। এ পটভূমিকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণাকে অনুমোদন করছে।
ঘোষণাটি আইনের ভাষায় রচিত এবং তা রচনা করেছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম। এ ঘোষণায় গুরুত্বপূর্ণ দুটি বাক্য হচ্ছে—

১. "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি।"
২. বাংলাদেশের মানুষের শৃঙ্খলাপূর্ণ ও ন্যায়মূলক সরকার প্রদানের [জন্য] যা যা করা দরকার তা করবেন।

এ ঘোষণায়ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের তারিখ ঘোষিত হয় যা নিয়ে এখনও হাস্যকর সব বিতর্ক হয়। মুজিবনগর ঘোষণায় পরিষ্কারভাবে লেখা আছে—"আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।"
এই তারিখে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম "অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আইন বলবৎকরণ আদেশ জারি" করেন। এ আদেশের বলে বাংলাদেশের ওপর অস্থায়ী সরকারের আইনগত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। শেষ হয় মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রথম পর্যায়। এর পরের পর্যায় হলো সরকার গঠন, শপথ ও কার্যক্রম পরিচালনা।

দুই

১১ তারিখ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের একটি দীর্ঘ ভাষণ প্রচার করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি যা বলেছিলেন ঠিক তাই ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে। এ ভাষণটির কথা অনেকের মনে নেই; কারণ কোথাও এর উল্লেখ নেই। উপসংহারে যে মন্তব্যগুলো করেছিলেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ—

১. আমাদের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস।
২. আমাদের মুক্তিবাহিনীর হাতে শেষ পরাজয় মেনে নেয়ার আগে শত্রুরা আরও অনেক রক্তক্ষয় ও ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করবে।
৩. এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ ... এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ।

১৩ই এপ্রিলের মধ্যে হাইকমান্ডের সদস্যরা মন্ত্রিসভা গঠন চূড়ান্ত করলেন। আপাতত অন্তর্দ্বন্দ্ব সবাই ভুলে গেলেন। ১৪ই এপ্রিল ঠিক হয়েছিল চুয়াডাঙ্গায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। কিন্তু হয়ত পাকিস্তানিদের কাছে সে খবর পৌছে গেল। ১৪ তারিখ চুয়াডাঙ্গায় সাংঘাতিকভাবে বোমাবর্ষণ করা হলো। তারপর মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় ঠিক হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। এবার আর কাউকে জানানো হলো না কোথায় শপথ হবে। ১৭ তারিখ কলকাতা প্রেসক্লাব থেকে সাংবাদিকদের নিয়ে আমিরুল ইসলাম পৌছেন বৈদ্যনাথতলায়। ১১টার দিকে তাঁরা সেখানে পৌছান।
মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম ছিলেন ঝিনেদাহ্‌র এস.ডি.পিও। যুদ্ধ করতে করতে তিনি তখন সীমান্তের কাছাকাছি। তিনি জানিয়েছেন, তৌফিক-ই-ইলাহী তাঁকে খবর পাঠান দ্রুত বৈদ্যনাথতলায় পৌছতে হবে। সেখানে পৌছে তিনি দেখেন নিরাভরণ একটি মঞ্চ। তাঁকে জানানো হয়, মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করবে এবং গার্ড অফ অনারের বন্দোবস্ত

তাকে করতে হবে। তিনি আশেপাশে আনসার পুলিশ যাদের পেলেন তাদের নিয়ে গার্ড অফ অনার দিলেন।

কর্নেল (অঃ) আবু ওসমান চৌধুরী আমাকে বলছেন, "শপথ গ্রহণের আগে গার্ড অফ অনার হয় কিভাবে? সত্যিকার গার্ড অফ অনার দেয়া হয় পরে এবং তখন আমি সেখানে ছিলাম।"

ব্যারিস্টার ইসলাম লিখেছেন—"কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। একটি ছোট মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, ওসমানী, আবদুল মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই স্থানের নাম 'মুজিবনগর' নামকরণ করেন। ১৬ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিবনগর ছিল অস্থায়ী সরকারের রাজধানী।"

তৌফিক-ই-ইলাহী বলেছেন, "নিজেকে মনে হচ্ছিল ধাত্রীর মতো। একটি দেশের জন্ম হচ্ছে। প্রত্যক্ষ করছি"। আবেগে তার গলা বুজে আসে। "সে আমবাগানে হাজার লোকের ভিড়, "জানিয়েছেন আমিরুল ইসলাম, আর চারদিকে মুখরিত শ্লোগান 'জয়বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।"

আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নিল বাংলাদেশ। এরপরই মন্ত্রীসভা, মুক্তিবাহিনী পুনর্গঠন, যুদ্ধ চালনা, সিভিল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ সব ইতিহাস আমাদের জানা। মুজিবনগর সরকারের অধীনে (যার প্রধান ছিলেন শেখ মুজিব) যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। এক্ষেত্রে জনাব তাজউদ্দীনের নেতৃত্ব অবশ্যই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ আলোচনার সময় এই সরকার, এই সরকারের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন এবং যারা এর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন তাদের কোন কারণে হেয় করা ঠিক নয়। তাতে ইতিহাসের বিকৃতি হয় মাত্র।

প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর ১৭ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ দীর্ঘ এ প্রেস স্টেটমেন্ট প্রদান করেন, যার শিরোনাম ছিল 'টু দি পিপল অফ দি ওর্য়াল্ড'।

দীর্ঘ এ প্রেস স্টেটমেন্টে বাংলাদেশের স্বাধীতার ঘোষণার পটভূমি বর্ণিত হয়েছে। এর মূল সূত্রগুলো ছিল এ রকম—

১. পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বাধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় স্বাধিকার সংগ্রামের পথ বেছে নিতে হয়েছে।

২. পাকিস্তান কাঠামোর ভেতর বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্য ছয় দফা দেয়া হয়েছিল এবং ১৯৭০ নির্বাচনের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছিল।

৩. এর আগে আর কোন দাবির প্রতি মানুষ এমন ব্যাপক সমর্থন জানায়নি। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে যেখানে ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল সেখানে ছয় দফার কথা নির্বাচনের সময় উল্লেখ করা হয়নি। বালুচিস্তানে সেখানে ন্যাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তারা ছয় দফার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদে ন্যাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও অধিকমাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছিল।

৪. ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও পিপলস্ পার্টি ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নির্বাচিত সদস্য পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া অ্যাডমিরাল আহসানকে বরখাস্ত করেন। যাকে মডারেট মনে করা হত। মন্ত্রিসভায় বাঙালি সদস্যদের বরখাস্ত করা হয়, যাতে ক্ষমতা একমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

৫. ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে আঁতাত করে এগুলো করেছেন; কারণ তারা চাননি পাকিস্তানের পার্লামেন্টই ক্ষমতার আসল উৎস হয়ে উঠুক।

৬. এসব কারণে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হয়েছিল।

৭. অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছিল শেখ মুজিবকে এবং নিজেদের স্থাপন করেছিল তার কর্তৃত্বের অধীনে।

৮. এ পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ বাধ্য হয়ে অর্থনীতি ও প্রশাসন সচল রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শুধু মানুষ নয়, প্রশাসন ও ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ও শর্তহীনভাবে সমর্থন দিয়েছে। তারা আওয়ামী লীগের নির্দেশ মেনে চলেছে এবং নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগকেই একক কর্তৃত্ব হিসেবে মেনে নিয়েছে।

৯. ইয়াহিয়া ৬ই মার্চ এক প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা আসবে।

১০. যদিও মানুষ স্বাধীনতা চাচ্ছিল; কিন্তু শেখ মুজিব আবারও রাজনৈতিক সমাধানের পথে যেতে চেয়েছিলেন।

তাজউদ্দীন এরপর ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেছেন, "লাশের পাহাড়ের নিচে পাকিস্তান এখন মৃত ও কবরস্থ এবং এসব ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে ইয়াহিয়া ও তার সমর্থকরা অনেক আগে থেকেই দুই দেশের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল।"

তাজউদ্দীন সবশেষে আশা ব্যক্ত করে বলেন, "বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল দেশ এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ছাই থেকে এক নতুন দেশ গড়ে তোলা। তাই ছোট-বড় সকল শক্তির সহযোগিতা তার কাম্য—

"We do not aspire to join any block or pact but will seek instance from those who give it in a spirit of goodwill free from any desire to control our destinies. We have struggled for too long for our selfdetermination to permit ourselves to become any ones satellite."

স্বাধীনতার ঘোষণা ও তাজউদ্দীন আহমদের বক্তব্যে এ কথাটি ধ্বনিত হয়েছিল যে, বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে সমতা, মানবিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার রক্ষাকল্পে এবং ন্যায়মূলক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য। আদর্শগুলো প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে। শাসনতন্ত্রের চারটি মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল—জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটিই বিবেচনা করা হত যে, সমাজতন্ত্র মানুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা করে ও মানুষের সম্মান নিশ্চিত করে।

ন্যায়মূলক সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হত সংসদীয় গণতন্ত্রকে। এ সমস্ত আদর্শ রক্ষা করা যাবে যদি কোন শক্তির লেজুড় না হওয়া যায়। এবং কোন জোটে আবদ্ধ না হওয়া যায়। যে কারণে বাংলাদেশ সরকার জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছিল।

স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যে কিন্তু আহত হয়েছিল চারটি নীতির একটি গণতন্ত্র। ছাই থেকে দেশ গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার সচেষ্ট ছিলেন, বিরাট কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনাও করেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সে সরকার পারেনি। এর কারণ শুধু যে স্বাধীনতাবিরোধী ও বৈরী শক্তির চাপ তা নয় নিজের দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাও ছিল বড় কারণ। এর প্রধান সামাজিক কারণ ছিল, একটি যুদ্ধ পুরো একটি দেশ ও জেনারেশনকে বদলে দিয়েছিল। তরুণ জেনারেশন অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিল এবং তা ছেড়ে দিতে তারা রাজি ছিল না। ঐ সময়ের আমাদের ও আমাদের পূর্বকার জেনারেশনের সে কথা ভোলার কথা নয়। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে, দেশের পরিস্থিতি উন্নত হলে, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে তিনি এগিয়ে আসতেন কি না তা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু ১৯৭২ সালে সংবিধানের অন্য তিনটি আদর্শ যে ক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা হয়েছিল তা সবাই স্বীকার করবেন এবং মুজিবনগর ঘোষণায় যে পররাষ্ট্রনীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তাও মেনে চলা হয়েছিল, যে কারণে বৃহৎ কিছু শক্তিবর্গ ও জোট মুজিব সরকারের প্রতি বৈরী আচরণ করেছিল; কিন্তু শেখ মুজিব বেঁচে থাকলে মনে হয় তার ব্যক্তিত্বের কারণেই এসব বাধা কাটিয়ে উঠতে পারতেন।

১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের হত্যার পর বাংলাদেশের পুরো পরিস্থিতিই পাল্টে যায়। মুজিবনগরের স্বাধীনতা ঘোষণার অঙ্গীকারগুলোও এ সময় পরিহার করা হয়। গণতন্ত্রের জায়গা নেয় সামরিকতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থান নেয় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র একেবারেই বর্জিত হয়। স্বাধীনতা ঘোষণা, যে কোন জাতির জন্যই অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এবং স্বাধীনতা ঘোষণার মূল সূত্রগুলো সব সময় সংরক্ষণে জাতি সচেষ্ট থাকে। একমাত্র বাংলাদেশেই চার বছরের মধ্যে স্বাধীনতার ঘোষণাকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়। প্রশ্ন করা যেতে পারে, যদি স্বাধীনতার ঘোষণাকে জলাঞ্জলি দেয়া হয় তা হলে জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয় কিনা? নাকি, এ জাতি যেসব কারণে যুদ্ধ করেছিল সেগুলো ছিল ভুল? এ প্রশ্নটি আমাদের প্রত্যেকের বিবেকের কাছে করা উচিত। এখানে আরো মনে রাখা দরকার, স্বাধীনতার ঘোষণা পশ্চিম পাকিস্তানি বা অন্য কোন বহিঃশত্রু দ্বারা পদদলিত হয় নি। এটি হয়েছে বাংলাদেশের বাঙালি সৈনিকদের একাংশের দ্বারা। এবং ঐ সময় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান। আগেই উল্লেখ করেছি মুজিবনগর ঘোষণার মূলসূত্রগুলো বিধৃত হয়েছিল। ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্র। জিয়াউর রহমান থেকে এরশাদ আমল—এ পনের বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। এরশাদ আমল জিয়া-আমল থেকে ভিন্নতর কিছু ছিল না বরং ছিল পূর্ববর্তী আমলের যোগ্য উত্তরসুরি। মুজিবনগর ঘোষণায় বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠাকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হ্যাঁ, মুজিব আমলে এর ওপর আঘাত

হানা হয়েছিল; কিন্তু প্রতিষ্ঠান ভাঙার সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। জিয়া ও এরশাদ আমলে শুধু সিভিল সমাজের আধিপত্য খর্ব করার জন্য শাসনতন্ত্রে ৭ বার বড় ধরনের সংশোধন করা হয়।

তিন

মুজিবনগর ঘোষণার আগে স্বাধীনতার আরো দুটি ঘোষণা দেয়া হয়েছিল বলে আগেই উল্লেখ করেছি। সংবিধানে মুজিবনগর ঘোষণা বিধৃত হয়েছে। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর থেকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানের নাম বারবার প্রচার মাধ্যমে উল্লেখ করে পুরো একটি প্রজন্মকেই বিভ্রান্ত করা হয়েছে এবং এভাবে জাতির জন্ম পরিচয়েই আঘাত হানা হয়েছে। যে তিনটি ঘোষণার কথা প্রবন্ধের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—এ তিনটিই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং জিয়া আমলে তার কাজ হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ দলিল এখন সরকার স্বীকৃত। এর কোনটিতে কি উল্লেখ করা আছে যে, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন? সুতরাং বি.এন.পি. যে কাজটি করেছে তা রাষ্ট্রবিরোধী, ইতিহাস বিরোধী এবং জবরদস্তিমূলক কাজ। এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রতিহত করা স্বাধীনচেতা প্রতিটি নাগরিকের জাতীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তবে, মুজিবনগর ঘোষণার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। স্বাধীনতা ঘোষণা ও তাজউদ্দীনের বক্তব্যে একটি সুর লক্ষ্য করা যায়—তা হলো, বাঙালি এ যুদ্ধে যেতে চায়নি। সে স্বাধিকার চেয়েছে। সেই ন্যায্য দাবি মেনে তাকে দমনের জন্য গণহত্যা চালানো হয়েছিল এবং সে কারণে সে বাধ্য হয়েছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে। সে সবসময় রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছে। তাজউদ্দীন বলেছেন, "ইয়াহিয়া আশা করেছিলেন ৭ই মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন।' এরপর তাজউদ্দীন কিন্তু নীরব। সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নেতৃবর্গ এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, শত প্ররোচনা সত্ত্বেও শেখ মুজিব রাজনৈতিক সমাধান চেয়েছিলেন। তার বদলে তাঁকে উপহার দেয়া হয় গণহত্যা। সে কারণে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ডাক দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এ কারণে, ২৬শে মার্চই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্ক সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু নির্দ্বিধায় বলা যায়, ১৯৭১ সালের মার্চের শুরুতেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির পত্তন হয়েছিল এবং তা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই। ইতিহাসের একজন সামান্য ছাত্র হিসেবে আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে যে তিন খণ্ডের 'বাংলাদেশের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়েছে তাতেও এ বক্তব্যই দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর 'রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্তভাবে তা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে ৩৫টি নির্দেশ শেখ মুজিব জারি করেন তা, "কর্তৃত্ব প্রতিরোধ এবং অস্বীকার করার মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতা এবং বিপরীত জনমুখী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বাঙালি জনসাধারণের সঙ্গে প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতার ভিত্তি তৈরি করে। ... বাঙালি

জনসাধারণ একটি স্বতন্ত্র, বিকল্প স্বাধীন রাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়ার বোধ যুদ্ধের পূর্ব থেকেই বুকের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, বুদ্ধির মধ্যে লালন করতে থাকে।"

ড. জাহাঙ্গীর আরো লিখেছেন যে, এই সব নির্দেশের মধ্যে দিয়ে শেখ মুজিব "বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের ভিত্তি তৈরি করে দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় নীতিমালার নির্দেশ দেন।"

ইতিহাসের আলোকে বিচার করলে কিন্তু ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার দিবস হিসেবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

মুজিবনগর ঘোষণায় যা বলা হয়েছিল আজ পঁচিশ বছর পর তার অধিকাংশই বিলীন হয়ে গেছে। একটি দেশের উত্থানের জন্য পঁচিশ বছর কম সময় নয়। কিন্তু এই সময়ে বাংলাদেশ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে "মানুষের সাম্য, মানবিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার' সবই লুপ্ত। মুজিবনগর ঘোষণায় বাঙালি জাতির যে আত্মমর্যাদার কথা বলা হয়েছিল দৃপ্ততরে তা আজ অপসৃত। একটি জাতির উন্নয়নের জন্য যে দিক নির্দেশনার প্রয়োজন তার সবই ছিল আমাদের শাসনতন্ত্রে। আজ পঁচিশ বছর পর তা যুগোপযোগী নয় এমন কথা এখনও বলা যাবে না। ঐ ঘোষণা, তথা শাসনতন্ত্র যদি নিষ্ঠভাবে মেনে চলা যায় তাহলে জাতি অনেক বিভ্রান্তি, দ্বন্দ্ব দূর করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। ঐ ঘোষণার মূল বাণী সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার কাঠামোও নির্মাণ করা যেতে পারে।

মুজিবনগর ঘোষণা দিয়েছিল জাতির পক্ষে আওয়ামী লীগ। ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিল জাতির পক্ষে আওয়ামী লীগ। এখন জাতির মর্যাদাজ্ঞাপক ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রে আবার ফিরে যাবো কিনা তাও নির্ধারণ করতে পারে আওয়ামী লীগ।

১০-১১.১২.১৯৯৬